মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান

অরুণ ঘোষ

এম্-এ, এম্-এড্, পি-এইচ-ডি,

এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স

৫/১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি-৯

পুরোভাষ

প্রথম সংস্করণ

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একটি সাম্প্রতিকতম বিজ্ঞান। একথা বললে একটুও অসত্য বলা হবে না যে আজও বিদেশ থেকে ভারতে প্রকৃত পক্ষে এর নামটিই এসে পৌছেছে, তার বেশী কিছু আসে নি। বস্তুত শিক্ষক, ছাত্র ও বিশেষজ্ঞদের গোষ্ঠীর বাইরে বর্তমানে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রকৃত তাৎপর্য কেউ বোঝে বলে মনে হয় না। আর যে দেশের জনসাধারণ দৈহিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কেই শোচনীয়ভাবে অজ্ঞ তাদের কাছে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ধারণাটাই যে অকল্পনীয় সে কথা বলা বাহুল্য।

অথচ এই বিজ্ঞানটির প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা আজকের সব দেশের মনীষীরাই বুঝতে পেরেছেন। নিছক ব্যক্তিগত সুষ্ঠু জীবনধারণের জন্যই যে এই শাস্ত্রটির জ্ঞান আবশ্যক তা নয় মৌলিক মানব সমস্যাগুলির সমাধান এবং সামাজিক সংহতি ও বিকাশ সাধনের জন্যও এই বিজ্ঞানটির সাহায্য অপরিহার্য এটি আজ বিদ্বদ্‌জনস্বীকৃত সত্য।

শিক্ষাতত্ত্বের স্নাতক, উত্তরস্নাতক, শিক্ষকশিক্ষণ প্রভৃতি পাঠস্তরে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি একটি অতি সুখের কথা। এই সব স্তরের শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই বইটি পরিকল্পিত।

১৬এ ফার্ন রোড, কলি-১৯

অরুণ ঘোষ

দশম সংস্করণ

প্রায় দু'দশক আগে এই বইটির প্রথম প্রকাশের পর থেকে মাঝে মাঝে এর সংস্কার সাধন করা হলেও বইটির কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ধন করা হয় নি। বর্তমানে শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সর্ব পাঠস্তরে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তির ফলে এর পরিধিরও যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটেছে। সাম্প্রতিক কালে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আধুনিক ও ব্যাপক গবেষণার ফলে 'সঙ্গতিবিধানের মনোবিজ্ঞান' শীর্ষক এর একটি স্বতন্ত্র বিভাগের উদ্‌ভব হয়েছে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সমতা রেখে বইটির এই সংস্করণ থেকে 'সঙ্গতিবিধানের মনোবিজ্ঞান' নামে একটি নতুন পর্যায় সংযুক্ত করা হল। আশা করা যায় যে শিক্ষার্থীরা এই নতুন সংযোজনটির দ্বারা বিশেষ উপকৃত হবে।

অরুণ ঘোষ

ডক্টর অরুণ ঘোষের
শিক্ষক-শিক্ষণ স্তরের অন্যান্য বই

বি-এড্'র প্রথম পত্র
শিক্ষাবিজ্ঞানের দর্শন ও মূলতত্ত্ব

বি-এড্'এর দ্বিতীয় পত্র
শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান

বি-এড্'র তৃতীয় পত্র
সাধারণ পদ্ধতি, বিদ্যালয় সংগঠন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা

বি-এড্'র চতুর্থ পত্র
শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস

বি-এড্'র বিশেষ পত্র
মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ ও পরিসংখ্যান
অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান

অন্যান্য বই
ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাস
আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস

সূচীপত্র

এক

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Mental Hygiene)

যদিও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইতিপূর্বে বহু শিক্ষাবিদ্‌ই উপলব্ধি করেছেন তথাপি সুপরিকল্পিত শাস্ত্ররূপে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অতি সাম্প্রতিক কালেই আত্মপ্রকাশ করেছে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে অবাঞ্ছিত সঙ্গতিবিধান থেকে রক্ষা করা এবং যারা নানারূপ মানসিক ব্যাধিতে কষ্ট পায় তাঁদের নিরাময় করা। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এই দু'রকম কাজ, প্রতিরোধ এবং নিরাময়, পরস্পরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে ছোটখাট মানসিক ব্যাধির নিরাময় করার ফলে কোন জটিল ও গুরুতর মানসিক ব্যাধি ঘটতে পারেনি। এই কারণে প্রতিরোধ ও নিরাময়—এ দু'য়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট বিভাজন রেখা টানা যায় না। ফলে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কেবলমাত্র অসুস্থ বা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্যই নয়, যারা সুস্থ ও স্বাভাবিক মনের অধিকারী তাদের জন্যও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে। দেশের জন-স্বাস্থ্য বিভাগ যেমন ব্যাধিগ্রস্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে তেমনই যারা সুস্থ নাগরিক তাদেরও স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকেও তেমনই মনের দিক দিয়ে রোগগ্রস্ত এবং নীরোগ উভয় প্রকার ব্যক্তিরই মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য আয়োজন করতে হয়।

একাধারে বিজ্ঞান ও প্রয়োগশাস্ত্র

বলা বাহুল্য মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একাধারে বিজ্ঞান এবং প্রয়োগশাস্ত্র। নানা পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের সাহায্যে মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও সিদ্ধান্ত আহরণ করা মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই তথ্যগুলি থেকে সর্বজনীন সূত্র গঠন করা মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্মসূচীর অন্তর্গত। এই দিক দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার এই লব্ধ তথ্য ও সূত্রগুলিকে মানসিক ব্যাধির নিরাকরণ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করাও মানসিক স্বাস্থ্য-বিধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই দিক দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকে একটি প্রয়োগশাস্ত্র বলা চলে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তি-মানুষের সত্তা ও মর্যাদার সারা বিশ্বব্যাপী যে নতুন মূল্যায়ন হয়েছে তারই একটি ফলরূপে দেখা দিয়েছে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আন্দোলনটি। বর্তমান শতাব্দীতে আমরা নতুন করে বুঝতে শিখেছি যে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের উপরই সমাজের উন্নতি নির্ভর করে। এই বিশ্বাসেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিকাশের আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে আর একটি নতুন বিজ্ঞান। তাকে আমরা বলতে পারি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology)। শিক্ষাকে কেন্দ্র করে যে মনোবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে সেই মনোবিজ্ঞানের প্রধান বক্তব্য হল যে কেবলমাত্র পাঠ্য বিষয়গুলিতেই মনোযোগ দিলে চলবে না, শিক্ষার্থীর প্রতিও সমান মনোযোগ দিতে হবে। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের এই দৃষ্টিকোণটি মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সংগঠনের সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) নামক নতুন শাস্ত্রটি এবং তাঁর অনুগামী মনোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত মানব মন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি। ফ্রয়েডই প্রথম মানব মনের অজ্ঞাত অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন এবং মানসিক ব্যাধির প্রকৃত কারণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার নতুন নতুন পথ খুলে যায় এবং অনির্দিষ্ট অনুমান-নির্ভর চিকিৎসার পরিবর্তে আধুনিক সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বর্তমান প্রসার ও অগ্রগতি মনঃসমীক্ষণের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব শিক্ষাবিদ্‌গণ বহুদিন উপলব্ধি করলেও প্রথম মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৮ সালে, আমেরিকার কনেকটিকাট নামক স্থানে। এর পরের বৎসর ১৯০৯ সালে মানসিক স্বাস্থ্যের জাতীয় প্রতিষ্ঠান নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। এই দুটি প্রতিষ্ঠানই গড়ে ওঠে ক্লিফোর্ড ডব্লিউ বিয়ারস (Clifford W. Beers) নামে একজন ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণায়। বিয়ারস অল্প বয়সে একবার মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং রোগ থেকে মুক্ত হয়ে মানসিক ব্যাধি নিরাময়ের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করার সংকল্প করেন। প্রথম প্রথম এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির কাজ ছিল মানসিক

ব্যাধির হাসপাতালগুলির রোগীদের অবস্থার উন্নয়ন করা। মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য অনুপযোগী ব্যবস্থা দূর করা, তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত আইনাদির পরিবর্তন করা, বিদ্যালয়ের ক্ষীণ-বুদ্ধি বালক-বালিকাদের শিক্ষার উন্নতি করা, অপরাধপ্রবণ এবং কারাবন্দীদের সুশিক্ষার আয়োজন করা প্রভৃতি কাজই ছিল জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীর অন্তর্গত।

অবশ্য পরের দশক থেকেই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্মপরিধি বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়ে উঠল। মানসিক ব্যাধির নিরাময়ের চেয়ে মানসিক ব্যাধির প্রতিরোধের উপরই মনোবিজ্ঞানীরা বেশী জোর দিতে সুরু করলেন। ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে বিভিন্ন শহরে ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক ক্লিনিক স্থাপিত হল। দেখতে দেখতে এই ক্লিনিকগুলি এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে এগুলির ব্যয়নির্বাহের ভার স্থানীয় জনসমাজই গ্রহণ করল। ১৯৪০ সালের পর থেকে আমেরিকান সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থাগুলি মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিস্তারের জন্য উদার হস্তে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য যোগাতে সুরু করে। এ্যাডমিনিস্ট্রেসান নামক প্রতিষ্ঠানটি বড় শহরগুলিতে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ক্লিনিক স্থাপন করলেন এবং সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের নানা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করলেন। বয়স্ক জনসাধারণের জন্য এই ধরনের সুযোগের আয়োজন মানব ইতিহাসে এই প্রথম। ক্লিনিক এবং হাসপাতালের কর্মচারীদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য মনশ্চিকিৎসা এবং চিকিৎসামূলক মনোবিজ্ঞানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হল।

মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রথম আইন

১৯৪৬ সালে জুলাই মাসে আমেরিকায় প্রথম জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য আইন (National Mental Health Act) পাশ হয়। এই আইনের দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা বলে স্বীকার করা হল। এই আইনের তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, এই আইনে বলা হল যে মানসিক রোগে অসুস্থ ব্যক্তিদের যত্ন নেওয়াই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য নয়। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য আরও ব্যাপক। দ্বিতীয়ত, এই আইনের দ্বারা এই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা হল যে মানসিক ব্যাধির প্রতিরোধ ও নিরাময় করা সম্ভব এবং তৃতীয়ত, এই আইনের দ্বারা মানসিক ব্যাধিতে বিশেষজ্ঞদের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ এবং তাঁদের লব্ধ জ্ঞানের প্রচারের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের আয়োজন করা হল।

এই আইনটিতে আরও বলা হল যে দেশের সুষ্ঠু মানসিক স্বাস্থ্যের পরিকল্পনা গড়ে তোলা নির্ভর করছে স্থানীয় নারী-পুরুষদের উপরেই। কেননা, সমাজের প্রয়োজন এবং সঙ্গতির সঙ্গে তাদেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে এবং তাদের প্রত্যেকেরই ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ভর করছে প্রতিবেশীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের দ্বারা জনসাধারণের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব আংশিকভাবে স্বীকার করে নিলেন এবং এ কথা মেনে নিলেন যে দেশের জনসমাজ এবং রাষ্ট্র উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার পরিকল্পনাটিকে কার্যকর করে তুলতে হবে। এই জন-সাধারণের মধ্যে আবার শিক্ষকদের দায়িত্ব আরও বেশী। কেননা, শিশুর সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তা গঠনের দায়িত্ব বিশেষ করে শিক্ষকদের উপরেই ন্যস্ত থাকে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অগ্রগতি বিশেষভাবে ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে ১৯৪৯ সালে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব মেণ্টাল হেল্‌থ (National Institute of Mental Health) নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের ফলে। এই সংস্থাটি আমেরিকার স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও জন-মঙ্গল-বিভাগের একটি অঙ্গ বিশেষ। রাষ্ট্রপ্রদত্ত অর্থের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানটি মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণায় পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য দিয়েছেন এবং জনসাধারণের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা জাগাতে চেষ্টা করেছেন।

মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্যার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা

বিভিন্ন দেশে মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির যে পরিসংখ্যান আমাদের হস্তগত হয়েছে তা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা সমস্যাটির গুরুত্ব ও ব্যাপকতা সম্পর্কে একটি ধারণা করা সম্ভব। এ সম্বন্ধে ১৯৪৯ সালে রবার্ট ফেলিক্সের (Robert Felix) মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য। সে মন্তব্যটি হল যে যদি এই মানসিক ব্যাধির বর্তমান হার না কমান যায় তাহলে আমেরিকার বিদ্যালয়ের বর্তমান শিশু সংখ্যার প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজনকে অবশ্যই মানসিক রোগের হাসপাতালে কাটাতে হবে। এই মন্তব্যটির গুরুত্ব অতি সহজেই বোঝা যায়। এর অর্থ হল যে প্রতি ১০০টি শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঁচজন কোন না কোন রকম মানসিক রোগে ভুগছে। নিউইয়র্কের ডাক্তার উইলিয়াম টারহোম (William Terhome) বলেন যে ক্যান্সার, যক্ষ্মা এবং শিশু পক্ষাঘাত এই তিনটি রোগকে

একত্রিত করলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তার চেয়েও বড় সমস্যা হল মানসিক ব্যাধির সমস্যা। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকার সৈন্যদলে ভর্তি করার সময় পরীক্ষিত ব্যক্তিদের শতকরা ৩৮ জনকে নিছক মানসিক এবং প্রক্ষোভমূলক অস্থিরতার জন্য বাতিল করা হয়। অথচ এদের অধিকাংশের বয়স ছিল অত্যন্ত অল্প। পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রতি চারটি বিবাহের মধ্যে একটি ডিভোর্সে গিয়ে শেষ হয়। দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিচ্ছেদের কারণ হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সংগতিবিধানের সামর্থ্যের অভাব। মদ বা অন্য কোন নেশার বস্তুতে অতিরিক্ত আসক্তিকেও মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার একটি লক্ষণ বলে বর্ণনা করা হয়। মানুষ যখন বাস্তবের সম্মুখীন হতে ভয় পায় তখন তারা নেশার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। ১৯৪০ সালে এক আমেরিকাতেই ২৪ লক্ষের বেশী লোক অতিরিক্ত মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল এবং ৬ লক্ষেরও বেশী লোকের ক্ষেত্রে মদ্যপান স্থায়ী অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। এই থেকে মানসিক ব্যাধির গুরুত্ব ও ব্যাপকতা বোঝা যায়।

মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ একটি সামাজিক সমস্যা

বর্তমান সভ্য সমাজে মানসিক ব্যাধির দৃষ্টান্ত এত প্রচুর পাওয়া যায় যে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার সমস্যাকে একটি সামাজিক সমস্যা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মানসিক ব্যাধির বিভিন্ন লক্ষণ প্রতিনিয়তই আমাদের চোখে পড়ে। এই লক্ষণ বা চিহ্নগুলি নানা বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এক পরিবারের ছেলেমেয়েরা তাদের ভাইবোনদের প্রতি প্রচণ্ড ঈর্ষা অনুভব করে কিংবা মনে করে যে পিতামাতা তাদের উপর অবিচার বা উৎপীড়ন করছেন। অনেক সময় পিতামাতারাও মনে করেন যে ছেলেমেয়েদের জন্য তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অযথা ক্ষুন্ন হচ্ছে। আবার কোন ছেলে বা মেয়ে হয়তো আক্রমণধর্মী হয়ে উঠেছে। স্কুলেও মানসিক অসুস্থতার বহু উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন ছেলেমেয়ে ক্লাস থেকে পালায়। অনেকে আবার পর্যাপ্ত মানসিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষায় ফেল করে। অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষকের নির্দেশ বা স্কুলের অনুশাসন ঠিকমত মেনে চলতে পারে না। তার ফলে তারা অবাধ্য বা দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ মানসিক অপসঙ্গতির জন্য বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে। আবার এমন অনেক বয়স্ক ব্যক্তি আছেন যাঁরা কর্মজীবনের দায়িত্বের চাপে বাস্তব জীবনের সঙ্গে

সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ হয়ে মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এমন অনেক ব্যক্তির সন্ধানও পাওয়া যায় যাঁদের রোগের কোন দৈহিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না এবং তার ফলে তাঁদের মানসিক রোগীর শ্রেণীতে ফেলা হয়। আমাদের সমাজে মানসিক অসুস্থতার এই ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ কথা বলা চলতে পারে যে আমাদের চতুষ্পার্শ্বে জনসমাজের মধ্যে ঈর্ষা, সন্দেহ, রূঢ়তা, অতিরিক্ত মদ্যপান, কলহপরায়ণতা, পরনিন্দা, রুক্ষ মেজাজ, কর্মে অনাসক্তি, অবসন্নতা, অসন্তুষ্টি প্রভৃতি যে সব লক্ষণ দেখা যায় সেগুলিকে মানসিক স্বাস্থ্য ঘটিত সমস্যার গুরুতর লক্ষণ বলা চলে।

সমাজজীবন যাপনে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরেক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। যদি কোন শিশু কোন রকম মানসিক রোগে আক্রান্ত হয় এবং যদি তার যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে সে কালক্রমে সমাজের পক্ষে বিপদ্‌জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়ম কানুনে অনভিজ্ঞ থাকলে তার মা বাবা ভাই বোন ও অন্যান্য আত্মীয়েরা তার সমস্যাটিকে ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টি দিয়ে কখনই বিচার করতে পারবেন না এবং বলা বাহুল্য যে তার প্রতি তাঁরা অবিচার করবেনই। স্কুলেও যদি মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের চর্চা না থাকে তাহলে শিক্ষক তাকে লেখাপড়ায় অমনোযোগী, অবাধ্য বা একগুঁয়ে বলে মনে করবেন এবং তাঁদের কাছে সে হয়ে দাঁড়াবে অবাঞ্ছিত। তার ফলে সে কোনদিন ভাল শিক্ষা লাভ করতে পারবে না এবং বড় হলে কর্মজীবনে ভাল চাকুরীও তাকে কেউ দেবে না। ফলে সমাজের নিম্ন স্তরে তার জীবনযাত্রা সীমাবদ্ধ থাকবে। পরে হয় সে কোন নেশায় আসক্ত হবে কিংবা চুরি, জুয়াচুরি, প্রভৃতি অপরাধপ্রবণতার দিকে ঝুঁকবে। কালক্রমে সে সমাজের একটি প্রথম স্তরের শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু যদি যথা সময়ে এই ছেলেটির রোগ নির্ণয় করা হয় এবং সেই রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা করা হয় তাহলে সে সমাজের একজন দায়িত্বশীল এবং সম্ভ্রান্ত সদস্য হয়ে উঠতে পারে। ব্যাপক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, যে সব ব্যক্তি পরিণত বয়সে অপরাধমূলক কাজ করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই অল্প বয়সে কোন না কোনরূপ মানসিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। পরে ঠিকমত এই সব ব্যাধির চিকিৎসা না করায় তারা অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়মকানুনগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হত তাহলে সমাজে মানসিক বিকারগ্রস্ত লোকের সংখ্যা একপ্রকার থাকত না বললেই চলে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের স্বরূপ

মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার বিজ্ঞানকেই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলা হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের স্বরূপ বুঝতে হলে প্রথমে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। বস্তুত সংক্ষেপে মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই শক্ত। তবু সব দিক দিয়ে বিচার করে মানসিক স্বাস্থ্যের নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি দেওয়া যেতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে সেই সামর্থ্যকেই বোঝায় যার দ্বারা ব্যক্তিকে জীবনের যে সব জটিল মানসিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় সেগুলির সঙ্গে সে সন্তোষজনক ভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে। আর মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হল ব্যক্তিকে এই গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গতিবিধানে সাহায্য করার উপকরণস্বরূপ।

আরও বিশদভাবে মানসিক স্বাস্থ্যকে ব্যাখ্যা করলে বলা চলতে পারে যে সব চেয়ে কার্যকরভাবে ও সব চেয়ে বেশী সন্তুষ্ট ও আনন্দের সঙ্গে এবং সমাজ অনুমোদিত আচরণের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি যখন অন্যান্য ব্যক্তি এবং বহির্জগতের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারে এবং বাস্তব জীবনকে যখন সে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে তখনই তাকে সত্যকারের মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী বলা চলে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার চতুষ্পার্শ্বের বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি, নানা রীতি-নীতি, এবং সমাজব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সঙ্গতিবিধান করে চলতে হয়। এই সঙ্গতি-বিধান করার সময় ব্যক্তিকে প্রায়ই ছোটবড় সংঘর্ষ ও সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা মনের সেই অবস্থাকেই বুঝব যখন ব্যক্তি এই প্রয়োজনীয় সঙ্গতিবিধানের কাজটি স্বল্পতম সংঘর্ষ ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করতে পারে। তাছাড়া ব্যক্তির সামাজিক আচরণগুলিও তার মানসিক স্বাস্থ্যের আর একটি মাপকাঠি। যখনই ব্যক্তির আচরণ সামাজিক মনের দিক দিয়ে পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হবে তখনই বুঝতে হবে যে ঐ ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ আছে।

উপরের বিবরণ থেকে মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরী করা যেতে পারে। প্রথমত, মানসিক স্বাস্থ্য অপরিবর্তনীয় কোন বস্তু নয়। বরং সুষ্ঠু ও বিরামহীন সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়ার উপরই মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠিত। এই সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়ার পরিবর্তনে মানসিক স্বাস্থ্যেরও পরিবর্তন হয়।

দ্বিতীয়ত, এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে মানসিক স্বাস্থ্য নিছক মানসিক স্তরেতেই সীমাবদ্ধ নয়। শারীরিক, মানসিক এবং প্রাক্ষোভিক সব রকম আচরণের উপরই মানসিক সুস্থতা নির্ভর করে। এমন কি কাজের অভ্যাস, বিভিন্ন সমস্যা বা বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রতি মনোভাব ইত্যাদির সঙ্গেও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

তৃতীয়ত, মানসিক স্বাস্থ্যের একটি সামাজিক দিক আছে। মানসিক স্বাস্থ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমরা সামাজিক আচরণের কথা উল্লেখ করেছি। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা প্রভৃতির সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের সামর্থ্যকে মানসিক স্বাস্থ্য বলা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

চতুর্থত, মানসিক স্বাস্থ্যের কোন আদর্শ মান বা রূপ নির্ধারিত করে দেওয়া যায় না। বস্তুত যে সব সদাপরিবর্তনশীল জাগতিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক পরিবেশ ব্যক্তিকে ঘিরে থাকে সেগুলির সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে পারাটাই মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। অতএব আদর্শ মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা সেই মানসিক অবস্থাকে বুঝব যেটিতে সম্পূর্ণভাবে পৌছান না গেলেও অন্তত কাছাকাছি যাবার জন্য সব সময় ব্যক্তি প্রচেষ্টা করে যাবে।

পঞ্চমত, পৃথিবীতে যে ব্যক্তি যে বৃত্তিই অনুসরণ করুক না কেন মানসিক স্বাস্থ্য যে তার পক্ষে অপরিহার্য একথা বলা বাহুল্য। সাধারণ কর্মচারী, মজুর, শ্রমিক থেকে সুরু করে বড় বড় অফিসের দায়িত্বশীল পদে প্রতিষ্ঠিত কর্মচারীদের প্রত্যেকেরই মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। যাঁরা সমাজ সংস্কারক বা দেশনেতা, তাঁদের ক্ষেত্রেও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা পৃথক করে বলার দরকার নেই। তাঁদের উপরই ভার থাকে ছোট শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করার। অতএব তাঁরা নিজেরাই যদি মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী না হন তাহলে তাঁদের পক্ষে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। শিক্ষণের কার্যকারিতা, শিক্ষার্থীর উন্নতি, শিক্ষকদের মানসিক শান্তি প্রভৃতির জন্যই শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা অপরিহার্য। তাঁদের মানসিক সুস্থতা থেকেই শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতা আসবে এবং সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়াটিও সার্থক হয়ে উঠবে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

মানসিক স্বাস্থ্য বলতে তাহলে আমরা বুঝলাম ব্যক্তির দেহমনের সেই অবস্থাকে যার দ্বারা তার পক্ষে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতি-বিধান করা সম্ভব হয় এবং যার ফলে তার ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির সুষম বিকাশে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয় না। এই যদি মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা হয় তাহলে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝব সেই সব নিয়মকানুন ও সর্ত যেগুলি অনুসরণ করলে ব্যক্তির পক্ষে মানসিক স্বাস্থ্য আহরণ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এক কথায় মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হল সেই সব অনুশাসন এবং সর্তের সমষ্টি যেগুলি পালন করলে ব্যক্তি তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে স্বল্পতম সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সঙ্গতিবিধান করতে পারে। এবং সমাজ-অনুমোদিত আচরণের মধ্যে দিয়ে তার নিজস্ব পূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

যদিও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকে এখানে কতকগুলি নিয়মকানুন ও সর্তাদির সমষ্টি বলে বর্ণনা করা হল, তবু সুনিশ্চিতভাবে কতকগুলি বিশেষ নিয়মাবলীর উল্লেখ করা চলে না। প্রকৃতপক্ষে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্মপরিধি ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে সমব্যাপী এবং সে যা কিছু করে, বলে বা অনুভব করে সে সবেরই প্রভাব এসে পড়ে তার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। এই জন্যই অনেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকে 'জীবনযাপনের একটি পন্থা' বলে বর্ণনা করেছেন।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিজেকে ভাল করে জানা এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে দৈনিক যাদের সংস্পর্শে আসে তাদের ভালো করে বোঝা। সুপরিণত সাধারণ জ্ঞান এবং বিজ্ঞানভিত্তিক অভিজ্ঞতা, এ দুটি বস্তুকে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারা যেমন একদিক দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার আর একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হল ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে আশাপূর্ণ এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সঙ্গে দৈহিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দেহ ও মনের মধ্যে যে দ্বৈততা প্রাচীনকাল থেকে দার্শনিক ও শিক্ষাবিদেরা কল্পনা করে এসেছেন তা যে একান্ত ভুল একথা আজ বিজ্ঞানের বিচারে প্রমাণিত [illegible]। বরং দেহ ও মনের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের উপরই যে ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর

করে একথাই সর্বজনস্বীকৃত। অতএব মানসিক সুস্থতা নানা দিক দিয়ে দৈহিক সুস্থতার উপর নির্ভরশীল। এইজন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপযোগী জ্ঞান আহরণ এবং তার প্রয়োগও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রথম লক্ষ্য হল যে ব্যক্তি যাতে তার পরিবেশকে যথাযথভাবে বুঝতে এবং সেইমত তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তাতে তাকে সাহায্য করা। ব্যক্তির মনের জটিল প্রক্রিয়াগুলিকে সহজ ও ঈপ্সিত পথে পরিচালিত করা এবং সমস্যা দেখা দিলে সেগুলির সমাধানের পথ নির্দেশ করাই হল মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মুখ্য কাজ। এই কাজের দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজস্ব তৃপ্তি ও শান্তিলাভের পথই প্রশস্ত করে না, ব্যক্তি যাতে সমাজের আর দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় সামাজিক জীবনযাপন করতে পারে তারও ব্যবস্থা করে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যক্তিকে তার বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শেখায়, তার আচরণকে যতটা সম্ভব কার্যকর, তৃপ্তিদায়ক, আনন্দময় এবং সমাজ-অনুকূল করে তোলে। প্রকৃতিদত্ত সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে এবং স্বল্পতম সংঘর্ষ ও বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে যাতে ব্যক্তি নিজের ও তার সমাজের চরমতম তৃপ্তি আনতে পারে তা দেখাই হল মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সহায়তায় ব্যক্তি আপত্তিকর ও অসামাজিক আচরণ থেকে বিরত থাকে এবং বিচারশক্তি, বিবেচনা ও প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির দিক দিয়ে নিজের মানসিক সাম্য অক্ষুন্ন রাখতে পারে। এক কথায় মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যক্তিকে সব দিক দিয়ে অধিকতর পূর্ণ, সুষম ও কার্যকর জীবনযাপনে সাহায্য করে থাকে।

এই দিক দিয়ে আমরা মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের চারটি প্রধান লক্ষ্যের কথা বলতে পারি। যথা—(১) ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির বিকাশ সাধন করা, (২) তাকে আনন্দ ও মানসিক তৃপ্তিলাভে সমর্থ করা, (৩) তাকে সুষম ও সুসংহত জীবন-যাপনে সক্ষম করে তোলা ও (৪) তার জীবনকে সমাজ ও তার নিজের দিক দিয়ে যথাসম্ভব কার্যকর করে তোলা।

শিশু যে সব বিভিন্ন অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায় সেগুলি যাতে বিনা বাধায় পূর্ণভাবে বিকাশলাভ করে তা দেখাই হল মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রথম লক্ষ্য। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে মানসিক তৃপ্তি ও আনন্দ লাভে সহায়তা করা। অর্থ, সম্মান, শক্তি কোন কিছুরই জীবনে মূল্য থাকে না যদি না সেগুলি ব্যক্তির মধ্যে সত্যকারের তৃপ্তি ও আনন্দ আনতে পারে। সেজন্যই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের একটি বড় কাজ হচ্ছে ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের মাধ্যমে সত্যকারের আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করতে সাহায্য করা। বস্তুত আনন্দ ও তৃপ্তি আসে একমাত্র সার্থক সঙ্গতি-বিধানের মধ্যে দিয়ে, আর মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানই ব্যক্তিকে সেই অতিপ্রয়োজনীয় সঙ্গতিবিধান করতে সাহায্য করে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের তৃতীয় লক্ষ্যটির অর্থ হল যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজে ভালভাবে বাঁচলেই হয় না। সে অন্যান্য যাদের সঙ্গে বাস করে তাদের সঙ্গে যাতে মিলে মিশে সার্থক জীবন যাপন করতে পারে সেটা দেখাও মানবজীবনের আর একটি লক্ষ্য। অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারা সার্থক জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। এজন্য যেমন একদিকে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস, বুদ্ধি দূরদৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর, তেমনই প্রয়োজন সমাজের আর সকলের সঙ্গে একটি স্বাস্থ্যময় বোঝাপড়া গড়ে তোলার। মন থেকে হিংসা, সন্দেহ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দূর করে না দিলে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপন করা সম্ভব হয় না।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের চতুর্থ লক্ষ্যটি হল ব্যক্তিকে কার্যকর জীবনধারণের জন্য সক্ষম করে তোলা। ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃতিদত্ত সম্ভাবনাগুলিকে কেবলমাত্র বিকশিত করলেই সার্থক জীবন গঠিত হয় না। সেই বিকশিত বৈশিষ্ট্যগুলি যতক্ষণ না পূর্ণভাবে ব্যক্তির নিজের এবং সমাজের আর সকলের প্রয়োজনে নিয়োজিত হচ্ছে ততক্ষণ ঐ সম্ভাবনাগুলিকে সত্যকার বিকশিত বলে গণ্য করা যায় না। যদি ব্যক্তির কোন সম্ভাবনা বা শক্তি এমনভাবে বিকশিত হয় যার দ্বারা ব্যক্তি বা সমাজ কারোরই তৃপ্তি না আসে তাহলে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিচারে সে ব্যক্তির জীবন সার্থকতা লাভ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি তার উন্নতবুদ্ধিকে অপরাধমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে বিকশিত করে তাহলে তার সে বিকাশ নিশ্চয়ই ত্রুটিপূর্ণ ও অবাঞ্ছিত। কেননা সেই ব্যক্তি তার আচরণের দ্বারা নিজের বা তার সমাজের সত্যকারের আনন্দ ও মঙ্গল আনতে পারবে না।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্মপরিধি

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্মপরিধি ব্যক্তির সমগ্র জীবনের সঙ্গেই সমব্যাপী। ব্যক্তির সঙ্গে তার বাইরের জগতের যে বহুমুখী সম্পর্ক তার প্রকৃতি ও সমস্যা নিয়ে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। ফলে ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন স্তরের সমস্ত দিকগুলির সঙ্গেই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ব্যক্তির শৈশব থেকে সুরু করে তার ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তর ও সেগুলির বৈশিষ্ট্য, তার বাড়ী, স্কুল, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, কর্মস্থল, অবসর বিনোদনের আয়োজন—এ সবই পর্যবেক্ষণ করা মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কর্মসূচীর মধ্যে পড়ে।

ব্যক্তির শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার উপর তার ভবিষ্যৎ জীবনের মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। অতএব শিশুর প্রতি পিতামাতা ও বয়স্কদের আচরণ, তার বিভিন্ন চাহিদার পরিতৃপ্তি, তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা প্রভৃতি ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করা মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অবশ্য করণীয় কাজ। শিশুর মধ্যে যে নানারকম প্রক্ষোভ-মূলক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তার ফলে তার মানসিক সংগঠনে যে বিরাট বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, সেগুলির পর্যবেক্ষণ করাও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্মসূচীর অন্তর্গত। এই সময়েই শিশুর মনে নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং তা থেকে অপরাধপ্রবণ ও সমস্যামূলক আচরণ সৃষ্টি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। ব্যক্তির পরিণত বয়সের আচরণও তেমনই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণসূচীর অন্তর্গত। কি ধরনের আচরণ করলে ব্যক্তি তার মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তার নির্দেশ দেওয়া মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

শিশুর কেবল গৃহের আচরণ নয়, তার বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাসমষ্টিরও পর্যবেক্ষণ মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্মসূচীর অন্তর্গত। শৈশবে যেমন শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে আচরণের প্রকৃতির উপর শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে, তেমনই পরিণত জীবনে সে তার কর্মক্ষেত্র ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে যে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সেগুলির যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্মসূচীর অন্তর্গত।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যক্তির সামাজিক জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অতএব ব্যক্তির সামাজিক আচার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা এবং অপরের সঙ্গে সে কি ধরনের সঙ্গতি বিধান করতে সমর্থ হল তা দেখা মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের

আর একটি প্রয়োজনীয় কাজ। অর্থাৎ এক কথায় ব্যক্তি এবং তার সমগ্র পরিবেশই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের অন্তর্গত।

দৈহিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মধ্যেও সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। অতএব কেবলমাত্র ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করাই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কাজ নয় ব্যক্তির দৈহিক স্বাস্থ্যের সংরক্ষণও তার কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the nature and scope of Mental Hygiene. How is mental health related to physical health ?

Ans. (পৃঃ ৭—পৃঃ ১৩)

2. Describe the modern concept of mental health and its relation to Mental Hygiene.

Ans. (পৃঃ ৭—পৃঃ ১৩)

3. Give a short sketch of the movement of Mental Hygiene. Discuss in this connection the significance and massiveness of the problem of mental ill-health.

Ans. (পৃঃ ১—পৃঃ ৭)

4. What do you understand by mental health ? Discuss the nature and aims of Mental Hygiene.

Ans. (পৃঃ ৭—পৃঃ ১৩)

দুই

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও শিক্ষা

(Mental Hygiene and Education)

শিক্ষার সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। উভয়ই পরস্পরের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া যেমন কার্যকর শিক্ষণ সম্ভব নয় তেমনি উপযুক্ত শিক্ষা না পেলে মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখাও সম্ভব নয়।

বস্তুত, শিক্ষা এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান—দু'য়েরই লক্ষ্য এক। উভয়েরই লক্ষ্য হল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ ও সুষম বিকাশ সাধন করা যাতে সে সমাজে সার্থক ও সন্তোষজনক জীবনধারণ করতে পারে। প্রাচীন শিক্ষাবিদ্‌দের মতে শিক্ষা বলতে নিছক কতকগুলি জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনকেই বোঝাত এবং কে কতটা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারল তার উপর নির্ভর করত শিক্ষার সার্থকতা। কিন্তু বর্তমান কালে কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা হয় না। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌ ও মনোবিজ্ঞানীদের মতে যে সকল জ্ঞান ও মনোভাব আমাদের জীবনের সমস্যাগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করতে সমর্থ করবে সেই জ্ঞান ও মনোভাবগুলির আহরণকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা হবে। তাছাড়া এতদিন আমরা শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক দিকটির উন্নতিকেই বুঝে এসেছি। কিন্তু কেবল জ্ঞানমূলক বৈশিষ্ট্যাবলী দিয়েই শিক্ষার্থীর পূর্ণ সত্তাটি গঠিত নয়। সম্পূর্ণ শিশু বলতে যেমন একদিকে তার জ্ঞানমূলক দিকটিকে বোঝায় তেমনি অপর দিকে তার প্রক্ষোভমূলক দিক, তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক সঙ্গতিবিধান, এ সবকেই বুঝিয়ে থাকে। যে শিশু বিদ্যালয়ে পড়তে আসে সে তার সমগ্র সত্তা নিয়েই সেখানে আসে। অতএব কেবলমাত্র তার জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াগুলিরই উৎকর্ষসাধনে বিদ্যালয়ের কাজ সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এই কারণে আধুনিক বিদ্যালয়ের কর্ম-পরিধি ও দায়িত্ব আগের চেয়ে অনেক ব্যাপক ও বিচিত্রধর্মী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে প্রাচীনকালে শিশুর বিদ্যালয়ে অবস্থিতির সময়ও ছিল সংক্ষিপ্ত এবং তার ফলে বিদ্যালয়ের কাজও নিছক ভাষামূলক শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুকে তার দিনের অনেকক্ষণ সময়ই

বিদ্যালয়ে কাটাতে হয় এবং অধিকাংশ প্রগতিশীল দেশে প্রায় ১৬।১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতি শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা নিতে হয়। অতএব এসব ক্ষেত্রে শিক্ষায়তনগুলির দায়িত্ব এবং কর্মসূচী যে অনেক ব্যাপক ও জটিল হয়ে উঠবে সে বিষয়ে বিস্মিত হবার কিছু নেই। শিশুকে কেবলমাত্র কতকগুলি তত্ত্ব এবং কৌশল শিক্ষা দান করেই আধুনিক শিক্ষার কাজ শেষ হতে পারে না। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা ও অন্যান্য দিকগুলিও যাতে সুষ্ঠুভাবে বিকাশলাভ করে এবং যাতে শিশু তার চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অতএব মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং শিক্ষা উভয়কেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে হবে শিক্ষার সুষ্ঠু সাথক পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য।

তাছাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলেও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হবে। শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য যদি অক্ষুণ্ণ না থাকে তাহলে তার পক্ষে শিক্ষাগ্রহণ যে বিশেষ কষ্টকর এমন কি সময় সময় দুঃসাধ্যও হয়ে ওঠে সে বিষয়ে সকল শিক্ষাবিদ্‌ই একমত। শরীর-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার দিক দিয়ে শিক্ষা বলতে স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ পরিবর্তনকেই বোঝায়। এই স্নায়ুতন্ত্রমূলক পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে একমাত্র তখনই যখন শিক্ষার্থীর মনের ধৈর্য ও সমতা বর্তমান থাকে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, বিক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত মন নিয়ে কোনরূপ শিক্ষা গ্রহণই যে সম্ভব নয়, মনোবিজ্ঞানীমাত্রেই এই সত্য স্বীকার করেন। অতএব শিক্ষাদানের পূর্বে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ আছে কিনা তা নিরূপণ করা অবশ্য কর্তব্য।

নানা কারণে বিদ্যালয় পরিবেশ থেকেও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠতে পারে। বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা শিশুর পক্ষে সব সময়েই তৃপ্তিকর এবং শিক্ষামূলক হওয়া উচিত। কিন্তু হয় পরিবেশের দোষে কিংবা পদ্ধতির অসম্পূর্ণতার জন্য অনেক সময় বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাও শিশুর কাছে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে মানসিক শক্তি পর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও অনেক ছেলেমেয়েই পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল দেখাতে পারে না। এই সব ক্ষেত্রে তিরস্কার, ভীতি-প্রদর্শন, বার বার অনুশীলন ইত্যাদি যে সব গতানুগতিক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয় সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ফল বলে প্রতিপন্ন হয়। তার ফলে শিক্ষার্থীর

মনে যে অসন্তোষ ও ব্যর্থতা দেখা দেয় তা তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করে তোলে। অথচ যদি মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়মকানুন মেনে শিক্ষার্থীর এই বিশেষ ত্রুটিটির মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক চিকিৎসা করা হত তাহলে শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতাও দুর হত এবং তার মানসিক স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকত।

দেখা গেছে কোন শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে পঠনীয় বিষয় বা বিষয়গুলিতে অসাফল্যের কয়েকটি প্রধান প্রধান কারণ আছে। তার মধ্যে সব চেয়ে প্রথম আসে অনুপযোগী পাঠক্রম। সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠক্রমটি অপরিবর্তনীয় রূপে তৈরী করা হয় এবং তার ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে সেই পাঠক্রম অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতিও সকলের পক্ষে সমানভাবে কার্যকর হয় না। তৃতীয়ত, সমগ্র বিদ্যালয়টি কিংবা বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়টি ঘিরে শিক্ষার্থীর মনে এমন প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হতে পারে যা তার মনের মধ্যে স্থায়ীভাবে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে। এই ধরনের দুশ্চিন্তা শিক্ষার অগ্রগতির পথে একটা চিরকালীন অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং তার মনের দৃঢ়তা ও শান্তি নষ্ট করে দেয়। যে সব শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পাঠ্য বিষয়ে প্রাথমিক অসাফল্যকে ভীতি-প্রদর্শন বা শাস্তি প্রদানের দ্বারা দুর করার চেষ্টা করা হয় সে সব শিক্ষার্থীর মনে ঐ বিষয়ে একটা স্থায়ী ভীতি ও দুশ্চিন্তা দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়। চতুর্থত, স্কুলের পড়া সম্পর্কে বাড়ীতে থাকা কালীন শিক্ষার্থীর মনে যে গভীর দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয় তাও তার মানসিক শান্তিকে বিশেষভাবে নষ্ট করে দেয়। বিদ্যালয়ের এই সব অভিজ্ঞতাই শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ প্রতিবন্ধক। শিশুর শিক্ষাকে কার্যকর ও সার্থক করে তুলতে হলে এই ধরনের কোন অভিজ্ঞতা যাতে তার না হয় সেদিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে।

বহু ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে ভুল শিক্ষণপদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য শিক্ষার্থী পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করতে পারে না এবং তার ফলে তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। পঠন, গণিত এবং বানান এই তিনটি বস্তু শেখার ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণপদ্ধতি শিক্ষার্থীর অসাফল্যের জন্য বিশেষভাবে দায়ী হয়ে থাকে। যথা সময়ে যদি শিক্ষার্থীদের দোষত্রুটিগুলি অনুসন্ধান করে সেগুলি সংশোধন করা না হয় তাহলে তাদের শিক্ষা চিরকালের জন্য অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং

তার পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি এই দোষ ত্রুটিগুলি যথা সময়ে দূর করা যায় তাহলে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। অধুনা আবিষ্কৃত ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষাগুলির (Diagnostic Tests) সাহায্যে শিক্ষার্থীর কোন্ পাঠ্য বিষয়ে কি ধরনের দোষ বা অসম্পূর্ণতা আছে তার স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। যে শিশু স্কুলে বা পরীক্ষায় প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করতে পারে না সে পিতামাতা শিক্ষকদের কাছে তাড়না খায় এবং সহপাঠীদেরও বিদ্রূপ এবং উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। অতএব স্কুলে যাতে শিক্ষার্থী পড়াশোনার দিক দিয়ে কোন রকম অসুবিধায় না পড়ে সে ব্যাপারে যত্ন নেওয়া মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

অনেক সময় শিক্ষার্থীর গৃহ এবং বিদ্যালয় এই দু'য়ের মধ্যে নীতি বা আদর্শের দিক দিয়ে সংঘাতের জন্য শিক্ষার্থীর মনে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ে অনুসৃত পদ্ধতি, শিক্ষকদের মতামত, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পরিশাসন নীতি ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক সময় পিতামাতা ও অভিভাবকেরা ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন এবং তাঁদের সেই বিরোধী মনোভাব শিশুদের সামনেও প্রকাশ করেন। তার ফলে শিশুদের পিতামাতার প্রতি ভালবাসা ও বিদ্যালয়ের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং তা থেকে তাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের পরিস্থিতি থেকে শিশুদের মুক্ত রাখতে হলে গৃহ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে যাতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গঠিত হয় সেদিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। যে সব ক্ষেত্রে গৃহ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক বোঝাপড়া থাকে সে সব ক্ষেত্রে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা খুব কম।

কখনও কখনও অস্বাভাবিক গৃহ পরিবেশের জন্য শিশুর শিক্ষার স্বাভাবিক অগ্রগতি ক্ষুণ্ন হয়ে ওঠে। কখনও দেখা গেছে যে শিশুর লেখাপড়ার ব্যাপারে তার পিতা ও মাতা দু'জনে ভিন্ন মত বা নীতি অনুসরণ করেন। তার ফলে শিশু দু'জনের মতের সঙ্গেই সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে লেখাপড়ায় আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারে না। কিন্তু মাতা ও পিতার মধ্যে যদি এই ধরনের নীতিগত কোন সংঘাত না থাকে তাহলে শিশুর শিক্ষা স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন পথে অগ্রসর হতে পারে।

এই রকম নানা কারণে বিদ্যালয় পরিবেশে যে দুশ্চিন্তা শিশুর মনে সৃষ্টি হয় সেগুলি তার মধ্যে অতি শক্তিশালী প্রক্ষোভধর্মী প্রেষণার রূপ গ্রহণ করে এবং যে আচরণ বা অভিজ্ঞতার দ্বারা তার সেই প্রেষণা মুক্তি পায় শিশু সেই আচরণ অনুষ্ঠান করতে বা সেই অভিজ্ঞতা আহরণ করতে সচেষ্ট হয়। কখনও কখনও এই ধরনের অতি দুশ্চিন্তার চাপে পড়ে শিশুকে লেখাপড়ায় ভাল ফল করতে দেখা গেছে। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে শিশু সংকীর্ণচেতা ও নিছক জ্ঞানসর্বস্ব ব্যক্তি হয়ে ওঠে, তার ব্যক্তিসত্তার অন্যান্য দিকের কোনও বিকাশই ঘটে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু দুশ্চিন্তা থেকে নানা অবাঞ্ছিত ক্ষতিকর আচরণই সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে শিশু অস্থির ও অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে এবং সে কোন রকমেই পড়ায় মন দিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এসব ক্ষেত্রে শিশু অপ্রীতিকর পাঠ্য বিষয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় নেয়। যদিও সমাজ, পিতামাতা, আত্মসম্মান ইত্যাদির চাপে সে বিদ্যালয়ে আসতে বাধ্য হয়, তবু সত্যকারের পড়ায় মন দিতে সে কোনক্রমেই সমর্থ হয় না।

অনেক সময় আবার শিশু পিতামাতার উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্য ভাল করে পড়াশোনা করে না। শাসনধর্মী নিপীড়ক পিতামাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্য শিশু স্বেচ্ছায় পড়াশোনায় খারাপ ফল করে এবং শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছে বদনাম কেনে।

উপরের উদাহরণগুলি থেকে এই ব্যাপারটি দ্বিধাহীন ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর শিক্ষার সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে। যে কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা হল সেই ক্ষেত্রগুলিতে শিশুর অসাফল্য দূর করতে হলে সাধারণ পন্থা বা উপায় অবলম্বন করলে কোন কাজই হবে না। যতক্ষণ না ঐ শিক্ষার্থীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করা হচ্ছে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শিক্ষা কার্যকর হয়ে উঠবে না। এখানে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য। যদি শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব গুরুতর প্রকৃতির না হয় তাহলে তার মানসিক সমস্যাটির কারণ নির্ণয় করে সেটির সমাধান করলেই শিশুর শিক্ষামূলক প্রতিবন্ধক দূর হয়ে যাবে। আর যদি দেখা যায় যে শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব অতি গভীর প্রকৃতির এবং সহজে তার সমাধান করা যাবে না তাহলে অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্যে তার সেই মনোবিকারের কারণ খুঁজে বার করতে হবে এবং সেটিকে দূর করতে হবে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরস্পরের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। সুষ্ঠু ও সার্থক শিক্ষার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রয়োগ যেমন অপরিহার্য, তেমনই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শিক্ষাপ্রক্রিয়ার সুপরিকল্পিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত সম্পাদনও বিশেষভাবে প্রয়োজন। শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান উভয়েরই লক্ষ্য হল শিশুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ ও সুসংহত বিকাশ সাধন এবং সেই লক্ষ্যে পৌছতে হলে উভয়কেই একটি সম্মিলিত কার্যসূচী অনুসরণ করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss critically the relation between Mental Hygiene and Education and show they are interrelated.

Ans. (পৃঃ ১৫—পৃঃ ১৯)

2. The aim of Mental Hygiene and Education is same. Discuss.

Ans. (পৃঃ ১৫—পৃঃ ১৯)

3. Show how the lack of proper mental health leads to imperfect education of the child and how the same can be rectified.

Ans. (পৃঃ ১৫—পৃঃ ১৯)

4. What constitutes the subject matter of Mental Hygiene ? Examine the relation between Mental Hygiene and Education.

Ans. (পৃঃ ৭—পৃঃ ১৯)

5. Define the scope of Mental Hygiene. "The problems of Mental Hygiene are allied closely with those of Education."

Ans. (পৃঃ ৭—পৃঃ ১৯)

6. What is Mental Hygiene ? Explain how the study of this subject is profitable for the teacher.

Ans. (পৃঃ ৭—পৃঃ ১৯)

তিন

মানসিক ব্যাধি (Mental Diseases)

বিভিন্ন শারীরিক ব্যাধির জন্য যেমন আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে তেমনই মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার মূলেও আছে নানারূপ মানসিক ব্যাধি। ছোট শিশু থেকে স্থুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই মানসিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। মানসিক ব্যাধি বিভিন্ন কারণ থেকে সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃতিতেও নানা প্রকারের হয়ে থাকে।

১। সমস্যামূলক আচরণ (Problem Behaviour)

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে যে সব অবাঞ্ছিত আচরণ দেখা যায় সেগুলিকে এক প্রকার মানসিক ব্যাধি বলা চলতে পারে। তবে সাধারণত এগুলি নিছক পরিবেশমূলক কারণ থেকেই জন্মে থাকে এবং প্রায়ই শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি নিজে নিজেই দূর হয়ে যায়। সেইজন্য সাধারণত মনোবিজ্ঞানীরা এগুলিকে মানসিক ব্যাধি না বলে সমস্যামূলক আচরণ (Problem Behaviour) নামে অভিহিত করে থাকেন।

সমস্যামূলক আচরণ আবার সব ক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় নয়। অনেক সময় জটিল পারিবেশিক কারণ থেকে যে সব সমস্যামূলক আচরণ দেখা দেয় যথা সময়ে চিকিৎসা করা না হলে পরে সেগুলিই গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে এবং স্থায়ী অপরাধ-পরায়ণতায় পরিণত হতে পারে। তাছাড়া সমস্যামূলক আচরণের অর্থই হল যে শিশু স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী নয় এবং কোন না কোন দিক দিয়ে সে প্রক্ষোভমূলক নিপীড়ন থেকে কষ্ট পাচ্ছে। সেই জন্য শিশুদের ক্ষেত্রে সমস্যামূলক আচরণমাত্রকেই ভবিষ্যৎ জীবনের গুরুতর বিপদের সূচক বলে ধরে নিতে হবে এবং যথা সময়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। অপরাধপরায়ণতা (Delinquency)

সাধারণত এক বৎসর বয়স থেকে সাত আট বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে যে সব অবাঞ্ছিত আচরণ দেখা যায় সেগুলিকেই আমরা সমস্যামূলক আচরণ নাম দিয়ে থাকি। ৭-৮ বৎসর বয়সের পর থেকে যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের

মধ্যে যে সব অবাঞ্ছিত আচরণ দেখা যায় সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে অপরাধ-পরায়ণতা (Delinquency)। আর যৌবন-প্রাপ্তির পরে ব্যক্তি যে সব অবাঞ্ছিত আচরণ সম্পন্ন করে সেগুলিকে আইনত দণ্ডার্হ অপরাধ (Crime) নাম দেওয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী অবাঞ্ছিত আচরণের এই শ্রেণীবিভাগ সমাজে প্রচলিত নৈতিক মানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণত ছোট শিশুর ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ম-কানুন ভাঙ্গার অপরাধকে আমরা তেমন গুরুতর বলে মনে করি না এবং তার জন্য কোনরূপ শাস্তি দেওয়ার কথাও আমরা ভাবি না। এমন কি কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা যে সব অপরাধ করে সেগুলিকেও আধুনিক সমস্ত সভ্য দেশে প্রকৃত অপরাধ বলে মনে করা হয় না এবং প্রায় সর্বত্রই কিশোর অপরাধের বিচার করার জন্য স্বতন্ত্র কিশোর বিচারালয় (Juvenile Court) প্রচলিত আছে। তবে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেই সমাজের প্রচলিত আইন-কানুন ভঙ্গ করাকে সত্যকারের অপরাধ বলে মনে করা হয়। সেই জন্য এই ধরনের অপরাধীদের শাস্তি দেবার জন্য সর্বত্রই কঠোর আইনের ব্যবস্থা আছে।

সমস্যামূলক আচরণের শ্রেণীবিভাগ

(Types of Problem Behaviour)

ছোট শিশুর মধ্যে নানারকমের অবাঞ্ছিত আচরণ দেখা যায়। সাধারণ স্বাস্থ্যবান শিশুর ক্ষেত্রে যে সব আচরণ প্রত্যাশিত সেগুলিকেই আমরা স্বাভাবিক বা বাঞ্ছিত আচরণ বলে ধরে নিয়ে থাকি। আর যখনই এই স্বাভাবিক বা বাঞ্ছিত আচরণের মান থেকে শিশুর আচরণকে ভ্রষ্ট হতে দেখি তখনই তাকে আমরা অবাঞ্ছিত বা অস্বাভাবিক আচরণ বলে অভিহিত করি। নীচে এ ধরনের কতকগুলি সমস্যামূলক আচরণের বিবরণ দেওয়া হল।

১। খাদ্য-ঘটিত সমস্যা (Food Problem)

ছোট শিশু খুব শীঘ্রই আবিষ্কার করে যে যদি সে খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে পিতামাতার মনোযোগ ত সে পেতেই পারে এমন কি তাঁদের তার খেয়ালখুসী মেনে চলতে বাধ্য করতে পারে। শিশু বুঝতে পারে যে তার খাবার সময় সে যদি অনিচ্ছা প্রকাশ করে বা উদাসীনতা দেখায় তাহলে পিতামাতা নিতান্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়বেন আর তখন সে তার খুসী মত তাঁদের চলতে বাধ্য করে তুলতে পারবে। খাদ্যঘটিত সমস্যা বলতে খাদ্য গ্রহণ করতে

অস্বীকৃতি বা খুব ধীরে ধীরে খাওয়াকেও বোঝায়। দুই থেকে চার বছরের শিশুদের মধ্যে খাদ্য মুখ থেকে বার করে দেওয়া বা বমি করে ফেলা ইত্যাদির দৃষ্টান্তও দেখা যায়। এই বয়সের শিশুদের মধ্যে সত্যকারের অসুস্থতা বা অরুচির জন্য বমি করার দৃষ্টান্ত যত বেশী না পাওয়া যায়, পিতামাতার মনোযোগ আকর্ষণ করা বা তাঁদের জব্দ করার জন্য এইসব আচরণ সম্পন্ন করার দৃষ্টান্ত তার চেয়ে অনেক বেশী পাওয়া যায়।

এই ধরনের সমস্যামূলক আচরণ অবশ্য আর একটু বড় হলে থাকে না। শিশুর মনোযোগ তখন বৃহত্তর পৃথিবীর নানা বস্তুর উপর নিবদ্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে এই ধরনের সমস্যাও আর বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু যে সব শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় হয় না সে সব শিশুর মধ্যে এই ধরনের খাদ্যসংক্রান্ত সমস্যা থেকে যায় এবং তারা তখন খাদ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি, বমি, খাদ্যে বৈরাগ্য দেখান ইত্যাদি পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি কোন ছোট শিশুর বিশেষ কোন খাদ্যে বিরাগ দেখা যায় তাহলে তাকে ঐ খাদ্য বার বার খেতে দিতে হবে যাতে তার ঐ বিরাগ দূর হয়ে যায়। তবে খাদ্যের পরিমাণ প্রথম প্রথম অল্প হবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা না আসা পর্যন্ত ধীরে ধীরে তা বাড়িয়ে যেতে হবে।

২। **বদ্‌মেজাজ** (Temper Tantrum)

ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সমস্যামূলক আচরণটি ব্যাপকভাবে দেখা যায় সেটি হল বদ্‌মেজাজ। এটি বিশেষ করে শৈশবের শেষে বাল্যকালের প্রারম্ভে দেখা দেয়। এই সময় শিশু বুঝতে পারে যে মা বাবার কাছে মেজাজ দেখিয়ে বা আব্দার করে সে তার ঈপ্সিত বস্তুটি আদায় করতে পারবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুর এই সমস্যামূলক আচরণ কিছুটা বড় হলে আপনা হতে চলে যায়। খুব ছোট ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে পিতামাতারা সাধারণত সব আব্দারই মেনে নেন। সেজন্য বদ্‌মেজাজ দেখান তাদের কাছে খুবই কার্যকর অস্ত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু শিশু যত বড় হতে থাকে পিতামাতারা ততই আর তাদের সব আব্দার নির্বিচারে মেনে নেন না। তার ফলে তাদের বদ্‌মেজাজও ধীরে ধীরে কমে আসে। কিন্তু যদি শিশু বড় হলেও পিতামাতা তার বদ্‌-মেজাজকে প্রশ্রয় দেন এবং সেটিকে দূর করার জন্য কোন কার্যকর পন্থা গ্রহণ না করেন তাহলে পরিণত বয়সে একগুঁয়েমি, নেতিবাচক মনোভাব প্রভৃতি গুরুতর সমস্যামূলক আচরণ স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

যে কোন বয়সেই হোক্ না কেন বদ্‌মেজাজকে অবহেলা করা বা প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। খুব ছোট শিশুর ক্ষেত্রে তার আব্দার যতদূর সম্ভব মেটান উচিত। কিন্তু সে যদি এটা বুঝতে পারে যে চেঁচামেচি কান্নাকাটি করলেই তার আব্দার মেটে তাহলেই তার মধ্যে তার এই বদ্‌মেজাজ স্থায়ীভাবে থেকে যাবে। কিন্তু যদি তার যে সব আব্দার মেটান সম্ভবপর সেগুলি চাওয়া মাত্রই মিটিয়ে দেওয়া হয় এবং যেগুলি মেটান সম্ভবপর নয় সেগুলি সম্বন্ধে অনমনীয় দৃঢ়তা অবলম্বন করা হয় তাহলে তার মধ্যে এই বদ্‌মেজাজরূপ সমস্যামূলক আচরণটি আর দেখা দেবে না। দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে পিতামাতারা অতি নির্দোষ আব্দারও সহজে মেটাতে চান না, অথচ শিশু চেঁচামেচি হৈ চৈ করলে সব রকম দাবীর ক্ষেত্রেই তাঁরা নরম হয়ে পড়েন। সে সব ক্ষেত্রে তাঁরাই শিশুর মধ্যে বদ্‌মেজাজ সৃষ্টি ও স্থায়ী করার জন্য দায়ী হন। অতএব প্রথম থেকেই শিশুর আব্দার মেটান সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করলে তার মধ্যে বদ্‌মেজাজ দেখা দেবে না।

৩। নেতিমনোভাব (Negativism)

বদ্‌মেজাজের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত আর একটি সমস্যামূলক আচরণ হল নেতিমনোভাব। নেতিমনোভাব বলতে পিতামাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিব্যক্তিকেই বোঝায়। বাল্যকালের প্রথম দিকে এই মনোভাব প্রায় সকল ছেলেমেয়ের মধ্যেই দেখা যায়। বদ্‌মেজাজ এবং নেতিমনোভাবের মধ্যে একটি নিকট সম্পর্ক আছে। কেননা দুইই পিতামাতার অনুশাসনের বিরুদ্ধে শিশুর বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ।

এই সমস্যামূলক আচরণটি নানা কারণে সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত, যদি শিশুর প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি যথাযথ তৃপ্ত না হয় তাহলে তার মন পিতা-মাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে নেতিমনোভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, যে সব পরিবারে শিশুকে অতিরিক্ত আদর দেওয়া হয় এবং শিশুর সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সকল চাহিদাই বিনা দ্বিধায় মেটান হয় সেখানেও শিশুর মধ্যে নেতিমনোভাব দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে শিশু পিতামাতার অনুশাসনকে গ্রাহ্যই করে না এবং সব সময়েই তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করে। তৃতীয়ত, যে সব পরিবারে শিশুর প্রতি অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক আচরণ করা হয় সেই সব পরিবারের শিশুদের মধ্যেও নেতিমনোভাব বিশেষ করে দেখা দেয়। বস্তুত শিশু

যখন নিজেকে অবহেলিত ও লাঞ্ছিত বলে মনে করে তখন স্বভাবতই তার ক্ষুদ্র মন বয়স্কদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

নেতিমূলক মনোভাব দুর করতে হলে শিশুর প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি যাতে যথা সময়ে তৃপ্ত হয় তার আয়োজন সর্বাগ্রে করতে হবে। অতিরিক্ত আদর বা চরম অনাদর দুইই মানসিক স্বাস্থ্যের পরম ক্ষতিকর। সহানুভূতি ও বিচক্ষণতার সঙ্গে শিশুর সমস্ত চাহিদাগুলির বিচার করতে হবে এবং সাধ্যমত সেগুলির তৃপ্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। অতিনির্ভরশীলতা (Overdependence)

অনেক সময় দেখা গেছে যে একা চলাফেরা করতে পারলেও বা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে সমর্থ হলেও ছোট ছেলেমেয়েরা পিতামাতা বা অন্য বয়স্কদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে থাকে। যেমন না খাইয়ে দিলে শিশু খেতে পারে না, জামাকাপড় না পরিয়ে দিলে পরতে পারে না, হাত ধরে না নিয়ে গেলে চলতে পারে না ইত্যাদি। এগুলি সবই অতিনির্ভরশীলতার দৃষ্টান্ত এবং এক ধরনের সমস্যামূলক আচরণ।

এই সব ছেলেমেয়ে দেহ মনে পরিণত হয়ে উঠলেও তাদের অতি-শৈশবকালীন আচরণগুলি তারা ছাড়তে চায় না। যে সব শিশুর প্রতি প্রথম থেকেই অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া হয় এবং স্বাধীনভাবে তাদের কিছু করতে দেওয়া হয় না তারা বয়সে বড় হলেও একই ভাবে বয়স্কদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এই আচরণমূলক সমস্যাটি যদি যথাসময়ে দূর করা না হয় তাহলে ভবিষ্যতে শিশুর ব্যক্তিসত্তার গঠনে গুরুতর ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা দূর করতে হলে শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার সুযোগ দিতে হবে এবং যাতে সে নিজের প্রেরণা ও বুদ্ধি অনুযায়ী তার নিজের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। আধিপত্য এবং আক্রমণধর্মিতা
(Dominance and Aggressiveness)

অনেক ছোট ছোট শিশুর মধ্যে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করার বা অপরকে আক্রমণ করার প্রবণতা দেখা যায়। এই ধরনের আচরণগুলিও শিশুকে অতিরিক্ত আদর দেওয়া থেকেই জন্মায়। শিশু যখন বোঝে তার ইচ্ছার প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করার মত কেউ নেই তখন সে সকলের উপরেই

তার আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। অতিরিক্ত স্নেহের বশে পিতামাতা হয়ত তার সমস্ত আদর-আব্দার মেনে নেন এবং তার ফলে তার এই আধিপত্য-মূলক মনোভাব আরও বেড়ে ওঠে। কোন কারণে যখন এই আধিপত্যমূলক আচরণটি বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন শিশু আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে এবং চেঁচামেচি, হৈ চৈ, জিনিসপত্র ভেঙে ফেলা, মারামারি প্রভৃতি আচরণ তার মধ্যে দেখা দেয়। এই ধরনের আচরণ শিশুর সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তার গঠনের পরম বিরোধী এবং যথাসময়ে এগুলি দূর করা না হলে শিশু পরিণত বয়সে কলহপ্রিয়, অত্যাচারী ও আক্রমণধর্মী (Bully) হয়ে ওঠে। পিতামাতার উচিত এই ধরনের প্রবণতা শিশুর মধ্যে দেখলে অবিলম্বে তার নিয়ন্ত্রণ করা এবং যাতে শিশুর আচরণ স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় পথে অগ্রসর হয় তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

৬। আঙ্গুল চোষা, দাঁতে নখ কাটা ইত্যাদি

খুব ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে আঙ্গুল চোষা, দাঁতে নখ কাটা প্রভৃতি সমস্যামূলক আচরণগুলি দেখা যায়। এগুলি খুব গুরুতর সমস্যার পর্যায়ে পড়ে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায় যে শিশু একটু বড় হলেই তাদের এই অভ্যাসগুলি নিজে নিজেই চলে গেছে। তবে যদি বড় হওয়া সত্ত্বেও এই আচরণগুলি থেকে যায় তবে এগুলি দূর করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

৭। মিথ্যাভাষণ ও অপহরণ (Lying and Stealing)

ছোট ছেলেমেয়েদের সমস্যামূলক আচরণগুলির মধ্যে গুরুতর আচরণ হল মিথ্যাভাষণ ও অপহরণ। বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়েদের মধ্যে যত অপরাধ-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তার মধ্যে ৩৫% থেকে ৮০% হল মিথ্যাভাষণ এবং অপহরণের ক্ষেত্র। অন্যান্য অপরাধপরায়ণতার সঙ্গেও মিথ্যাভাষণ অপরিহার্য সহগামীরূপে থাকে।

মিথ্যাভাষণ ও অপহরণ নানা কারণে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা দিতে পারে। যে কোন কারণেই দেখা দিক না কেন মিথ্যাভাষণ প্রকৃতপক্ষে হল একটি পরিপূরক আচরণ। কোন একটি বিশেষ চাহিদা যদি শিশুর মধ্যে দেখা দেয় এবং যদি স্বাভাবিক পন্থায় ও সহজভাবে সে চাহিদা পূর্ণ না হয় তাহলে শিশু ঐ চাহিদাটিকে অন্যভাবে তৃপ্ত করার জন্য যে আচরণ সম্পন্ন করে তাকেই পরিপূরক আচরণ বলে। মিথ্যা কথা বলার মত চুরি করাও একটি এই ধরনের

পরিপূরক আচরণ। কোন স্বাভাবিক চাহিদা অতৃপ্ত থাকলে শিশু মিথ্যাভাষণ বা অপহরণের মধ্যে দিয়ে তার সেই চাহিদাটি তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। এই ধরনের শিশুদের আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা—(১) যে সব শিশু তাদের সহপাঠীদের সমকক্ষ হবার জন্য চুরি করে বা মিথ্যা কথা বলে এবং সহপাঠীরা তাদের পিতামাতার কাছ থেকে যে সব বস্তু উপহার পায় সেগুলি তারা পেতে চায়। (২) যে সব শিশু অপরের মনোযোগ পাবার জন্য চুরি করে বা মিথ্যা কথা বলে। (৩) যে সব শিশু যৌনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অন্য কোন মানসিক অপসঙ্গতি থেকে জাত প্রক্ষোভের তৃপ্তির জন্য চুরি করে বা মিথ্যা কথা বলে।

প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের চিকিৎসা করা খুব শক্ত নয়। তাদের বস্তুগত অভাব মেটাতে পারলেই তাদের এই মন্দ অভ্যাসটি দূর হয়ে যায়। কিন্তু যে সব ছেলেমেয়ে নিছক অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য মিথ্যা কথা বলে বা চুরি করে তাদের সংশোধন করা বিশেষ দুরূহ হয়ে ওঠে। তার সর্বপ্রধান কারণ হল যে এই সব ছেলেমেয়ে বুঝতে পারে যে তারা মিথ্যাভাষণ বা অপহরণের দ্বারা অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এইজন্য তাদের অপরাধ অপরের কাছে ধরা পড়লেও তারা তাদের সেই অপরাধমূলক আচরণ থেকে নিবৃত্ত হয় না। বরং তাদের যদি শাসন করার চেষ্টা করা হয় তাহলে তাদের মধ্যে অন্যান্য অপরাধপরায়ণতার উপসর্গ দেখা দেয়। পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি তাদের কাছে তখন শত্রু হয়ে দাঁড়ান, কেননা তাঁরা সকলেই তাদের কাজের প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করেন। কালক্রমে নিজেদের সহপাঠীদের দ্বারাও তারা পরিত্যক্ত হয় এবং পরে অসৎ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে শেখে। তাদের কাছে তখন দুটি মাত্র পরস্পরবিরোধী জীবনাদর্শের অস্তিত্ব থাকে। একটি হল যে জীবনাদর্শ তারা নিজেরা গ্রহণ করেছে এবং অপরটি হল যে জীবনাদর্শ তাদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই আদর্শমূলক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে শিশুর মানসিক শান্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং যদি সে কোন প্রকারে তার এই দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু মীমাংসা করতে না পারে তাহলে সে বড় হয়ে দুর্বলচিত্ত ও অপরাধপরায়ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠে।

এই সব ছোট ছেলেমেয়েদের আচরণমূলক সমস্যা দূর করতে হলে তাদের বোঝাতে হবে যে তাদের পিতামাতা শিক্ষকেরা তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ত নন‌ই বরং যাতে সন্তোষজনক ও বাঞ্ছিত আচরণের মাধ্যমে সকল পরিস্থিতির সঙ্গেই

তারা সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে পারে সে ব্যাপারে তাঁরা তাকে সাহায্য করতে চান। কোনরকম শাস্তি দিয়ে বা নিপীড়ন করে তাদের সংশোধন করার চেষ্টা নিতান্তই অর্থহীন।

অনেক স্বাস্থ্যহীন বা শারীরিক দুর্বলতাসম্পন্ন শিশুকেও অপরের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য চুরি করতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এরাও আর দশটি স্বাস্থ্যবান শিশুর মত চায় যে সকলে তাদের কাজের প্রশংসা করুক ও তাদের মূল্য স্বীকার করুক। আর সেইজন্য সহজ ও স্বাভাবিক পথে সেই প্রশংসা ও মূল্য আদায় করতে না পেরে তারা চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করে।

এই সব ছেলেমেয়ে যাতে চুরি ও মিথ্যাভাষণের পরিবর্তে অন্য কোন ভাল প্রতিপূরক আচরণের সাহায্যে তাদের কাম্য প্রশংসা এবং পরিচিতি আদায় করতে পারে তার ব্যবস্থা করাই তাদের সংশোধন করার একমাত্র উপায়।

যে সব শিশু তাদের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত প্রক্ষোভকে অভিব্যক্ত করার জন্য মিথ্যা কথা বলে বা চুরি করে তাদের চিকিৎসার জন্য বিশেষভাবে সময়, যত্ন ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। যতক্ষণ না এদের মনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বটির স্বরূপ খুঁজে বার করা যাচ্ছে এবং উপযুক্ত পন্থায় সেই অন্তর্দ্বন্দ্বটি দূর করা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ তাদের এই অপরাধপরায়ণতা দূর করা যাবে না। সেই জন্য এই সব ক্ষেত্রে অনেক সময় অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

মনোবিকারমূলক মিথ্যাভাষণ ও অপহরণ

(Pathological Lying and Stealing)

সাধারণত ছেলেমেয়েরা যখন মিথ্যা কথা বলে বা চুরি করে তখন তাদের সেই কাজের পেছনে কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকেই। সেই বিশেষ লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে পৌঁছবার জন্য তারা এই অসামাজিক আচরণগুলি সম্পন্ন করে থাকে। কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে কোন বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাড়াই শিশুকে চুরি করতে বা মিথ্যা কথা বলতে দেখা যায়। এই উদ্দেশ্যহীন মিথ্যাভাষণ বা অপহরণকে মনোবিকারমূলক মিথ্যাভাষণ বা অপহরণ বলা হয়। এই অবাঞ্ছিত আচরণগুলির কোন বাহ্যিক কারণ খুঁজে পাওয়া না গেলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি কারণ-বর্জিত নয়। এগুলির যথার্থ কারণ শিশুমনের গভীর তলদেশে নিহিত থাকে এবং কোন সাধারণ পন্থায় বা আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এগুলির স্বরূপ জানা যায় না। বস্তুত শিশুর নিজের কাছেও সেই কারণ-

গুলি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অন্তর্নিহিত কারণগুলি কোন না কোন মানসিক বিকার থেকে জন্মায় এবং সেই মানসিক বিকারের চিকিৎসা করা না হলে ঐ অবাঞ্ছিত আচরণগুলিও দূর হয় না। এই জন্য এই সব শিশুর চিকিৎসা প্রচলিত পদ্ধতিতে করা সম্ভব নয়। একমাত্র অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সযত্ন ও সুপরিকল্পিত চিকিৎসার দ্বারাই এদের মানসিক বিকার দূর করা সম্ভব।

প্রশ্নাবলী

1. What is a problem behaviour ? Give examples of a few problem behaviours and suggest their remedies.

Ans. (পৃঃ ২০—পৃঃ ২৮)

2. Discuss the nature of problem behaviours and show how they should be dealt with.

Ans. (পৃঃ ২০—পৃঃ ২৮)

3. Write notes on : Pathological Lying and Stealing.

Ans. (পৃঃ ২৭—পৃঃ ২৮)

4. Discuss the instances of the following problem behaviours in pre-school children. How will you deal with them ?

(a) Temper Tantrum (b) Truancy (c) Dominance and Aggressiveness (d) Lying and Stealing (e) Thumb Sucking (f) Food Problem (g) Negativism.

Ans. (পৃঃ ২১—পৃঃ ২৭)

চার

অপরাধপরায়ণতার স্বরূপ (Nature of Delinquency)

শিশুর বয়স অনুযায়ী অসঙ্গতিমূলক আচরণকে আমরা দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছি। সমস্যামূলক আচরণ (Problem Behaviour) এবং অপরাধ-পরায়ণতা (Delinquency)। এই উভয় প্রকার আচরণই যদিও মানসিক অসঙ্গতি থেকে জন্মলাভ করে থাকে তবু গুরুত্ব এবং জটিলতার দিক দিয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এই শ্রেণীবিভাগকেই সমর্থন করে থাকেন। সাত-আট বৎসরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সব অবাঞ্ছিত আচরণ দেখা যায় সাধারণভাবে সেগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয় না এবং শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই সেগুলি লোপ পায়। এই পর্যায়ে সাধারণত খাদ্য-সংক্রান্ত সমস্যা, বদমেজাজ, নেতিমনোভাব ইত্যাদি আচরণগুলি অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু সাত-আট বৎসর বয়সের পরেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সব দুষ্কৃতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেগুলির গুরুত্ব শৈশবকালীন সমস্যামূলক আচরণের চেয়ে অনেক বেশী। এই সময় শিশু সাধারণত বিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে থাকে এবং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়। তার ব্যক্তিসত্তার বহুমুখী বিকাশ বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এই সময়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। সেই জন্য শিশু যদি এই সময়ে কোন অবাঞ্ছিত বা অসামাজিক আচরণ করে তা তার সমগ্র ব্যক্তিসত্তার সংগঠনকেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাছাড়া তার সমগ্র বিকাশ প্রক্রিয়াটিও তার অপরাধপরায়ণতার জন্য গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সব কারণে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে অপরাধপরায়ণতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

অপরাধপরায়ণতা বলতে আমরা সমাজবিরোধী আচরণ সম্পন্ন করাকে বুঝি। প্রত্যেক সমাজেরই কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত আচরণের মান থাকে। যে সব আচরণের এই সামাজিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে সেই আচরণগুলিকে আমরা অপরাধ নাম দিই না। সেগুলিই হল সমাজের দিক দিয়ে কাম্য ও বাঞ্ছিত আচরণ। আর যে সব আচরণ সমাজ-অনুমোদিত মান থেকে ভ্রষ্ট হয় সে সব আচরণকেই আমরা অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক আচরণ নাম দিয়ে থাকি। এই সামাজিক মাপকাঠির বিচারে কোন্ আচরণটি অপরাধ, কোন্‌টি অপরাধ নয়, তা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

শিশুর অপরাধপরায়ণতাকে এক কথায় এই নির্দিষ্ট সামাজিক মানের বিরোধী আচরণ বলে বর্ণনা করা যায়। তবে বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজবিরোধী আচরণকে যেমন গুরুতর অপরাধ বলে ধরা যায় এবং তাকে নিবৃত্ত করার জন্য আইনের সাহায্যে শাস্তিদানের ব্যবস্থা থাকে, ছোট শিশুর ক্ষেত্রে অপরাধমূলক আচরণকে সে দৃষ্টিতে দেখা হয় না। গতানুগতিক পন্থায় তাকে কোনও প্রকার শাস্তি না দিয়ে মনোবৈজ্ঞানিক পন্থায় তার ব্যাধির চিকিৎসা করাই উচিত বলে মনে করা হয়। এই জন্য শিশু বা যুব অপরাধীদের সাধারণ বয়স্ক অপরাধীদের সঙ্গে একত্রে বিচার করা হয় না। তাদের স্বতন্ত্রভাবে বিচার করার ব্যবস্থা সব দেশেই প্রচলিত আছে।

অপরাধপরায়ণতার শ্রেণীবিভাগ

প্রকৃতির দিক দিয়ে অপরাধপরায়ণতাকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, যেমন—

১। নির্দোষ অপরাধপরায়ণতা (Benign Delinquency)।

২। শরীরতত্ত্বমূলক অপরাধপরায়ণতা (Physiological Delinquency)।

৩। মনোবিজ্ঞানমূলক অপরাধপরায়ণতা (Psychological Delinquency)।

৪। মনোবিকারমূলক অপরাধপরায়ণতা (Neurotic Delinquency)।

১। নির্দোষ অপরাধপরায়ণতা (Benign Delinquency)

স্কুলের ক্লাস পালান একটি সমাজবিরোধী কাজ এবং এক ধরনের অপরাধপরায়ণতা। কিন্তু যদি স্কুলের পাঠদান শিশুর কাছে নীরস ও কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে এবং তখন যদি সে তার পরিশ্রান্ত মনকে তৃপ্তি দেবার জন্য ক্লাস ছেড়ে বাইরের খোলা মাঠে বেরিয়ে পড়ে তাহলে তার আচরণটি যদিও সমাজে অনুমোদিত নয় তবু সেটিকে সত্যকারের অপরাধ বলা যায় না। এই ধরনের আচরণগুলিকে আমরা নির্দোষ অপরাধপরায়ণতা নাম দিতে পারি। সামাজিক মানের বিচারে এগুলি অপরাধ হলেও এগুলির পিছনে কোন জটিল মানসিক অসঙ্গতি নেই এবং যে পারিবেশিক ঘটনার জন্য শিশু এই ধরনের অপরাধ করে সেই ঘটনাটি দূর করতে পারলেই শিশুর অপরাধপরায়ণতাও চলে যায়। অর্থাৎ উপরের ক্ষেত্রে যদি ক্লাসে শিক্ষকের পাঠদানকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তাহলে ঐ শিশুটি আর ক্লাস পালাবে না।

২। শরীরতত্ত্বমূলক অপরাধপরায়ণতা (Physiological delinquency)

সময় সময় এমন কতকগুলি অপরাধপরায়ণতা দেখা যায় যেগুলি নিছক ব্যক্তির শরীরতত্ত্বমূলক বৈশিষ্ট্য থেকেই জন্মলাভ করে থাকে। ঐ শরীরতত্ত্বমূলক বৈশিষ্ট্যটি সব সময়েই যে কার্যকর হয় তা নয় এবং ব্যক্তি যখনই ঐ ধরনের শরীরতত্ত্বমূলক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবাধীন হয় তখনই সে অপরাধ করে থাকে। আর যখন ঐ বৈশিষ্ট্যটি সক্রিয় থাকে না তখন ঐ ধরনের কোন অপরাধ-পরায়ণতাও তার মধ্যে দেখা যায় না। এই ধরনের অপরাধপরায়ণতা সাময়িক অস্থায়ী ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব গুরুতর হয় না।

৩। মনোবৈজ্ঞানিক অপরাধপরায়ণতা (Psychological Delinquency)

সাধারণত শিশুর যে সমস্ত আচরণকে আমরা অপরাধপরায়ণতা বলে অভিহিত করে থাকি সেগুলি এই পর্যায়েই পড়ে। বিশেষ কোন পারিবেশিক কারণবশত শিশুর মনের মধ্যে এমন একটি মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যার ফলে সে সমাজ অনুমোদিত পন্থায় সেই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে সমর্থ হয় না। অথচ মানসিক দ্বন্দ্বটি কালক্রমে একটি প্রবল প্রক্ষোভধর্মী শক্তির রূপ ধারণ করে এবং শিশুকে অসামাজিক পথে সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে বাধ্য করে। এই থেকেই তার মধ্যে দেখা দেয় অপরাধমূলক আচরণ। সাত-আট বৎসর বয়স থেকে সুরু করে উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সব সমাজবিরোধী আচরণ দেখা দেয় সেগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৪। মনোবিকারমূলক অপরাধপরায়ণতা (Neurotic Delinquency)

গভীর কোন মানসিক বিকারের জন্য যে সমাজবিরোধী আচরণ ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয় তাকে আমরা মনোবিকারমূলক অপরাধপরায়ণতা নাম দিতে পারি। বিভিন্ন কারণের জন্য শিশু বা পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে মানসিক বিকৃতির উদ্ভব হতে পারে। এই মানসিক বিকৃতি থেকেই তার মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণের সৃষ্টি হয়। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, আত্মহত্যা করা, আগুন লাগান প্রভৃতি নানা রকমের অস্বাভাবিক ও সমাজবিরোধী আচরণ কোন বিশেষ ধরনের মনোবিকার থেকে ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে অনেক মনোবিজ্ঞানী মনোবিকারমূলক আচরণকে সাধারণ অপরাধপরায়ণতার শ্রেণীভুক্ত করতে চান না। তাঁদের মতে সাধারণ অপরাধ-

পরায়ণতাকে মনোবিকারের মত একটি মানসিক ব্যাধি বলে বর্ণনা করা যায় না। ব্যাপক গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে অপরাধপরায়ণতা সামাজিক ও পারিবেশিক কারণ থেকেই প্রধানত উদ্ভূত হয়ে থাকে। কিন্তু মনোবিকারমূলক আচরণগুলির সৃষ্টির পেছনে সামাজিক ও পারিবেশিক শক্তিগুলির যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও মূলত সহজাত মানসিক বিকারমূলক প্রবণতাই এগুলির সৃষ্টির প্রধান কারণ। এই জন্যই মনোবিকারমূলক আচরণকে সাধারণ অপরাধপরায়ণতা থেকে স্বতন্ত্র বলে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত।

অপরাধপরায়ণতার বিভিন্ন রূপ বা দৃষ্টান্ত

অতএব দেখা যাচ্ছে অপরাধপরায়ণতা বলতে আমরা শিশু এবং প্রাপ্ত-যৌবনদের মধ্যে প্রধানত পারিবেশিক কারণ থেকে উদ্ভূত যে সব সমাজবিরোধী আচরণ দেখা দেয় সেগুলিকেই বুঝি। সাধারণত শিশুদের মধ্যে এই ধরনের অপরাধপরায়ণতার যে সব রূপ বা দৃষ্টান্ত দেখা যায় তার কয়েকটির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। আক্রমণধর্মিতা (Aggressiveness)

একটু পরিণত হলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে অপরাধপরায়ণতাটি প্রায় দেখা যায় সেটি হল আক্রমণধর্মিতা। এই ধরনের ছেলেমেয়েরা তাদের দুর্বল সহপাঠী, ভাইবোন প্রভৃতির প্রতি অনর্থক অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে। এদের ইংরাজীতে বুলি (Bully) বলা হয়।

নিরাপত্তার অভাববোধই আক্রমণধর্মিতার প্রধান কারণ। যে শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার বোধ নেই এবং যে নিজেকে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত মনে করে, সে তার লুপ্ত আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পাবার জন্য অপরের উপর উৎপীড়ন করে। আত্মস্বীকৃতি ও অপরের কাছ থেকে পরিচিতি পাবার জন্যও অনেক শিশু, আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে। বাড়ীতে বা স্কুলে স্বাভাবিক পন্থায় পরিচিতি বা স্বীকৃতি পেতে ব্যর্থ হলে শিশু এই অস্বাভাবিক পন্থাটি গ্রহণ করে। এর দ্বারা সে বাড়ীর বয়স্কদের বা স্কুল শিক্ষক-সহপাঠীদের কাছ থেকে আত্মস্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে।

আক্রমণধর্মিতা দূর করতে হলে প্রথমে শিশুর বিশেষ চাহিদাটি কি তা নির্ণয় করতে হবে। যে চাহিদার অপূর্ণতার ফলে সে আক্রমণধর্মী হয়ে উঠেছে সেটিকে অনুসন্ধান করে তার তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি নিরাপত্তাহীনতার বোধই তার অপরাধপরায়ণতার কারণ হয়ে থাকে তবে যাতে তার মন থেকে এই বোধটি

যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণত শিশু যদি তার মা-বাবা বা শিক্ষকদের কাছে অবহেলিত বা প্রত্যাখ্যাত হয় তবেই তার মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়ে থাকে। একমাত্র আন্তরিক ভালবাসাই শিশুর মধ্যে প্রকৃত নিরাপত্তার বোধ সৃষ্টি করতে পারে। অতএব তার রুক্ষ মনকে ভালবাসা দিয়ে সিক্ত করে তুলতে হবে এবং যাতে সে তার আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে পেতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হবে।

আর যদি আত্মস্বীকৃতি ও সমর্থনই তার অতৃপ্ত চাহিদা হয়ে থাকে তবে সে যাতে ঈপ্সিত পথে তা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। খেলাধূলা, অভিনয়, বিতর্ক, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে যাতে সে তার অহংসত্তাকে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার পর্যাপ্ত সুযোগ ও সাহায্য তাকে দিতে হবে।

অনেকে শিশুর এই আক্রমণধর্মী আচরণকে অবদমিত করার চেষ্টা করে থাকেন। বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল যে আক্রমণধর্মী আচরণকে অবদমিত করার ফল মন্দই হয়। তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা হল ঐ আচরণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে কোন মঙ্গলকর পথে পরিচালিত করা। এই পদ্ধতিকে উন্নীতকরণ (Sublimation) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ছেলে মারামারি করতে অভ্যস্ত তাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় নিযুক্ত করলে ধীরে ধীরে তার ঐ আচরণটি সংযত ও গঠনমূলক হয়ে ওঠে।

যদি যথা সময়ে আক্রমণধর্মিতার চিকিৎসা করা না হয় তাহলে এই মনোভাবটি তার ব্যক্তিসত্তার স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় এবং পরিণত বয়সে সে একজন অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে পরিগণিত হয়।

২। ক্লাস পালানো (Truancy)

ক্লাসপালানো একটি অতি সাধারণ অপরাধপরায়ণতার উদাহরণ। ক্লাস পালানোর অভ্যাস নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গড়ে ওঠে। ক্লাস-পালানোর সবচেয়ে বড় কারণ হল শিশুর শিক্ষামূলক চাহিদা ক্লাসে পূর্ণ না হওয়া। যে কোনও কারণে হোক শিশু ক্লাসের পড়া থেকে তার প্রয়োজন মেটাবার মত কিছুই পায় না। তার ফলে ক্লাসে থাকার কোন প্রয়োজন সে আর অনুভব করে না এবং সুযোগ সুবিধা পেলেই ক্লাস থেকে পালায়।

ক্লাসে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন না মিটতে পারার তিন রকম কারণ আছে।

প্রথম, শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতিটি ত্রুটীপূর্ণ হতে পারে এবং তার ফলে হয় শিক্ষার্থীর কাছে ক্লাসের পড়া দুরূহ ঠেকে, কিংবা তা তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এইজন্য আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুর শিক্ষাকে নানা শিক্ষণ-সহায়ক সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তাছাড়া বর্তমান কালে শিক্ষণ-পদ্ধতিটিকে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক করার প্রচেষ্টাও সর্বত্র দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয়, শিক্ষার্থী যদি উন্নত-ধীসম্পন্ন শিশু হয় তবে তার কাছে ক্লাসের পড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগে থেকে জানা বা অতি সহজ বলে মনে হয়। ফলে তার মধ্যে সে নতুন কিছু খুঁজে পায় না এবং সেই জন্য ক্লাসে থাকার কোনও অনুপ্রেরণা সে বোধ করে না। এই কারণেই উন্নত মানসিক শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্লাসপালানোর দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। এই সব ছেলেমেয়েদের ক্লাস পালানো বন্ধ করতে হলে ক্লাসে স্বতন্ত্রভাবে তাদের ক্ষমতার উপযোগী বিশেষ উন্নত ধরনের কাজ দিতে হবে। তার ফলে তারা তাদের মানসিক শক্তির সত্যকারের প্রয়োগ করতে পারবে এবং লেখাপড়ায় আগ্রহ অনুভব করবে।

তৃতীয়, যে সব ছেলেমেয়ে বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি নিয়ে জন্মায় তারা সাধারণ ক্লাসের পড়ার প্রতি কোন আগ্রহ বোধ করে না। সনাতন গতানুগতিক প্রকৃতির স্কুলগুলিতে সাহিত্যধর্মী এবং ভাষাভিত্তিক বিষয় পাঠের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে বিশেষধর্মী শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শক্তির প্রকৃত ব্যবহার এ সব ক্লাসে হয় না এবং তারা বাধ্য হয়ে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু এই সব ছেলেমেয়েদের প্রকৃতিদত্ত শক্তির উপযোগী কাজ যদি তাদের দেওয়া হয় তাহলে তারা সেই সব কাজ করে তৃপ্তি ও সাফল্য দু'ই পাবে। আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে এইজন্য নানা বিভিন্ন প্রকৃতির কাজের ব্যবস্থা আছে যাতে সকল রকম বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েই তাদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যন্ত্রঘটিত শক্তিসম্পন্ন একটি ছেলেকে যদি সাধারণ স্কুলের ক্লাসে পড়তে দেওয়া হয় তাহলে সে মোটেই সেখানে আগ্রহ বোধ করবে না এবং সুযোগ পেলেই ক্লাস থেকে পালাবে। কিন্তু যদি তাকে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে তার উৎসাহ ও আগ্রহের কোন অভাব নেই।

এছাড়াও ক্লাসপালানোর আরও অনেকগুলি কারণ কাছে। অনেক সময় অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার জন্য ছেলেমেয়েরা ক্লাস পালায়। বিশেষ করে বাড়ীতে সম্পন্ন করার জন্য যে সব কাজ দেওয়া হয় সেগুলির প্রতি কখনও কখনও

ছেলেমেয়েরা সত্যকারের আগ্রহ বোধ করে না এবং প্রায়ই এই সব কাজ করে উঠতে না পারলে শিক্ষকদের বকুনি ও সহপাঠীদের উপহাসের ভয়ে তারা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে। তাছাড়া নিজেদের নিম্নজাতি, আর্থিক অসঙ্গতি, নিকৃষ্ট পোষাক ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতার জন্যও অনেক সময় ছেলেমেয়েরা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে।

ক্লাসপালানোর কারণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এ ব্যাধির চিকিৎসা বিশেষ শক্ত নয়। এমন কি ক্লাসপালানোকে আমরা গুরুতর অপরাধপরায়ণতা বলে না ধরতেও পারি। ইতিপূর্বে আমরা ক্লাসপালানোকে নির্দোষ অপরাধ-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত বলে বর্ণনা করেছি। তবে ক্লাস পালানো যে অন্যান্য গুরুতর অপরাধপরায়ণতার পূর্বসোপান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অধিকাংশ যুব অপরাধীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ক্লাসপালানো তাদের স্কুলজীবনের একটি অপরিহার্য লক্ষণ ছিল। ক্লাসপালানোর কারণটি প্রথম অবস্থায় দূর করা শক্ত নয়। কিন্তু যদি সেটিকে অবহেলা করা হয় বা প্রাথমিক অবস্থায় দূর করা না হয় তবে ঐ কারণটি জটিল আকার ধারণ করে এবং কালক্রমে ব্যক্তির মনে গভীর বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত হল যে শিশুর মনে ক্লাসপালানোর প্রবণতা দেখলেই অবিলম্বে তার কারণ খুঁজে বার করতে হবে এবং যতটা সম্ভব তা দূর করতে হবে।

ক্লাসপালানোর প্রবণতা দূর করতে হলে প্রথমেই ক্লাসের পাঠটিকে শিশুর কাছে তৃপ্তিকর করে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে স্কুলের আবহাওয়াকে চিত্তাকর্ষক করতে হবে, শিক্ষণ পদ্ধতিটি মনোবিজ্ঞানসম্মত করতে হবে এবং অর্থহীন নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা প্রয়োগের ফলে শিশুর মন যাতে বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজন কতটা ক্লাসের পাঠে পরিতৃপ্ত হল তার উপর নির্ভর করছে শিশুর কাছে ক্লাস কতটা আকর্ষণীয় হবে। অতএব প্রথম শিশুর নিজস্ব চাহিদার স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং ক্লাসের পাঠের মধ্যে দিয়ে তার মানসিক শক্তির যাতে যথাযথ ব্যবহার হয় সেদিকে যত্ন নিতে হবে।

৩। মিথ্যা ভাষণ (Lying)

মিথ্যা কথা বলাও একটি অতি সাধারণ অপসঙ্গতির উদাহরণ। নানা কারণে শিশু মিথ্যাভাষণের আশ্রয় নেয়। অনেক ক্ষেত্রে কারণটি নিতান্ত নির্দোষ প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং আচরণটি প্রকৃত অপরাধপরায়ণতার পর্যায়ে পড়ে না।

যেমন উচ্ছ্বাসের মাথায় কোন কিছু অতিরঞ্জিত করে বলা বা বানিয়ে বলা বা ভয়ে কোন কিছু গোপন করা বা মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি আচরণগুলির পেছনে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকার ফলে এগুলিকে সত্যকারের অপরাধপরায়ণতা বলা চলে না। তবে যদি এই আচরণগুলি অভ্যাসে পরিণত হয় তাহলে ভবিষ্যতে তা থেকে গুরুতর অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তি তার কোন বিশেষ অতৃপ্ত চাহিদার তৃপ্তি মিথ্যাভাষণের মধ্যে দিয়ে খোঁজে। উদাহরণস্বরূপ কোন শিশু নিজের অসামর্থ্যবশত লেখাপড়া বা অন্যান্য প্রচলিত পথে তার কাম্য আত্মস্বীকৃতি বা সহপাঠীদের কাছ থেকে বাঞ্ছিত পরিচিতি পেল না। সে তখন বন্ধুবান্ধব, সহপাঠীদের কাছে তার মিথ্যা সাফল্য ও কল্পিত কীর্তির নানা কথা অতিরঞ্জিত করে বলা সুরু করল এবং এইভাবে তাদের কাছ থেকে তার প্রাপ্য প্রশংসা ও আত্মপরিচিতি আদায় করল। এই ধরণের মিথ্যাভাষণ প্রকৃতপক্ষে তার অতৃপ্ত আত্মস্বীকৃতির চাহিদা থেকে জাত অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল এবং অপরাধ-পরায়ণতার একটি উদাহরণ। কিন্তু এই মিথ্যাভাষণে তার চাহিদা সত্যকারের তৃপ্ত হয় না। ফলে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব অমীমাংসিতই থেকে যায়। ঐ সাময়িক এবং আংশিক তৃপ্তির জন্য সে ক্রমশ মিথ্যাভাষণের মাত্রা ও পরিমাণ বাড়িয়ে যায় এবং শেষে প্রচণ্ড অপরাধবোধ তার মনকে দুর্বল ও পঙ্গু করে তোলে। বাইরের জগতের কাছেও শীঘ্রই তার এই মিথ্যাভাষণ ধরা পড়ে যায় এবং সমাজে সে মিথ্যাবাদী, অনির্ভরযোগ্য ও দায়িত্বহীন লোক বলে পরিগণিত হয়। শেষ পর্যন্ত সে তার বাঞ্ছিত প্রশংসা ও স্বীকৃতিও পায় না। ফলে তার অপরাধপরায়ণতার মাত্রা আরও বেড়ে চলে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই তার মিথ্যাভাষণের প্রকৃত কারণটি খুঁজে বার করতে হবে এবং যে চাহিদাটির অতৃপ্তির জন্য সে এই পরিপূরক আচরণ অবলম্বন করছে সেটির তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদের বিভিন্ন কর্মশক্তির বিকাশের পর্যাপ্ত আয়োজন থাকে সেখানে কোন না কোন উপায়ে সে তার আত্মস্বীকৃতি পায় এবং তার ফলে তাকে মিথ্যা-ভাষণরূপ অপরাধমূলক আচরণের আশ্রয় নিতে হয় না।

বহু ক্ষেত্রে শিশু মিথ্যা ভাষণকে প্রতিরক্ষামূলক পন্থারূপে ব্যবহার করে থাকে। শিশু কোন অন্যায় কাজ করে ফেললে শাস্তি বা নিন্দা এড়াবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে। এই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় যদি যথাযোগ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে পরে তা অভ্যাসে দাঁড়ায় এবং শিশুর

ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

৪। **অপহরণ** (Stealing)

অপহরণ বা চুরি করাও মিথ্যাভাষণের মত একটি অপরাধপরায়ণতার উদাহরণ। কোন গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার তৃপ্তির অভাবকে শিশু অপরের জিনিস-পত্র অপহরণের মাধ্যমে আংশিকভাবে মেটাবার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশু ভাল পড়া পারে না। ফলে শিক্ষক, সহপাঠী কারোর কাছ থেকে সে তার কাম্য পরিচিতি পায় না এবং তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। তখন সে এই চাহিদা মেটাবার জন্য তার সহপাঠীদের বই, খাতা, পেন্সিল ছুরি ইত্যাদি চুরি করতে সুরু করে। তার এই কাজের জন্য বন্ধুবান্ধবদের চাঞ্চল্য ও দুশ্চিন্তা দেখে সে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে এবং তার দ্বারা তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা কিছুটা তৃপ্তিলাভ করে। বলা বাহুল্য এই ধরনের তৃপ্তি তার সমস্যার সত্যকারের সমাধান করতে পারে না এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্বেরও স্থায়ী মীমাংসা হয় না।

এই ধরনের অপসঙ্গতিমূলক অপহরণ ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করে এবং শিশু তার সামাজিক মান, মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস সবই হারাতে থাকে। এতে তার অপরাধপ্রবণতার মাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং কালক্রমে সে স্থায়ীভাবে একটি অপরাধপরায়ণ শিশু হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত অপহরণ গুরুতর অপরাধ-পরায়ণতার প্রাথমিক সোপান ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোনও কোনও শিশুর মধ্যে আরও গভীর মনোবিকারমূলক চুরি করার প্রবণতা দেখা যায়। সে সব ক্ষেত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব গভীর অচেতনে নিহিত থাকে এবং কোন একটি বিশেষ মনোবিকারমূলক চিন্তা বা ধারণাকে কেন্দ্র করে দিন দিন তা বাড়তে থাকে। সেই অচেতনের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশেষ বিশেষ বস্তু চুরি করার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

এই সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে বস্তুগুলি চুরি করে সেগুলিকে সে কোন কিছুর প্রতীক বলে ধরে নেয় এবং ঐ বস্তুগুলির অধিকার লাভের মধ্যে দিয়ে সে তার বিশেষ কোন চাহিদা তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য অপহরণের এই ক্ষেত্রগুলি অস্বাভাবিক মনোবিকার থেকে সঞ্জাত এবং অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়া এগুলির চিকিৎসা করা একেবারে সম্ভব নয়।

অপসঙ্গতিমূলক অপহরণের অভ্যাস প্রাথমিক অবস্থাতে দূর করা একান্ত প্রয়োজন। শিশু যাতে নিজের অহংসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, নিজের

কাজের প্রাপ্য পরিচিতি আর সকলের কাছ থেকে পেতে পারে এবং তার অবলুপ্ত আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব ছেলেমেয়ে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে না, তারা যাতে অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের উৎকর্ষ দেখাতে পারে তারও পর্যাপ্ত আয়োজন করতে হবে। এই জন্য স্কুলে খেলাধূলা, অঙ্কন, অভিনয়, বিতর্ক ইত্যাদির আয়োজন থাকলে শিক্ষার্থীরা তাদের বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং তার ফলে তাদের অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলিরও তৃপ্তি হয়।

অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই অপরাধ-পরায়ণতা যে অপসঙ্গতি থেকে জন্মায় তা নয়। নিছক মানসিক অপরিণতির জন্যও অনেক ছেলেমেয়ে মিথ্যাকথা বলার মত এটা ওটা চুরি করেই থাকে। চুরি করা যে অনুচিত একথা বোঝার মত বয়সই তখন তাদের হয় না। তাছাড়া অনেক ছেলেমেয়ে নিছক কৌতূহল চরিতার্থের জন্য চুরি করে থাকে। আবার কেউ কেউ তাদের পিতামাতার অস্বচ্ছলতার জন্য সুন্দর বা মূল্যবান কোন বস্তু দেখে সাময়িক লোভের বশে চুরি করে। এই ক্ষেত্রগুলি প্রকৃত অপরাধপরায়ণতার দৃষ্টান্ত নয় এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের সাহায্যে বুঝিয়ে এদের নিবৃত্ত করা যায়। কিন্তু যদি এই ধরনের চুরিকেও যথা সময়ে নিবৃত্ত না করা হয় তাহলে তা অভ্যাসে দাঁড়াতে পারে এবং পরে তা থেকে গুরুতর অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি হতে পারে।

৫। নেতিমনোভাব (Negativism)

নেতিমনোভাব বলতে বোঝায় কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষকদের আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করা, অনুরোধ অগ্রাহ্য করা এবং প্রচলিত আইনকানুনের বিরুদ্ধে ইচ্ছামত কাজ করা। এই মনোভাবসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব সময়েই একটি প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের প্রবণতা দেখা যায় এবং যা কিছু অনুমোদিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত তারই বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়ায়। এই মনোভাবের ফলে কি বাড়ীতে, কি স্কুলে সর্বত্রই শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে স্কুলের সুসংগঠিত রূপ ও আবহাওয়াটি এই সব ছেলেমেয়েদের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে এবং শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড বিরক্তির সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষেরা এই ছেলেমেয়েদের বিদ্রোহী বলে ধরে নেন এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এই ধরনের ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভুল। নেতিমনোভাব শিশুমনের বৃদ্ধির স্বাভাবিক পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সময়

শিশুরা স্বাধীন হবার চেষ্টা করে এবং তার ফলে অপরের অনুশাসন বা কর্তৃত্বের তারা বিরোধিতা করে। সে প্রমাণ করতে চায় যে সে নিজেই নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে এবং নিজের স্বাধীন মত অনুযায়ী চলতে সমর্থ হয়েছে। অতএব সাধারণভাবে বলতে গেলে নেতিমনোভাব কোন প্রকার অপরাধপরায়ণতা নয় বরং স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ারই প্রকাশ।

কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে এই নেতিমনোভাব গুরুতর অপরাধের আকার ধারণ করতে পারে। শিশুর ক্রমবর্ধমান মনের এই স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে যদি অবদমিত করা হয় বা ভুল বুঝে তাকে শৃঙ্খলাভঙ্গ, বিদ্রোহ ইত্যাদি নামে অভিযুক্ত করা হয় তাহলে শিশুর মনে ঐ গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় এবং তা থেকে গুরুতর অপরাধপরায়ণতা দেখা দিয়ে থাকে। শিশুর এই স্বাধীনতার চাহিদা অতৃপ্ত থাকলে তার মধ্যে নেতিমনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে এবং সে হয় আত্মকেন্দ্রিক ও বস্তুজগৎ থেকে প্রত্যাহৃত ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ায়, নয় আক্রমণধর্মী, অপরাধপ্রবণ ও সমাজবিদ্বেষী ব্যক্তি রূপে বড় হয়ে ওঠে।

৬। যৌন-অপরাধ (Sex Offences)

শিশু যখন কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পা দেয় তখন তার মধ্যে ধীরে ধীরে সচেতনতা ও যৌন কৌতূহল সক্রিয় আচরণের রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন যৌন ঘটনা সম্পর্কে জানবার জন্য শিশুর প্রবল কৌতূহল দেখা দেয় এবং তার সেই কৌতূহল সুস্থ উপায়ে তৃপ্ত না হলে সে অসুস্থ ও অসামাজিক পন্থা অবলম্বন করে। গুরুতর ক্ষেত্রে এই বিপথগামী যৌন-চাহিদা নানা রকম যৌন অপরাধের রূপ নেয়। বিকৃত যৌন আচরণ, যৌনধর্মী নিপীড়ন, যৌনমূলক আঘাত, অশ্লীল সাহিত্য পাঠ ও ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি বহু রকমের অবাঞ্ছিত আচরণ শিশুর মধ্যে দেখা দেয়। এই ধরনের অস্বাভাবিক প্রবণতাগুলি যদি অবিলম্বে দূর করা না হয় তাহলে শীঘ্রই সেগুলি গুরুতর অপরাধপরায়ণতার রূপ নেয়।

যৌন-অপরাধ গুরুতর অপসঙ্গতির ফল। যৌবনাগমে স্বাভাবিক যৌনচাহিদার তৃপ্তি না হলে তা যৌন অপরাধের রূপ নেয়। অতএব যৌন অপরাধ দূর করার উপায় হল যাতে যৌন চাহিদা বিকৃত পথে না যায় তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। দেখা গেছে যে প্রাপ্তযৌবনদের যৌন চাহিদার একটি বড় অঙ্গ হল কৌতূহল। অতএব যৌন ব্যাপারগুলি সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের কৌতূহল তৃপ্তি করা এবং যৌন রহস্যগুলি সম্পর্কে তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা দেওয়াই হল যৌন চাহিদাকে অনেকখানি পরিতৃপ্ত করা এবং যৌন প্রচেষ্টাকে সুপরিচালিত করার

প্রধান উপায়। তাছাড়া জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের অবহিত করে কি উপায়ে সার্থক ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন যাপন করা যায় সে সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে যুক্তিধর্মী আলোচনা করলে এই ধরনের অপরাধপরায়ণতার দিকে মন আর যাবে না।

৭। অতিরিক্ত অবাধ্যতা ও উদ্ধত মনোভাব

অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় অবাধ্যতা এবং বয়স্কদের প্রতি উদ্ধত মনোভাব দেখা যায়। এই সব ছেলেমেয়ে কোন রকম আইনকানুন, বিধিনিষেধ মানতে রাজী হয় না বরং তাদের কোনও উপদেশ দিতে বা বোঝাতে গেলে তারা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করে। বলা বাহুল্য এগুলিও এক ধরনের অপরাধ-পরায়ণতার নিদর্শন এবং শৈশবকালের অনুপযোগী পরিবেশ থেকে এগুলি সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাধারণত ছেলেমেয়েদের মাত্রাতিরিক্ত আদর দিলে ছেলেমেয়েরা অবাধ্য ও উদ্ধত হয়ে ওঠে। তাছাড়া যদি পিতামাতার আচরণের মধ্যে কোনও সুনির্দিষ্ট নৈতিক মান বা আদর্শবোধ না থাকে তাহলেও ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাধ্যতা এবং ঔদ্ধত্য দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে পিতামাতার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধার অনুভূতি তাদের মধ্যে দেখা দেয় না এবং তারা তাঁদের কথা বা উপদেশের কোনও মর্যাদা দিতে শেখে না।

তাছাড়া শিশুর কোনও গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা যদি তৃপ্ত না হয় তাহলেও তার মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বাড়ী বা স্কুলের কোনও নিয়ম-কানুন বা ঘটনা শিশুর মনের মত না হলে শিশুর মধ্যে স্বভাবতই বিরূপ মনোভাব জেগে ওঠে। এই সময় এই বিরূপ মনোভাব দূর করার জন্য পিতামাতা এবং শিক্ষকগণ অনেক সময় কঠোর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তার ফলে শিশুর মন থেকে ঐ বিরূপ মনোভাব লোপ পাওয়া দূরে থাকুক তার পরিবর্তে তার মন অতিরিক্ত মাত্রায় অবাধ্য ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সব ক্ষেত্রে কখনই নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়। তার পরিবর্তে শিশুকে যুক্তির দ্বারা বুঝিয়ে তার মনকে জয় করে তাকে শৃঙ্খলা মানতে প্রণোদিত করা উচিত।

৮। দলবদ্ধ দুষ্কৃতি ও শৃঙ্খলাভঙ্গ করা

অনেক সময় দেখা যায় যে ছেলেমেয়েরা ছোটখাট দল বেঁধে নানারকম দুষ্কৃতি করে চলে। উৎপাত করা, জিনিষপত্র ভাঙ্গা, বাগান নষ্ট করা, নিরীহ ব্যক্তি বা ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখান, জনসাধারণের সম্পত্তি নষ্ট করা, অন্যান্য দলের সঙ্গে মারামারি করা এই রকম বহু অবাঞ্ছিত আচরণ এই ধরনের দলগুলি সম্পন্ন করে থাকে।

অবশ্য যৌবন প্রাপ্তির কিছু আগে সব শিশুর মধ্যে দল-বাঁধার কাল (Gang

period) বলে একটি বিশেষ সময় দেখা দেয়। এই সময় ছেলেমেয়ে সকলেই দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতে, খেলতে ও কাজ করতে ভালবাসে। কোন পারিবেশিক কারণের জন্য যে সব ছেলেমেয়ে অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠে তারাদল বেঁধে এই ধরনের দুষ্কৃতিমূলক কাজকর্ম করে বেড়ায়। যে সব শিশুর মধ্যে আক্রমণাত্মক বা ধ্বংসাত্মক মনোভাব সৃষ্টি হয় তারাই বিশেষ করে দল-বাঁধার চেষ্টা করে। তার কারণ হল যে এই দল-বাঁধার মধ্যে দিয়ে তারা তাদের ধ্বংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক প্রবণতাকে তৃপ্ত করতে পারে। বিশেষ করে যে সব ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য দুর্বল বা যারা মনে মনে ভীতু তারা নিজেরা একা একা আক্রমণমূলক বা ধ্বংসাত্মক কাজ করতে ভয় পায়। কিন্তু দলের সাহায্যে তারা তাদের সেই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে। এই সব ছেলেমেয়ের চিকিৎসা করতে হলে তাদের মন থেকে ধ্বংসমূলক ও আক্রমণাত্মক মনোভাব দূর করতে হবে। কি কারণে তাদের মনে এই ধরনের অসামাজিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে তা নির্ণয় করে সেই কারণটি দূর করতে পারলে তাদের অপরাধপরায়ণতাও দূর হয়ে যাবে।

অপসঙ্গতির অন্যান্য রূপ

এছাড়া অপরাধপরায়ণতা আরও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে। যেমন অতিরিক্ত স্বার্থপরতা, বদমেজাজ, একগুঁয়েমী, কলহপরায়ণতা ইত্যাদি। এগুলি সবই অপরাধপরায়ণতার লক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আগের মত কোন না কোন মৌলিক চাহিদার তৃপ্তির অভাব থেকেই এগুলি জন্মলাভ করেছে। এ সমস্ত দূর করতে হলে যে সকল অতৃপ্ত কামনা থেকে এই সব অপরাধপরায়ণতা জন্মলাভ করেছে সেই কামনাগুলি খুঁজে বার করতে হবে এবং সেগুলির তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অপরাধপরায়ণতার কারণাবলীর বিশদ আলোচনা পৃঃ ৪৭-পৃঃ ৫২ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্নাবলী

1. What is delinquency ? Name a few cases of delinquency that you usually find among your children and examine their causes and modes of treatment.

Ans. (পৃঃ ২৯—পৃঃ ৪১)

2. Describe some af the common types of misconduct in the class-rooms of secondary school in Suggest a few remedial measures.

Ans. (পৃঃ ২৯—পৃঃ ৪১)

3. Examine the following cases of delinquency of children and suggest means of dealing with them.

(a) Lying (b) Stealing (c) Truancy (d) Negativism (e) Sex Offences (f) Aggressive Gang.

Ans. (পৃঃ ৩২—পৃঃ ৪১).

পাঁচ

সমস্যামূলক আচরণের কারণাবলী

(Causes of Problem Behaviour)

ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সব মানসিক ব্যাধি দেখা দেয় সেগুলিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করেছি। সমস্যামূলক আচরণ (Problem Behaviour) এবং অপরাধপরায়ণতা (Delinquency)। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সব দুষ্কৃতি বা অসামাজিক আচরণ দেখা যায় সেগুলিরই নাম দেওয়া যায় সমস্যামূলক আচরণ। আর পরিণত বয়সের ছেলেমেয়েরা যে সব অবাঞ্ছিত আচরণ করে থাকে সেগুলিকে আমরা অপরাধপরায়ণতা নাম দিয়ে থাকি।

সাধারণত সমস্যামূলক আচরণের ক্ষেত্রে কোন গুরুতর ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কমই থাকে এবং অধিকাংশ ছেলেমেয়েই বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই অবাঞ্ছিত আচরণগুলি কাটিয়ে ওঠে। অপরাধপরায়ণতা আরও পরিণত বয়সের ব্যাধি বলে এর গুরুত্ব অনেক বেশী।

সমস্যামূলক আচরণের প্রধানতম কারণ হল অপসঙ্গতি (Maladjustment)। প্রত্যেক শিশুই কতকগুলি মৌলিক চাহিদা নিয়ে জন্মায়। যেমন, জল, হাওয়া, উত্তাপ প্রভৃতির চাহিদা। কিন্তু জন্মের পর সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি মনোবিজ্ঞানমূলক চাহিদা তার মধ্যে দেখা দেয়। এই চাহিদাগুলির গুরুত্ব তার জৈবিক চাহিদার চেয়ে কোন অংশে কম নয় এবং এই চাহিদাগুলির সুষ্ঠু পরিতৃপ্তির উপরই পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার মানসিক স্বাস্থ্য। যদি কোন কারণে তার কোন গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পরিতৃপ্ত না হয় তাহলে তার পক্ষে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের অভাবেরই নাম দেওয়া হয়েছে অপসঙ্গতি (Maladjustment)।

শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিলে অনেক সময় তার মধ্যে অস্বাভাবিক এবং সমাজবিরোধী আচরণের প্রবণতা দেখা দেয়। এগুলিকেই আমরা সমস্যামূলক আচরণ নাম দিয়ে থাকি। প্রকৃতপক্ষে এই আচরণগুলি হল পরিপূরক আচরণ। অর্থাৎ স্বাভাবিক পন্থায় নিজের মানসিক তৃপ্তি পেতে অসমর্থ হয়ে শিশু অস্বাভাবিক পন্থায় সেই কাম্য মানসিক তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করে।

সেইজন্য সমস্যামূলক আচরণের চিকিৎসার সব চেয়ে কার্যকর উপায় হল শিশুর সেই অতৃপ্ত চাহিদাটির তৃপ্তিসাধন করা। উদাহরণস্বরূপ, যে শিশু চুরি করে বা মিথ্যা কথা বলে যে হয়ত স্বাভাবিক পন্থায় তার শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে তার বাঞ্ছিত প্রশংসা বা স্বীকৃতি পেতে সমর্থ হয়নি। সেইজন্য চুরি করা এবং মিথ্যা বলা রূপ অস্বাভাবিক পন্থার সাহায্যে সে তার বাঞ্ছিত স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে। এখানে চুরি করা এবং মিথ্যা কথা বলা যদিও অস্বাভাবিক আচরণ তবুও সেগুলি শিশুর চাহিদার তৃপ্তি আনতে সমর্থ হয়েছে। এই শিশুটির অপসঙ্গতি দূর করতে হলে তাকে ভয় দেখিয়ে বা শাস্তি দিয়ে কোন ফলই পাওয়া যাবে না। শিশুর ঐ অতৃপ্ত চাহিদাটিকে সর্বাগ্রে তৃপ্ত করতে হয়।

ছোট শিশু প্রথম প্রথম তার জৈবিক চাহিদাগুলি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু যত সে তার সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে ততই তার মধ্যে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানমূলক চাহিদা দেখা দেয়। এই চাহিদাগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, কৌতূহল তৃপ্তির চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা ইত্যাদি। এই চাহিদাগুলির মধ্যে কোনটি যদি তৃপ্ত না হয় তাহলে শিশুর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে কোন প্রকার সমস্যামূলক আচরণ দেখা দিতে পারে।

যে সব অপসঙ্গতির জন্য শিশুর মধ্যে সমস্যামূলক আচরণ দেখা দেয় সেগুলি সাধারণত বিভিন্ন প্রকার পারিবেশিক অবস্থার জন্য সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এই পারিবেশিক কারণগুলিকে আমরা দুটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। যথা, গৃহঘটিত কারণাবলী এবং বিদ্যালয়ঘটিত কারণাবলী।

ক। গৃহঘটিত কারণাবলী

এই পর্যায়ের কারণগুলি মূলত পিতামাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি পিতামাতা এবং শিশুর মধ্যে সম্পর্ক সব দিক দিয়ে সন্তোষজনক হয় তাহলে শিশুর মধ্যে কোনরূপ মানসিক অপসঙ্গতি দেখা দেয় না এবং তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু কোন কারণে যদি শিশু ও তার পিতামাতার মধ্যে সম্পর্কটি ক্ষুণ্ন হয় তাহলে অনিবার্যভাবেই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই শ্রেণীর গৃহঘটিত কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা হল।

১। শিশুর প্রতি অবহেলা

ছোট শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু ও সুষম বিকাশের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় হল স্নেহ ও সযত্ন মনোযোগ। তার দেহ ও মনের সুপরিণতির জন্য সে সব দিক দিয়ে বয়স্কদের উপর নির্ভরশীল থাকে এবং এ সময় তার প্রতি যদি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া না হয় তাহলে তার শারীরিক সুপরিণতি ত ক্ষুণ্ণ হয়ই, তার মানসিক স্বাস্থ্যও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সময় শিশুদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল ভালবাসা ও নিরাপত্তার চাহিদা। অনেক সময় বয়স্কদের অবহেলার জন্য তার এই ভালবাসা ও নিরাপত্তার চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় এবং কালক্রমে তার মধ্যে গুরুতর অপসঙ্গতি দেখা দেয়।

২। শিশুর প্রতি অতিরিক্ত আদর

শিশুর প্রতি অবহেলা যেমন তার মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি আনে তেমনই তার প্রতি অতিরিক্ত আদরও তার গুরুতর ক্ষতি করে থাকে। অতিরিক্ত আদর পেলে শিশুর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা, দাম্ভিকতা ও অহঙ্কারের সৃষ্টি হয় এবং কালক্রমে সে অসামাজিক ও স্বার্থপর ব্যক্তি হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত আদরের সবচেয়ে বড় দোষ হল যে এই ধরনের অতিরিক্ত আদর পাওয়া ছেলেমেয়েরা বাস্তবকে চিনতে শেখে না এবং পরে যখন পিতামাতার সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণের গণ্ডী ছেড়ে বাইরের জগতে সে পা দেয় তখন তারা একেবারেই পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। তার ফলে আশাভঙ্গ ও ব্যর্থতার পরিতাপে তাদের সমস্ত জীবনটাই দুঃখময় হয়ে ওঠে। যে সব ছেলেমেয়ে পিতামাতার একমাত্র সন্তান হয়, পিতামাতার অতিরিক্ত আদর ও মনোযোগের জন্য প্রায়ই তাদের ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং তাদের মধ্যে সমস্যামূলক আচরণ দেখা দেয়। এমন কি যে সা ছেলেমেয়ে পিতামাতার প্রথম সন্তান হয়ে জন্মায় তারাও প্রায়ই অতিরিক্ত আদর ও মনোযোগের জন্য সমস্যামূলক শিশুরূপে বড় হয়ে ওঠে।

৩। বিপর্যস্ত পরিবার

যে সব পরিবারে পিতা ও মাতার মধ্যে সম্প্রীতি নেই, কলহ, বিতর্ক ও মনোমালিন্যে যে পরিবারের আবহাওয়া সদা তিক্ত কিংবা যেখানে মদ্যপ পিতা বা উদাসীন মাতার জন্য পরিবারের সংগঠন বিধ্বস্তপ্রায় কিংবা যে পরিবারে মৃত্যু, কর্মজীবন বা বিবাহবিচ্ছেদের ফলে পিতা ও মাতার মধ্যে একজন গৃহছাড়া সে পরিবারের শিশুর মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই অপসঙ্গতি দেখা দেয়। শিশুর

ক্রমবিকাশমান মনটির উপর পরিবারের এই বিপর্যস্ত অবস্থা গভীর ছাপ রেখে যায় এবং নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা তার মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে। তার ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই শিশুর মন দুষ্কৃতির দিকে ঝোঁকে।

৪। অতি-কঠোর শৃঙ্খলা বা চরম শৃঙ্খলাহীনতা

শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের পক্ষে অতি কঠোর শৃঙ্খলা যেমন ক্ষতিকর, একেবারে শৃঙ্খলাহীনতাও তেমনই অনিষ্টকর। নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার ফলে শিশুর বিকাশমান মনের সহজ ও স্বাভাবিক উপাদানগুলি সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করতে পারে না এবং তার ফলে তার মধ্যে নানা সমস্যামূলক আচরণ দেখা দেয়। অতিরিক্ত ভীরুতাও এই অতিরিক্ত নিপীড়ন থেকে সৃষ্টি হয় এবং এটিকেও একটি গুরুতর প্রকৃতির সমস্যামূলক আচরণ বলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন। তেমনই আবার যে সব পরিবারে একেবারেই শৃঙ্খলা নেই সেই সব পরিবারেও শিশু দুষ্কৃতিপরায়ণ হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক শৃঙ্খলার অভাবে শিশুর মনে স্বৈরাচার দেখা দেয় এবং আক্রমণধর্মিতা, ধ্বংসকতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি সমস্যামূলক আচরণের প্রতি শিশুর প্রবণতা দেখা দেয়।

৫। পিতামাতার অজ্ঞতা

গৃহ পরিবেশে শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতির আর একটি বড় কারণ হল পিতামাতার অজ্ঞতা। অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অনভিজ্ঞ পিতামাতারা অনেক সময় শিশুর মনোভাব বা চাহিদার প্রকৃত স্বরূপ ধরতে পারেন না এবং তার ফলে তার প্রতি অবাঞ্ছিত এবং প্রতিকূল আচরণ করেন। বিশেষ করে যে সব পিতামাতার আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই তাঁরা সব সময়েই শিশুর আচরণের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন। ফলে এই সব ছেলেমেয়ের মধ্যে নানা কারণে অপসঙ্গতি দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির সমস্যামূলক আচরণ সৃষ্টি হয়।

খ। বিদ্যালয়ঘটিত কারণাবলী

গৃহের পরিবেশ যেমন শিশুর মধ্যে নানা দিক দিয়ে অপসঙ্গতি সৃষ্টি করতে পারে তেমনই বিদ্যালয়ের পরিবেশও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল না হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকূল বিদ্যালয় পরিবেশের জন্য শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তার ফলে শিশু বিভিন্ন সমস্যামূলক আচরণে প্রবৃত্ত হয়।

বিদ্যালয়ঘটিত যে সব কারণের জন্য শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটির নীচে উল্লেখ করা হল।

৬। অনুপযোগী পাঠক্রম

বিদ্যালয়ে অনুসৃত পাঠক্রম যদি শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী না হয় তাহলে তারা সে পাঠক্রম অনুসরণ করতে পারে না এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে দেখা দেয় নানারূপ সমস্যামূলক আচরণ। খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠক্রমটিকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

৭। মনোবিজ্ঞান-বিরোধী পদ্ধতি

অনুপযোগী পাঠক্রমের পরে আসে অনুপযোগী পদ্ধতি। বিদ্যালয়ে অনুসৃত পদ্ধতি যদি মনোবিজ্ঞানবিরোধী হয় তাহলে তা শিশুর মধ্যে ব্যর্থতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব সৃষ্টি করে এবং তা থেকে নানা সমস্যামূলক আচরণ দেখা দেয়।

৮। কঠোর শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠুর শাস্তিদান

যে সব বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় সেই সব বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রায়ই সমস্যামূলক আচরণ দেখা দিয়ে থাকে। এই জন্য বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা যাতে সুপরিকল্পিত ও সুপরিমিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

৯। পর্যাপ্ত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অভাব

ছোট শিশুর বিকাশোন্মুখ দিকগুলি বিভিন্ন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পরিণতি লাভ করে। এই জন্য প্রচলিত লিখন-পঠনধর্মী পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজন রাখা আবশ্যক। যে সব বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা নেই সেই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দুষ্কৃতির দিকে সহজেই প্রবণতা দেখা দেয়।

১০। কুসঙ্গের প্রভাব

বিদ্যালয় পরিবেশে শিশুদের মধ্যে অপসঙ্গতির আর একটি বড় কারণ হল কুসঙ্গের প্রভাব। অনেক সময় মন্দ সঙ্গীদের প্ররোচনায় শিশু কোন অন্যায় কাজ সম্পন্ন করে ফেলে এবং তাই থেকে তার মনে অপরাধবোধের সৃষ্টি হয়। এই অপরাধবোধ কালক্রমে তার মধ্যে নানা সমস্যামূলক আচরণের সৃষ্টি করে থাকে।

ছয়

অপরাধপরায়ণতার কারণাবলী

(Causes of Delinquency)

সমস্যামূলক আচরণ এবং অপরাধপরায়ণতা এ দুটি প্রকৃতির দিক দিয়ে একই বস্তু হলেও মাত্রা এবং গুরুত্বের দিক দিয়ে দু'য়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। সমস্যামূলক আচরণগুলি প্রধানত পারিবেশিক অপসঙ্গতি থেকেই জন্মায় এবং শিশু একটু বড় হলেই সেগুলি লোপ পায়। কিন্তু অপরাধপরায়ণতা বলতে অপেক্ষাকৃত বড় বয়সের ছেলেমেয়েদের অসামাজিক আচরণকেই বোঝায় এবং সেগুলির কারণ যেমন প্রকৃতিতে ব্যাপক হতে পারে তেমনই নানা বিভিন্ন ধরনের উৎস থেকে সেগুলির সৃষ্টি হতে পারে। অপরাধপরায়ণতার কারণগুলিকে নীচের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

১। পারিবেশিক কারণ (Environmental Factors)

২। সামাজিক কারণ (Social Factors)

৩। সহজাত বা বংশধারামূলক কারণ (Hereditary Factors)

৪। মনোবিজ্ঞানমূলক কারণ (Psychological Factors)

১। পারিবেশিক কারণ

অধিকাংশ অপরাধপরায়ণতাই বিভিন্ন পারিবেশিক কারণ থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে। শিশু যে পরিবেশে বড় হয় সেই পরিবেশে যদি তার বিকাশ প্রক্রিয়ার অনুকূল না হয় তাহলে তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে। সাধারণত ৬।৭ বছর বয়স থেকেই শিশু গৃহপরিবেশে ত্যাগ করে বৃহত্তর জগতে পদার্পণ করে এবং তখন থেকে তার পরিবেশ যেমন জটিল তেমনই ব্যাপক হয়ে ওঠে। এই বয়সের শিশুদের পরিবেশকে আমরা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা, গৃহ পরিবেশ, বিদ্যালয় পরিবেশ ও বৃহত্তর পরিবেশ। অপরাধ-পরায়ণতার কারণগুলি এই ত্রিবিধ পরিবেশের যে কোন একটি পরিবেশ থেকে উদ্ভূত হতে পারে।

ক। গৃহ পরিবেশ

শিশুর জীবন সুরু হয় গৃহ পরিবেশে। তার সকল প্রকার অভিজ্ঞতার সূত্রপাতও হয় এখানেই। সেই জন্য তার মানসিক সংগঠনে তার গৃহপরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন কারণে শিশুর গৃহপরিবেশ তার বৃদ্ধি

প্রক্রিয়ার অনুকূল না হয় তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। যে সব অবাঞ্ছিত গৃহ পরিবেশজনিত কারণ থেকে অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি হয় তার কয়েকটির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। অবহেলিত ও প্রত্যাখ্যাত শিশু

শিশু যদি পিতামাতা কর্তৃক অবহেলিত হয় তবে সে অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠে। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য হল তার নিরাপত্তার চাহিদা। যে শিশু তার পরিবারের যত্ন, ভালবাসা ও মনোযোগ থেকে বঞ্চিত সে শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে না। তখন সে তার এই অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাটি মেটাবার জন্যে নানা অপরাধমূলক আচরণ অনুষ্ঠান করে। সাধারণত যে সব পরিবারে অনেকগুলি ভাইবোন থাকে কিংবা যেখানে পিতামাতারা কর্মঘটিত নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন সেই সব পরিবারে পিতামাতারা শিশুর প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দিতে পারেন না এবং সেই সব শিশুর মধ্যে থেকে অপরাধপরায়ণ শিশুর সৃষ্টি হয়।

২। অতিরিক্ত আদর ও মনোযোগ

শিশুকে যদি অতিরিক্ত আদর ও মনোযোগ দেওয়া হয় তাহলেও শিশুর মধ্যে অপরাধপরায়ণতা দেখা দেয়। যে সব শিশু পিতামাতার একমাত্র সন্তান হয় বা পরিবারের বড় ছেলে বা বড় মেয়ে হয় সেই শিশুরাও অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত আদর যত্নে মানুষ হয়। ফলে তাদের ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং কালক্রমে তাদের অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠার খুবই সম্ভাবনা থাকে।

৩। অতি কঠোর বা নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা

অতিরিক্ত আদর যেমন শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর তেমনই অতি কঠোর শৃঙ্খলাও শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিবন্ধক। অতি কঠোর ও নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলাও শিশুর আত্মপ্রত্যয় ও নিরাপত্তাবোধকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করে এবং সে তখন অপরাধ ও অসামাজিক আচরণ সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে তার অবদমিত অহংসত্তার মুক্তি অনুসন্ধান করে।

৪। বৈষম্যমূলক শৃঙ্খলা

কঠোর শৃঙ্খলার মতই বৈষম্যমূলক শৃঙ্খলাও শিশুদের মধ্যে অপরাধপরায়ণতা সৃষ্টি করে। দেখা যায় অনেক সময় পিতামাতা শিশুকে খুব বকাবকি, মারধোর

ও কঠোর নির্যাতন করলেন কিন্তু পরমুহূর্তেই অনুতপ্ত হয়ে প্রচণ্ডভাবে আদর যত্ন করলেন বা নানাবিধ উপহার, পুরস্কারে শিশুকে প্লাবিত করে তুললেন। এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে শিশুর মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং তাকে কালক্রমে অপরাধপ্রবণ করে তোলে।

৫। শৃঙ্খলার অভাব

যে সব পরিবারে কোন শৃঙ্খলা সেই সব পরিবারে ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। পরিবারের শৃঙ্খলাহীনতা শিশুদের স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। ফলে তাদের ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলি স্বাস্থ্য-সম্মতভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। কোনরূপ নিয়মকানুন বা আদর্শ না থাকার ফলে তাদের আচরণ অসংযত হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে তা অপরাধ-পরায়ণতায় রূপান্তরিত হয়।

৬। বিপর্যস্ত বা বিধ্বস্ত গৃহ

বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত গৃহ অপরাধপরায়ণতার একটি বড় কারণ। যে সব পরি-বারে পিতামাতারা সর্বদা কলহে লিপ্ত অথবা দুশ্চরিত্র মদ্যপ পিতা বা স্বার্থপর উদাসীন মাতার জন্য যে পরিবার শান্তিহীন, অথবা মৃত্যু, বিবাহবিচ্ছেদ বা অন্য কোন কারণে শিশু অল্পবয়সে তার মাকে কিংবা বাবাকে হারিয়েছে বা দুজনকেই সেই সব পরিবারের শিশুরা অতি সহজেই অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠে। কোন কারণে পরিবারের সংগঠনটি যদি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তবে শিশুর নিরাপত্তাবোধের চাহিদাটি সম্পূর্ণ অতৃপ্ত থেকে যায় এবং অপরাধমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে সে তার লুপ্ত আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার চেষ্টা করে।

৭। পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

আধুনিক সমাজে পিতামাতার সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। যে সব পিতামাতার অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত এবং তার ফলে সমাজের নিম্নস্তরে যাঁদের স্থান তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধপরায়ণতা বিশেষভাবে দেখা যায়। নিজেদের দারিদ্র্যের জন্য এই ছেলেমেয়েরা সব সময় নিম্নতাবোধে কষ্ট পায় এবং নানারকম অপরাধমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের সেই নিম্নতাবোধকে অবদমিত করার চেষ্টা করে। আবার যে সব পিতামাতা অত্যন্ত ধনী তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও শাসন ও শৃঙ্খলার অভাবে অপরাধপরায়ণতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু যে সব পিতামাতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

খুব উন্নতও নয় আবার খুব নিম্নও নয় তাঁদের ছেলেমেয়েদের সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তাবিকাশে প্রতিবন্ধক কম দেখা দেয় ?

শিশুর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে বিদ্যালয় পরিবেশের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত দিনের বেশ একটি বড় অংশই শিশু বিদ্যালয়ে কাটায় এবং সেখানে সে বহু বিভিন্নধর্মী শক্তির সংস্পর্শে আসে। শিক্ষকমণ্ডলী, সহপাঠী, পাঠ্যবিষয়, বিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়মকানুন প্রভৃতি শিশুর মানসিক সংগঠনকে অতি গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যে সব বিদ্যালয়ে এই সব শক্তি শিশুর ব্যক্তিসত্তার অনুকূল হয় সে সব ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে। কিন্তু যদি কোনও কারণে বিদ্যালয়ের এই শক্তিগুলি শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়ার বিরোধী হয়ে ওঠে তাহলে যেই সব ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণত বিদ্যালয় পরিবেশের যে সব কারণ থেকে শিশুর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং আচরণমূলক সমস্যা দেখা দেয় সেগুলির নীচে উল্লেখ করা হল।

১। অনুপযোগী ও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি

বিদ্যালয়ের পাঠক্রম যদি শিশু রুচি ও সামর্থ্যের অনুপযোগী হয় তাহলে শিশুর মধ্যে অসন্তোষ ও অতৃপ্তি দেখা দেয় এবং নানা প্রকার অপরাধমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে সেই শিশু তার মানসিক তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করে। শিশুদের মধ্যে ক্লাস পালানো একটি অতি সাধারণ অপরাধ। ক্লাস থেকে পালানোর একটি বড় কারণ হল পাঠক্রমের অনুপযোগিতা। তেমনই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণপদ্ধতিও শিশুর মধ্যে এই ধরনের অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি করার আর একটি বড় কারণ। শিক্ষণপদ্ধতি যদি মনোবিজ্ঞানসম্মত না হয় তাহলে শিশুর পক্ষে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয় না। তার ফলে শিশুর মধ্যে দেখা দেয় ব্যর্থতা, নিজের সম্পর্কে নিম্নতাবোধ এবং অপরাধের অনুভূতি। এই মনোভাবকে দূর করার জন্য শিশু অনেক অপরাধপরায়ণতার আশ্রয় নেয়।

২। নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে অপরাধপরায়ণতা সৃষ্টির একটি বড় কারণ হল নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা। প্রাচীন শিক্ষাবিদ্দের ধারণা অনুযায়ী অনেক বিদ্যালয়েতেই কঠোর শৃঙ্খলা ও বিধিনিষেধের নাগপাশে শিশুকে বেঁধে রাখা হয়। তার ফলে তার স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়ে ওঠে এবং তার বিভিন্ন মৌলিক চাহিদাগুলির অধিকাংশই অতৃপ্ত থেকে যায়। অতি স্বাভাবিকভাবেই এই সব

ছেলেমেয়ে অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত আচরণের মধ্যে দিয়ে তাদের অবদমিত প্রক্ষোভ ও চাহিদাগুলি তৃপ্ত করার চেষ্টা করে।

৩। সমাজধর্মী পরিবেশ

অপরাধপরায়ণতা হল অসামাজিক আচরণের প্রবণতা। যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ সমাজধর্মী সেখানে শিশুদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা শক্তিশালী মানসিক বৈশিষ্ট্যরূপে গড়ে ওঠে। তার ফলে সেখানে শিশুরা সহজে অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠে না। কিন্তু যে সব বিদ্যালয়ের পরিবেশ কৃত্রিম এবং অসমাজধর্মী সেখানে শিশুদের মধ্যে সামাজিক বিচারবুদ্ধি সহজে গড়ে ওঠে না। ফলে সেই শিশুরা স্বভাবতই অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠে।

৪। পর্যাপ্ত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অভাব

কেবল লিখন-পঠনধর্মী পাঠক্রমের দ্বারাই শিশুদের বিকাশমান মনকে তৃপ্ত করা যায় না। তাদের এই বহুমুখী বিকাশ প্রক্রিয়াব সুষ্ঠু পরিণতি আসতে পারে একমাত্র বিচিত্র ও বিভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। যে বিদ্যালয়ে এই ধরনের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজন নেই সেখানে শিশুর নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ অভিব্যক্ত হতে পারে না এবং তার ফলে শিশুর মনে অপরাধমূলক আচরণের প্রবণতা দেখা দেয়।

গ। বৃহত্তর পরিবেশঘটিত কারণাবলী

শিশু যখন আরো বড় হয়ে ওঠে তখন সে গৃহ ও বিদ্যালয় ছেড়ে বাইরের বৃহত্তর জগতের পরিবেশে পদার্পণ করে। সে তখন নিজের পরিবারের লোকজন, বিদ্যালয়ের সহপাঠী ও শিক্ষক সমাজের গণ্ডীর বাইরে অনেকেরই সংস্পর্শে আসে এবং তাদের দ্বারা নানা ভাবে প্রভাবিত হয়। এই সময় বাইরের জগতের ব্যক্তিদের চেয়েও সেখানকার ধারণা, বিশ্বাস ও মতবাদ যে সব এতদিন তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতই ছিল, সেগুলি তার মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। এই বৃহত্তর পরিবেশে শিশু যে সব ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে তারাই তার মানসিক বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশে দায়ী। যদি কোন প্রকারে শিশু কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা দলের প্রভাবে গিয়ে পড়ে তাহলে তার বিকাশমান মনে নানা বিকৃত ও অবাঞ্ছিত ধারণা বাসা বাঁধে এবং সেগুলি শিশুকে অপরাধমূলক কাজ করতে প্ররোচিত করে। সেই জন্য শিশু যখন বড় হয় এবং বাইরের জগতে প্রবেশ করতে শেখে তখন কি ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা করে তা দেখা একান্ত প্রয়োজন।

দেখা গেছে যে অনেক পিতামাতা ও শিক্ষকের যথেষ্ট মঙ্গলকর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই বৃহত্তর পরিবেশের মন্দ প্রভাবের জন্যই শিশু অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠে। তাই আধুনিক কালে শিশুকে বৃহত্তর পরিবেশের অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করাকে সর্বোত্তম পন্থা বলে শিক্ষাবিদেরা মনে করে থাকেন।

১। সামাজিক কারণ

আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মতে অপরাধপরায়ণতা নিছক একটি শিক্ষামূলক সমস্যাই নয়, প্রকৃতপক্ষে এটি একটি গুরুতর প্রকৃতির সামাজিক সমস্যাও। সব সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল শিশু। বড়দের সামাজিক সংগঠন যে প্রকৃতির হয় শিশুদের সমাজও সেই প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সমাজের গঠন, প্রকৃতি, ব্যক্তির আচরণের অনুমোদিত মান, বাধা-নিষেধের কঠোরতা, নৈতিক আদর্শের স্বরূপ প্রভৃতির উপরই ব্যক্তির আচরণের প্রকৃতি প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। বিশেষ করে সমাজের প্রচলিত নৈতিক মানের প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের যে মাত্রায় আনুগত্য থাকে সেই মাত্রার দ্বারাই সেই সমাজের প্রতিটি শিশুর মধ্যে ভালমন্দের ধারণা গড়ে ওঠে। যে সমাজে নীতিগত আদর্শ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট বাধানিষেধ নেই অতি স্বাভাবিক ভাবেই সে সমাজের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে ব্যাপকভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপরাধপরায়ণতার নিদর্শন দেখা যায়। এই জন্য অনিয়ন্ত্রিত বা বিপর্যস্ত সমাজব্যবস্থায় দুর্নীতি ও অপরাধের এত প্রাচুর্য। যুদ্ধ, অন্তর্বিপ্লব, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থ নৈতিক অবনতি, কুশিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা যখন কোন দেশের সমাজব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তখন সেই সমাজের কিশোর ও তরুণেরা অপরাধমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজেদের মানসিক সমতা রক্ষা করার চেষ্টা করে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে দেশের সামাজিক সংগঠন যে প্রকৃতির হবে শিশুসমাজের মধ্যে অপরাধ-পরায়ণতাও সেই অনুপাতে কমবে বা বাড়বে।

সমাজ-সংগঠনের মৌলিক যোগসূত্রগুলি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন সেই দুর্বলতা অসংযম ও আদর্শহীনতার রূপ নিয়ে ব্যক্তির মনে প্রতিফলিত হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই স্বাভাবিক সমাজ সংগঠনের মধ্যে অল্পবিস্তর বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। ভারতের মত সুদূর দেশেও কালো বাজার, অতিরিক্ত লাভ, অন্যায়ভাবে মাল মজুত রাখা, প্রতারণা, উৎকোচগ্রহণ

প্রভৃতি নানা অন্যায় এবং সমাজবিরোধী কাজ প্রচুর পরিমাণে সংঘটিত হয়েছিল। এর ফলে আমাদের সমাজ সংগঠনে যে শ্রেণীর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তা, আমাদের দেশের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অপরাধপরায়ণতার মাত্রা যে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অতএব অপরাধপরায়ণতাকে দূর করতে হলে কেবলমাত্র শিশুসমাজকে উন্নত করলেই চলবে না সমগ্র সমাজের উন্নয়নেরও প্রয়োজন। সমাজের নৈতিক আদর্শ, পারস্পরিক আদানপ্রদান, কর্তব্যপরায়ণতা সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতির মান যখন উন্নত হবে তখন স্বাভাবিক ভাবেই অপরাধপরায়ণতাও সমাজের অঙ্গ থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে।

২। মনোবিজ্ঞানমূলক কারণ

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে অপরাধপরায়ণতা মাত্রেরই প্রকৃত কারণ হল মনোবিজ্ঞানমূলক। যে কোন স্তরের অপরাধ হোক না কেন এবং যে কোন পারিবেশিক কারণই তার পেছনে থাক না কেন, অপরাধপরায়ণতা মাত্রেই বিশেষ একটি মানসিক বিকলতা থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে এই বিকলতাকে আমরা অপসংগতি (Maladjustment) নাম দিয়েছি। শিশুই হোক আর বয়স্ক ব্যক্তিই হোক প্রত্যেককেই সুষ্ঠু ও নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করতে হলে তাকে তার চতুষ্পার্শের পরিবেশের সংগে সন্তোষজনক সংগতিবিধান করে চলতে হয়। যতই সে পরিবেশের বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে ততই তার মধ্যে নানা বিভিন্ন প্রকৃতির চাহিদা দেখা দেয়। যতক্ষণ তার এই চাহিদাগুলি সে ঠিক মত মেটাতে পারে ততক্ষণ তার সঙ্গতিবিধানে কোনরূপ বাধা দেখা দেয় না। আর যদি কোন কারণে তার এই চাহিদার কোনোটি অপূর্ণ থেকে যায় তাহলে তার সংগতিবিধান প্রক্রিয়াটিও বাধাপ্রাপ্ত হয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশুর কোন মৌলিক চাহিদা অতৃপ্ত থাকার জন্য নানা অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক আচরণের মধ্যে দিয়ে সে তার সেই চাহিদাটিকে তৃপ্তি দেবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় সে অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠে।

শিশুর চাহিদার এই অতৃপ্তি নানা কারণে ঘটতে পারে। সেগুলি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু যে কোন কারণেই তার অতৃপ্তি ঘটুক না কেন সব ক্ষেত্রেই শিশুর মধ্যে একটি মানসিক বিকলতা দেখা দেয় এবং তারই প্রভাবে অপরাধমূলক কাজের প্রতি তার প্রবণতা জন্মায়। এই জন্যই শিশু ও

কিশোরদের মধ্যে অপরাধ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রগুলিকে মনোবৈজ্ঞানিক অপরাধ-পরায়ণতা (Psychological Delinquency) নাম দেওয়া হয়েছে।

৩। বংশধারামূলক কারণ

অনেক সময় কোন প্রকার সহজাত কারণের জন্যও ব্যক্তির মধ্যে অপরাধ-পরায়ণতা দেখা দতে পারে। শিশু তার জন্মের সময় পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সব বৈশিষ্ট্য পায় সেগুলির মধ্যেই এই কারণগুলি নিহিত থাকে। সহজাত কারণ থেকে জাত অপরাধপরায়ণতাকে আমরা সাধারণত মনোব্যাধিমূলক অপরাধপরায়ণতা (Neurotic Delinquency) নাম দিয়ে থাকি। প্রকৃতপক্ষে অপরাধপরায়ণতা শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে পায় না। এটি একটি অর্জিত বৈশিষ্ট্য। পরিবেশের সংস্পর্শে এসে শিশু অপরাধপরায়ণতা অর্জন করে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের মতে অপরাধসম্পাদনের একটি প্রবণতা অনেক সময় শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকে এবং পারিবেশিক কারণগুলি প্রত্যক্ষ কারণরূপে কাজ করলেও এই সহজাত অপরাধসম্পাদনের প্রবণতা পরোক্ষ কারণরূপে শিশুর উপর অতি গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মনোবিকার-মূলক চুরি করা বা মিথ্যা কথা বলা সাধারণত এই ধরনের সহজাত অপরাধ-প্রবণতা থেকে জন্মলাভ করে থাকে। দেখা গেছে যে যারা কোন মনোবিকারমূলক কারণের জন্য চুরি করে বা মিথ্যা কথা বলে তারা প্রকৃত পক্ষে তাদের অচেতন মনের গভীর তলদেশে কোন এক অন্তর্দ্বন্দ্ব বা নিরুদ্ধ কামনার জন্য এইসব কাজ করে। তাদের সচেতন চাহিদা বা চিন্তার সঙ্গে এই অপরাধপরায়ণতার কোন সম্পর্ক থাকে না। এরা প্রকৃতপক্ষে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত এবং অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়া এদের চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না।

আর একটি সহজাত বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যক্তির মধ্যে অপরাধপরায়ণতা দেখা দেয়। সেটি হল ক্ষীণবুদ্ধিতা (Feeblemindedness)। ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপরায়ণতার একটা গভীর যোগাযোগ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে অপরাধপরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষীণবুদ্ধির সংখ্যা যথেষ্ট। যাদের বুদ্ধি স্বল্প তারা সাধারণ মানুষের মত ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে সমর্থ হয় না এবং তার ফলে সাধারণ ব্যক্তি যে সব কাজ করতে ভয় পায় বা ইতস্তত করে ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তি সে সব কাজ করতে কোনরূপ দ্বিধা করে না। কোন্ কাজের কি ফল এবং সেই ফল ব্যক্তির পক্ষে

কতটা ক্ষতিকর তা বোঝার ক্ষমতা ক্ষীণবুদ্ধিদের থাকে না। সেইজন্যই কোন অপরাধ করতে তাদের কোনরূপ সঙ্কোচ বা ভয় থাকে না। বস্তুত, দেবদূতেরা যেখানে পা দিতে ভয় পায়, মূর্খেরা সেখানে সবেগে এগিয়ে যায়।

প্রতিকারের মাধ্যম ও পন্থা

ছেলেমেয়েদের সমস্যামূলক আচরণ এবং অপরাধপরায়ণতাকে আমরা এক-প্রকার মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা বলে বর্ণনা করতে পারি। কি ধরনের কারণ থেকে এই স্বাস্থ্যহীনতার উৎপত্তি হয় সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। উপযুক্ত পন্থা অনুসরণ করলে যেমন শারীরিক ব্যাধি দূর করা যায় তেমনি যথাযথ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে মানসিক ব্যাধিও দূর করা সম্ভব। এই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়াই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রধানতম কাজ।

শিশুদের সমস্যামূলক আচরণ এবং অপরাধপরায়ণতা দূর করার প্রধান মাধ্যম বলতে দুটি। একটি শিশুর নিজের গৃহ, অপরটি শিশুর বিদ্যালয়।

গৃহ ও বিদ্যালয়

শিশুকে মানসিক বিকার থেকে মুক্ত রাখতে হলে কতকগুলি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। এবং সেগুলির মাধ্যম হল দুটি। প্রথমত, শিশুর বাড়ী ও পিতামাতা এবং দ্বিতীয়ত, শিশুর বিদ্যালয় ও শিক্ষকমণ্ডলী। বস্তুত শিশু যত রকম গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার অধিকাংশই শিশুর কাছে পৌঁছয় এই দুটি মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে। তার দিনরাত্রির প্রায় সবটা সময়ই কাটে হয় বাড়ীতে, নয় বিদ্যালয়ে। ভাল, মন্দ, তৃপ্তিকর সব রকম অভিজ্ঞতাই সে আহরণ করে বাড়ী এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে বাস করে। অতএব তার মানসিক স্বাস্থ্যও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এই দুটি মাধ্যম এবং তাদের অধিবাসী-দের উপর। বাড়ীতে সে কোন্ পরিবেশে মানুষ হয় এবং পিতামাতা ও আর দশ-জনের কাছ থেকে সে কি ধরনের আচরণ পায় এবং গৃহ-পরিবেশে সে কি ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ইত্যাদির উপরই বিশেষ করে নির্ভর তার মানসিক সুস্থতা। তেমনি বিদ্যালয় পরিবেশে তার সহপাঠী ও শিক্ষকেরা তার সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করেন, তার ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলি কত সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পায় এবং তার বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে কতখানি সঙ্গতিবিধান করতে সে সমর্থ হয় ইত্যাদির উপরও প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে তার মানসিক স্বাস্থ্যের প্রকৃতি।

শিশুর গৃহ এবং তার বিদ্যালয়ই তার মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে সব চেয়ে কার্যকর মাধ্যম এবং পিতামাতা, শিক্ষক, সহপাঠী প্রভৃতির দ্বারাই তার সমগ্র অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। গৃহ এবং বিদ্যালয় পরিবেশে শিশুর মধ্যে যে সব অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি দেখা দেয় সেগুলি যদি যথাযথভাবে তৃপ্ত হয় তাহলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য কোন দিক দিয়েই ক্ষুণ্ণ হয় না। উদাহরণস্বরূপ, গৃহপরিবেশে শিশুর সব চেয়ে বড় চাহিদা হল ভালবাসার চাহিদা এবং নিরাপত্তার চাহিদা। এই দুটি চাহিদা যদি ঠিক মত তৃপ্ত হয় তাহলে শিশুর মধ্যে কোনরূপ অসঙ্গতি দেখা দেয় না এবং শিশু দেহে ও মনে স্বাস্থ্যবান হয়ে ওঠে। শিশুর এই চাহিদাগুলি কতখানি তৃপ্ত হল তা আবার নির্ভর করে শিশুর পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিরা তার সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করেন তার উপর।

বিদ্যালয় পরিবেশেও শিশুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চাহিদা দেখা দেয়। যদি যথা সময়ে এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি দেবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে শিশুর শিক্ষা যেমন সুসম্পন্ন হয় তেমনি তার মানসিক স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, প্রশংসার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলি বিদ্যালয়জীবনে শিশুর মধ্যে দেখা দেয় এবং সেগুলির যথাযথ তৃপ্তি হলেই শিশুর ব্যক্তিসত্তা সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, সহপাঠী প্রভৃতিদের আচরণের উপরই এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি নির্ভর করে। যদি কোন কারণে বিদ্যালয় পরিবেশ প্রতিকূল হয় এবং শিশুর চাহিদাগুলি সেখানে তৃপ্ত হবার সুযোগ না পায় তাহলে শিশুর মধ্যে ব্যর্থতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত সে অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর অপরাধপরায়ণতাকে প্রতিরোধ করতে হলে তার গৃহ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ যাতে উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত হয় সেদিকে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে। এই দুটি পরিবেশ যদি শিতর মানসিক বৃদ্ধির অনুকূল হয় তাহলে শিশুর মধ্যে কোন প্রক্ষোভজনিত অসঙ্গতি দেখা দেয় না এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার বৃদ্ধিও সব দিক দিয়ে সুষম ও সুষ্ঠু হয়ে ওঠে।

পিতামাতা

বলাই বাহুল্য যে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভর করে তার পিতামাতার উপর। যে সময়ে শিশুর মনের প্রাথমিক সংগঠনটি সুনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে সেই সময়ে তার অধিকাংশ আদান-প্রদান, ভাব-বিনিময় এবং

অভিজ্ঞতা-আহরণ পিতামাতার মাধ্যমেই ঘটে থাকে। পিতামাতা শিশুর সঙ্গে যেমন আচরণ করবেন তার মানসিক সংগঠনটিও সেই ভাবেই গড়ে উঠবে। বস্তুত, শিশুর প্রাথমিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হয় একমাত্র পিতামাতার মাধ্যমেই। বিশেষ করে শিশুর ভালবাসা এবং নিরাপত্তার চাহিদা তৃপ্ত করতে পারেন একমাত্র তার পিতামাতাই। একথা সর্বজনীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে এই দুটি চাহিদার তৃপ্তির উপরই শিশুর মানসিক সংগঠনের সুস্থতা নির্ভর করে। এই জন্যই যে সব ছেলেমেয়ে কোন কারণে শৈশবেই পিতামাতার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় তাদের অনেকেরই মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। তাছাড়া পিতামাতার সঙ্গে আচরণের মধ্যে দিয়ে শিশু তার অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক অভিজ্ঞতাগুলি আহরণ করে থাকে। যে সব পিতামাতা শিশু সম্পর্কে উদাসীন বা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হন তাঁরা শিশুর প্রাথমিক অভিজ্ঞতাগুলি সম্বন্ধে কোনরূপ যত্ন বা সতর্কতা অবলম্বন করেন না। ফলে শিশু নানা অবাঞ্ছিত, বৈষম্যমূলক এবং সময় সময় আঘাতাত্মক (Traumatic) অভিজ্ঞতাও আহরণ করতে বাধ্য হয়। এই ধরনের প্রতিকূল অভিজ্ঞতাগুলি যে তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করে এবং তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তাকে দুর্বল ও বিকৃত করে তোলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিশু যখন বেশ কিছুটা বড় হয়ে ওঠে তখন সে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং পিতামাতার প্রভাবের গণ্ডী ত্যাগ করে শিক্ষক ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির প্রভাবের অধীন হয়। এই সময় তার উপর পিতামাতার প্রভাব কিছুটা কমে আসলেও কখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় না। তার ক্রমবিকাশমান মানসিক সংগঠনে পিতামাতার অবদান চিরকালই যথেষ্ট থাকে। বস্তুত যাকে আমরা নৈতিক মান বা বিচারবুদ্ধি বলে বর্ণনা করি সেটি বহুলাংশে পিতামাতার অনুশাসন থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যানে শিশুর মধ্যে ঈডিপাস কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয় তার প্রতি পিতামাতার শাসন ও শিক্ষা থেকেই। এই ঈডিপাস কমপ্লেক্স থেকেই পরবর্তীকালে বিবেক বা নৈতিক সচেতনতা জন্মলাভ করে থাকে। অতএব শিশুর প্রতি পিতামাতার আচরণের উপরই বহুল পরিমাণে নির্ভর করে তার মানসিক সংগঠন।

শিক্ষক

গুরুত্বের দিক দিয়ে শিশুর জীবনে পিতামাতার পরেই শিক্ষকের স্থান। শিশুর জীবনের মূল্যবান কয়েকটি বৎসরই কাটে তার বিদ্যালয়ে, শিক্ষক ও অন্যান্য

শিক্ষার্থীর পরিবেশে। সেখানে তার বিচিত্র ও বহুমুখী অভিজ্ঞতা সম্ভার শিক্ষকই রচনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তার এই সময়কার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা তৃপ্ত করার দায়িত্বও শিক্ষকের। আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, আত্মসমর্থনের চাহিদা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি যদি যথাসময়ে তৃপ্ত না হয় তাহলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী জীবনে সে অপরাধপরায়ণও হয়ে উঠতে পারে। এইজন্য শিশুর অপরাধপরায়ণতা দূর করতে হলে শিক্ষকদের বিশেষভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে যেমন এক দিক দিয়ে উন্নত করা প্রয়োজন তেমনই শিশুর সঙ্গে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত আচরণও যাতে আন্তরিক ও ত্রুটীহীন হয় সেদিকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। তাঁদেরই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, উদারতা, বিচারবুদ্ধি এবং বিচক্ষণ আচরণের উপর শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

অপরাধপরায়ণতা দূর করার উপায়

শিশুর অপরাধপরায়ণতা দূর করতে হলে আমাদের দু' শ্রেণীর উপায় অবলম্বন করতে হবে। যথা : (১) প্রতিরোধমূলক (Preventive) এবং (২) নিরাময়-মূলক (Curative)। প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি আবার দু'রকমের হতে পারে। ব্যক্তিমূলক (Individual) এবং সমষ্টিমূলক (Collective)

১। প্রতিরোধমূলক পন্থা (Preventive Measures)

প্রতিরোধমূলক পন্থা বলতে বোঝায় শিশুর মধ্যে যাতে প্রথম থেকেই অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। যে সব কারণের জন্য শিশুর মধ্যে অপরাধপরায়ণতা দেখা দেয় সেগুলিকে আগে থেকে দূর করাই এই পর্যায়ের কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত।

যখন এই প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি শিশুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে প্রযোজ্য হয় তখন সেগুলিকে ব্যক্তিগত প্রতিারাধমূলক পন্থা বলা হয়। নীচের পন্থাগুলি এই পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত বলা চলে।

১। উন্নত গৃহ পরিবেশ

শিশু যে পরিবেশে মানুষ হয়, সেই পরিবেশটিকে সব দিক দিয়েই স্বাস্থ্যময় করে তুলতে হবে। অভাব-অনটন, পারিবারিক সমস্যা, পিতামাতাদের কলহ-মতান্তর যাতে শিশুকে স্পর্শ না করে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশুর চোখের সামনে চেঁচামেচি, বকাবকি, মারধোর ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। শিশুর বাস-

কক্ষটি যাতে স্বাস্থ্যসম্মত হয়, সে যাতে পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশ্রাম পায় এবং যাতে সে ব্যায়াম ও শরীর সঞ্চালনের যথেষ্ট সুযোগ পায় সেদিকেও বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। শিশুর নিত্য-সঙ্গী' খেলাধূলার সাথী ও বন্ধুবান্ধব যাতে সুনির্বাচিত হয় সেদিকে পিতামাতাকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

২। সুষম আচরণ ও সুপরিমিত শৃঙ্খলা

শিশুর প্রতি বয়স্কদের আচরণ যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। অতিরিক্ত আদর বা অতিরিক্ত অবহেলা দুইই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। শিশুর প্রতি পিতামাতা ও বয়স্কদের আচরণ হবে পরিমিত মাত্রার ও সুষম প্রকৃতির। মাত্রাহীন বৈষম্যমূলক শৃঙ্খলাও বিশেষ ভাবে বর্জন করতে হবে। অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক আচরণ যেমন বর্জনীয়, তেমনি অবাঞ্ছিত হল শৃঙ্খলার অভাব। বিশেষ করে এই মুহূর্তে অতিরিক্ত শাসন ও নিপীড়ন আবার পরমুহূর্তে সীমাহীন আদর—এই ধরনের খামখেয়ালী ব্যবহার একেবারে বর্জন করতে হবে। যে গৃহ পরিবেশে শৃঙ্খলা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অন্তর্জাত সেই পরিবেশেই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ত্রুটিহীন হয়ে গড়ে ওঠে।

৩। মৌলিক চাহিদার তৃপ্তি

শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলি যাতে তৃপ্ত হয় তার ব্যবস্থা করাই অপরাধ-পরায়ণতাকে দূরে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। শিশুর অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে আসে ভালোবাসার চাহিদা, তারপর নিরাপত্তার চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা ইত্যাদি। শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠনটি বিশেষভাবে নির্ভর করে এই চাহিদাগুলির তৃপ্তির উপর।

৪। উন্নত বিদ্যালয় পরিবেশ

প্রথমত, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে শিশুর বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে সমাজধর্মী করে তুলতে হবে যাতে সে সেখানে নিজেকে একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একজন বলে মনে করতে পারে। এই ধরনের পরিবেশে শিশুর বিভিন্ন প্রক্ষোভমূলক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি হয় এবং সহজে তার মধ্যে মানসিক অসংগতি দেখা দেয় না। দ্বিতীয়ত, শিশুর জন্য নির্ধারিত পাঠক্রমটি যেন তার উপযোগী হয় এবং তার প্রয়োজন তৃপ্ত করতে পারে। তৃতীয়ত, বিদ্যালয়ে অনুসৃত শিক্ষণ পদ্ধতি যেন উন্নত ও আধুনিক মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক হয়। চতুর্থত, বিদ্যালয়ের কার্যসূচীতে যেন খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, অভিনয়, সংগীত,

বিতর্ক, ভ্রমণ প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী প্রচুর পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সব শেষে বিদ্যালয়ের পরিবেশটি পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রেষারেষি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহাওয়া থেকে সেটি সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।

খ। সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা

সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা বলতে বোঝায় সমগ্রভাবে কিশোর সমাজকে উন্নত করে তোলা। তার জন্য নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করা দরকার।

১। জীবনধারণের মানের উন্নয়ন

যে সব সমাজের জীবনধারণের মান অনুন্নত সেই সব সমাজের কিশোরদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা সামাজিক আদান-প্রদান প্রভৃতিও নিম্ন মানের হয় কিশোরদের মধ্যে অপরাধপরায়ণতা দূর করতে হলে সমগ্র সামাজিক সংগঠনটিকে সুসংহত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সাধারণ জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করে তুলতে হবে।

২। পরিবর্তনশীল আদর্শ ও মানের স্বীকৃতি

বিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় প্রাচীন ধারণা ও আদর্শের সঙ্গে আধুনিক ধারণা ও আদর্শের অবশ্যম্ভাবী সংঘাত দেখা দেয়। সময়ের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রাচীন গতানুগতিক মানের প্রতি অন্ধ আসক্তি পরিত্যাগ করতে হবে এবং আধুনিক ভাবধারা ও আদর্শকে মেনে নিতে হবে। প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানের সংঘাত দেখা দেওয়ার ফলে কিশোর মনে চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় এবং বহু ক্ষেত্রে তা অপরাধপরায়ণতায় পর্যবসিত হয়। অতএব ক্রমপরিবর্তনশীল সমাজের নতুন নতুন আদর্শ ও মানগুলি যাতে স্বীকার করে নেওয়া হয় সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে।

৩। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে মানুষের জীবনে শঙ্কা ও নিরাপত্তাহীনতা যখন দেখা দেয় তখন প্রাপ্তবয়স্কদের মত কিশোর ও তরুণদের মনের উপরেও সেই অনুভূতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই সময় অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা কিশোর মনের উপর এমন একটি মনোবৈজ্ঞানিক চাপের সৃষ্টি করে যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাদের মন অপরাধপরায়ণতার আশ্রয় গ্রহণ করে।

বর্তমান পৃথিবীতে এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি সর্বাত্মক মানব-বিধ্বংসী অস্ত্রসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যেই একটা সর্বব্যাপী আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়েছে। আদিম বন্য পরিবেশ

ছেড়ে মানুষ যেদিন সভ্য হয়েছিল সেদিন সে যে নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার বোধ অনুভব করেছিল আজ এই সব মারণ অস্ত্রের আবিষ্কারে তা মানুষের মন থেকে ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে বর্তমান জগতের সভ্য সমাজমাত্রই এক সর্বজনীন ভীতি ও অনিশ্চয়তার অনুভূতিতে সদা ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। এই সর্বব্যাপক অনিশ্চয়তা, ভীতি ও দুশ্চিন্তার চাপ কিশোর মনের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে তার মধ্যে অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি করে।

এই জন্য রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা যাতে কিশোর মনকে স্পর্শ করতে না পারে তার জন্য তাদের সব সময় সংগঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত রাখতে হবে। সুপরিকল্পিত পন্থায় নানা উন্নত অভিজ্ঞতার সাহায্যে কিশোরদের শিক্ষাসূচীকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে এই ধরনের চিন্তা বা মনোভাব তাদের মনকে স্পর্শ করতে না পারে।

৪। বয়স্কদের আদর্শ আচরণ

সমাজের বিধিনিষেধ, শৃঙ্খলা-নিয়মকানুন, কঠোর হোক বা শিথিল হোক তাতে কিশোর মনের কিছু এসে যায় না। সবচেয়ে বেশী যা কিশোর মনকে প্রভাবিত করে সেটি হল সেই নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধের প্রতি সমাজের বয়স্ক-দের আনুগত্যের মাত্রা। যে সমাজে প্রাপ্তবয়স্কেরা সমাজের আদর্শ বিধিনিষেধের প্রতি বিশ্বস্ত সে সমাজে কিশোরদের মধ্যে অপরাধপরায়ণতা কম দেখা যায়।

২। নিরাময়মূলক পন্থা (Curative Measures)

অপরাধপরায়ণ শিশুর চিকিৎসার জন্য যত্ন, দূরদৃষ্টির এবং অভিজ্ঞতা এই তিনটিই দরকার। একই রকম অপরাধপরায়ণতা নানা বিভিন্ন কারণ থেকে সৃষ্টি হতে পারে এবং যতক্ষণ না সেই প্রকৃত কারণটি খুঁজে বার করা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ অপরাধপরায়ণতার কার্যকর চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কি নিরাময়মূলক পন্থা অবলম্বন করা উচিত তার একটি বিবরণ দেওয়া হল।

১। পরিবেশের পরিবর্তন বা সংস্কারসাধন

যদি প্রতিকূল পরিবেশের জন্য অপরাধপরায়ণতা সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সেই পরিবেশ থেকে শিশুকে অবিলম্বে অপসারিত করা কিংবা সেই পরিবেশের সংস্কার-সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। অনুপযোগী পরিবেশ থেকে শিশুকে সরিয়ে আনলে অনেক সময় অপরাধপরায়ণতার নিরাময় হয়ে থাকে।

২। গৃহ-পরিবেশের উন্নয়ন

যে সব ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ গৃহ-পরিবেশের জন্য অপরাধপরায়ণতা দেখা দেয় সে সব ক্ষেত্রে গৃহপরিবেশের পরিবর্তন বা উন্নয়ন করলে বহু ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যায়। যে সব ক্ষেত্রে গৃহপরিবেশকে উন্নত বা পরিবর্তিত করা সম্ভব নয় সেই সব ক্ষেত্রে শিশুকে আবাসিক বিদ্যালয়ে রাখা যেতে পারে। পিতৃমাতৃহীন শিশুর ক্ষেত্রে তাকে কোন সহৃদয় দম্পতির কাছে পালিত সন্তানরূপে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ্য যদি অপরাধপরায়ণতার মাত্রা গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় তাহলে কেবলমাত্র পরিবেশের পরিবর্তন করলেই তা নিরাময় হবে না। তার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান।

৩। অপসঙ্গতি দূরীকরণ

যে সব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সংগতির অভাবে শিশুর মধ্যে অপরাধপরায়ণতা দেখা দিয়েছে সেই সব ক্ষেত্রে শিশু যাতে সন্তোষজনক ভাবে সংগতিবিধান করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িতে পিতামাতা, বিদ্যালয়ে শিক্ষক-সহপাঠী প্রভৃতিদের সংগে শিশু যাতে সুষ্ঠু ভাবে সংগতিবিধান করতে পারে তাকে সেই রকম শিক্ষা ও সাহায্য দিতে হবে। যে সব অতি প্রয়োজনীয় চাহিদার অতৃপ্তির জন্য শিশুর মধ্যে অসংগতি দেখা দিয়েছে সেই সব চাহিদার যথাসম্ভব তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা

যখন কোন জটিল কারণ থেকে অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি হয় তখন সহজে সাধারণ পন্থায় তার নিরাময় করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা মনোবিজ্ঞান-সম্মত ও সুপরিকল্পিত চিকিৎসার আয়োজন করা। আধুনিক কালে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য মনশ্চিকিৎসা (Psychiatry) নামে একটি নতুন চিকিৎসা শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। জটিল অপরাধপরায়ণতার ক্ষেত্রগুলির নিরাময়ের জন্য এই উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। এই বিজ্ঞানে শিশুর মনের গভীর অচেতন স্তরে যে প্রক্ষোভমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি হয় সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করে সেটিকে সযত্ন শিক্ষার সাহায্যে দূর করার চেষ্টা করা হয়।

৫। দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ও প্রক্ষোভমূলক সমন্বয়

শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য এবং প্রক্ষোভমূলক সমতার উপর তার মানসিক স্বাস্থ্য

প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। অতএব অপরাধপরায়ণতা দূর করতে হলে শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য এবং প্রক্ষোভমূলক সমন্বয়ন যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করতে হবে।

৬। খেলাধুলা, অবসর বিনোদন, সুষম খাদ্য প্রভৃতির আয়োজন

শিশুর অপরাধপরায়ণতা দূর করার আর একটি প্রকৃষ্ট উপায় হল তার মানসিক আনন্দ যাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। নানা রকম খেলাধূলা, সৃজনমূলক কাজ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সে যদি তার মানসিক তৃপ্তি খুঁজে পায় তাহলে অপরাধপরায়ণতা সহজেই দূরীভূত হয়। সুষম খাদ্যও অপরাধপরায়ণতা দূর করার একটি বড় উপকরণ। ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যের অভাবে শিশুর স্বাভাবিক পুষ্টি ব্যাহত হয় এবং তার দেহ মন উভয়ই সহজে রোগাক্রান্ত হয়।

৭। সমাজধর্মী অভিজ্ঞতা

সমাজধর্মী অভিজ্ঞতা অপরাধপরায়ণতা দূর করার আর একটি বড় উপায়। নানারকম সামাজিক আদান-প্রদান, সম্মিলিত কাজকর্ম, যৌথ অভিজ্ঞতা প্রভৃতির মাধ্যমে শিশু তার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

প্রশ্নাবলী

1. Elucidate the main causes of delinquent behaviour. How could you prevent children from developing such behaviour ?

Ans. (পৃঃ ৪৭—পৃঃ ৬৩)

2. Show your acquaintance with some of the common behaviour problems of adolescent students. How could you tackle them ?

Ans. (পৃঃ ৩২—পৃঃ ৪১ + পৃঃ ৫৫—পৃঃ ৬৩)

3. Elucidate the main causes of problem behaviour. Suggest a few remedial measures.

Ans. (পৃঃ ৪৭—পৃঃ ৬৩)

4. Describe the means of preventing and curing delinquency.

Ans. (পৃঃ ৫৫—পৃঃ ৬৩)

5. Describe the individual and collective measuress of treating delinquency.

Ans. (পৃঃ ৫৫—পৃঃ ৬৩)

সাত

মনঃসমীক্ষণ ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান

(Psychoanalysis and Mental Hygiene)

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সঙ্গে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) শাস্ত্রটির অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বস্তুত ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত মানবমনের নতুন তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করেই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রধান প্রধান মৌলিক সূত্রগুলি গড়ে উঠেছে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসার পদ্ধতিগুলিও বহুল পরিমাণে মনঃসমীক্ষণের বিভিন্ন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মনঃসমীক্ষণের জন্ম

মনঃসমীক্ষণ মূলত মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা হলেও পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে এর বিরাট পার্থক্য আছে। এক দিক দিয়ে এটিকে মানব আচরণের বিজ্ঞান বলা যেতে পারে, যদিও আচরণ-বাদী মনোবিজ্ঞানীদের (Behaviourist) সঙ্গে কোন দিক দিয়েই এর কোন মিল পাওয়া যায় না। বরং আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে এটিকে সঙ্গতিবিধানের মনোবিজ্ঞান (Psychology of adjustment) নাম দেওয়া যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন পারিবেশিক পরিস্থিতিতে মানুষ কি ভাবে সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করে তার বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণয় করা মনঃসমীক্ষণের প্রধান কাজ। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল এই যে সাধারণ মনোবিজ্ঞানে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে তাদের স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পৃথকভাবে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেইভাবে তাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়। কিন্তু মনঃসমীক্ষণে মানব আচরণকে তার পারিবেশিক শক্তিগুলির সমাবেশেই বিচার করা হয় এবং তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার সংব্যাখ্যান করা হয়।

ভিয়েনাবাসী মনোব্যাধির চিকিৎসক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড আধুনিক মনো-বিজ্ঞানটির জনক। বস্তুত মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি থেকেই মনঃসমীক্ষণ জন্ম লাভ করেছে এবং এর পুষ্টি ও বিকাশও ঘটেছে ঐ মনোব্যাধির চিকিৎসা-গারেই। হিষ্টেরিয়া ও অন্যান্য মানসিক বিকারের চিকিৎসা করতে গিয়ে ফ্রয়েড মানবমনের গভীর অন্তঃস্থলে এমন সব অকল্পনীয় বৈচিত্র্যের সন্ধান পান যার ফলে

মানব আচরণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এক নতুন সংব্যাখ্যান নিয়ে তাঁর সামনে দেখা দিল। এই ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে ফ্রয়েড প্রবর্তন করলেন এক অভিনব মনশ্চিকিৎসার পদ্ধতি এবং গড়ে তুললেন তাঁর অধুনা প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষণের চমকপ্রদ সৌধটি।

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে ফ্রয়েড তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার সাহায্যে মনঃসমীক্ষণের বিভিন্ন তত্ত্বগুলির সুসংহত রূপ দিয়ে যান। তাঁর তত্ত্বগুলি প্রকৃতিতে এতই নতুন এবং প্রচলিত ধারণার এতই বিরোধী যে এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁকে বহুদিক থেকে প্রচণ্ড বিরোধিতা ও তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে ফ্রয়েড যে কেবলমাত্র তাঁর এই নতুন তত্ত্বগুলি সপ্রমাণিত করে গেছেন তাই নয়, মানব-আচরণের সংব্যাখ্যানের সম্পূর্ণ অভিনব এক পন্থারও নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বহু অনুগামীও তাঁর প্রদত্ত তত্ত্বগুলির মধ্যে নানারূপ পরিবর্তন করে নিজেদের প্রয়োজন মত স্বতন্ত্র মনোবিজ্ঞানের শাখার সৃষ্টি করেছেন।

ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যানে মনের বিকাশ

মানব মন সম্বন্ধে বহু প্রাচীন কাল থেকেই নানা বিচিত্র ধারণা ও মতবাদ চলে এসেছে। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশ ছিল নিছক জল্পনা-কল্পনা প্রসূত। পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সাম্প্রতিক কালে মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তারিত গবেষণা সুরু হয় এবং চিন্তন, শিখন, স্মরণ, বিস্মরণ প্রভৃতি মনের আচরণগুলি সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়। কিন্তু এই সব গবেষণা যতই সূক্ষ্ম এবং জটিল হোক না কেন, সেগুলি কোনমতেই মানব মনের বাহ্যিক স্তর ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে নি। বস্তুত এতদিন মনোবিজ্ঞানের সমস্ত অনুসন্ধান ও তথ্য-উদ্‌ঘাটন মানব মনের উপরতলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার গভীর অন্তঃস্থলে যে অসীম ও চমকপ্রদ রহস্য নিহিত আছে তা মানুষের নিজের কাছেই অজ্ঞাত ও অপরিচিত রয়ে গেছল। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণই প্রথম মানব মনের এই অজ্ঞাত রাজ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হয় এবং বহু অপ্রত্যাশিত ও অকল্পিত তথ্য উদ্‌ঘাটিত করে।

সহজাত প্রবৃত্তি বা অভ্যন্তরীণ শক্তি

ফ্রয়েডের মতে মানুষের সমস্ত আচরণের মূলে আছে তার সহজাত কতকগুলি প্রবৃত্তি বা অভ্যন্তরীণ শক্তি। এগুলি জন্ম থেকেই তার মনের মধ্যে নিহিত

থাকে এবং সারা জীবন ধরে তার সমস্ত আচরণকে পরিচালিত করে। এই প্রবৃত্তিগুলি ব্যক্তির আচরণের নিয়ন্ত্রক হলেও ব্যক্তি সচেতনভাবে সেগুলির সঙ্গে পরিচিত নয়। কেননা সেগুলি সাধারণত বাস করে তার মনের অচেতন স্তরে। বিশেষ বিশেষ মানসিক পরিস্থিতিতে এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং যতক্ষণ না সেগুলি তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারছে ততক্ষণ সেগুলির তৃপ্তি হয় না। অনেক সময় আবার প্রবৃত্তিগুলি প্রত্যক্ষভাবে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। সে সব ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিগুলি তাদের কাম্য তৃপ্তি পরোক্ষভাবে আদায় করে নেয়। আবার অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কোন দিক দিয়েই প্রবৃত্তিগুলি তাদের কাম্য তৃপ্তি পায় না। সে ক্ষেত্রে তারা অবদমিত হয়ে মনের মধ্যে বাস করে এবং সময় ও সুযোগ বুঝে ব্যক্তির সচেতন মনে আবির্ভূত হয়ে ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। প্রবৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি নিয়ে ব্যক্তিকে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার প্রধান কারণ হল যে প্রবৃত্তিগুলি সাধারণভাবে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত আচরণমূলক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিরোধী এবং প্রায়ই তাদের তৃপ্তি দিতে গেলে আমাদের প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের বিরোধিতা করতে হয়। কিন্তু আমাদের সচেতন সত্তা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে কোনরূপ সংঘর্ষ চায় না বলে সে জ্ঞাতসারে এই অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিগুলির কোনরূপ তৃপ্তি দিতে পারে না।

প্রাণশক্তি ও মরণশক্তি (Eros and Thanatos)

ফ্রয়েড এই সহজাত আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। একটির তিনি নাম দিয়েছেন প্রাণশক্তি (Eros) বা জীবন প্রবৃত্তি (Life Instinct)। এটি হল জীবন এবং ভালবাসার শক্তি। ফ্রয়েড ভালবাসা কথাটি ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে ভালবাসা বলতে বোঝায় নিজের এবং অপরের প্রতি ভালবাসা, আত্মসংরক্ষণ এবং জাতি সংরক্ষণের চাহিদা। এরস বা প্রাণশক্তির পাশাপাশি রয়েছে আর একটি আদিম প্রবৃত্তি। এটি প্রকৃতিতে এরসের বিপরীতধর্মী। ফ্রয়েড এটির নাম দিয়েছেন মরণশক্তি (Thanatos) বা মরণ প্রবৃত্তি (Death Instinct)। এরস যেমন প্রাণীকে বেঁচে থাকার শক্তি জোগায়, তেমনই থ্যানাটস প্রাণীকে তার অপরিহার্য গন্তব্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ফ্রয়েডের মতে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে যেমন আছে বাঁচার ইচ্ছা তেমনই তার পাশাপাশি আছে

তার মৃত্যুর ইচ্ছা। এই দু'য়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। মরণশক্তির প্রকাশ আবার দু'রকমের হতে পারে, যখন এই শক্তিটি অন্তর্মুখী হয় তখন তা আত্মনির্যাতন, আত্মহত্যা ইত্যাদির রূপ নেয়, আবার যখন এটি বহির্মুখী হয়ে ওঠে তখন তা ধ্বংস বা হননের রূপে অভিব্যক্ত হয়। নিষ্ঠুরতা, আক্রমণমূলক আচরণ, বিনাশ বা ধ্বংসের প্রচেষ্টা ইত্যাদি মারণাত্মক প্রবণতাগুলি মরণশক্তিরই বহির্মুখী প্রকাশ।

ফ্রয়েডের এই সংব্যাখ্যান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি বার্গস্‌ঁ প্রভৃতির মত জীবনীশক্তিবাদী (Vitalist) এবং অন্যান্য জীবনীশক্তিবাদীদের সঙ্গে তাঁর মতের মৌলিক মিলও যথেষ্টই আছে। ফরাসী দার্শনিক বার্গস্‌ঁর জীবন প্রেষণার (Elan Vital) পরিকল্পনা বা বার্নার্ড শ'র জীবনীশক্তির (Life Force) পরিকল্পনার সমগোত্রীয় হল ফ্রয়েডের এই প্রাণশক্তির পরিকল্পনাটি। কিন্তু ফ্রয়েড বার্গস্‌ঁ বা বার্নাড শ'ব মত কেবলমাত্র একটি জীবনীশক্তি পরিকল্পনা করেন নি। তিনি মানব মনের অন্তরস্থ শক্তিকে দুটি পরস্পববিরোধী প্রবৃত্তিরূপে কল্পনা করেছেন। ফ্রয়েডেব এই মানব মনের মৌলিক শক্তিকে দুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তিরূপে পরিকল্পনা করার মধ্যে সত্যই অভিনবত্ব আছে। এর দ্বারা মানব মনের মধ্যে যে একটি সুগভীর ও অপ্রতিবোধ্য অন্তর্বিরোধিতা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে, তারই একটি সন্তোষজনক সংব্যাখ্যান পাওয়া যায়।

লিবিডোর প্রকৃতি (Nature of Libido)

ফ্রয়েড এই প্রাণশক্তি বা জীবন-প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত মূলশক্তিটির নাম দিয়েছেন লিবিডো (Libido)। এই লিবিডো হল তেজ ও উদ্যমের আধার। ফ্রয়েডের পরিকল্পনায় এই লিবিডোই হল ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, বৃদ্ধি এবং পরিণতির একমাত্র নিয়ন্ত্রক। এটি একটি পুরোপুরি মানসিক বা অতি-দৈহিক শক্তি বিশেষ। দেহগত শক্তি, পুষ্টি বা অন্যান্য দৈহিক শক্তির সঙ্গে একে অভিন্ন বলে মনে করলে ভুল হবে।

প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান পরিমাণ বা সমান প্রকৃতির লিবিডো নিয়ে জন্মায় না। কারও এই মানসিক তেজোভাণ্ডার থাকে কম, আবার কারও থাকে বেশী। তাছাড়া সকলের ক্ষেত্রে লিবিডোর ক্রমবিকাশ একই ভাবে সম্পন্ন হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে লিবিডোর বিকাশ বিভিন্ন ভাবে সংঘটিত হয়। ব্যক্তিভেদে লিবিডোর বিকাশ-প্রচেষ্টা নানা বিভিন্ন পথ ধরে এগোতে পারে।

লিবিডোর এই বিভিন্ন গতিপথের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা। অতএব ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর পরিমাণ, তার গতিধারা এবং সবশেষে তার উপর পরিবেশের প্রতিক্রিয়া এই সব বিষয়ের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক পরিণতি এবং তার ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ ও সংগঠনটি।

ফ্রয়েডের মতে লিবিডো প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ যৌনধর্মী। অর্থাৎ লিবিডোর সকল বিকাশ-প্রচেষ্টার মূলেই আছে ব্যক্তির কোন না কোন যৌনকামনা তৃপ্তির প্রয়াস। ফ্রয়েডের এই নতুন সংব্যাখ্যান বহু যুগের সুপ্রতিষ্ঠিত মানব-চিন্তার রাজ্যে বিরাট এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর মতে প্রাণীর বিকাশ বা বৃদ্ধির মূলগত যে শক্তি সেটি প্রাণীর যৌনকামনার অভিব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন। লিবিডোকে যৌনধর্মী বলার অর্থ হল মানুষের সমস্ত আচরণ, কর্মপ্রয়াস ও পরিকল্পনার মূলেই তার যৌন কামনা আছে বলে বর্ণনা করা। ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যান অনুযায়ী শিশু থেকে সুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের সমস্ত আচরণই এক ধরনের যৌন প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য যৌনতাকে ফ্রয়েড প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি। তিনি যৌনতা বলতে সকল রকম আসক্তিকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে যৌনতার অন্তর্গত হল ব্যক্তির সুখ-অন্বেষণের সকল প্রচেষ্টা। আত্মপ্রীতি, পিতামাতা-বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আকর্ষণ, মানবজাতির প্রতি প্রেম এবং ভালবাসা বলতে যত বিভিন্ন রকম আসক্তিকে বোঝায় সে সকলই ফ্রয়েডের যৌনতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। কিন্তু তা বলে যৌনতার সঙ্কীর্ণতম অর্থটিকেও এখানে বাদ দেওয়া হচ্ছে না। নরনারীর দৈহিক মিলন বা প্রজনন প্রক্রিয়াটিও যে লিবিডোর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লিবিডোর ক্রমবিকাশ (Development of Libido)

ফ্রয়েডের পরিকল্পনীয় লিবিডো একটি চলমান তেজঃপ্রবাহ। জন্মের মুহূর্ত থেকে লিবিডোর চলা সুরু হয় এবং নানা বিচিত্র পথ ধরে লিবিডো তার পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ বা মনের ক্রমপরিণতি দুইই এই লিবিডোর অগ্রগতির সঙ্গে সমার্থক। ফ্রয়েডের মতে এই লিবিডোর ক্রমবিকাশের তিনটি প্রধান স্তর আছে। যথা—

প্রথমত, শৈশব স্তর, জন্ম থেকে পাঁচ-ছ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

দ্বিতীয়ত, প্রসুপ্তি কাল (Latent period), পাঁচ ছয় বৎসর থেকে বার বা তের বৎসর বয়স পর্যন্ত।

তৃতীয় যৌবনাগম, যার স্থায়িত্ব ১৮ থেকে ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

ফ্রয়েডের মতে এই স্তর তিনটির মধ্যে দিয়ে শিশুর মন ধীরে ধীরে তার পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় এবং যৌবনাগমের শেষে তার লিবিডো পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এই সময়ে তার মনের বিকাশও শেষ হয়। ফ্রয়েডের মতে এই তিনটি স্তরের মধ্যে শৈশবের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এই সময় লিবিডোর মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয় এবং লিবিডো নানা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

১। শৈশব (Infancy Stage)

ফ্রয়েডের তত্ত্বগুলির মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি হল তাঁর শিশু যৌনভাব (Infantile Sexuality) মতবাদটি। প্রতিষ্ঠিত সমস্ত বিশ্বাস ও মতবাদকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে ছোট শিশুর মধ্যেও প্রবল ও বিচিত্র যৌন অনুভূতি আছে। শৈশবকালীন যৌনতা নানা বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। সাধারণভাবে শৈশব স্তরে যৌনতা বিকাশের তিনটি পর্যায়ের নাম করা যায়, প্রথম মৌখিক পর্যায়, দ্বিতীয় পায়ু পর্যায় এবং তৃতীয় লৈঙ্গিক পর্যায়। এই তিনটি পর্যায়ে শৈশবকালীন যৌনতার বিকাশ শেষ হয়।

ক। মৌখিক পর্যায় (Oral Phase)

জন্মের সময় শিশুর লিবিডো থাকে অসংহত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। তখন লিবিডোর কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান থাকে না। তবে খুব শীঘ্রই লিবিডো তার নিজস্ব আশ্রয় বা অবস্থান খুঁজে নেয়। কিন্তু লিবিডোর এই অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে না। শিশু যতই বড় হয় ততই তার লিবিডোও ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে চলে। লিবিডোর অবস্থান সর্ব প্রথমে থাকে শিশুর মুখে। এই পর্যায়টিকেই বলে মৌখিক-রতি (Oral erotic) পর্যায়। এই সময় শিশু তার মুখের নানা রকম ব্যবহার থেকেই অধিকাংশ আনন্দ পেয়ে থাকে। প্রথম প্রথম চোষা এবং পরে কামড়ান, চিবানো ইত্যাদি কাজ থেকে সে লিবিডোর তৃপ্তি আহরণ করে। এই মৌখিক রতিরই শেষের দিকে আসে মৌখিক-ধর্ষণমূলক (Oral-sadistic) পর্যায়। এই পর্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ধ্বংসমূলক মনোভাব। শিশু এই সময় ধ্বংসপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং জিনিষপত্র ভাঙা, নষ্ট করা ইত্যাদি কাজের মধ্যে দিয়ে সে তার লিবিডোর তৃপ্তি খুঁজে পায়। এই সময়ে সে যা হাতের কাছে পায় তাই ভাঙা বা নষ্ট করার চেষ্টা করে।

খ। পায়ু পর্যায় (Anal Phase)

মৌখিক-রতিপর্যায়ের পরে আসে পায়ু-রতি (Anal erotic) পর্যায়। এই পর্যায়ে লিবিডো শিশুর মুখ ত্যাগ করে তার পায়ুদেশে আশ্রয় নেয় এবং এই সময় পায়ুদেশের সঞ্চালনে শিশু বেশ তৃপ্তি লাভ করে। এই পর্যায়ে প্রথম প্রথম মল-নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় শিশু আনন্দ পায়। কিন্তু শেষের দিকে দেহের মধ্যে মল-সংরক্ষণে তার লিবিডোর তৃপ্তি ঘটতে দেখা যায়। ফ্রয়েডের মতে পরবর্তী জীবনে অনেক ব্যক্তির মধ্যে যে কৃপণতা বা অতিরিক্ত মাত্রায় সঞ্চয়-প্রবণতা দেখা যায় তা এই পর্যায়ে লিবিডোর সংবন্ধন থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গ। লৈঙ্গিক পর্যায় (Phallic Phase)

পায়ু-পর্যায়ের পর আসে লৈঙ্গিক (Phallic) পর্যায়। এই সময় শিশু যৌন-ইন্দ্রিয়ের সুখদানের ক্ষমতা আবিষ্কার করে। এই পর্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত শিশুর যৌনতা অস্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলিতে ঘুরে বেড়াত। এই লৈঙ্গিক পর্যায় থেকেই তার লিবিডো স্বাভাবিক গতিপথ অনুসরণ করে।

শৈশবকালীন যৌনতার বিকাশ এই স্তরে এসে শেষ হয়। একে যৌনপ্রবৃত্তি বিকাশের 'প্রথম তরঙ্গ' (First Wave) নাম দেওয়া যায়।

লিবিডোর সঙ্গে সঙ্গে তার আসক্তির বিষয় বা পাত্রের মধ্যেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথম প্রথম লিবিডোর আসক্তি থাকে বিষয়বর্জিত অবস্থায় এবং কেবলমাত্র নিজের দৈহিক সুখানুভূতিতে তার তৃপ্তি সীমাবদ্ধ থাকে। এখানেই লিবিডোর স্বতঃরতি (Auto-erotic স্তরের সুরু।

এই সময়ে কোন বিশেষ বিষয়ে লিবিডোর তৃপ্তি সংযুক্ত থাকে না, নিছক দেহগত সুখই তখন শিশুর কাম্য। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে তার অহংসত্তার বিকাশ হতে শুরু করে তখন তার লিবিডো অহমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। এটিই হল স্বতঃরতি স্তরের পরিণত রূপ। একে প্রাথমিক নার্সিসাসত্ব বা প্রাথমিক আত্মরতি (Primary Narcissism) বলা হয়। নার্সিসাসত্ব কথাটি এসেছে গ্রীক পৌরাণিক চরিত্র নার্সিসাসের কাহিনী থেকে। নার্সিসাস জলে নিজের ছায়া দেখে তাকেই ভালবেসে ফেলেছিল। অতএব নার্সিসাসত্ব মানে হল নিজের প্রতি যৌন অনুভূতি বা আত্মরতি। এই স্তরে শিশুর আসক্তি তার নিজের সত্তায় কেন্দ্রীভূত হয় এবং শিশু তখন নিজেই নিজের আসক্তির-পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রাথমিক আত্মরতি ব্যক্তির অহংসত্তার বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং সারা জীবনই ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু মাত্রায় থেকে যায়। যদিও অতিরিক্ত

আত্মরতি কখনই কাম্য নয়, তবু কিছুটা আত্মরতি ব্যক্তির সুদৃঢ় ব্যক্তিসত্তাগঠনে সর্বদাই অত্যাবশ্যক। এই প্রাথমিক নার্সিসাসত্বের স্তরে যাদের লিবিডোর সংবন্ধন বা প্রত্যাবৃত্তি ঘটে তারা অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। যৌবনাগমে নার্সিসাসত্বের দ্বিতীয় স্তর দেখা দেয়। এই সময় প্রাপ্তযৌবন বালক-বালিকারা নতুন করে নিজেদের ভালবাসতে শেখে।

লিবিডো-আসক্তির তৃতীয় স্তরে লিবিডো অহংকে ছেড়ে দিয়ে বাইরের বিষয়ে সংযুক্ত হয়। শিশুর আসক্তির প্রথম বিষয়বস্তু হল তার পিতামাতা। এর সুরু হয় লৈঙ্গিক পর্যায়ে। পিতামাতার প্রতি শিশুর আসক্তি থেকেই জন্মায় ঈডিপাস কমপেক্স।

লৈঙ্গিক স্তরে এসে লিবিডোর লক্ষ্যহীন ইতস্তত ঘোরাফেরা বন্ধ হয়ে যায় এবং সে তার স্বাভাবিক অগ্রগমনের পথটি খুঁজে পায়। এ সময় থেকেই শুরু হয় তার সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশ।

শৈশবকালীন যৌনতার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য ঈডিপাস কমপেক্স। আত্ম-রতি স্তরের শেষে শিশুর লিবিডো নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেড়ে হয় বাবা, নয় মার প্রতি উদ্দিষ্ট হয়। ছেলে নিজেকে বাবার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে মাকে নিজের আসক্তির পাত্রীরূপে কল্পনা করে। আর মেয়ে নিজেকে মার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে বাবাকে নিজের আসক্তির পাত্র বলে ভাবে। ফ্রয়েড শিশুর এই মনোভাবটিরই নাম দিয়েছেন ঈডিপাস কমপ্লেক্স। প্রসুপ্তি কালের সুরুতে শিশুর এই মা বা বাবাকে আসক্তির পাত্র বলে মনে করা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় এবং মা বা বাবার প্রতি যৌনমূলক আসক্তি যৌনবর্জিত ভালবাসায় ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়। এই ঈডিপাস কমপেক্স থেকেই জন্ম নেয় শিশুর অধিসত্তা বা সুপার-ঈগো। পিতামাতার অনুশাসন ও কর্তৃত্ব শিশুর নিজের সত্তার উপর প্রতিফলিত হয়ে তার মধ্যে নীতি ও আচরণের একটি মাপকাঠি সৃষ্টি করে।

২। প্রসুপ্তি কাল (Latent Period)

শৈশবকালের পর যৌনতায় প্রসুপ্তি কাল আসে। এই কালটির স্থায়িত্ব হল যৌবনাগম পর্যন্ত। এ সময় শিশুর মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তিটির কোনরূপ ব্যাহ্যিক প্রকাশ থাকে না বলে এই কালটির নাম দেওয়া হয়েছে প্রসুপ্তি কাল। বাহ্যিক অভিব্যক্তি না থাকলেও শিশুর মধ্যে কিন্তু যৌনতায় অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। শিশুর শৈশবকালীন বিভিন্ন যৌনপ্রবণতাগুলির প্রভাব তার আচরণকে এই সময় তার

সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে প্রভাবিত করে এবং তার মধ্যে বহু অচেতন আচরণধারার জন্ম দেয়।

৩। যৌবনাগম (Adolescence)

প্রসুপ্তিকালের পর আসে যৌবনাগম। এই সময় যৌনপ্রকৃতির বিকাশের 'দ্বিতীয় তরঙ্গে'র (Second Wave) সুরু হল বলা যেতে পারে। আর এইটিই হল যৌনপ্রবৃত্তির বিকাশের শেষস্তর।

শৈশবকালের শেষে লিবিডো লৈঙ্গিক স্তরে এসে পৌছয়। কিন্তু লৈঙ্গিক স্তরেই লিবিডোর সংগঠন সম্পূর্ণ হয় না। লিবিডোর পরিণতি ও সংগঠন পূর্ণতা লাভ করে যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে। এই সময় লিবিডো তার বিভিন্ন ও অস্বাভাবিক অবস্থানগুলি ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে জননেন্দ্রিয়ে এসে আশ্রয় নেয়। এই স্তরকে উপস্থ (Genital) স্তর বলা হয়। এখানেই লিবিডোর বৈচিত্র্যময় যাত্রার শেষ হয় এবং তার চরম ও স্বাভাবিক লক্ষ্য প্রজননক্রিয়ার প্রচেষ্টায় এসে লিবিডো সংগঠনের সমাপ্তি ঘটে।

ফ্রয়েড পুনরাবৃত্তির তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যৌবনাগম শৈশবকালেরই পুনরাবৃত্তি। শৈশবকালে শিশু যে সব বৈচিত্র্যময় যৌন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল সে সবগুলিই আবার ঘুরে ফিরে তার যৌবনাগমে দেখা দেয় এবং তার পরিণত বয়সের যৌনজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শৈশবকালীন ভালবাসার সম্পর্কগুলি এবং বহু বিভিন্নমুখী প্রক্ষোভ আবার তার মধ্যে নতুন করে জেগে ওঠে এবং তার ফলে অধিসত্তার সঙ্গে তার অহংসত্তার নতুন করে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।

লিবিডোর সংবন্ধন (Fixation of Libido)

লিবিডোর অগ্রগতির যে বিবরণ দেওয়া হল সেটি হল লিবিডোর স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের বিবরণ। স্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলিতে উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি স্তর বা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে লিবিডো প্রবাহিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা স্বাভাবিক যৌন আসক্তি ও যৌন প্রচেষ্টায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। কিন্তু নানা রকম বৈষম্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রে লিবিডো এই প্রত্যেকটি স্তর বা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সমানভাবে অগ্রসর হয় না। অনেক ক্ষেত্রে লিবিডো তার চলার পথে কোন একটি বিশেষ স্তরে বা পর্যায়ে আটকা পড়ে যায় এবং তার ফলে লিবিডোর স্বাভাবিক অগ্রগতি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়ে ওঠে। এই ধরনের শৈশবকালীন কোন যৌনমূলক

প্রক্ষোভমূলক ক্ষেত্রে লিবিডোর আটকা পড়ে যাওয়ার নামকে সংবন্ধন (Fixation) বলা হয়।

কোন বিশেষ একটি প্রক্ষোভমূলক ক্ষেত্রে যদি লিবিডো সংবন্ধিত হয়ে যায় তাহলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার সংগঠনটিই তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। অবশ্য ব্যক্তির সম্পূর্ণ লিবিডোটি কখনও কোন একটি স্থানে সংবন্ধিত হয় না। মোট লিবিডোর কিছুটা অংশ ঐ সংবন্ধন ক্ষেত্রে বন্দী হয়ে থাকে এবং বাকীটুকু তার স্বাভাবিক পরিণতির পথে এগিয়ে চলে। কিন্তু এই সংবন্ধনের ফলে লিবিডো বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যে অংশটি সামনের দিকে এগিয়ে চলে তার গতিধারা দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে যায়। লিবিডোর এই বিভক্তীভবনের ফলে তার ব্যক্তিসত্তার পরিণতি এবং মানসিক সংগঠন সবই ভবিষ্যতে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

লিবিডোর সংবন্ধনের উপর ব্যক্তির ভবিষ্যৎ মানসিক স্বাস্থ্য অনেকখানি নির্ভর করে। যে সব ব্যক্তি পরে কোন মানসিক বিকারে আক্রান্ত হয় তাদের অসুস্থতার জন্য এই শৈশবকালীন লিবিডোর সংবন্ধন অনেকখানি দায়ী। কেননা মানসিক বিকারের ক্ষেত্রে লিবিডো তার অগ্রগতির পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এই ধরনের শৈশবকালীন সংবন্ধনের কেন্দ্রগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। মানসিক বিকারের কারণ সম্পর্কে ফ্রয়েডের মত হল যে লিবিডোর বাধাপ্রাপ্তি এবং লিবিডোর সংবন্ধন এই দুটি ঘটনাই প্রধানত দায়ী। লিবিডোর বাধাপ্রাপ্তি বলতে বিশেষ কোন যৌন কামনার ব্যর্থতাকেই বোঝান হয়ে থাকে। পারিবেশিক কারণের প্রতিকূলতার জন্য ব্যক্তির কোন প্রবল কামনা যখন বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন লিবিডোর সম্মুখগতি বন্ধ হয়ে যায় এবং জীবনের প্রারম্ভে যে সব ধরনের প্রক্ষোভমূলক ক্ষেত্রে লিবিডো সংবন্ধিত হয়ে ছিল সেগুলির কোন একটি বা একাধিক ক্ষেত্রে লিবিডো প্রত্যাবর্তন করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর সংবন্ধন ব্যক্তির মানসিক ও আচরণমূলক সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং মানসিক ব্যাধি বা মনোবিকার সৃষ্টির এটি একটি প্রধান কারণ।

লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি (Regression of Libido)

লিবিডোর সংবন্ধনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হল আর একটি ঘটনা। সেটির নাম লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি (Regression)। সহজ স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে লিবিডো বিনা বাধায় সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং তার ফলে ব্যক্তিসত্তা ও মনের সংগঠনও সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করে। কিন্তু এমন

অনেক ক্ষেত্র আছে যখন লিবিডো তার চলার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে লিবিডো তার সামনের দিকে চলা বন্ধ করে গতিপথ বদলে পেছন দিকে চলতে সুরু করে। একেই লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি বলে। পরিণত বয়সে কোন গুরুতর মানসিক আঘাত বা দুঃসহ ব্যর্থতার ফলে সম্মুখে প্রবহমান লিবিডো পশ্চাৎমুখী হয়ে তার পুরাতন শৈশবের অবস্থানগুলিতে ফিরে এসে আশ্রয় নেয়। মনোবিকারের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে লিবিডো যখন কোন পারিবেশিক কারণের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শৈশবকালীন সংবন্ধনের স্থলগুলিতে আশ্রয় নেয় তখনই মনোবিকার দেখা দেয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মনোবিকারের সৃষ্টিতে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সংবন্ধনের সঙ্গে প্রত্যাবৃত্তির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। কেবল তাই নয় বহুদিক দিয়ে এ দুটি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। লিবিডোর সংবন্ধন যত দৃঢ় হবে প্রত্যাবৃত্তিও তত সহজে ঘটবে। লিবিডোর ক্রমবিকাশের সময় সংবন্ধনের কেন্দ্রগুলি যদি শক্তিশালী হয় তাহলে যখনই বাইরের প্রতিবন্ধকে লিবিডো বাধাপ্রাপ্ত হবে তখনই এই শৈশবকালীন সংবন্ধনের ক্ষেত্রগুলিতে লিবিডো প্রত্যাবর্তন করবে। যে সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে শৈশবকালীন সংবন্ধন কম তাদের লিবিডো সহজে প্রত্যাবৃত্ত হয় না এবং সেই কারণে তারা মনোবিকারেও কম আক্রান্ত হয়।

লিবিডোর বিকাশের দিক দিয়ে প্রত্যাবৃত্তি দু'রকমের হতে পারে। প্রথমত, লিবিডোর প্রাথমিক আসক্তির বস্তুগুলিতে প্রত্যাবৃত্তি। দ্বিতীয়ত, সমগ্র যৌন সংগঠনটির শৈশবকালীন স্তরে প্রত্যাবৃত্তি।

লিবিডোর প্রাথমিক আসক্তির বস্তু বলতে শিশুর নিজের মা-বাবাকেই বুঝিয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণীর প্রত্যাবৃত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে পিতামাতার প্রতি শৈশবকালীন যৌন আসক্তি আবার ফিরে আসে। হিস্টেরিয়া রোগে এই ধরনের প্রাথমিক আসক্তির বস্তুতেই রোগীর লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি ঘটে। হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনের কোন দুরূহ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পেরে শৈশবের অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে, এমন কি নানাধরনের শিশুসুলভ আচরণও করতে সুরু করেছে। তার লিবিডো বর্তমান বাস্তবের কাছে হার মেনে শৈশবের কল্পনাময় ও অবাস্তব সুখের দিনগুলিতে ফিরে গেছে। হিস্টেরিয়াতে ব্যক্তির লিবিডো তার শৈশবকালীন আসক্তির পাত্র-পাত্রীতে প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং রোগীর জল্পনা-কল্পনা

আকাঙ্ক্ষা-বাসনা সমস্তই তার মা বাবাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট হয়। কিন্তু যৌন সংগঠনের দিক দিয়ে তার কোনো প্রত্যাবৃত্তি ঘটে না। অর্থাৎ এদিক দিয়ে সে পরিণত স্তরেই অবস্থান করে।

কিন্তু কোনও কোনও মানসিক বিকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সমগ্র যৌনসংগঠনটিই শৈশবকালীন স্তরে প্রত্যাবৃত্ত করে থাকে। যেমন অবসেসান (Obsession) বা বাধ্যতামূলক মনোভাব নামক মনোবিকারের ক্ষেত্রে লিবিডো শৈশবের ধর্ষণ-মূলক পায়ু-রতির স্তরে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তখন তার ভালবাসার অভিব্যক্তি ধর্ষণমূলক বা নিপীড়নমূলক প্রক্ষোভের রূপ গ্রহণ করে। অবসেসানের রোগী যখন ভাবে 'আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই' তখন সে প্রকৃতপক্ষে বলতে চায় যে 'আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই।'

অতএব দেখা যাচ্ছে যে মনোবিকার সৃষ্টির ক্ষেত্রে লিবিডোর সংবন্ধন এবং প্রত্যাবৃত্তি দুটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। মনোবিকারের প্রত্যক্ষ কারণ বলতে যদিও লিবিডোর অগ্রগতিতে বাধাপ্রাপ্তিকে বোঝায়, তবু সংবন্ধন এবং প্রত্যাবৃত্তি ছাড়া সত্যকারের মনোবিকার ঘটতে পারে না। বস্তুত প্রতিনিয়তই আমাদের জীবনে নানাভাবে লিবিডোর বাধাপ্রাপ্তি ঘটছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলের ক্ষেত্রেই মনোবিকার দেখা দেয় না এবং বাস্তব জীবনে অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই সত্যকারের মনোবিকারে আক্রান্ত হয়। তার কারণ হল যে, শৈশবে যে সব ব্যক্তির লিবিডো বিকাশের সময় কোন প্রক্ষোভমূলক কেন্দ্রে লিবিডোর সংবন্ধন ঘটে আর তাদের পরিণত বয়সে যদি কোন কারণে লিবিডো বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলেই তাদের লিবিডোর শৈশবের ঐ প্রক্ষোভমূলক কেন্দ্রে প্রত্যাবৃত্তি ঘটে এবং তখনই মনোবিকার দেখা দেয়।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the nature of libido after Freud. Give a brief description of the development of libido from infancy to adolescence.

Ans. (পৃঃ ৬৮—পৃঃ ৭৩)

2. Discuss the Freudian concept of instinct. What role does libido play in the development of the child's mind ?

Ans. (পৃঃ ৬৬—পৃঃ ৭৫)

3. Discuss according to Freud different stages of the development of libido.

Ans. (পৃঃ ৬৮—পৃঃ ৭৩)

4. Discuss according to Freud the psycho-dynamics of mind.

Ans. (পৃঃ ৬৮—পৃঃ ৭৩)

5. Discuss according to Freud, the different stages of psycho sexual development of mind. Add your comment.

Ans. (পৃঃ ৬৮—পৃঃ ৭৩)

আট

ফ্রয়েডীয় মানসিক সংগঠন

(Freudian Structure of Mind)

বহু বর্ষের গবেষণার ফলে ফ্রয়েড মানব মনের পূর্ণ সংগঠনটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর একটি ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আমাদের এত কাছে অথচ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এত বড় একটি বিস্ময়কর বস্তু যে ছিল তা সহজে বিশ্বাস করাই শক্ত।

চেতন, প্রাক্-চেতন ও অচেতন

(Conscious, Pre-conscious and Unconscious)

ফ্রয়েডের পূর্বে চেতন মন ছাড়া অন্য কোন মনের কথা মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় বা আলোচনায় স্থান পায় নি। ফ্রয়েডই প্রথম দেখালেন যে মনের অজ্ঞাত অংশটি জ্ঞাত অংশের চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ত নয়ই বরং মানব-আচরণের প্রকৃতি ও গতি নির্ধারণে অচেতন মনই চেতন মনের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবশালী। তাঁর পরিকল্পনায় মনের তিনটি স্তর আছে। যথা—চেতন, প্রাক্‌চেতন ও অচেতন।

১। চেতন (Conscious)

আমাদের যে মনটি বাস্তব জগতের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখে এবং যে মনটির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা সচেতন, মনের সেই অংশটিকে চেতন (Conscious) বলা হয়। এই চেতন মন অচেতনের তুলনায় আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র এবং প্রায় অচেতনের সাতভাগের একভাগের মত। তাছাড়া চেতন প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশ অচেতন প্রক্রিয়ারই প্রভাব থেকে জন্মলাভ করে থাকে।

২। প্রাক্-চেতন (Pre-conscious)

অবস্থিতির দিক দিয়ে চেতনের ঠিক নীচেই হল প্রাক্‌চেতন। এটি যদিও সাধারণ অবস্থায় আমাদের সচেতন চিন্তার বাইরে অবস্থিত তবু চেষ্টা করলে এই স্তরের বিষয়বস্তুগুলি চেতন মনে আনা যায়। যে সকল ঘটনা আমাদের মনে নেই অথচ চেষ্টা করলে আমরা মনে করতে পারি সেই ঘটনাগুলির অবস্থিতি হল প্রাক্‌চেতনে। অবশ্য প্রাক্‌চেতনের সমস্ত ঘটনাই যে সহজে মনে করা যায় তা নয়, প্রাক্‌চেতনের এমন অনেক ঘটনা আছে যা মনে করতে আমাদের যথেষ্ট কষ্ট বা অসুবিধা হতে পারে।

৩। অচেতন (Unconscious)

প্রাক্‌চেতনের নীচে অবস্থিত হল অচেতন। মনের অধিকাংশ জায়গা জুড়েই অচেতনের অবস্থান। যদিও অচেতনের প্রক্রিয়াগুলি আমাদের জ্ঞানের পরিসীমার বাইরে তবুও আমাদের সচেতন চিন্তা ও আচরণের উপর তাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

চেতন মনে যেমন আছে শৃঙ্খলা ও সংহতি, অচেতনে তেমনই আছে বিশৃঙ্খলা ও অসংহতি। ফ্রয়েড অচেতন প্রক্রিয়াকে অসঙ্গতিপূর্ণ, শিশুসুলভ ও আদিম প্রকৃতির বলে বর্ণনা করেছেন। অচেতনের প্রধান অধিবাসী হল নগ্ন কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের দল। এগুলি আসে দুটি উৎস থেকে—প্রথমত, চেতন মন থেকে এবং দ্বিতীয়ত, উত্তরাধিকার সূত্রে। পরিবেশের সঙ্গে দৈনন্দিন প্রতিক্রিয়ার ফলে বহু চিন্তা ও কামনা তাদের অবাঞ্ছিত প্রকৃতির জন্য চেতন মন ত্যাগ করে অচেতনে এসে আশ্রয় নেয়। প্রত্যেক মানব মনেই অতি শৈশব থেকে এমন সব চিন্তা বা কামনা দেখা দেয় যেগুলি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের বিচারে অবাঞ্ছিত ও পরিত্যাজ্য। এই অনুশাসনের চাপে শিশু সেগুলিকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। ফলে এই অবদমিত চিন্তা ও বাসনাগুলি তার সচেতন মন থেকে নির্বাসিত হয়ে অচেতনে বাসা বাঁধে। এগুলি অচেতনে অতৃপ্ত কামনা-বাসনার রূপে বাস করে এবং ব্যক্তির আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজেদের তৃপ্তি খোঁজে। আর দ্বিতীয় স্তরের চিন্তা ও কামনাগুলি হল সহজাত, জন্ম থেকেই অচেতনের অধিবাসী, কখনও তারা চেতনের স্তরে ওঠে না। তারা চিরকালই অচেতনে নিহিত থাকে এবং সেখান থেকে নানাভাবে ব্যক্তির সচেতন আচরণকে প্রভাবিত করে। ইউঙ (Jung) এই শ্রেণীর অচেতন সত্তাগুলির নাম দিয়েছেন জাতিগত অচেতন (Racial Unconscious or Archetype)। এগুলি মানুষের আদিম পূর্বপুরুষদের মন থেকে বংশধারার মধ্যে দিয়ে আমাদের মনে সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

ইদম্, অহম্, অধিসত্তা (Id, Ego and Super-Ego)

মনের এই তিনটি বিভিন্ন স্তর ছাড়া ফ্রয়েড মনের আরও তিনটি বিশেষ অধিবাসীর পরিকল্পনা করেছেন। সে তিনটি হল ইদম্, অহম্ এবং অধিসত্তা।

ইদম্ হল পূর্ণমাত্রায় অচেতন। এটি লিবিডোর আদিম আশ্রয়স্থল এবং ব্যক্তির সমস্ত প্রবৃত্তিমূলক কামনার পেছনে শক্তি জুগিয়ে থাকে। এ ছাড়া চেতন মনে যত অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক ইচ্ছা জেগে থাকে সেগুলি অবদমিত

হয়ে ইদমে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ইদম্ প্রকৃতিতে অতি আদিম ও বন্য। সে পুরো-পুরি অনুসরণ করে সুখভোগের নীতি (Pleasure Principle)। অর্থাৎ সে চায় দুঃখকে এড়িয়ে যেতে এবং কেবল মাত্র সুখকে পেতে। সে সমাজ, শিক্ষা, নীতি কোন কিছুরই ধার ধারে না। ইদম্ হল মূর্তিমতী কামনা, মানুষের নগ্ন বাসনার প্রতিচ্ছবি। তার মধ্যে কোন যুক্তি নেই, বিচারবুদ্ধি নেই, নৈতিক

[মনের সংগঠনের ফ্রয়েডীয় পরিকল্পনা]
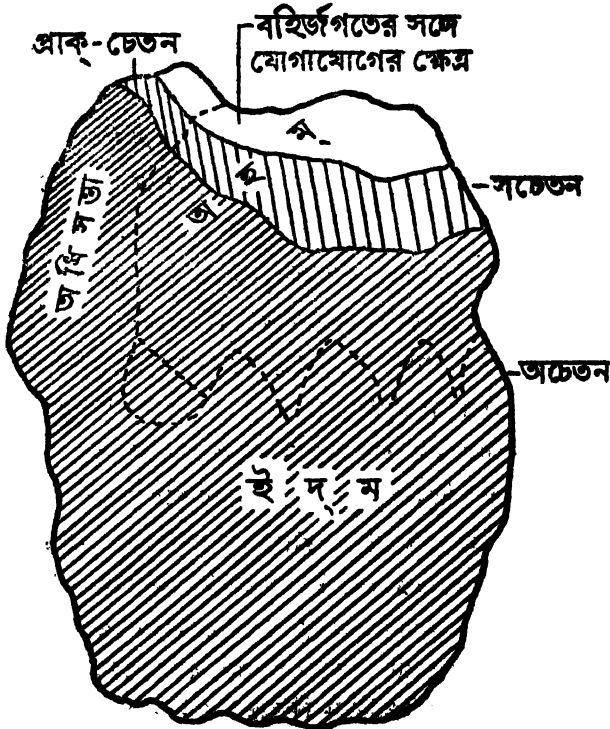
ভালমন্দের স্থান নেই। আদিম মানব মনের সে প্রতীক। সে চায় নিছক আনন্দ, তার কামনা-বাসনার বাধাহীন পরিতৃপ্তি—তা সে ভালই হোক, আর মন্দই হোক, সমাজ-অনুমোদিতই হোক, আর সমাজ-বিরোধীই হোক, সেদিকে তার কোন দৃষ্টি নেই।

ইদম্ ব্যক্তির কামনা-বাসনার আধার হলেও বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। ফলে সে সরাসরি নিজের কোন ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে না। তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে একমাত্র পারে ইগো বা অহম্। অতএব ইদম্ [illegible]

সমস্ত কামনার উৎস হলেও তার সেই কামনার পরিতৃপ্তির জন্য তাকে পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় ইগো বা অহমের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার উপর।

অহম্ (Ego)

অহমের কিছুটা চেতন, আবার কিছুটা অচেতন। জন্মের সময় অহম্ থাকে অতি দুর্বল। কিন্তু শিশু যত বড় হয় ততই বাস্তবের সংস্পর্শে এসে তার অহম্ পুষ্ট হতে থাকে। অহমের চেতন অংশটি বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলে, আর তার অচেতন অংশটি ইদমের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে। ইদম্ অনুসরণ করে সুখ-ভোগের নীতি। কিন্তু অহম্ পরিচালিত হয় বাস্তব নীতির (Reality Principle) দ্বারা। অহম্ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যুক্তিধর্মী। সে ভালভাবেই বোঝে যে তাকে সমাজে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে হবে। সে জন্য বাস্তবের অনুশাসন মেনে চলাই তার নীতি এবং এই নীতির জন্যই সে ইদমের সমস্ত দাবী পূর্ণ করতে পারে না। বস্তুত ইদমের তৃপ্তি মানে অহমের নিজেরই তৃপ্তি, কিন্তু বাস্তবের চাপে অহম্ বাধ্য হয় ইদম্‌কে দাবিয়ে রাখতে, তার কামনাকে অতৃপ্ত রাখতে। তবে যদি অহম্ বোঝে যে ইদমের কোন বিশেষ ইচ্ছা পূর্ণ করলে তাকে সমাজের কাছে সমালোচনা বা শাস্তি ভোগ করতে হবে না তখনই সে ইচ্ছা সে পূর্ণ করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু ইদমের অধিকাংশ কামনাই এত অসামাজিক প্রকৃতির যে সেগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে পূর্ণ করা অহমের পক্ষে সম্ভব হয় না।

অধিসত্তা (Super Ego)

অচেতন মনের তৃতীয় অধিবাসীটি হল অধিসত্তা। কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নীতিবোধ ও বিধিনিষেধের ধারণা, কিছুটা মাতাপিতার কাছ থেকে অর্জন করা নৈতিক শিক্ষা, এই দুইয়ে মিলে তৈরী হয়েছে অধিসত্তা। অধিসত্তার বেশীর ভাগই অবস্থিত অচেতনে। সেই জন্যই অহমের চেয়ে অধিসত্তা ইদমের অবাঞ্ছনীয় ও অসামাজিক কামনা বাসনা সম্বন্ধে বেশী খবর রাখে। অধিসত্তার সর্বপ্রধান কাজ হল অহমের কাজের সমালোচনা করা এবং তার তিক্ত সমালোচনার দ্বারাই সে ইদমের কামনাগুলিকে দমন করতে অহম্‌কে বাধ্য করে। আমরা প্রচলিত ভাষণে যাকে বিবেক বলি অধিসত্তা বলতে অনেকটা তাকেই বোঝায়।

উপরের বর্ণনায় আমরা ব্যক্তির ইগো বা অহংসত্তার যে ছবিটি পেলাম

স্পষ্টতই সেটি খুব সুখকর নয়। অহংকে সর্বদা একাধিক বিপরীতধর্মী শক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। ফ্রয়েডের ভাষায় অহংকে একসঙ্গে তিনটি প্রভুর সেবা করতে হয়, যথা, বাস্তব, ইদম্ ও অধিসত্তা। অহম্‌কে তার সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বাস্তবের অনুশাসন বিধিনিষেধ প্রভৃতি মেনে চলতে হয়। আবার ইদমের কামনা-বাসনাগুলির তৃপ্তির জন্য বিরামহীন চাপ তাকে সহ্য করে যেতে হয়। আর সব শেষে অধিসত্তার কঠোর সমালোচনা অনুযায়ী তাকে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করতে হয়। যদি কোনভাবে সে কোনও নীতিবিরুদ্ধ কাজ করে তবে অধিসত্তার কাছে তার নিন্দা ও সমালোচনার আর অন্ত থাকে না। এক কথায় এই তিনটি শক্তির চাপ অহম্‌কে অনুক্ষণ সহ্য করতে হয়। যতক্ষণ অহম্ এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করে চলতে পারে ততক্ষণ তার মানসিক সাম্য বজায় থাকে। আর যে মুহূর্তে এই শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় নষ্ট হয়ে যায় সেই মুহূর্তেই দেখা দেয় মানসিক বিপর্যয়। ফ্রয়েডের মতে মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীর অহম্ যে কোন কারণের জন্যই হোক এই তিনটি পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে নি বলেই সে তার মনের সুস্থতা হারিয়েছে।

কমপ্লেক্স (Complex)

কমপ্লেক্স কথাটির সাধারণ অর্থ হল মানসিক জটিলতা। ফ্রয়েড কমপ্লেক্স কথাটি ব্যবহার করেছেন বিশেষ এক ধরনের মানসিক সংগঠনকে বোঝাতে। যখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে আমাদের মনের মধ্যে একটি স্থায়ী জটিল সংগঠন সৃষ্ট হয় তখন তাকে কমপ্লেক্স বলা হয়। এই বিশেষ মানসিক সংগঠনটির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যথা—

প্রথমত, প্রক্ষোভাত্মক, অর্থাৎ কোন কমপ্লেক্স সক্রিয় হয়ে উঠলে ব্যক্তি বিশেষ একটি প্রক্ষোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওঠে। কমপ্লেক্স মাত্রের সঙ্গেই কোনও না কোন প্রক্ষোভ জড়িত থাকে এবং কোন কারণে কমপ্লেক্সটিতে বিন্দুমাত্র আঘাত পড়লেই ব্যক্তির মধ্যে সেই প্রক্ষোভটি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, কমপ্লেক্স মাত্রেই ব্যক্তির আচরণের নিয়ন্ত্রক। ব্যক্তির বহু আচরণ কমপ্লেক্সের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির মধ্যে যখন কোন কমপ্লেক্স জাগে তখন ব্যক্তির আচরণ বিশেষ একটি গতিপথ অনুসরণ করে সংঘটিত হয়।

তৃতীয়ত ফ্রয়েডের মতে কমপ্লেক্সের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি হল এর অচেতন-ধর্মিতা। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজের কমপ্লেক্স সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সচেতন থাকে না

এবং কমপ্লেক্সের প্রভাবে সে যে আচরণ করে তার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধেও তার কোন সচেতনতা থাকে না। অনেক মনোবিজ্ঞানী অবশ্য সচেতন মনের প্রক্ষোভমূলক সংগঠনকেও কমপ্লেক্স নাম দিয়ে থাকেন। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে অচেতনধর্মিতা কমপ্লেক্স মাত্রেরই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থত, কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয় অবদমন থেকে। যখন ব্যক্তির মনে এমন কোন চিন্তা বা ইচ্ছা দেখা দেয় যেটি তার অর্জিত শিক্ষা ও সামাজিক মান বা ধর্ম-বোধের বিচারে অবাঞ্ছনীয় বলে প্রমাণিত হয় তখন সে সেটিকে তার অচেতন মনে অবদমিত করে এবং তার ফলে সেটি সম্পূর্ণ ভুলে যায়। কিন্তু এই চিন্তা বা ইচ্ছা ব্যক্তির অচেতনের গভীর তলদেশে কমপ্লেক্স বা একটি আবেগধর্মী জটিল সংগঠনের রূপ নিয়ে বাস করে এবং যখনই সুযোগ পায় তখনই তা সচেতন স্তরে উঠে এসে ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

পঞ্চমত, ব্যক্তির অচেতনে নির্বাসিত অবস্থায় থাকলেও কমপ্লেক্স তার কর্মক্ষমতা বিন্দুমাত্র হারায় না এবং প্রক্ষোভ নিষিক্ত অবস্থায় প্রবল এক শক্তির আধাররূপে তার অচেতনের অন্তঃস্থলে অভিব্যক্ত হবার সুযোগের প্রতীক্ষা করে। কমপ্লেক্স মাত্রেরই পশ্চাতে কোন না কোন মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকবেই। সেইজন্য যখনই কমপ্লেক্সের প্রভাবে ব্যক্তি কোন বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করে তখনই তার সেই আচরণে তার মনের গুপ্ত অন্তর্দ্বন্দ্বটি প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এইজন্য কমপ্লেক্স থেকে জাত আচরণ কখনও স্বাভাবিক প্রকৃতির হয় না।

ষষ্ঠত, এ থেকে আমরা কমপ্লেক্সের আর একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। কম-প্লেক্সের মধ্যে সব সময়েই একটি অবাঞ্ছনীয়তা থাকবে। কেননা সচেতনতা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ইচ্ছা বা চিন্তা থেকেই কমপ্লেক্স জন্ম নেয়। এই কারণেই সচেতন মনে কমপ্লেক্সের প্রবেশাধিকার নেই, তাকে চিরকালই অচেতনে বাস করতে হয়। বস্তুত ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যানে কমপ্লেক্সকে তার অচেতন অবস্থান থেকে সচেতন স্তরে টেনে আনতে পারলেই কমপ্লেক্সের মৃত্যু হয়।

যে কোন বিষয় বা ঘটনাকে ঘিরেই কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, একটি শিশু বার কয়েক অঙ্কে ফেল করায় অঙ্ককে ঘিরে তার মধ্যে একটি কমপ্লেক্স তৈরী হতে পারে। ফলে যখনই অঙ্কের প্রসঙ্গ ওঠে বা সে নিজে অঙ্ক করার চেষ্টা করে তখনই তার মধ্যে ভীতিকর একটি অনুভূতি দেখা দেয় এবং তাই থেকে অঙ্কের সংশ্লিষ্ট তার সমস্ত আচরণই উল্লেখযোগ্য রূপে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

কমপ্লেক্স ব্যক্তিগত হতে পারে, আবার সর্বজনীনও হতে পারে। উপরে বর্ণিত ব্যক্তিগত কমপ্লেক্স ছাড়াও সকলের মধ্যে সমানভাবে দেখা যায় এমন কতকগুলি সর্বজনীন কমপ্লেক্সেরও সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে হীনমন্যতার কমপ্লেক্স (Inferiority Complex) উল্লেখযোগ্য। যখন কোন ত্রুটি বা অক্ষমতা বা অসাফল্যের জন্য ব্যক্তি নিজেকে ছোট বা হেয় বলে মনে করে তখন তাকে হীনমন্যতার কমপ্লেক্স বলা হয়। তেমনই অপর পক্ষে এর বিপরীত মনোভাব থেকে জাত কমপ্লেক্সটিকে আত্মশ্লাঘার কমপ্লেক্স (Superiority Complex) নাম দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ফ্রয়েড আরও কয়েকটি সর্বজনীন কমপ্লেক্সের নাম করেছেন। সেগুলির মধ্যে ঈডিপাস কমপ্লেক্স, কাষ্ট্রেসন কমপ্লেক্স প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

ঈডিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus Complex)

শিশুর লিবিডো যখন প্রথম নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেড়ে বাইরের বিষয় বা পাত্রের দিকে পরিচালিত হয়, তখন তার প্রকৃত আসক্তির বস্তু হন তার মা কিংবা বাবা। লিবিডোর পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই আসক্তি ক্রমশ যৌনমূলক হয়ে ওঠে। ছেলে তখন নিজেকে তার বাবার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে এবং মাকে তার যৌন আবেগ পরিতৃপ্তির উপকরণ করে তোলে। তেমনই মেয়েও নিজেকে তার মার সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরে নেয় এবং বাবাকে তার যৌন আবেগ পরিতৃপ্তির উপকরণ রূপে গ্রহণ করে। কিন্তু খুব শীঘ্রই শিশু বুঝতে পারে যে তার এই যৌন আসক্তি অনুচিত ও সমাজে অননুমোদিত এবং বিশেষ করে তার এই আসক্তির ব্যাপারে তার মা বা বাবাই হলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে সে তখন সেটিকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। নানা ঘটনা ও আচরণের মধ্যে দিয়ে ছেলে বুঝে নেয় যে মার প্রতি যৌন আসক্তি প্রকাশের অধিকার কাছে সম্পূর্ণ তার পিতারই। সেইজন্য মার প্রতি তার নিজের যৌন কামনাটি একান্ত অসঙ্গত। অপর পক্ষে তেমনই মেয়েও বোঝে যে বাবার প্রতি যৌনমূলক অধিকার আছে একমাত্র মায়েরই এবং বাবার প্রতি তার আসক্তি অন্যায় ও নিন্দনীয়।

ফলে শিশু তার কামনাকে অচেতনে অবমমিত করে এবং এই অবদমিত কামনাটি কমপ্লেক্সের রূপে সেখানে বাসা বাঁধে। ফ্রয়েড এই বিশেষ কমপ্লেক্সটির নাম দিয়েছেন ঈডিপাস কমপ্লেক্স। এই কমপ্লেক্সটির নামকরণ হয়েছে গ্রীসদেশের

একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে। ঈডিপাস ছিল থিব্‌সের রাজার ছেলে। ছেলের হাতে নিজের মৃত্যু হবে এই ভবিষ্যৎ বাণী শুনে থিব্‌সের রাজা জন্মের সময় ছেলেকে হত্যা করার আদেশ দেন। ঘাতক কিন্তু ছেলেটিকে না হত্যা করে একটি পাহাড়ে ফেলে আসে এবং একজন রাখাল তাকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করে। বড় হয়ে ঈডিপাস বিরাট একজন যোদ্ধা হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত একদিন তার নিজের বাবার রাজ্যই আক্রমণ করে। যুদ্ধে ঈডিপাস নিজের বাবাকে হত্যা করে ও সে দেশের প্রথামত নিজের মাকে বিবাহ করে রাজা হয়, অবশ্য এ সবই সে করে তার মা বাবার আসল পরিচয় না জেনে।

অতএব ঈডিপাস কমপ্লেক্স বলতে বোঝায় মার প্রতি ছেলের যৌনমূলক আসক্তিকে। মনে রাখতে হবে যে শিশুর এই যৌনমূলক ইচ্ছাটি সম্পূর্ণ তার অচেতনে নিহিত থাকে। শৈশবে যখন এই বাসনাটি তার মধ্যে জাগে তখন সে পরিবেশের চাপে সেটিকে অচেতনে অবদমিত করে। ফলে তার চেতন মনে মার প্রতি কোনরূপ যৌনমূলক আসক্তির কথা তার জানা থাকে না। মার প্রতি তার এই আসক্তি বাহ্যিক আচরণে প্রকাশ পায় মার আদর ও মনোযোগ চাওয়া কিংবা মার কাছে শোওয়া প্রভৃতি ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে। প্রথম মনে করা হত যে শিশুর এই আসক্তি বোধ করি তার মায়ের দৈহিক সত্তার প্রতি উদ্দিষ্ট, কিন্তু পরে দেখা গেছে যে শিশু তার অচেতন মনের অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে তার মার একটি প্রতিরূপ তৈরী করে নেয় এবং তার সমস্ত আসক্তি গড়ে ওঠে তার অচেতনের সেই মাতৃমূর্তিকে (Imago) ঘিরে। মায়ের প্রতি তার এই যৌন আসক্তি যত বেড়ে চলে ততই পিতাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয় এবং শেষ পর্যন্ত পিতার প্রতি বিদ্বেষ, তাঁর দৈহিক ক্ষতি এমন কি তাঁর মৃত্যুকামনাও শিশুর চিন্তায় আশ্রয় পায়।

ছেলের যেমন মায়ের প্রতি আসক্তি ঠিক সেই আসক্তি দেখা দেয় মেয়ের ক্ষেত্রে তার পিতার প্রতি। মেয়ে তার বাবার সঙ্গ কামনা করে এবং মাকে তার ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। ফ্রয়েড মেয়ের এই মনোভাবকে প্রথমে ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স (Electra Complex) নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে ছেলেমেয়ে উভয়েরই এই মনোভাবকে ঈডিপাস কমপ্লেক্স নাম দিয়ে বোঝান হয়ে থাকে।

শিশু যত বড় হয় তত ঈডিপাস কমপ্লেক্সের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি মীমাংসা

ধীরে ধীরে তার মধ্যে দেখা দেয়। মার প্রতি তার আসক্তিকে সে যৌনবর্জিত করে তোলে এবং সে যত বড় হয় তত তার যৌনমূলক ভালবাসা যৌনহীন ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। বাবার প্রতিও বিরাগ ক্রমশ তাঁর কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য শিশুর অচেতন মনে পিতার প্রতি তার প্রাথমিক বিদ্বেষও থেকে যায়। ফলে পিতার প্রতি শিশুর মনোভাবকে ভালবাসা ও বিদ্বেষের মিশ্রিত এক দ্বৈত অনুভূতি (Ambivalence) বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

অধিসত্তার অনেকখানি ঈডিপাসেরই অবদান। মায়ের প্রতি আসক্তি শিশুর মনে পিতার সম্বন্ধে একটি বিরাট ভীতির সৃষ্টি করে। শিশু মনে করে তার এই আসক্তির জন্য পিতা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। এমন কি তার যৌনাঙ্গ ছেদন করতে পারেন। তাই বাবার প্রতি শিশুর এই ভীতিমূলক মনোভাবকে কাষ্ট্রেসন কমপ্লেক্স (Castration Complex) নাম দেওয়া হয়েছে। পিতার সম্বন্ধে এই ভীতিবোধ তাকে পিতার প্রতি অনুগত ও বাধ্য করে তোলে। পরে যখন শিশু বড় হয় তখন তার উপর ঈডিপাস কমপ্লেক্সের এই প্রভাব ধীরে ধীরে কমে যায় এবং পিতার সম্বন্ধে এই অস্বাভাবিক ভীতিবোধও লোপ পায়। কিন্তু পেছনে থেকে যায় একটি সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ ও নৈতিক আদর্শের প্রতি স্বতঃ-প্রসূত আনুগত্য। এরই নাম অধিসত্তা বা সুপার-ইগো। প্রচলিত ভাষণে একেই আমরা বিবেক বলে থাকি।

প্রশ্নাবলী

1. Describe after Freud the structure of human mind. Discuss the relations among Conscious, Preconscious and Unconscious.

Ans. (পৃ: ৭৬—পৃ: ৮০)

2. Discuss the concepts of Id, Ego and Super-Ego according to Freud. How do they stand for the different aspects of human mind?

Ans. (পৃ: ৭৭—পৃ: ৮০)

3. What is a complex? How is a complex formed? Discuss the origin and structure of Oedipus Complex.

Ans. (পৃ: ৮০—পৃ: ৮৪)

4. How are the complexes formed? How do they affect our mental health?

Ans. (পৃ: ৮০—পৃ: ৮৪)

নয়

যৌবনাগম ও তার সমস্যা (Adolescence and its Problems)

মানব সত্তার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়গুলির মধ্যে যৌবনাগমের কালটি সব দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যৌবনাগমেই ব্যক্তির সত্তার বিভিন্ন দিকগুলি তাদের পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছয়। কিন্তু সেই সঙ্গে যৌবনাগম আবার একটি বিরাট অনিশ্চয়তা ও সমস্যার কালও বটে। এই সময় ব্যক্তির মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সংগঠনে এমন কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে যার ফলে তার পক্ষে পরিবেশের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক সঙ্গতিবিধান করা দুরূহ হয়ে পড়ে। ফ্রয়েডের মতে যৌবনাগম হল শৈশবের পুনরাবৃত্তি। শৈশবে শিশুর লিবিডো বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন আসক্তির স্থল পরিভ্রমণ করে এবং বহু স্থানে বিভিন্ন প্রকৃতির যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে। প্রসুপ্তি কালের সুরুতে অস্বাভাবিক যৌন অনুভূতিগুলি লুপ্ত হয়ে যায় এবং লিবিডো তার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথটি খুঁজে পায়। কিন্তু যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে সেই শৈশবকালীন বৈচিত্র্যময় ও অস্বাভাবিক যৌন আবেগগুলি আবার যেন তাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং প্রাপ্তযৌবন ছেলে-মেয়েদের মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করে। ইতিপূর্বে শিশুর মনে এই সব অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত কামনা বাসনা নিয়ে অধিসত্তার সঙ্গে একটি বোঝাপড়া হয়ে গেছল। কিন্তু এই শৈশবকালীন আসক্তির সম্পর্কগুলি পুনরায় জেগে ওঠায় অহম্ ও অধিসত্তার মধ্যে পারস্পরিক সঙ্ঘর্ষ আবার তীব্র হয়ে দেখা দেয়। তার ফলে প্রাপ্তযৌবনদের প্রক্ষোভমূলক সমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য গুরুতরভাবে ক্ষুন্ন হয়ে ওঠে। এই সব কারণে যৌবনাগমকে কেউ কেউ পীড়ন ও কষ্টের কাল, কেউ কেউ আবার ঝড়ঝঞ্ঝার কাল বর্ণনা করেন।

যৌবনাগমের বৈশিষ্ট্যাবলী

যৌবনাগমের সুরু প্রজনন শক্তির বিকাশে (Puberty)। প্রজনন শক্তির বিকাশ বলতে ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্যোৎপাদন ও মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃসৃষ্টি বোঝায়। ছেলেমেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই এই সময় যৌন ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে ও তাদের দেহে নানারূপ যৌনসূচক চিহ্নের আবির্ভাব হয়। এগুলিকে গৌণ যৌন চিহ্ন (Secondary sexual character) বলা হয়।

পীড়ন ও কষ্টের কাল বা ঝড়ঝঞ্ঝার কাল

কি ছেলে কি মেয়ে উভয়ের জীবনেই যৌবনাগম নানাদিক দিয়ে একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা এই সময়টিকে পীড়ন ও কষ্টের (stress and strain) কাল বা ঝড়ঝঞ্ঝার কাল বলে বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকে সময়টিকে অপরাধপরায়ণতার কাল বলেও মনে করে থাকেন। কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে এ ধরনের চরম বর্ণনাগুলির মধ্যে যথেষ্ট অতিরঞ্জন আছে। কেননা এ সময়ে ছেলেমেয়েরা বিরাট একটি প্রক্ষোভমূলক আলোড়নের পাত্র হয়ে দাঁড়ালেও অস্বাভাবিক কোনও পরিবর্তন তাদের মধ্যে সাধারণত দেখা দেয় না। যৌবনাগমকে পীড়ন ও কষ্টের কাল বা ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল বলে বর্ণনা করা চললেও এটিকে অপরাধপরায়ণতার কাল বলা একান্তই অসঙ্গত। কেননা এ সময়ে অপরাধ সম্পাদনের কোন বিশেষ ইচ্ছা বা প্রবণতা ছেলেমেয়ের মধ্যে দেখা দেয় না। তবে পরিবেশের চাপে অনেক সময় ছেলেমেয়েরা অপরাধপরায়ণতার দিকে ঝোঁকে। তার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাপ্তযৌবনদের চেয়ে উদাসীন ও অনুপযোগী পরিবেশই দায়ী।

শৈশবের পুনরাবৃত্তি

যৌবনাগমকে ফ্রয়েড, আর্নেষ্ট জোনস প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা শৈশবের পুনরা-বৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। শৈশবে দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভমূলক ও যৌনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এক চরম অসংহতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, বাল্যকাল ও কৈশোরের আগমনে সেই অসংহতি ও বিশৃঙ্খলা ধীরে ধীরে লোপ পায় এবং শিশু অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যৌবনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই শৃঙ্খলা ও সংহতি আকস্মিকভাবে আবার লোপ পেয়ে যায় এবং ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও যৌনমূলক জগতে এক বিরাট বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শৈশবে যেমন তাকে নতুন জগতের অপরিচিত শক্তিগুলির সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করার জন্য প্রয়াস করতে হয়েছিল যৌবনা-গমেও সেই ভাবে আবার তার চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে নতুন করে সঙ্গতি-বিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শৈশবে যেমন নতুন পরিবেশের সঙ্গে ঠিক মত সঙ্গতিবিধান করতে না পারার জন্য বার বার তাকে দুঃখকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যৌবনাগমেও তেমনই তার পুরাতন ও পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য তাকে প্রতিপদে ব্যর্থতা, লজ্জা ও হতাশা বরণ করতে বাধ্য করে। এই দিক দিয়ে শৈশবের সঙ্গে যৌবনাগমের একটি বিরাট মিল আছে।

শারীরিক পরিবর্তন

যৌবনাগমে ছেলেমেয়ের মধ্যে এক সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময়ে ছেলেমেয়ে উভয়ের দেহে আকস্মিকভাবে এমন কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে যেগুলি পরিবার বা বাইরের আর সকলের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। অনেক ক্ষেত্রে বয়ঃপ্রাপ্তরা ছেলেমেয়েদের এই দৈহিক পরিবর্তনগুলিকে ভালভাবে নেন না এবং উপহাস, বিদ্রূপ এমন কি হিংস্র মন্তব্যও করেন। তার ফলে যৌবন-প্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মনে একটি অস্বাচ্ছন্দ্যময় ও অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তাদের আচরণ সঙ্কোচময় ও আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। বয়স্কদের বিরূপ আচরণের ফলে অনেক সময় তারা গুরুতর মানসিক আঘাতও পায় এবং বাস্তব থেকে নিজেদের অপসৃত করে নেয়।

মানসিক পরিবর্তন

বুদ্ধি বা মানসিক শক্তির দিক দিয়ে যৌবনপ্রাপ্তির সময় ছেলেমেয়েদের মনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না। তবে এই সময় মনের বিভিন্ন ক্ষমতাগুলি তাদের সহজ বৃদ্ধি প্রচেষ্টায় পূর্ণতালাভ করে। ফলে মননশক্তি, বোধশক্তি, বিচার শক্তি ইত্যাদি মানসিক শক্তিগুলির দিক দিয়ে ছেলেমেয়েরা পরিণত ব্যক্তির সমকক্ষ হয়ে ওঠে। নিজেদের এই নবলব্ধ সামর্থ্য সম্বন্ধে তাদের মনে সচেতনতা দেখা দেয় এবং পরিবার ও সমাজের আর দশজনের মত তারাও ছোট বড় সমস্যার সমাধানে নিজেদের অভিমত নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু সাধারণত তাদের এই হস্তক্ষেপকে অনেক পরিণত ব্যক্তিই অকালপক্কতা বলে মনে করেন এবং তাদের ধমক দিয়ে সরিয়ে দেন বা অগ্রাহ্য করেন। তার ফলে ছেলেমেয়েরা নিজেদের অবহেলিত ও পরিত্যক্ত বলে মনে করে এবং কালক্রমে তাদের মধ্যে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়।

অনুভূতির পরিবর্তন

প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সব চেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা দেয় তাদের অনুভূতির রাজ্যে। বলতে গেলে সেখানে একটি ছোটখাট বিপ্লব ঘটে যায়। দেহের আকস্মিক পরিবর্তন, যৌন পরিণতি, মানসিক শক্তির পূর্ণতা লাভ, বাইরের জগতের উপর সেগুলির প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি মিলে প্রাপ্তযৌবনদের মনে একটি বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং তাদের এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রক্ষোভের সংগঠনটি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। নিজেদের বহুমুখী পরিপূর্ণতার নতুন উপ-লব্ধিতে যেমন একদিক দিয়ে তাদের মনে এক অনাস্বাদিত আনন্দ দেখা দেয়

তেমনই তাদের সামর্থ্য ও প্রয়োজনের প্রতি সমাজের উদাসীনতা ও তাচ্ছিল্য তাদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ফলে অধিকাংশ প্রাপ্তযৌবনকেই অন্তর্মুখী বা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে দেখা যায়। অনেকের মধ্যে আবার নেতিমনোভাব (Negativism) দেখা দেয়। বাইরের জগতের প্রতি তখন তাদের মনে একটি বিক্ষোভের ভাব জাগে এবং অনেক ছেলেমেয়েই মনে করে যে তাদের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করা হচ্ছে না বরং সকলে মিলে তাদের উপর অবিচার ও নিপীড়ন করছে। পরিবার বা সমাজের অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তির প্রাপ্তযৌবনদের এই বিশেষ চিন্তাধারাকে অনুসরণ করতে না পেরে প্রায়ই তাদের প্রতি সত্য সত্যই অবিচার করে থাকেন এবং তার ফলে তাদের মধ্যে এই ধরনের নিপীড়নমূলক মনোভাব (Persecution mentality) আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

বিদ্রোহী মনোভাব

এই নিপীড়নমূলক মনোভাব থেকেই প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে জন্ম নেয় বিদ্রোহের মনোভাবে। সহজেই সে কোন কিছু স্বীকার করতে বা মেনে নিতে চায় না। তার পরিণত বুদ্ধি ও উন্নত মননক্ষমতা তাকে যোগায় তার বিদ্রোহের পেছনে আত্মবিশ্বাস। সে প্রচলিত বিশ্বাস, রীতি নীতি, ধর্মীয় বা সামাজিক মান প্রভৃতি সবেরই বিরোধিতা করে। সে চায় সমাজসংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে। তবে সমাজের প্রাচীন যা কিছু তা ভাঙ্গার মধ্যেই তার আনন্দ সীমাবদ্ধ থাকে, নতুন করে কিছু গড়ার প্রতি তার তেমন আগ্রহ দেখা যায় না।

যৌনবোধের পূর্ণতা

যৌবনপ্রাপ্তিতে ছেলেমেয়েদের যৌনতা পূর্ণ বিকাশলাভ করে। সেইজন্য প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে চাহিদাকে খুব বড় স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এ সময় সত্যকারের যৌনচাহিদা তেমন কিছু অস্বাভাবিক বা তীব্র রূপ গ্রহণ করে না। এই সময়ে যৌনঘটিত আকস্মিক শারীরিক পরিবর্তনগুলি ছেলেমেয়েদের কাছে মধুর বিস্ময়রূপে দেখা এবং তাদের যৌনচাহিদা মূলত প্রণয়ঘটিত আবেগবহুল কল্পনা ও চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। গভীর ভাববিলাসময় প্রেমের ঘটনা এ সময়ে ছেলেমেয়েদের জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে।

যৌন-কৌতূহল

যৌন-কৌতূহল এ সময় প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে তীব্রতর আকার ধারণ করে এবং বিভিন্ন যৌনঘটিত রহস্যগুলি জানার জন্য তাদের আগ্রহের সীমা থাকে না। কিন্তু

দেশেই যথোপযুক্ত যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকার ফলে প্রাপ্তযৌবনদের হয় সে কৌতূহল অতৃপ্ত থেকে যায়, নয় তারা অবাঞ্ছিত স্থান থেকে অর্ধসত্য ও বিকৃত তথ্য আহরণ করতে বাধ্য হয়। ফলে প্রাপ্তযৌবনদের ভবিষ্যৎ যৌনজীবন অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যাজটিল হয়ে ওঠে।

দিবাস্বপ্ন বা অবাস্তব কল্পনা

যৌবনাগমের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অবাস্তব কল্পনা ও দিবা-স্বপ্নের আধিক্য। সর্বতোমুখী পরিণতি প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে যে সকল নতুন চাহিদার সৃষ্টি করে সেগুলি বাস্তবে অতি অল্পই তৃপ্তিলাভ করতে পারে। ফলে সে তখন দিবাস্বপ্ন ও অলীক কল্পনার সাহায্য নেয় সেগুলিকে পূর্ণ করতে। প্রাপ্তযৌবনদের দিবাস্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে দু'শ্রেণীর স্বপ্ন পাওয়া যায়। প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠাঘটিত বা আত্মগৌরবমূলক দিবাস্বপ্ন। যেমন, প্রাপ্তযৌবন স্বপ্ন দেখে যে সে পড়াশোনায় প্রথম হচ্ছে বা খেলায় সবচেয়ে সেরা প্রমাণিত হচ্ছে বা কোন দুঃসাহসিক কাজ করেছে ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বপ্ন হচ্ছে প্রণয়মূলক দিবাস্বপ্ন। যেমন, সে তার আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ীকে বা প্রণয়িনীকে লাভ করেছে। প্রাপ্তযৌবনদের অধিকাংশ দিবাস্বপ্নই তীব্র প্রক্ষোভে নিষিক্ত থাকে এবং এই ধরনের অলীক কল্পনার সাহায্যে তারা তাদের অতৃপ্ত প্রক্ষোভের তৃপ্তি সাধন করে। সে দিক দিয়ে প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে দিবাস্বপ্নের যথেষ্ট উপকারিতাও আছে। এগুলি প্রাপ্তযৌবনদের মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করে এবং তাদের প্রাক্ষোভিক সাম্য বজায় রাখে। কিন্তু অতিরিক্ত ও অতি অবাস্তব দিবাস্বপ্ন যে সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় সে কথাও খুবই সত্য।

প্রাপ্তযৌবনদের সমস্যা (Problems of the Adolescent)

ব্যক্তির সমগ্র জীবনে যৌবনাগম যে একটি বিশেষ সমস্যামূলক কাল সে বিষয়ে সকল মনোবিজ্ঞানীই একমত। কিন্তু যৌবনাগমের এই সমস্যাগুলি কেন সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কালে বিশেষ মতভেদ দেখা গেছে। এতদিন মনোবিজ্ঞানীরা মনে করে এসেছেন যে প্রাপ্তযৌবনদের সমস্যার মূলে আছে একদিকে তাদের দেহমনের অতি দ্রুত ও আকস্মিক বৃদ্ধি ও তজ্জনিত একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এবং অপর দিকে নিজেদের যৌনতার পূর্ণ পরিণতি সম্পর্কে

বিশেষ কিছু করার থাকে না। কেননা সে ক্ষেত্রে যৌবনাগমের সমস্যাগুলি অপরিহার্যভাবে দেখা দেবেই। পিতা-মাতা-শিক্ষকেরা বড় জোর সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে প্রাপ্তযৌবনদের এই আকস্মিক পরিবর্তনগুলি গ্রহণ করতে পারেন এবং তাদের অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটি যাতে অতি তীব্র হয়ে না দাঁড়ায় সে ব্যাপারে যত্ন নিতে পারেন। কিন্তু প্রাপ্তযৌবনদের সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁরা এর চেয়ে কার্যকর কোন উপায় গ্রহণ করতে পারেন না।

যৌবনাগম সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী

কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা প্রাপ্তযৌবনদের সমস্যার জন্য তাঁদের শারীরিক এবং যৌনমূলক বিকাশকে ততটা দায়ী করেন না। তাঁদের মতে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে যে সব সমস্যা দেখা দেয় তার জন্য প্রধানত দায়ী হল পরিবেশের চাপ। মানব সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক সমাজেই সাংস্কৃতিক, নীতি-মূলক ও সমাজমূলক পরিবেশের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এই সব পরিবর্তন আমাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে এমন একটি নতুন বিন্যাস এনেছে যে প্রাপ্তযৌবনদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সঙ্গতিবিধান করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের কাল আগের চেয়ে অনেক দীর্ঘ হয়ে উঠেছে। আজকের শিশুকে দীর্ঘ সময় ধরে লেখাপড়ায় ব্যাপৃত থাকতে হয়। তার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক দিয়ে কুড়ি একুশ বছরের একটি ছেলে বা মেয়ে কোনরূপ ফলদায়ক কাজে লাগতে পারে না এবং প্রকৃত পক্ষে সমাজের কাছে তারা বোঝা বলেই পরিগণিত হয়। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেও সব দেশের সমাজেই একটি কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে বা মেয়ে সমাজের কাছে মূল্যবান সম্পদ বলে বিবেচিত হত। বর্তমান সমাজের মাপকাঠিতে প্রাপ্তযৌবন না হল একটি শিশু, না একজন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি। ফলে তার জন্য সমাজে স্বীকৃত কোন স্থান বা ভূমিকা নেই। এই কারণে বর্তমান যুগের প্রাপ্তযৌবনদের সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদাটি ভালভাবে তৃপ্ত হতে পারে না এবং তারা নিজেদের সমাজবহির্ভূত ও পরিত্যক্ত বলে মনে করে। প্রাপ্তযৌবনদের সমস্যা সৃষ্টির প্রধান কারণ হল তাদের প্রতি সমাজের এই মনোভাবটি।

দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিককালে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে যথেষ্ট পরিণত বয়স্ক না হলে বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত নেই। কিন্তু গত শতকের সমাজব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ সর্বত্রই প্রচলিত ছিল এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে বেশ অল্প বয়সে

ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়া হত। পরিণত বয়সে বিবাহের প্রথা নানা দিক দিয়ে সমর্থনযোগ্য হলেও বিলম্বিত বিবাহের ফলে যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের যৌনতার চাহিদা যে অতৃপ্ত থেকে যায় সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ অন্যান্য উপায়ে তাদের যৌনচাহিদার তৃপ্তির কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থাও আমাদের দেশে নেই।

এই দুটি কারণের সঙ্গে মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন, সর্বব্যাপী রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং বৃত্তির ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি অন্যান্য কারণগুলি সংযুক্ত হয়ে বর্তমান কালের সামাজিক পরিবেশকে প্রচণ্ডভাবে জটিল ও নির্মম করে তুলেছে। আধুনিক মনো বিজ্ঞানীদের মতে বর্তমান যুগের পরিবেশের এই দুর্বার চাপ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে প্রাপ্তযৌবনদের বিভিন্ন সমস্যাগুলি। অতএব প্রাপ্ত-যৌবনদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে হলে পরিবেশের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের মতে প্রাপ্তযৌবনদের সমস্যা কোন জীব-তত্ত্বমূলক (biological) সমস্যা নয়। এটি একটি সম্পূর্ণ সামাজিক ও মনো-বিজ্ঞানমূলক সমস্যা।

প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদার ক্ষেত্রে স্বভাবতই বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। তার দেহ, মন, প্রক্ষোভ ও চিন্তার ক্ষেত্রে যে সব নতুন পরিবর্তন আসে তাই থেকে তার মধ্যে নানা নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। বাল্যকালে তার চাহিদা মূলত শারীরিক ও কতকগুলি সহজ মানসিক চাহিদায় সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যৌবনা-গমে তার মনের রাজ্যের আরও অনেক নতুন নতুন দরজা খুলে যায়। ধর্মাধর্ম, বৃহত্তর সমাজের আবেদন, ভালমন্দের বিচার, যৌনস্পৃহা, জীবনরহস্য প্রভৃতি সম্পর্কে কৌতূহল, নতুন নতুন ধারণা ও অনুভূতি তার মনকে পরিপ্লাবিত করে তোলে এবং তার মধ্যে নব নব প্রয়োজনের উত্তুঙ্গ তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সমস্যা তখনই দেখা দেয় যখন তার এই নব অনুভূত চাহিদাগুলি বাস্তবে অতৃপ্ত থেকে যায়। আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় এই সব চাহিদা তার পুরাতন পরিচিত পরিবেশে সাধারণত তৃপ্ত হবার কোন সুযোগ পায় না। ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় অতৃপ্তি এবং অতৃপ্তি থেকে আসে অপসঙ্গতি (maladjustment)। অপসঙ্গতি বলতে বোঝায় পরিবেশের সঙ্গে সুসঙ্গতিবিধানে অসামর্থ্য। প্রাপ্তযৌবনদের চার পাশে যে সব বিভিন্নধর্মী শক্তি কাজ করে সেগুলির সঙ্গে সে ঠিকমত মানিয়ে নিতে পারে না এবং এই অপসঙ্গতি থেকেই তার মধ্যে জন্মায় নানারকম অপরাধপরায়ণতা, দুষ্কৃতি এবং সমস্যামূলক

আচরণ। এই জন্যই অনেকে যৌবনপ্রাপ্তিকে 'ঝড়ঝঞ্ঝার কাল' বা 'অপরাধ-প্রবণতার কাল' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তযৌবনদের মনে ঝড়ঝঞ্ঝা, অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদি দেখা দেয় যদি তার চাহিদাগুলি ঠিকমত তৃপ্ত না হয় তবেই। উপযুক্ত যত্ন ও মনোযোগ, সুবিবেচনা ও সহানুভূতি, মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রাপ্তযৌবনদের সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করলে প্রাপ্তযৌবনদের বিকাশ-প্রচেষ্টা কোন রূপ ক্ষুণ্ণ হয় না এবং সুস্থ ও সুষম ব্যক্তিসত্তা নিয়ে তারা বড় হয়ে উঠতে পারে।

প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা (Needs of the Adolescent)

প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং বহু মনোবিজ্ঞানী নানা তালিকাও উপস্থাপিত করেছেন। সেগুলির মধ্যে আমেরিকার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক শিক্ষানীতির জন্য যে কমিশনটি গঠিত হয়েছিল তাঁদের দেওয়া তালিকাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই তালিকাটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

সমস্ত প্রাপ্তযৌবনই চায়—

১। অর্থ উপার্জনকর কোন দক্ষতা আহরণ করতে।

২। ভাল স্বাস্থ্য এবং শারীরিক সামর্থ্য অর্জন ও সংরক্ষণ করতে।

৩। নাগরিক রূপে তাদের কর্তব্য এবং অধিকার জানতে।

৪। ব্যক্তি এবং সমাজের পক্ষে পরিবারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে।

৫। প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি বিচক্ষণতার সঙ্গে কেনার এবং ব্যবহার করার উপায় জানতে।

৬। মানবজীবনের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব উপলব্ধি করতে।

৭। সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে।

৮। অবসর সময় যথাযথ ব্যবহার করার উপায় জানতে।

৯। অপরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে।

১০। যুক্তিধর্মী চিন্তা করার শক্তি অর্জন করতে।

উপরের তালিকাটি যে অত্যন্ত প্রগতিশীল ও দূরদৃষ্টি প্রসূত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ষ্টানলী হল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানীরাও প্রাপ্তযৌবনদের বিভিন্ন আচরণের ব্যাপক পর্যবেক্ষণ করে তাদের চাহিদাগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁদের সেই সব পর্যবেক্ষণকে ভিত্তি করে এবং বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদার বিভিন্ন তালিকাগুলি

পরীক্ষা করে নীচে প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদাগুলিব একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেওয়া হল।

১। মুক্ত সক্রিয়তার চাহিদা (Need for Free Activity)

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের সর্বদেহে একটি আকস্মিক বৃদ্ধি দেখা দেয়। এই দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সক্রিয়তার আয়োজন, মুক্ত বাতাসে, রোদে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবাধ সঞ্চালনের সুযোগ। খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ, ভ্রমণ, পিকনিক ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্তযৌবনদের এই মূল্যবান চাহিদাটির তৃপ্তি হতে পারে। সেই জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে নানা রকম সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্তি মনোবিজ্ঞানেব দিক দিয়ে অপরিহার্য বলে পরিগণিত হয়েছে।

২। স্বাধীনতার চাহিদা (Need for Freedom)

যৌবনপ্রাপ্তিতে যে চাহিদাটি ছেলেমেয়েদের মনে সর্বপ্রথম দেখা দেয় সেটি হল স্বাধীন আচরণের চাহিদা। আজন্ম সে সব দিক দিয়ে পরের উপর নির্ভরশীল ছিল। আজ সেই পরনির্ভরতা থেকে সে মুক্তি খোঁজে এবং সমাজের একজন হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। সে নিজে থেকেই নানা গুরুকর্মের দায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসে, পরিবারের সাধারণ সমস্যা সম্বন্ধে মতামত দেয় এবং কোন কাজের ভার পেলে আনন্দে ও সোৎসাহে তা সম্পন্ন করে। ছেলেমেয়েদের এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাদের মনের স্বাভাবিক পরিণতির ফল। মনের বিভিন্ন দিকের পূর্ণতা থেকেই তার মধ্যে আত্মনির্ভরতা জাগে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের বয়ঃপ্রাপ্তগণ প্রাপ্তযৌবনদেব এই মনোভাবকে ভাল চোখে দেখেন না। ফলে বয়স্কদের সমাজের সঙ্গে প্রাপ্তযৌবনদের সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং তাই থেকে তাদের মধ্যে নানারকম আচরণবৈষম্য দেখা দেয়।

৩। সমাজ-জীবনের চাহিদা (Need for Social Life)

যৌবনাগমের পূর্বে শিশু বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে একান্ত উদাসীন থাকে। অতি নিকটতম পরিবেশ ছাড়া তার আগ্রহ দূরতর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয় না। কিন্তু যৌবনাগমে তার পরিণত মনের দরজায় বৃহত্তর পৃথিবীর আবেদন এসে পৌঁছয়। নিজের ক্ষুদ্র পরিবেশের গণ্ডীর বাইরে মানবসমাজের সঙ্গে একাত্মতার এক অনুভূতি তার মনকে স্পর্শ করে। সে অপরের সঙ্গ খোঁজে, অপরিচিতের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং নিজের স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীর স্বার্থে বিসর্জন দেয়। স্কুল,

ক্লাব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন, নানাবিধ যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাপ্তযৌবনদের এই সমাজ-জীবনের চাহিদাটি তৃপ্ত হয়।

৪। যৌনতৃপ্তির চাহিদা (Need for a Mate)

যৌবনপ্রাপ্তিতে ছেলেমেয়েদের যৌনচেতনা পরিণতিলাভ করে। শৈশবে যৌনবোধ নিতান্ত অসংগঠিত ও অপরিণত অবস্থায় থাকে। বাল্যকালে যৌনতা থাকে সুপ্ত বা অবদমিত অবস্থায়। কিন্তু যৌবনাগমে এই যৌনবোধ পরিণত ও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। এই পরিণত যৌনচেতনা প্রকাশ পায় ছেলেদের ক্ষেত্রে সঙ্গিনী এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে সঙ্গীর জন্য কামনার রূপে। এই সময় ছেলেরা ও মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গ কামনা করে এবং পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা ও মেলা-মেশায় আনন্দ লাভ করে। ইউরোপ ও আমেরিকায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার প্রথা প্রচলিত আছে। তার ফলে তাদের এই যৌন চাহিদা অনেকাংশে তৃপ্ত হয়। কিন্তু ভারত ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশের অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল সমাজে প্রাপ্তযৌবনদের যৌনচাহিদা এই ভাবে তৃপ্ত হবার বিশেষ সুযোগ পায় না।

সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য কামনা ছাড়াও যৌন চাহিদা আর একটি বিশেষরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেটি হল যৌন কৌতূহল। এই সময় যৌনঘটিত তথ্যাদি ও যৌন রহস্য সম্পর্কে জানার জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। তাদের এ চাহিদা তৃপ্ত করার জন্য সমাজে বিজ্ঞানভিত্তিক যৌনশিক্ষা দেবার আয়োজন থাকা একান্ত উচিত। যে সব সমাজে যৌনশিক্ষাদানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই সেখানে প্রাপ্তযৌবনরা নানা অবাঞ্ছিত উৎস থেকে অর্ধসত্য ও বিকৃত তথ্য সংগ্রহ করে এবং তার ফলে তাদের যৌনজীবন বিষময় হয়ে ওঠে। এইজন্য প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যৌনশিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

৫। নতুন জ্ঞানের চাহিদা (Need for New Knowledge)

প্রাপ্তযৌবনদের মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি এই সময়ে পূর্ণতা লাভ করে এবং বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলিও তাদের পূর্ণ পরিণতিতে পৌছয়। ফলে তাদের স্বাভাবিক কৌতূহল তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং নতুন নতুন জ্ঞানলাভের জন্য তাদের মধ্যে তীব্র আকাঙ্খা দেখা দেয়। মানব অস্তিত্বের বহুমুখী ভাবধারার প্রতি তারা ক্রমশ আকৃষ্ট হয় এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন

জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করার প্রয়াস তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের বহুমুখী বিকাশের যে সর্বব্যাপী প্রভাব মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে দেখা যায়। এই সময় তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানলিপ্সাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার উপরই প্রাপ্তযৌবনদের জীবন প্রস্তুতি নির্ভর করে।

৬। আত্ম-অভিব্যক্তির চাহিদা (Need for Self-Expression)

প্রাপ্তযৌবনদের প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি প্রধানত নিজেকে অভিব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। লেখাপড়া, খেলাধূলা, সঙ্গীত, অভিনয়, সৃজনী-মূলক প্রচেষ্টা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তারা চেষ্টা করে নিজেদের বিকাশোন্মুখ সত্তাকে অভিব্যক্ত করতে এবং সমাজে আর সকলের কাছে নিজেদের মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই চাহিদাটির তৃপ্তি প্রাপ্তযৌবনদের সুস্থ ও সুষম ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। যে সব ছেলেমেয়ের মধ্যে এই অত্যাবশ্যক চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় তারা দুর্বলচেতা, আত্মবিশ্বাসহীন ও জীবনসংগ্রামে পশ্চাদ্‌পদ হয়ে ওঠে।

৭। নীতিবোধের চাহিদা (Need for Ethical Sense)

এই সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বোধ-গুলিও অপরিণত হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন বস্তু বা কাজ সম্পর্কে নৈতিক মান তাদের মধ্যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট আকারের ছিল। যৌবনাগমে তাদের এ সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গঠনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। নিজের বা পরের সকলের কাজই সে তার এই নীতিবোধের মাপকাঠিতে বিচার করে। আর নিজেও যদি কখন তার এই নৈতিক মানের বিরোধী কাজ করে তাহলে সে তীব্র অপরাধবোধ থেকে কষ্ট পায়।

৮। আত্মনির্ভরতার চাহিদা (Need for Self-reliance)

এ সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে দেখা যায় এবং কেমন করে স্বনির্ভর হওয়া যায় সে সম্বন্ধেও নানা প্রশ্ন তাদের মনে উদয় হয়। স্বাধীন উপার্জনক্ষম হয়ে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার নানা পরিকল্পনা তারা মনে মনে রচনা করে। বিভিন্ন বৃত্তি ও উপার্জনের পন্থার প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং কোনও বিশেষ অর্থকরী দক্ষতা বা যোগ্যতা আহরণ করতে তারা উৎসাহী হয়। অনেকে এইজন্য এই চাহিদাটিকে বৃত্তির চাহিদা বলেও বর্ণনা করে থাকেন।

৯। জীবনদর্শনের চাহিদা

(Need for a Philosophy of Life)

যৌবনপ্রাপ্তিতেই প্রথম ছেলেমেয়েদের মনে জীবন ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন জাগে। মানুষের জীবনের অর্থ কি, কিসেই বা জীবনের সার্থকতা বা এই সৃষ্টির রহস্য কি, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তাদের মনকে বার বার আন্দোলিত করে। এই প্রশ্নগুলির উত্তর তারা সর্বত্র সন্ধান করে এবং যতটুকু তথ্য তারা সংগ্রহ করতে পারে তাই দিয়ে মোটামুটি একটি ধারণা তারা গড়ে তোলে। এই সময় দরকার হল যথাযথ পরিচালনার সাহায্যে তাদের মধ্যে এমন একটি সুস্থ ও সুষ্ঠু জীবনদর্শন গড়ে তুলতে সাহায্য করা যা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মধারাকে সুসংহত ও অর্থময় করে তুলতে পারবে।

উপরে বর্ণিত প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদাগুলি যদি যথাযথ তৃপ্ত না হয় তাহলে তাদের সঙ্গতিবিধান বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং তা থেকে তাদের মধ্যে নানা-রকম অবাঞ্ছিত মানসিক জটিলতা ও আচরণমূলক বৈকল্য দেখা দেয়। ফলে তাদের ক্রমবিকাশের সুষ্ঠু অগ্রগতি গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। যারা দুঃসাহসী তারা তাদের অতৃপ্ত চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য নানা অসামাজিক ও অমঙ্গলকর পন্থা গ্রহণ করে এবং সমাজে অপরাধপরায়ণ (Delinquent) বলে কুখ্যাত হয়। যারা তা পারে না তারা আংশিক বা কৃত্রিম তৃপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকে বা তাদের চাহিদাকে দমন করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ প্রাপ্তযৌবনই দিবাস্বপ্ন বা অলীক কল্পনার মধ্যে দিয়ে তাদের চাহিদার তৃপ্তি খোঁজে। এর কোনটিই সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষণ নয় এবং স্বাস্থ্যময় ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টিতে বিশেষ বাধাস্বরূপ। অতএব পিতামাতা, শিক্ষক, সকলের কর্তব্য হল যাতে প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদাগুলি যথাসম্ভব তৃপ্তিলাভ করে এবং তাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত জটিলতা দেখা না দেয় সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া।

শিক্ষক ও প্রাপ্তযৌবন (Teacher and the Adolescent)

প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদাগুলি যদি যথাসময়ে তৃপ্ত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয় এবং তার ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। অপসঙ্গতি যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন তা নানা রকম অপরাধপরায়ণতার রূপ গ্রহণ করে। এইজন্য শিক্ষক পিতামাতা সকলেরই উচিত প্রাপ্তযৌবনদের সমস্যাগুলি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং সেগুলি যাতে দূর করা যায় তার আয়োজন করা। এ সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। যথা—

১। প্রাপ্তযৌবনদের আচরণ ভালভাবে বোঝা।

এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সব অপসংগতি দেখা দেয় সেগুলির অধিকাংশের কারণই হল পিতামাতা বা শিক্ষক তাদের ভাল করে বুঝতে পারেন না। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা প্রাপ্তযৌবনদের আচরণের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যাই করে থাকেন। বস্তুত গতানুগতিক পন্থায় প্রাপ্ত-যৌবনদের আচরণগুলি বিচার করলে সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ কখনই জানা যাবে না এবং পিতামাতা এবং শিক্ষকরা যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন তা সব সময়েই সম্পূর্ণ ভুল হয়ে দাঁড়াবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ছেলে যদি অসুখ করার ভাণ করে বা হঠাৎ রেগে যায় বা চীৎকার করে ওঠে তবে তার এই আচরণগুলির হয়ত প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে যে সে দায়িত্ব গ্রহণ করার উপযুক্ত সুযোগ পাচ্ছে না। কিংবা যদি কোন ছেলে বা মেয়ে দিবাস্বপ্নে সময় কাটায় কিংবা নিজের ব্যর্থতাকে সমর্থন করার চেষ্টা করে তাহলে হয়ত বুঝতে হবে যে তাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে তা তার সামর্থ্যের তুলনায় দুঃসাধ্য। প্রাপ্তযৌবনদের আচরণগুলির যদি এই ভাবে মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করা হয় তাহলেই সেগুলির অন্তর্নিহিত প্রকৃত সমস্যার সন্ধান পাওয়া যাবে এবং ফলে সেগুলির সত্যকারের মীমাংসা করাও সম্ভব হবে।

২। সামাজিক সম্পর্ক গঠনে বিদ্যালয়

সুষ্ঠু সামাজিক সংগতিবিধানে ব্যর্থতা প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে অপসংগতি সৃষ্টির আর একটি বড় কারণ। গৃহ পরিবেশ যথেষ্ট উন্নত হলেও অনেক সময় দেখা গেছে যে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে নিজেদের ঠিকমত খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। তার একটি বড় কারণ হল যে প্রাপ্তযৌবনদের জন্য কোন সমাজেই কোন নির্দিষ্ট স্থান থাকে না এবং সমাজ তাদের বোঝবার চেষ্টাও করে না। এই সময় বিদ্যালয় এবং শিক্ষকমণ্ডলী চেষ্টা করলে প্রাপ্তযৌবনদের আত্মবিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। বিদ্যালয়ে নানারূপ সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজন করে এবং ক্লাব, হবি, খেলাধুলা, বিদ্যালয় পরিচালনা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাপ্ত-যৌবনদের সামাজিক সম্পর্ক গঠনে শিক্ষকগণ প্রচুর সাহায্য করতে পারেন। যে সব ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে সম্মিলিত ভাবে কোন কাজ করে সে সব

ক্ষেত্রে যদি শিক্ষক ব্যক্তিগত মনোযোগ ও যত্নের সংগে তাদের কাজের তত্ত্বাবধান করেন তাহলে তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক আচরণগুলি গড়ে উঠতে পারে।

৩। জীবনদর্শন গঠনে সাহায্য করা

এই সময়ে ছেলেমেয়েরা যাতে একটি উপযুক্ত জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে সেদিক দিয়ে শিক্ষক ও পিতামাতাদের সক্রিয় ও সযত্ন সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। ভাল ভাল বই পড়ার সুযোগ দেওয়া, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা, সেগুলি সম্বন্ধে তাদের সন্তোষজনক ধারণা গঠনে সাহায্য করা; প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার অবকাশ দিয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা ইত্যাদি পন্থায় প্রাপ্তযৌবনদের জীবন সম্বন্ধে একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা গড়ে তুলতে শিক্ষক তাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। প্রকৃতি-বীক্ষণও কল্পনাশক্তি বিকাশের পক্ষে পরম সহায়ক এবং ভ্রমণ, পিকনিক, স্কাউটিং ইত্যাদির মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে আসতে পারে। তাছাড়া নানাদেশে ভ্রমণের ফলে প্রাপ্তযৌবনদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয় এবং তারা উদার জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে।

তবে কোন একটি সুনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় জীবনদর্শন শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে তোলা শিক্ষকের পক্ষে কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রাপ্তযৌবন যাতে তার জীবনের একটি লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং তার নিজের অস্তিত্বের একটি অর্থ খুঁজে পায় সেদিক দিয়ে তাকে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্যের অন্তর্গত। প্রাপ্তযৌবন যখনই তার জীবনে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থাপন করতে পারবে তখনই সে তার নিজস্ব একটি জীবনদর্শনও গড়ে নিতে পারবে। এদিক দিয়ে শিক্ষক প্রাপ্তযৌবনকে ত্রিবিধ মূল্যবান নির্দেশ দিতে পারেন। প্রথমত, শিক্ষার্থীরা যেন উৎসাহহীনতা, অজুহাত প্রদর্শন, সন্দেহ, স্বার্থপরতা, আত্মগ্লানি, আলস্য প্রভৃতি অবাঞ্ছিত মনোভাব এবং অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করে। দ্বিতীয়ত, আশাবাদিতা, রসজ্ঞান, দায়িত্ববোধ, কর্মে উৎসাহ, বন্ধুত্ব প্রভৃতি বাঞ্ছিত অভ্যাস ও মনোভাবগুলি তারা যেন আহরণ করে। তৃতীয়ত, লেখাপড়া, বৃত্তিশিক্ষা, বিবাহ, ধর্মের ভূমিকা, পারিবারিক জীবন, নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব, জীবনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি মানবজীবনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেন পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে নিজেদের মতামত গঠন করতে শেখে।

৪। উন্নততর ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধানে সাহায্য করা

মানসিক স্বাস্থ্য সংগঠনে শিক্ষক প্রাপ্তযৌবনদের প্রচুর সাহায্য করতে পারেন। প্রাপ্তযৌবনদের সঙ্গতিবিধানমূলক সমস্যাগুলি উপলব্ধি করা এবং বিদ্যালয় পরিবেশের সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে সেগুলিকে দূর করা আধুনিক শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কর্মসূচীর অন্তর্গত। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করা, তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলি পর্যবেক্ষণ করা এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের সাহায্যে তাদের সমস্যাগুলির সমাধানে তাদের সুপরিচালিত করা। প্রাপ্তযৌবনদের আচরণধারা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজন হলে বিদ্যালয় পরিবেশের পরিবর্তন ও সংস্কারসাধন করাও বিধেয় হতে পারে।

প্রাপ্তযৌবনদের সুসঙ্গতিসাধনে সাহায্য করতে হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ককে আন্তরিকতা ও প্রীতির উপব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শিক্ষক এবং পিতামাতার মধ্যেও যাতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় তার আয়োজন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে শিক্ষক যাতে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠক্রমটিকেও পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করতে হবে।

৫। স্বাধীন কাজকর্মের সুযোগ

গৃহে বা অন্যান্য পরিস্থিতিতে প্রাপ্তযৌবনরা স্বাধীনভাবে কাজের সুবিধা পায় না। তার ফলে তাদের স্বাধীনতার চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায়। এদিক দিয়ে শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে কাজ করার নানা রকম সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যালয় পরিবেশে নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তাদের উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে তাদের স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদাগুলি তৃপ্ত করতে পারা যায়। এই চাহিদাগুলির যথাযথ তৃপ্তির উপরই নির্ভর করে প্রাপ্তযৌবনদের মানসিক স্বাস্থ্য।"

৬। বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রগতিশীল শিক্ষাপদ্ধতি

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর প্রাপ্তযৌবনদের শিক্ষাসূচীটি প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিটি ছেলেমেয়ে যদি তার নিজস্ব প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে তাহলে তার ব্যক্তিগত সার্থকতাবোধ পরিতৃপ্ত হবে এবং তার শিক্ষাও কার্যকর হয়ে উঠবে। নতুবা ব্যর্থতা বা আংশিক সাফল্য তাদের আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে তুলবে এবং তার ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যও ক্ষুণ্ণ

হয়ে উঠবে। এইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বহুমুখী ও বৃত্তিধর্মী পাঠক্রমের প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন। পাঠক্রমের মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা থাকলে প্রাপ্তযৌবনরা নিজেদের আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করে নিতে পারবে। এই কারণেই আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের মধ্যে নানা বিভিন্নধর্মী পাঠ্যবিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। বহুমুখী পাঠক্রমের মধ্যে দিয়ে প্রাপ্তযৌবনদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভাবনা ও প্রয়োজনগুলি তাদের পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়। ভারতে সম্প্রতি প্রবর্তিত উচ্চ মাধ্যমিক পাঠস্তরে প্রচলিত গতানুগতিক পাঠক্রম বর্জন করে বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের প্রবর্তন করা হয়েছে। তার ফলে প্রাপ্তযৌবনদের দীর্ঘ-অবহেলিত চাহিদাগুলি তাদের নিজস্ব পরিতৃপ্তি খুঁজে পাবে।

৭। পর্যাপ্ত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজন

প্রাপ্তযৌবনদের সর্বতোমুখী বিকাশ প্রচেষ্টাকে পূর্ণতালাভের সুযোগ দেবার জন্য তাদের পাঠক্রমে প্রচুর পরিমাণে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সম্মেলন, ভ্রমণ, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সত্তার সব দিকগুলি যাতে অবাধে অভিব্যক্ত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বর্তমান সমাজের অতিরিক্ত জটিল পরিবেশের চাপে প্রাপ্ত যৌবনরা তাদের অনেক প্রক্ষোভকেই অবদমিত করতে বাধ্য হয়। এই অবদমিত প্রক্ষোভগুলি অব্যক্ত থাকার ফলে তাদের মানসিক সমন্বয় নষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের মনের স্বাস্থ্যও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সহপাঠক্রমিক কাজগুলির মাধ্যমে এই অপ্রকাশিত ও নিরুদ্ধ প্রক্ষোভগুলি বহিঃপ্রকাশের সুযোগ পায় এবং ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকে।

৮। যৌনশিক্ষার আয়োজন

যৌনবিষয় সম্বন্ধে প্রাপ্তযৌবনদের নবজাগ্রত কৌতূহল তৃপ্ত করার জন্য তাদের উপযুক্ত যৌন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা দরকার। যৌনরহস্য সম্বন্ধে যাতে ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লাভ করতে পারে তার আয়োজন শিক্ষার সর্বস্তরের পাঠক্রমেই অন্তর্ভুক্ত হবে। নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে যাতে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত ও বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানলাভ করতে পারে সেদিকে শিক্ষককে দৃষ্টি দিতে হবে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রকৃত যৌনশিক্ষার সুরু হবে বাল্যকাল

থেকে, এমন কি শৈশব থেকেই। কিন্তু যথার্থ তথ্যমূলক যৌনশিক্ষার সুরু যৌবনাগমেই হওয়া উচিত এবং সে সময়েই শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যৌনশিক্ষার পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচীটি প্রাপ্তযৌবনদের জন্য বিদ্যালয় পাঠক্রমের অঙ্গীভূত হবে এবং যাতে নরনারীর যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে বলিষ্ঠ ও বিজ্ঞানভিত্তিক মনোভাব গড়ে ওঠে সে সম্বন্ধে শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the characteristics of adolescence ? Why is it called a period of stress and strain ?

Ans. (পৃঃ ৮৫—পৃঃ ৮৯)

2 State the problems of adolescence ? What are the symptoms of many abnormalities first observed in the adolescent.

Ans. (পৃঃ ৮৫—পৃঃ ১০০)

3. Critically discuss the role of teacher in alleviating the difficulties of the adolescent.

Ans. (পৃঃ ৯৬—পৃঃ ১০১)

4. Adolescence is the product of social and psychological forces and not of purely physiological ones—Discuss.

Ans (পৃঃ ৮৫—পৃঃ ৯২)

5. Give a brief account of the special needs of the adolescent and their educational implications.

Ans. (পৃঃ ৮৯—পৃঃ ১০১)

6 Describe the salient features of adolescence. Why is it called the recapitulation of Infancy ?

Ans (পৃঃ ৮৫—পৃঃ ৮৬)

দশ

যৌন শিক্ষা (Sex Education)

যৌনতা মানবজীবনের গঠন ও নির্বাহে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। জীবতত্ত্বের দিক দিয়ে প্রাণীর বংশপ্রবাহকে অব্যাহত রাখার জন্য যৌনতার সৃষ্টি হলেও প্রাণীর ব্যক্তিসত্তার সংগঠন এবং তার অন্যান্য দিকগুলির পরিপুষ্টির উপর যৌনতা একটি অতি প্রভাবশালী শক্তিরূপে কাজ করে থাকে। তার ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন, তার প্রক্ষোভমূলক সংগঠন, তার জীবনাদর্শের বিকাশ প্রভৃতি প্রতিটি দিকই যৌনতার দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে শৈশবে শিশুর মধ্যে কোনরকম যৌন চেতনা থাকে না এবং যৌবনাগমের আগে তার মধ্যে যৌন বিষয় সম্পর্কে কোন রূপ আগ্রহ বা প্রবণতা দেখা দেয় না। কিন্তু প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডের গবেষণা থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে জন্মের পর থেকেই শিশুর মধ্যে যৌনচেতনা দেখা দেয়। কেবল তাই নয় তার যে সব আচরণকে আমরা যৌনতাবর্জিত বলে মনে করি সেগুলির মধ্যে অনেক আচরণই প্রকৃতপক্ষে তার যৌন তৃপ্তির প্রচেষ্টা বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য প্রকৃতির দিক দিয়ে পরিণত নরনারীর স্বাভাবিক যৌন অনুভূতি ও প্রচেষ্টার সঙ্গে শিশুর এই যৌন অনুভূতি ও প্রচেষ্টার প্রচুর পার্থক্য আছে। এ দিকে দিয়ে শিশুর যৌন অনুভূতি ও প্রচেষ্টাকে স্বাভাবিক এবং সমাজস্বীকৃত মানের দিক দিয়ে বিকৃত এবং অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে। শৈশবকালের পর যে বাল্যকাল আসে তাকে যৌনতার দিক দিয়ে সুপ্তকাল বলা হয়। এই সময় শিশুর মধ্যে কোন যৌনতার অনুভূতি বা যৌনপ্রচেষ্টা প্রকাশ্যভাবে দেখা যায় না। কিন্তু বাল্যকালের শেষে যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যৌনতা তার পূর্ণরূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং ব্যক্তির জীবননির্বাহের একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। এই সময় ব্যক্তির জীবনে সব দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণতি দেখা দেয় এবং তার এই পরিণতিপ্রাপ্তির প্রচেষ্টায় যৌনতা একটি শক্তিশালী উপকরণ রূপে কাজ করে।

যৌনতা মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলেও সাধারণ সভ্যসমাজে যৌনতাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করে রাখা হয়ে থাকে। যৌনতা সম্পর্কে

সব দেশের সভ্যমানুষের একটি লজ্জা ও সংকোচের মনোভাব দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে যৌনতাকে ঘৃণার চোখেও দেখা হয়। তার ফলে শিশু যখন বড় হয়ে ওঠে এবং তার মনে যৌনতার উন্মেষণ দেখা দেয় তখন তাকে সে সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থাই আমাদের সমাজে থাকে না। যৌবনপ্রাপ্তির সময়ে প্রত্যেক ছেলেমেয়েই যৌন সম্পর্কিত ব্যাপারগুলি জানার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। অথচ আমাদের সমাজব্যবস্থাতে শিশুর এই যৌন কৌতূহল তৃপ্ত করার কোন সুষ্ঠু আয়োজন নেই। তার ফলে শিশু নানা অবাঞ্ছিত ও অনুপযোগী সূত্র থেকে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে। এই তথ্যগুলি যেমন একদিকে তার কৌতূহল পূর্ণভাবে তৃপ্ত করতে পারে না, তেমনই তার কাছে যৌন বিষয় সম্পর্কে অসত্য ও অর্ধসত্য পরিবেশন করে তার মধ্যে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞান সৃষ্টি করে।

এই বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞান যে নানা দিক দিয়ে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে এ বিষয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা একমত।

যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

দেখা গেছে যে আধুনিক সভ্যসমাজে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অপরাধ-প্রবণতার একটি বড় কারণ হল তাদের অসম্পূর্ণ ও বিকৃত যৌনজ্ঞান। নারী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কের কোন পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞান না থাকার ফলে তাদের মধ্যে এই ধরনের অপরাধপ্রবণতা ও নৈতিক অসংযমতা দেখা দেয়। কেবল ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেই নয় বিকৃত যৌনজ্ঞানের কুফল পরিণত বয়সের জীবনযাত্রাকেও গুরুতর ভাবে প্রভাবিত করে। দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি অনেকখানি নির্ভর করে নির্ভুল ও সুসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের উপর। বিকৃত যৌনজ্ঞান থেকে শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক যৌনপ্রচেষ্টা ও প্রবণতা জন্ম নেয় এবং বহুক্ষেত্রে পরিণত বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য, যৌনব্যাধি ও বিকৃত যৌন অভ্যাসের সৃষ্টি করে।

এই সব কারণে বর্তমানে শিশুদের যৌন শিক্ষা দেওয়ার স্বপক্ষে প্রবল আন্দোলন দেখা দিয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে মানবজীবনের একটি বড় দিককে শিশুর কাছে অজ্ঞাত বা অস্পষ্ট রেখে তার ব্যক্তিসত্তাকে কখনই সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করা সম্ভব হয় না। আজকাল অধিকাংশ প্রগতিশীল দেশেই যৌন শিক্ষাকে পাঠক্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ করে তোলা হয়েছে। যৌন শিক্ষাদানের স্বপক্ষে পর পৃষ্ঠায় যুক্তিগুলির উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, যৌবনপ্রাপ্তির সময় শিশুদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে যৌন চেতনা দেখা দেয়। এই যৌন চেতনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যৌন কৌতূহল। আগে বিশ্বাস করা হত যে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সক্রিয় যৌনমূলক আচরণের প্রতিই সত্যকারের আকর্ষণ থাকে। কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে যৌবনপ্রাপ্তির সময় সক্রিয় যৌনপ্রচেষ্টার প্রতি আকর্ষণের চেয়ে যৌন ব্যাপার সম্পর্কে জানার আগ্রহ অধিকতর প্রবল হয়ে দেখা দেয়। অতএব প্রাপ্তযৌবনদের যৌনমূলক চাহিদা তৃপ্ত করার একটি প্রধান পন্থা হল তাদের এই নব জাগ্রত যৌন কৌতূহল পরিতৃপ্ত করা। এক কথায় যৌন রহস্য সম্পর্কে শিশুদের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তথ্যাদি পরিবেশন করলে তাদের যৌনমূলক চাহিদা অনেকখানি তৃপ্ত হয়। এইজন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে বিদ্যালয় পর্যায় থেকেই যৌনশিক্ষা সুরু করা উচিত। বিশেষ করে নবম দশম শ্রেণীতে যে সময়ে যৌবনের প্রথম বিকাশ হয় তখন যাতে ছেলেমেয়েরা প্রধান প্রধান যৌন তথ্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে পাঠক্রমে তার আয়োজন রাখা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তার সংগঠন নির্ভর করে সুস্থ যৌনজীবনের উপর। যৌনজীবনকে বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন করে তুলতে হলে যৌনবিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। পরবর্তীকালে যৌনজীবনের সাফল্যের জন্য ব্যক্তির শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে যৌনশিক্ষাকে অবশ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

তৃতীয়ত, প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে যাতে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। বিকৃত সত্য, অর্ধসত্য ও অসত্য যৌনজ্ঞানের অধিকারী হয়ে অল্পবয়সে ছেলেমেয়েরা নানা অবাঞ্ছিত যৌন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। বিশেষ করে আমাদের সমাজে যৌন চাহিদা ও যৌন অনুভূতি সম্পর্কে একটি প্রতিকূল মনোভাব থাকার ফলে শিশুদের মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে একটি ভীতি এবং লজ্জার ভাব সৃষ্টি হয়। তার জন্য হয় তারা তাদের যৌন প্রবণতাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়, নয় অপরাধীর মনোভাব হতে সঞ্জাত আত্মগ্লানি থেকে তারা সারা জীবন কষ্ট পায়। এই অবাঞ্ছিত পরিণতি দূর করতে হলে সুপরিকল্পিত যৌনশিক্ষার আয়োজনই হল একমাত্র উপায়।

চতুর্থত, পরিণত জীবনের অধিকাংশ অভ্যাসেরই প্রাথমিক সংগঠনটি অতি শৈশবেই তৈরী হয়ে যায়। শিশুর যৌন অভিজ্ঞতার প্রকৃতি তার বিভিন্ন অভ্যাস গঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বলা বাহুল্য বিকৃত বা অসম্পূর্ণ

যৌনজ্ঞানের অধিকারী হলে শিশুর মধ্যে নানা অবাঞ্ছিত অভ্যাসের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটি এই ধরনের অভ্যাসের প্রভাবে ব্যর্থতা ও অতৃপ্তির বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

পঞ্চমত, যৌন অনুভূতি শিশুর ক্রমবিকাশমান প্রক্ষোভমূলক সংগঠনে একটি বড় অংশ অধিকার করে থাকে। শিশুর যৌনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে যদি সুষ্ঠু ও সুষম বিকাশের পথে পরিচালিত করা না হয় তাহলে তার সম্পূর্ণ প্রক্ষোভমূলক সংগঠনটি বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। শিশুর যৌনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার প্রকৃষ্ট পন্থা হল যৌনসম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যগুলি তাকে পরিষ্কার ভাবে জানতে দেওয়া।

ষষ্ঠত, যৌন শিক্ষা বলতে নিছক জীবতত্ত্বমূলক বা শরীরতত্ত্বমূলক তথ্য পরিবেশনকেই বোঝায় না। উপযুক্ত যৌনশিক্ষার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হল যৌনতা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করা ও অপর পক্ষের প্রতি সহানুভূতি-পূর্ণ সশ্রদ্ধ মনোভাব গঠন করা। সেইজন্য যৌনশিক্ষা সুষম ব্যক্তিসত্তা গঠনের অপরিহার্য অঙ্গ।

সবশেষে সুখী দাম্পত্যজীবনের পরিকল্পনা ও সন্তানপালনের শিক্ষাও যৌন-শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। দেখা গেছে যে জীবনের এই অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার-গুলি সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান না থাকার ফলে বহু নরনারীর পারস্পরিক সম্বন্ধ নানা জটিল সমস্যা ও নৈরাশ্যের পীড়নে বিপর্যস্ত হয় এবং সমগ্র দাম্পত্যজীবনটিই ব্যর্থ হয়ে ওঠে।

যৌনশিক্ষার প্রকৃতি

বিকাশমান শিশুমাত্রেরই প্রক্ষোভমূলক জীবনে একটি প্রধান নিয়ন্ত্রক হল যৌনতা। সেইজন্য যৌনশিক্ষা বলতে কেবলমাত্র যৌনতার জীবতত্ত্বমূলক রহস্য কিংবা যৌনতার সংগঠন বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি শিক্ষা দেওয়াকে বোঝায় না। ব্যক্তির সমগ্র প্রক্ষোভমূলক জীবনের উপর যৌনতার অসীম প্রভাব থাকার জন্য যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে প্রক্ষোভনিয়ন্ত্রণের অভ্যাসগঠন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ, তৃপ্তিকর শৈশব অভিজ্ঞতা, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যথাযথভাবে মেলামেশা করা, ভালবাসা, বিবাহ, পিতামাতা-সন্তানের সম্পর্কের প্রতি বলিষ্ঠ মনোভাব প্রভৃতি ঘটিত শিক্ষাকেও যৌনশিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে গ্রহণ করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে নানা কারণে পিতামাতা শিশুদের

যৌনশিক্ষা দেবার পক্ষপাতী হন না। কোন কোন পিতামাতা শিশুদের যৌনশিক্ষা দিতে ভয় পান। কেউ আবার যৌনশিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্পর্কে ভালভাবে নিজেরাই অবহিত থাকেন না। আবার কোন কোন পিতামাতা নিজেদের যৌনজীবনে অসঙ্গতি থাকার ফলে ছেলেমেয়েদের যৌন-শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেন। কিন্তু শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমানের জটিল সমাজব্যবস্থার দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে যৌন শিক্ষাদানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। বর্তমানে প্রত্যেক সুবিবেচক পিতামাতার পক্ষেই নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্য যৌন শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত।

যৌন শিক্ষাদানের তিনটি স্তর

যৌনশিক্ষাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—এক বাল্যকালের স্তর, দুই, কৈশোর স্তর ও তিন, যৌবনাগমের স্তর। বাল্যকালের স্তর বলতে সাধারণত ৩ বৎসর বয়স থেকে ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বোঝায়। কৈশোরের স্তর বলতে ১০ বৎসর বয়স থেকে ১৪-১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং যৌবনাগমের স্তর বলতে ১৪-১৫ বৎসর বয়স থেকে ১৮ ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বোঝায়। এই বয়সগত বিভাজনকে অবশ্য একেবারে চরম বলা যায় না। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে সামাজিক ও পারিবেশিক বৈষম্যের জন্য এই বয়সগত বিভাগের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যেতে পারে। শিক্ষাগত পর্যায়ের দিক দিয়ে বাল্যকালকে কিণ্ডার-গার্টেন ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সমকালীন, কৈশোরকে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের সমকালীন এবং যৌবনাগমকে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায় এবং উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায়ের সমকালীন বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই তিনটি স্তরের জন্য যৌনশিক্ষারও তিনটি বিভিন্ন পাঠক্রম অনুসরণ করতে হবে। যথা—

১। বাল্যকালের যৌনশিক্ষার পা ম

এই স্তরে যৌনশিক্ষা দেওয়া হবে অন্য:্র শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা রূপে। এ সময় যৌনশিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। সুপরিকল্পিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর যৌন অনুভূতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করাই হবে এই স্তরের পাঠক্রমের প্রধানতম লক্ষ্য।

প্রথমত, যাতে ছোট শিশুর মধ্যে সুস্থ ও স্বাস্থ্যময় শারীরিক ও মানসিক অভ্যাস গড়ে ওঠে সে দিকে যত্ন নিতে হবে। পরিবারের অন্যান্য সদস্য, ছোট ছেলেমেয়ে, পোষা পশুপাখী প্রভৃতির প্রতি ভালবাসা ও সাধারণ বিবেচনা শক্তি যাতে শিশুর মনে গড়ে ওঠে তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

যৌন বিষয় সম্পর্কে এই সময় শিশুর মনে দুরন্ত কৌতূহল দেখা যায়। শিশুর মাকে দেখতে হবে শিশু যেন তার যৌন কৌতূহল বিনা সংকোচে প্রকাশ করতে শেখে। দু'বছর বয়স থেকেই শিশু তার দেহের প্রতিটি অঙ্গের নির্ভুল নাম শিখবে। এই সময় নিজের যৌনাঙ্গগুলির নামও শিশু জানবে এবং সাধারণভাবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকলাপ সম্পর্কে তার মনে একটি ধারণা জন্মাবে।

ছোট শিশুর জীবনে মায়ের স্থানই সব চেয়ে বড়। মাকেই সে বেশীর ভাগ প্রশ্ন করে থাকে। একটু বড় হয়ে বাবার কাছেও সে তার নানা প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়। শিশুর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার জন্য মা বাবা উভয়েরই প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। অনেক সময় ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরের কোন জায়গা থেকে আলোচনা বা মন্তব্য শুনে এসে মা বাবাকে যৌনবিষয়ক কোন প্রশ্ন করে। তখন পিতামাতা'র উচিত শিশুর মনে সত্যকারের কোন্ ধরনের চিন্তার উদয় হয়েছে তা নির্ণয় করা এবং সেই মত তার কৌতূহল তৃপ্তির চেষ্টা করা। মনে রাখতে হবে যে ছোট ছেলেমেয়ের কোন প্রশ্নের উত্তর কখনও বিস্তারিত ভাবে দেওয়া উচিত নয়। কেননা তার ফলে অনেক সময় তাদের চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং তারা ঐ বিষয়ে তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

এর চেয়ে একটু বড় হলে শিশু যাতে বাড়ীর কাজকর্মে পরিবারের আর সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শেখে এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর খেলা ও কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। এই সময় শিশুরা পিতামাতার কাছ থেকে বিনা সংকোচে যৌনবিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আহরণ করতে শিখবে। শিশু যাতে কোনরূপ অবাঞ্ছিত যৌনপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে না পারে সেদিকে পিতামাতাকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। এই বয়স থেকেই প্রত্যেক ছেলেমেয়ে তার নিজের দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম নির্ভুলভাবে জানবে। যখন শিশুর বয়স দশ বৎসর বয়স হবে তখন থেকেই জনন-প্রক্রিয়ার অর্থ ও পদ্ধতির নির্ভুল প্রাথমিক জ্ঞান যাতে সে লাভ করতে পারে তার আয়োজন করতে হবে।

আট বৎসর বয়সের আগে শিশু বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে ছেলে না মেয়ে বিচার করে না। আট বৎসর বয়স থেকেই দেখা যায় যে ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসে। দশ এগার বৎসর বয়স থেকেই ছেলেরা ও মেয়েরা পরস্পরের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে সুরু করে। যৌন সচেতনতার এই ক্রমবিকাশের কথা মনে রাখলে ছেলেমেয়েদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন অনুযায়ী তাদের সঙ্গে বয়স্কদের আচরণকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

বিকাশমান শিশুর উপর পরিবারের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্নেহ ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার চেষ্টা করলে তাদের ব্যক্তিসত্তার সংগঠন সুষ্ঠু ও সুষম হয়ে উঠবে। এই সময় ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে নানা প্রশ্ন শিশুদের মনে দেখা দেয়। এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যাতে তারা পেতে পারে পিতামাতরা সে বিষয়ে সতর্ক হবেন।

একথা অনস্বীকার্য যে বিদ্যালয়ই হল যৌনশিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট স্থান। শৈশব স্তরে অবশ্য যৌনবিষয়ক কোন তথ্য প্রত্যক্ষভাবে পড়ান বা শেখান সম্ভবপর নয়। তবে শরীরতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে শিশুদের পরিচিত করার আয়োজন এই স্তরের পাঠক্রমে থাকা দরকার। ক্লাসের ভিতরে এবং বাইরে শিক্ষার্থীদের কাজকর্মগুলি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে কাজ এবং খেলাধুলা করার সুযোগ পায়। তার ফলে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটি আন্তরিক বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠবে।

২। কিশোর স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম

সাধারণভাবে বলা চলে যে যৌবনপ্রাপ্তির আগে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোন রূপ যৌনমূলক আচরণ দেখা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে বাল্যকালের যে সব আচরণকে যৌনমূলক বলা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি যৌনতাবর্জিত ও নির্দোষ প্রকৃতির হয়ে থাকে। কিন্তু যৌবনপ্রাপ্তির ঠিক আগের সময় থেকেই যৌনতার প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের যৌবনপ্রাপ্তি কিছু আগে ঘটে বলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিশোর বয়সে মেয়েরা যতটা ছেলেদের প্রতি আগ্রহ অনুভব করে ছেলেরা

মেয়েদের প্রতি ততটা আগ্রহ অনুভব করে না। এই জন্য এই সময় ছেলেদের যৌনবিকাশের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত এবং সুবিবেচনার সঙ্গে তাদের পরিচালনা করা দরকার। দেখতে হবে যে ছেলেমেয়েদের মনে যেন এ বিশ্বাস জন্মায় যে তাদের মা বাবাই তাদের যৌনঘটিত সমস্যার সমাধান সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারবেন।

যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মনেই একটি প্রবল প্রক্ষোভ-মূলক আলোড়ন দেখা দেয়। তাদের শরীরে এই সময় যে সব পরিবর্তন আত্ম-প্রকাশ করে সেগুলির অর্থ তার যদি ঠিকমত বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে না পারে তাহলে তাদের প্রক্ষোভমূলক অসংগতি থেকেই যাবে। যৌনমূলক শরীরতত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞানের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচিত করার দায়িত্ব প্রধানত পিতামাতারই। অবশ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক উপদেষ্টারা যে ছেলেমেয়েদের যৌনঘটিত জটিল সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিশোর বয়সে মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌনমূলক সংগতিসাধন বেশ সহজ হয়ে উঠতে পারে যদি রজঃসৃষ্টির রহস্য এবং সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়া তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। সাধারণত এই মূল্যবান কাজটি মা'রাই করে থাকেন। আর যে সব ক্ষেত্রে মেয়েরা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দৈহিক পরিবর্তনের প্রকৃত অর্থ না জেনেই জীবনযাত্রা সুরু করে সে সব ক্ষেত্রে তারা নানা অসুবিধা, সংশয় ও সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেই জন্য যৌনশিক্ষা পরিকল্পনার এইটিই হল একটি অতি মূল্যবান পর্যায়।

রজঃসৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে ছেলেদেরও পরিষ্কার জ্ঞান থাকা উচিত। কেননা মেয়েদের দৈহিক পরিবর্তনগুলি তাদের কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং মাতৃত্বের সঙ্গে সেগুলির কি সম্পর্ক এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি ছেলেদের জানা থাকলে তারা এই ঘটনাগুলিকে উপযুক্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখবে। আর যদি এই সব দৈহিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের মনে ভুল ধারণা জন্মায় তাহলে সমগ্র যৌনতার প্রতিই তাদের মনে একটি অস্বাস্থ্যকর ও বিকৃত মনোভাব গড়ে উঠবে। মোট কথা কিশোর স্তরের যৌন শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে থাকবে যৌনমূলক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানের আহরণ, যৌনঘটিত বিভিন্ন দৈহিক পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যাদির সঙ্গে পরিচিতি এবং ছেলেদের মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের ছেলেদের প্রতি বলিষ্ঠ ও উদার মনোভাব গঠন।

সাধারণত বাল্যকাল বা কৈশোরে শিশু যৌন তথ্য সংগ্রহে অসমর্থ হলেও যৌবনপ্রাপ্তির সময় সে নানা সূত্র থেকে নানা উপায়ে যৌনসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য আহরণ করে থাকে। স্বাস্থ্যবিকাশ ও জীবতত্ত্ব বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য সে তার বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক থেকে লাভ করে। এই সময়ে যৌন সংক্রান্ত সকল ব্যাপার সম্পর্কেই যাতে তার মধ্যে নির্ভুল জ্ঞান জন্মায় সেদিকে শিক্ষক এবং পিতামাতার সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই সব কারণেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ও প্রত্যক্ষভাবে যৌনশিক্ষার আয়োজন এই স্তরের পাঠক্রমে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩। যৌবনাগম স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম

নারী পুরুষের যৌন সম্পর্কের পূর্ণ পরিণতি যৌবনাগমের দ্বারাই সূচিত হয়ে থাকে। এই সময় ছেলেমেয়েরা সব দিক দিয়ে পরিণত মনের অধিকারী হয়ে ওঠে। তখন সে বিশেষ কোন ছেলে বা বিশেষ কোন মেয়েকে ভালবাসতে শেখে। নিজের বিবাহিত জীবনের কথা সে ভাবতে সুরু করে এবং ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে নানা পরিকল্পনায় মগ্ন হয়। কিন্তু যৌনসংক্রান্ত সমস্যাগুলি এই সময় তাদের কাছে খুব তীব্র হয়ে দেখা দেয়। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে নিজেদের ধারণা অনুযায়ী অগ্রসর হতে গিয়ে ছেলেরা অনেক সময় অতি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। তেমনই মেয়েরাও ছেলেদের সঙ্গে কিভাবে মিশবে সে সম্বন্ধে গুরুতর সমস্যা অনুভব করে। অনভিজ্ঞতা ও যৌনশিক্ষার অভাবে বহু ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহজ ও সুস্থ যৌন সম্পর্ক দুষ্ট হয়ে ওঠে। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে বিকৃত যৌনপ্রবণতা দেখা যায়। সমরতি (Homosexuality) এই ধরনের একটি অস্বাভাবিক যৌনপ্রবণতা যা প্রায়ই প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। অবশ্য এই প্রবণতা স্বল্পকালের জন্যই দেখা দেয় এবং স্বাভাবিক যৌনবোধ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়। স্বাভাবিক যৌনবোধ বলতে নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি সহজ যৌন আকর্ষণকেই বোঝায়। প্রাপ্তযৌবনদের যৌন আকর্ষণ যদি তাদের স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়ে না পৌঁছয় তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ যৌনজীবন অস্বাভাবিক ও ব্যর্থতাময় হয়ে ওঠে। কোন রকম বিকৃত যৌনপ্রবণতা যদি প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে থেকে যায় তাহলে তাদের পরিণত বয়সের দাম্পত্য জীবন একেবারেই সাফল্যজনক হয় না। এই সব অবাঞ্ছিত পরিণতি

দূর করতে হলে প্রাপ্তযৌবনদের সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট পন্থায় যৌনশিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ইতিপূর্বে শিশুকে যৌনশিক্ষা দানের দায়িত্ব প্রধানত ছিল পিতামাতারই উপর। বর্তমানে তা অনেকখানি এসে পড়েছে বিদ্যালয়ের উপর। বাল্যকাল থেকে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে যৌনশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যৌবনাগমের মুখে যৌনশিক্ষা বিদ্যালয় পাঠক্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠবে। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে যৌনতার শরীরতত্ত্বমূলক ও মনস্তত্ত্ব-মূলক তথ্যগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রাপ্তযৌবনদের বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রাপ্তযৌবনদের যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ক) যৌনবিষয়ক তথ্যাদির আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট জীবতত্ত্বমূলক ও শরীরতত্ত্বমূলক প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের পরিবেশন।

(খ) বিভিন্ন যৌনবিকৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান ও সেগুলির কুফল সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা।

(গ) যৌনঘটিত ব্যাপারে স্বাস্থ্যময় ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী গঠন এবং ছেলেদের মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের ছেলেদের প্রতি সশ্রদ্ধ ও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি।

(ঘ) দাম্পত্যজীবনের গুরুত্ব ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য সম্পর্কে সুসংহত বিবরণ। নারীপুরুষের সুষ্ঠু সম্পর্কের ব্যক্তিগত ও সমাজগত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা।

(ঙ) সন্তানপ্রালনের প্রয়োজনীয় নিয়মকানুনের জ্ঞান।

(চ) যৌথ কাজকর্ম, সাহিত্যমূলক ও সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান, সৃজনমূলক প্রয়াস, সামাজিক মেলামেশা, ভ্রমণ প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী।

প্রশ্নাবলী

1 Discuss the place of sex education in the school curriculum? How should it be imparted to the children?

Ans (পৃ ••—পৃঃ ১১১)

2 Discuss why sex education should be indispensably included in the child's study. Prepare a comprehensive programme of sex education for the different stages of the child's study.

Ans (পৃঃ •১—পৃ ১ ১)

3 Discuss the importance of sex education in the life of the adolescent. How should it be imparted to him?

An পৃ •১—পৃঃ ১১

এগার

অচেতনের স্বরূপ (Nature of Unconscious)

সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানের মানব আচরণের ব্যাখ্যায় অচেতন মনের প্রভাব ও কার্য্যাবলী প্রধানতম শক্তি বলে পরিগণিত হলেও পঞ্চাশ বৎসর আগেও মনোবিজ্ঞানীরা অচেতন মন সম্পর্কে কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। তাঁদের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মূল বিষয়বস্তু ছিল সচেতন মন ও তার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ফ্রয়েডই প্রথম নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দেন যে সমগ্র মানব মনের বেশীর ভাগ অংশই হল অচেতন এবং সেই অচেতন মনের প্রকৃতি ও আচরণ জানা না থাকলে সচেতন মনের প্রকৃতি ও আচরণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কিছুই জানা যাবে না। আজ অচেতন মন সম্পর্কে যে সব মূল্যবান তথ্য আমাদের মনোবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে এবং যে সব তথ্যকে ভিত্তি করে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, মনশ্চিকিৎসার বিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানগুলি গড়ে উঠেছে, সেগুলির অধিকাংশই ফ্রয়েডের অবদান।

অবশ্য প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা অচেতনের কোন কাজ বা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যে পরিচিত ছিলেন না তা নয়। স্বপ্নচারিতা (Somnambulism), দ্বৈত ব্যক্তিসত্তা (Double persona lity), অভ্যাসজনিত অচেতন আচরণ, স্বতঃলিখন (Auto matic writing) প্রভৃতি অচেতন মনের নানারকম কাজের কথা মনোবিজ্ঞানীদের বহু আগে থেকেই জানা ছিল। কিন্তু তখন তাঁরা এগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। প্যারিস এবং নান্সিতে ফ্রয়েড যখন বিভিন্ন মনোবিকারের রোগীর চিকিৎসা করেন সেই সময় তাঁর নিজের ব্যাপক গবেষণা থেকে অচেতন মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ হন। ফ্রয়েড দেখলেন যে এই সব মনোবিকারের রোগী সম্মোহিত অবস্থায় এমন বহু কথা মনে করতে পারে যেগুলি সম্মোহন থেকে জেগে ওঠার পর তারা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। স্পষ্টতই এই বস্তুগুলি তারা যে সত্য সত্য ভুলে যায় তা নয় সেগুলি তাদের অচেতনের গভীর অন্তঃস্থলে অবদমিত হয়ে থাকে।

এই থেকেই ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত করলেন যে ব্যক্তির মনের যে অংশটি সচেতন ব্যক্তির আচরণের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে সে অংশটির ভূমিকা নিতান্তই অকিঞ্চিৎ কর। কেননা এই সচেতন মনের নীচেই রয়েছে আর একটি অতি শক্তিশালী ও সক্রিয় অচেতন মন। যদিও এই অচেতন মনের কথা ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তবু মনের রাজ্যে একটিই হল প্রকৃত প্রভু। বড় বড় ফ্যাক্টরিতে যেমন কণ্ট্রোলরুম থাকে

এবং সেই কণ্ট্রোল রুমের নির্দেশে সমস্ত ফ্যাক্টরিটি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় সেই রকম এই অচেতন মনের অনুশাসন ও নির্দেশ অনুযায়ীই আমাদের সমগ্র মনের সমস্ত আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

সুদীর্ঘ অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ থেকে ফ্রয়েড মানব মনের সংগঠনের একটি পরিকল্পনা দেন।[১] তিনি মনকে তিনটি স্তরে ভাগ করেন। প্রথমটি হল সচেতন স্তর। ব্যক্তির সমস্ত জ্ঞাত মানসিক প্রক্রিয়া এবং কার্যাবলীব দ্বারা এই স্তরটি গঠিত। দ্বিতীয়টি হল অচেতন স্তর। যে সব মানসিক চিন্তা বা প্রক্রিয়া সচেতন স্তরে স্থান পেতে পারে না সেগুলি নিয়েই স্তরটি গঠিত। আর এই দুটি স্তরেব মধ্যবর্তী স্তরটি হল প্রাক্‌চেতন স্তর। এই স্তরে এমন সব স্মৃতি, অনুষঙ্গ, অস্পষ্ট, ধারণা প্রভৃতি থাকে, যেগুলি সাময়িকভাবে ব্যক্তির কাছে অজ্ঞাত হলেও চেষ্টা করলে সেগুলিকে সচেতন স্তরে আনা যায়।

অচেতনের অধিবাসী

অচেতনেব অধিবাসীদেব প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ফ্রয়েড দেখলেন যে সেখানে প্রধানত এমন কতকগুলি মৌলিক প্রবণতা বাস করে যেগুলি সাধাবণত
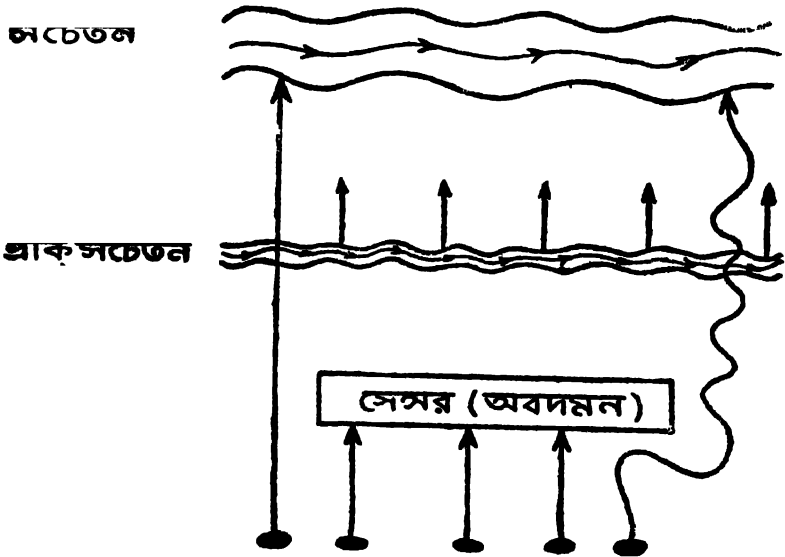
[অচেতন স্তর থেকে অবদমিত কামনাবাসনাগুলি সচেতনে উঠে আসার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে চলে। তাদের বাধা দেয় সেন্সর। সময় সময় সেন্সরকে এড়িয়ে অবদমিত কোন বাসনা সচেতন স্তরে গিয়ে পৌঁছয়]

১। পৃঃ ৬৭—পৃ. ৭৭

যৌনধর্মী। তাছাড়া আমাদের শিক্ষা ও সমাজ যে সব নৈতিক ও আচরণমূলক আদর্শ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দিয়েছে সেই সব আদর্শের সঙ্গে এই প্রবণতাগুলির প্রচণ্ড বিরোধ রয়েছে। এই প্রবণতাগুলির অধিকাংশই পুরোপুরি প্রবৃত্তিমূলক এবং জন্ম থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। এগুলি অচেতনের বাসিন্দা হলেও স্থির বা নিষ্ক্রিয় হয়ে সেখানে বাস করে না। এরা সব সময়ই চেষ্টা করে অচেতন স্তর থেকে সচেতন স্তরে উঠে আসতে এবং ব্যক্তির সচেতন আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজেদের পরিতৃপ্তি পেতে। কিন্তু ব্যক্তির অহংসত্তা বাস্তবের কঠিন নিয়ম-কানুনের ভয়ে এই প্রবণতাগুলিকে উপরে উঠতে দেয় না এবং যখনই তারা উপরে ওঠার চেষ্টা করে তখনই জোর করে তাদের অচেতনে অবদমিত করে রাখে।

অধিসত্তা ও অবদমন (Super Ego and Repression)

এই ইচ্ছা বা কামনাগুলি প্রবৃত্তিজাত এবং প্রকৃতিতে যৌনধর্মী হওয়ার জন্য সেগুলির সঙ্গে আমাদের সমাজের অনুশাসনের কোন সঙ্গতি ত নেইই বরং সেগুলি প্রচণ্ডভাবে সমাজবিরোধী। সেজন্য বহু সময় এই ধরনের কামনাগুলিকে অহম্‌কে বলপূর্বক অচেতনে দাবিয়ে রাখতে হয়। এই প্রক্রিয়াটি মনোবিজ্ঞানে অবদমন (Repression) নামে পরিচিত। যদিও এই সব অবাঞ্ছিত কামনা-বাসনাগুলিকে আমাদের অহম্‌ই অচেতনে অবদমিত করে তবু সে সম্বন্ধে প্রকৃত নির্দেশ ও অনুশাসন দেবার কর্তা হল অধিসত্তা (Super Ego)। এই অধিসত্তা হল ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ প্রভৃতির অচেতন মাপকাঠি। এটির জন্ম হয়ে থাকে শৈশবের ঈডিপাস কমপ্লেক্স থেকে এবং এর কাজ হল অহমের সমস্ত কাজের বিচার ও সমালোচনা করা। অচেতনের কোন্ ইচ্ছাটিকে তৃপ্তি দিতে হবে এবং কোন্‌টিকে দিতে হবে না সে সম্বন্ধে অধিসত্তার নির্দেশ অনুসারেই অহম্ কাজ করে থাকে।

ইদম্ (Id)

ফ্রয়েড অচেতনের এই অবাঞ্ছিত বাসনাসমষ্টির নাম দিয়েছেন ইদম্ (Id)। ইদম্ আমাদের নগ্ন ও অতৃপ্ত কামনা-বাসনার প্রতিমূর্তি। ইদম্ কোন ন্যায়-অন্যায় বোঝে না, কোন নীতি-দুর্নীতির ধার ধারে না। ইদমের কাছে একটি মাত্র নীতিই জানা আছে। সেটি হল সুখভোগের নীতি (Pleasure Principle)। ইদমের একমাত্র কাম্য হল তার বাসনার পরিতৃপ্তি। সেই বাসনার পরিতৃপ্তিতে ব্যক্তির কোন ক্ষতি হল কিনা সেটা ইদমের দ্রষ্টব্য নয়। কিন্তু অহমের পক্ষে এই

নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। অহম্ বাস্তবের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাস্তবের কঠোর অনুশাসন না মেনে চললে কি ধরনের অসুবিধা ও বিপর্যয় ঘটতে পারে তা সে তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জানে। তাকে বাঁচতে হলে বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে চলতেই হবে এবং আমাদের সভ্য সমাজের বিচারে যে আচরণ অনুমোদিত একমাত্র সেই আচরণই সে সম্পন্ন করতে পারে। এইজন্য ইদমের সুখভোগের নীতি সে অনুসরণ করতে পারে না। তার নীতি হল বাস্তবের নীতি (Reality Principle)। বাস্তবের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করা তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য। মনে রাখতে হবে অহম্ ও ইদম্ একই সত্তার দুটি অংশ। ইদমের কামনার তৃপ্তি মানে অহমেরই তৃপ্তি। কিন্তু তবুও অহম্ ইদমের ইচ্ছামত তার কামনা বাসনাগুলির তৃপ্তি দিতে পারে না। তাকে নিয়ন্ত্রিত করে বাস্তবের কঠোর অনুশাসন।

সেন্সর (Censor)

অচেতনের কামনাগুলি যাতে সচেতন স্তরে আবির্ভূত না হয় তার জন্য আর একটি শক্তি সর্বদা অচেতন পাহারাদারের কাজ করে। ফ্রয়েড এই শক্তিটির নাম দিয়েছেন সেন্সর (Censor)। সেন্সরের কাজ হল অচেতনের তৃপ্তিপ্রার্থী কামনাগুলিকে পরীক্ষা করা এবং দেখা যে কোনও অসামাজিক চিন্তা যেন সচেতন স্তরে গিয়ে হাজির না হয়। সেন্সর প্রকৃতপক্ষে অবদমনেরই আর একটি রূপ।

কেবলমাত্র সহজাত ইচ্ছা বা কামনা নিয়েই অচেতন গঠিত নয়। ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে মাঝে মাঝে এমন সব ইচ্ছা বা চিন্তার উদয় হয় যেগুলি এতই অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত প্রকৃতির যে সেগুলিকে সে তার সচেতন মন থেকে নির্বাসিত করে অচেতন মনে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। এই ইচ্ছা ও কামনাগুলি কালক্রমে অচেতনের অধিবাসী হয়ে দাঁড়ায় এবং সচেতন মনে উঠে এসে তৃপ্তি পাবার প্রতীক্ষায় থাকে।

অচেতনের তৃতীয় অধিবাসী হচ্ছে এমন কতকগুলি প্রবৃত্তি এবং প্রবণতা যা আমরা আমাদের বহু প্রাচীন পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকি। এগুলিকে জাতিগত অচেতন (Racial Unconscious) বলা হয়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং (Jung) এই জাতিগত অচেতনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর নাম দিয়েছেন আর্কিটাইপ বা আদিরূপ (Archetype)।

আদিম পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বহু ধারণা, সংস্কার, ইচ্ছা, বিশ্বাস ও প্রবণতা

ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে বর্তমান মানুষের মনের মধ্যে এসে সঞ্চিত হয়েছে। সেগুলির রূপ এতই অদ্ভুত, অসামাজিক ও বীভৎস যে সেগুলিকে আমরা আমাদের বর্তমান সভ্য জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারি না। ফলে আমরা কোনরূপেই সেগুলিকে সচেতন মনে স্থান দিতে পারি না। সেই জন্য তারা আমাদের জন্ম থেকেই অচেতনে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

মানসিক নির্ধারণ (Psychic Determinism)

অচেতনে নিহিত কামনা বাসনার অস্তিত্ব থেকেই ফ্রয়েড তার প্রসিদ্ধ মানসিক নির্ধারণের তত্ত্বটি (Theory of Psychic Determinism) গঠন করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের সচেতন মনের কোন চিন্তাই নিজে থেকে বা নতুন হয়ে জন্মায় না। আমাদের সমস্ত চিন্তাই অচেতনের গভীর স্তরে যে সব মানসিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় সেগুলির দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে আমাদের প্রতিটি আচরণকেই প্রবৃত্তিমূলক এবং অচেতন প্রবণতা, অর্জিত অভ্যাস এবং পরিবেশের উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বহুবিধ শক্তির সামগ্রিক ফলবিশেষ বলে বর্ণনা করা যায়। যেখানে মনের সচেতন স্তরে কোন আচরণের উদ্দেশ্য বা কারণ পাওয়া যাবে না সেখানে বুঝতে হবে যে আচরণটির প্রকৃত উদ্দেশ্য বা কারণ নিহিত আছে অচেতন স্তরে।

প্রায়ই দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি অসতর্কভাবে হঠাৎ কিছু বলে ফেলে বা অদ্ভুত কোন ভুল করে বসে। এই অসতর্ক উক্তি বা অদ্ভুত কাজটির কোনও ধারণা বা ব্যাখ্যা তার সচেতন মনে পাওয়া যায় না। তখন এই কাজগুলিকে অর্থহীন বা উদ্দেশ্যহীন বলে মনে করলে ভুল হবে। ফ্রয়েড বহু পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণ করে গিয়েছেন যে এই ধরনের আকস্মিক কাজগুলির পেছনে কোন না কোনও অচেতন কামনা নিহিত থাকে। বস্তুত আমাদের অসতর্ক উক্তি বা ভুল কাজেরও স্বাভাবিক উক্তি বা কাজের মত কোন বিশেষ একটি লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যদিও ঐ উক্তি বা কাজটি তার যথার্থ লক্ষ্যে পৌছতে পারে না তবুও ব্যক্তির সেই মুহূর্তের সচেতন উদ্দেশ্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়ে আংশিক তৃপ্তিলাভ করে।

মনোবিকারের রোগীদের ক্ষেত্রে মানসিক নির্ধারণের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মনোবিকারের রোগীরা যত রকম অস্বাভাবিক আচরণ করে সেগুলি বাহ্যত উদ্দেশ্যবিহীন বলে মনে হলেও তার কোনটিই প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যবিহীন নয়।

তাদের প্রতিটি আচরণই কোন না কোন অচেতন উদ্দেশ্যের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে। আনা বলে একটি মেয়ে বহুদিন ধরে তার রোগাক্রান্ত শয্যাশায়ী পিতার সেবাশুশ্রূষা করে আসছিল। তার নিষ্ঠা ও পিতৃভক্তি সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে সে যে হাত দিয়ে বাবার সেবা করত সেই হাতদুটি পক্ষাঘাতে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। পরীক্ষা করে জানা গেল যে আনা হিষ্টেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং তার হাতের পক্ষাঘাতের রোগটি হিষ্টেরিয়া থেকেই জন্মেছে। প্রকৃতপক্ষে আনা দীর্ঘদিন পিতার সেবা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং মনে মনে পিতার সেবার ভার থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। অথচ পিতার প্রতি ভালবাসা ও সামাজিক প্রথার চাপে সে তার সচেতন স্তরে সেই ইচ্ছাকে স্থান দিতে পারে নি। ফলে এই অবদমিত ইচ্ছাটি সহজ ও স্বাভাবিক রূপে অভিব্যক্ত হতে না পেরে তার মধ্যে মনোবিকারের সৃষ্টি করেছিল। তার হাতের এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থা তার সেই অবদমিত ইচ্ছারই একটি অভিব্যক্তি। এইভাবে আনা তার পিতার সেবা থেকে মুক্তি পাবার অতৃপ্ত বাসনাটির পরিতৃপ্তি হিষ্টেরিয়া রোগের মধ্যে দিয়ে আদায় করে নিল। এইজন্যই ফ্রয়েড মনোবিকারের প্রতিটি লক্ষণকে চেতন ও অচেতনের মধ্যে একটি মাঝামাঝি সিদ্ধান্ত বা বোঝাপড়া বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে যখনই এই বিশেষ অবদমিত ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যটিকে তার অচেতনের অবস্থান থেকে সচেতন স্তরে তুলে আনা যাবে তখনই মনোবিকারের অবসান ঘটবে।

মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association)

ফ্রয়েডের সহকর্মী ব্রুয়ার নিছক কথা বলার মধ্যে দিয়ে তাঁর রোগীদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা কামনাটি উদ্ঘাটন করতেন। পুরাতন অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে এইভাবে আবার জাগিয়ে তোলার নাম দেওয়া হয়েছে মনোবৈজ্ঞানিক বিরেচন (Psychocatharsis)। আর সেই তিক্ত বা অপ্রিয় স্মৃতিটির বর্ণনার সময় প্রক্ষোভের যে উন্মোচন ঘটত ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন এ্যাব্রিকসান (Abreaction)। এই তথ্য থেকেই ফ্রয়েড মনোবিকারের চিকিৎসায় তাঁর অধুনা প্রসিদ্ধ মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association) পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন।

প্রতিরক্ষণ কৌশল বা সঙ্গতিবিধান কৌশল (Defence Mechanism or Adjustment Mechanism)

যদিও অচেতন স্তর ব্যক্তির মনের মধ্যে অবদমিত হয়ে বাস করে এবং তার

অবস্থিতি সচেতন মন থেকে অনেক নীচে তবুও অচেতন সব সময়েই অচেতন অবস্থায় থাকে না। অচেতনের কামনা বাসনাগুলি দুটি উপায়ে সচেতন স্তরে অভিব্যক্ত হতে পারে। প্রথমত, ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থাতেই সেন্সরের কঠিন পাহারা কৌশলে এড়িয়ে অচেতনের কামনাটি ব্যক্তির অহমের কাছ থেকে তার কাম্য পরিতৃপ্তি আদায় করতে পারে। এই সময়ে ব্যক্তির আচরণ কখনই সহজ ও স্বাভাবিক থাকে না এবং প্রত্যাশিত স্বাভাবিক রূপ থেকে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। যখন অচেতনে নিহিত কোন কামনার দাবী প্রচণ্ড হয়ে ওঠে এবং অহমের পক্ষে সে দাবী পূর্ণ না করে উপায় থাকে না তখন অহম্ তার সে দাবী তৃপ্ত করার জন্য কতকগুলি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। অচেতনের কামনাটি সোজা পথে সেন্সরের কঠোর পাহারা অতিক্রম করতে পারে না। তার জন্য সে নিজের আসল রূপ বদলে ছদ্মরূপ ধারণ করে এবং সেন্সরকে কৌশলে অতিক্রম করে। তার ফলে এই বিশেষ কামনাটি যখন ব্যক্তির সচেতন স্তরে গিয়ে দেখা দেয় তখন তার পূর্বেকার অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক চেহারাটি আর থাকে না। এই নির্দোষ বেশ ধারণের ফলে অহমেরও আর ঐ বাসনাটিকে তৃপ্তি দিতে কোনও আপত্তি থাকে না। কিন্তু বাহ্যত কামনাটি নির্দোষ দেখালেও প্রকৃতপক্ষে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি অপরিবর্তিতই থাকে এবং একইভাবে সচেতন স্তরে উঠে আসার ফলে তার উদ্দেশ্যটির সম্পূর্ণ তৃপ্তি না হলেও আংশিক তৃপ্তি ঘটেই থাকে। ইদমের কামনাগুলিকে তৃপ্তি দেওয়ার এই কৌশলগুলিকে প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism) কিংবা সঙ্গতিবিধান কৌশল (Adjustment Mechanism) নাম দেওয়া হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে এই ধরনের আচরণগত কৌশল আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতি নিয়তই প্রয়োগ করে থাকি। এই প্রতিরক্ষণ বা সঙ্গতিবিধান কৌশলগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন—

প্রতিক্ষেপণ (Projection)—নিজের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়া। অপব্যাখ্যান (Rationalisation)—নিজের কোনও অনুচিত আচরণকে বিশেষভাবে তৈরী যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা। উন্নীতকরণ (Sublimation)—মন্দ প্রবণতাকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়া। প্রত্যাবৃত্তি (Regression)—বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ হয়ে শৈশবের আচরণে

১। পৃঃ ১৩৮—পৃঃ ১৪৩

ফিরে যাওয়া। রূপান্তরকরণ (Conversion)—অবদমিত চিন্তা বা কামনার শারীরিক লক্ষণের রূপে প্রকাশ পাওয়া। দিবাস্বপ্ন (Day-dreaming)—কল্পনার সাহায্যে অতৃপ্ত চাহিদার তৃপ্তি দান ইত্যাদি।

স্বপ্ন—অচেতনে পৌঁছবার রাজপথ (Royal Road to Unconscious)

অচেতনের বহিঃপ্রকাশের আর একটি অতি কার্যকর পন্থা হল স্বপ্ন। মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার সচেতন মন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অচেতনের পাহারাদার যে সেন্সর তারও পাহারা তখন শিথিল হয়ে ওঠে। ফলে তখন অচেতনের কামনাগুলির পক্ষে সেন্সরের পাহারাকে এড়িয়ে যাওয়া অনেক সহজ হয়ে ওঠে এবং অচেতনের সমস্ত নিরুদ্ধ চিন্তা ও ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। এই কারণে ফ্রয়েড স্বপ্নকে 'অচেতনে পৌঁছবার রাজপথ' (Royal road to unconscious) বলে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক মনশ্চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্বপ্নকে ব্যক্তির মনের অন্তর্নিহিত গুপ্ত ইচ্ছা পরিতৃপ্তির একটি বড় মাধ্যম বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং বর্তমানে ব্যক্তির স্বপ্নের বিশ্লেষণ থেকে তার মনের অবদমিত কামনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করার প্রথাটি মানসিক রোগের চিকিৎসার একটি প্রধান পন্থা বলে পরিগণিত হয়েছে।

স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির অতৃপ্ত চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে। অচেতনের অবদমিত কামনাটি সচেতনে আসতে পারলেই তার আংশিক তৃপ্তি হয়। জাগ্রত অবস্থায় সেন্সরের কড়া পাহারা থাকার ফলে এই তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু রাত্রে সুপ্ত অবস্থায় সেন্সর দুর্বল হয়ে পড়লে অচেতনের চিন্তাগুলি স্বপ্নের রূপ নিয়ে সচেতন স্তরে আবির্ভূত হয় এবং নিজেদের কাম্য পরিতৃপ্তি লাভ করে। তবে সেগুলি তখন তাদের নিজস্ব রূপে আর থাকে না, নানা রকম ছদ্মবেশ ধারণ করে। এই ছদ্মবেশ ধারণের বিভিন্ন পন্থা আছে যেমন—সংক্ষিপ্তকরণ (Condensation), স্থানচ্যুতি (Displacement), নাটকীয়তা (Dramatisation), প্রতীকধর্মিতা (Symbolisation) প্রভৃতি। এইসব কৌশলের সাহায্যে অচেতনের চিন্তাগুলি স্বপ্নের মাধ্যমে নিজেদের ব্যক্ত করে থাকে। তার ফলে সোজাসুজি ভাবে স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ বোঝা সম্ভব হয় না। এই জন্যই স্বপ্ন আমাদের কাছে এত অদ্ভুত ও অর্থহীন বলে মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে স্বপ্নের দুটি অর্থ আছে। একটি ব্যক্ত অর্থ (manifest content), অপরটি নিহিত অর্থ (latent content) বা মর্মার্থ। স্বপ্নে ব্যবহৃত এই কৌশলগুলির অর্থ উদ্ঘাটিত করতে পারলে স্বপ্নের মর্মার্থও জানা

যায়। কেমন করে স্বপ্নের মর্মার্থ বিশ্লেষণ করা যায় সে সম্পর্কে ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীরা বর্তমানে বহু চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

অচেতনের মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা

(Psychology of Unconscious and Teacher)

শিশুর পালন ও তার শিক্ষাদানের প্রকৃতি আজ ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের নানা নতুন আবিষ্কারের ফলে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। শিশুর প্রতি শিক্ষকের মনোভাব ও আচরণ দুইই এই অচেতনের মনোবিজ্ঞানের আধুনিক তথ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। অচেতনের আবিষ্কার কিভাবে প্রচলিত শিক্ষার পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলে দিয়েছে সে সংক্রান্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্যের বিবরণ দেওয়া হল।

১। আচরণ সমস্যার নতুন ব্যাখ্যা

পূর্বে শিশুর মন বলতে শিক্ষক একমাত্র সচেতন মনকেই বুঝতেন। তিনি মনে করতেন শিশুর কাজকর্ম ও আচরণ সবই তার সচেতন মনের চিন্তা বা ইচ্ছা থেকে প্রসূত। ফলে শিক্ষক শিশুর সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যাও যেমন তার সচেতন মনের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা দিতেন তেমনই তার আচরণের সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্যও তিনি তার এই সচেতন মনেরই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংশোধিত বা পরিবর্তিত করার চেষ্টা করতেন। উদাহরণস্বরূপ যদি একটি ছেলে মিথ্যা কথা বলত তা হলে শিক্ষক মনে করতেন যে সে তার মনের অসৎ কোন ইচ্ছা লুকোতে বা শাস্তি এড়াবার জন্য তা বলছে। কোন ছেলে যদি চুরি করত তাহলে তিনি মনে করতেন যে সে লোভের বশবর্তী হয়ে চুরি করেছে। আবার যদি কোন ছেলে ক্লাস থেকে পালাত তাহলে শিক্ষক মনে করতেন যে সে নিশ্চয় পড়াশোনায় অমনোযোগী বা অসৎসঙ্গের প্ররোচনায় পড়ায় অবহেলা করছে। এইসব দুষ্কৃতিকারীদের সংশোধনের জন্য সেই রকম উপযোগী পন্থাও তিনি অবলম্বন করতেন। অর্থাৎ যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে তার মনের অসৎ ইচ্ছাকে তিনি দমন করার বা তার মনের ভয় দূর করার চেষ্টা করতেন। যে ছেলে চুরি করত তাকে কেমন করে লোভ দমন করতে হয় তা শিক্ষা দিতেন বা যাতে সে চুরি করার সুযোগ না পায় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতেন। তেমনই যে ছেলে ক্লাস পালাত সে ছেলে যাতে ক্লাস পালাবার সুযোগ আর না পায় সেদিকে শিক্ষক সতর্ক দৃষ্টি দিতেন। শিক্ষক তার এই সংশোধনমূলক প্রচেষ্টায় দুটি বস্তুর সাহায্য

ব্যাপকভাবে নিতেন। সে দুটি হল শাস্তি এবং পুরস্কার। যাতে ছেলেমেয়েদের দুষ্কৃতির দিকে প্রবণতা না দেখা দেয় এবং যাতে তারা সঙ্গত আচরণ করে সেজন্য শাস্তি এবং পুরস্কারকে অস্ত্ররূপে সর্বত্রই ব্যবহার করা হত।

কিন্তু যেদিন থেকে মনোবিজ্ঞানীরা অচেতন মনের অস্তিত্বের কথা জানতে পারলেন সেদিন থেকেই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে শিশুর আচরণের যে ব্যাখ্যা এতদিন তাঁরা দিয়ে এসেছেন সে ব্যাখ্যা বহু ক্ষেত্রেই ভুল ও অসম্পূর্ণ। ব্যক্তির আচরণের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক ব্যক্তির সচেতন মন নয়, তার অচেতন মনই। শিশুর সচেতন মনের কোন চাহিদা বা ইচ্ছা পূর্ণ না হলে তা লুপ্ত বা বিনষ্ট হয়ে যায় না। তা অবদমিত হয়ে বাস করে তার অচেতন মনে এবং সেটি সেখানে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তার সচেতন মনে প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু তা তার সচেতন আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে তার সচেতন চিন্তাধারা, আচরণ, মনোভাব প্রভৃতির প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে।

যেমন, যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে সে যে নিছক অসৎ ইচ্ছার জন্য বা শাস্তির ভয়ে তা বলছে এমন না হতেও পারে। হয়ত তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা স্বাভাবিক পথে তৃপ্ত না হওয়ায় সে মিথ্যা কথা বলে অপরের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। তেমনই যে ছেলে চুরি করছে সেও হয়ত তার অতৃপ্ত সঞ্চয়ের চাহিদা কিংবা প্রত্যাখ্যাত স্বীকৃতির চাহিদাকে তৃপ্ত করার জন্য চুরি করছে। যে ছেলে ক্লাস পালাচ্ছে সেও হয়ত ক্লাসে তার কৌতূহল তৃপ্তির যথেষ্ট উপাদান না পাওয়ায় বাইরে বেরিয়ে পড়ছে তার কৌতূহল তৃপ্তির জন্য। এই সব ছেলেমেয়েদের আধুনিক মনোবিজ্ঞানে অপসঙ্গতিসম্পন্ন (maladjusted) শিশু বলা হয়ে থাকে। এই সব শিশু স্বাভাবিক পন্থায় নিজেদের চাহিদা তৃপ্ত করতে না পেরে অস্বাভাবিক পথ বেছে নিয়েছে সেই চাহিদার পরিতৃপ্তি পেতে। এতদিন এই ধরনের ছেলেমেয়েদের আচরণের ব্যাখ্যা গতানুগতিক পন্থাতেই দিয়ে আসা হয়েছে এবং তাদের সম্পূর্ণ সংশোধনের চেষ্টাও হয়েছে বাহ্যিক উপায়ে। কিন্তু সে চিকিৎসা হয়ে এসেছে নিছক লক্ষণভিত্তিক (symptomatic) অর্থাৎ সেখানে কেবলমাত্র তাদের লক্ষণগুলি দূর করার চেষ্টাই হয়েছে প্রকৃত রোগ নিরাময় করার চেষ্টা হয়নি। যে ছেলে ক্লাস থেকে পালাচ্ছে বা চুরি করছে তাকে কড়া শাসনে রাখলে সে হয়ত ঐ কাজগুলি আর করতে পারবে না, কিন্তু তাতে তার চাহিদার তৃপ্তি হবে না বা তার মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর হবে না। ফলে তার অতৃপ্ত চাহিদা অপর কোনও অস্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু বর্তমানে শিশুর অচেতন মন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করায় শিক্ষকগণ শিশুদের সমস্যামূলক আচরণের প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করতে পারেন। শিশুর অপসঙ্গতির যে মূল কারণটি তার অচেতনের গভীর তলদেশে নিহিত থাকে যতক্ষণ সেটির চিকিৎসা না করা হচ্ছে ততক্ষণ তার অপসঙ্গতি দূর হবে না। ফলে আজকাল শিশুর সমস্যামূলক আচরণের চিকিৎসা হয়ে দাঁড়িয়েছে মূলগত, নিছক লক্ষণগত নয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে শিশুকে আজকাল আর শাস্তি-পুরস্কারের সাহায্যে বা নৈতিক বিধিনিষেধের কড়া বাঁধনে বেঁধে সংশোধন করার চেষ্টা করা হয় না, তাদের সমস্যাগুলির প্রকৃত স্বরূপ চিকিৎসকের দৃষ্টি নিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয় এবং রোগের মূল কারণটি খুঁজে বার করে সেটি দূর করার ব্যবস্থা করা হয়। এই কারণে আজকাল সমস্ত প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য শিশু পরিচালনাগার (Child Guidance Clinic) স্থাপন করা হয়েছে। এই পরিচালনাগারে শিশুদের মানসিক সমস্যাগুলির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করে সেগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে চিকিৎসা করার আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া স্কুলের পরিবেশে যাতে শিশুদের বিভিন্ন মৌলিক চাহিদাগুলি তৃপ্তি লাভ করে এবং যাতে শিশু সুসঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে বেড়ে ওঠে তার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে।

বস্তুত অচেতন মনের আবিষ্কার মানব মনের বহু শতাব্দীর বন্ধ দরজা আজ খুলে দিয়েছে। শিক্ষক আজ শিশু মনের বহু জটিল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। মানুষের বহু আচরণই বাহ্যত নির্দোষ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কোন অন্তর্নিহিত অসামাজিক চাহিদা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই সেগুলি জন্মে থাকে। অনেক সময় অচেতনে অবদমিত কমপ্লেক্সও আমাদের বহু আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই আচরণগুলিকে মনঃসমীক্ষণে প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism) বা সঙ্গতিবিধান কৌশল (Adjustment Mechanism) বলা হয়। শিশুর কোন আচরণকেই আজকাল আর তার বাহ্যিক লক্ষণ বা বাহ্যিক স্বরূপের দ্বারা বিচার করা হয় না। ঐ আচরণের অন্তর্নিহিত গুপ্ত কারণ বা উদ্দেশ্যটিকে খুঁজে বার করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

২। মনোবিকারের কারণ নির্ণয়

অচেতনের মনোবিজ্ঞান যেমন এক সাধারণ সমস্যামূলক আচরণের ব্যাখ্যা দেয়, তেমনই গুরুতর মনোবিকারের কারণের সন্ধান দিয়ে থাকে।

ফ্রয়েডের অসংখ্য পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মনোবিকারের কারণ নিহিত থাকে ব্যক্তির অচেতনে। লিবিডোর সংবন্ধন, লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি, শৈশবকালীন আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা (traumatic experience) ইত্যাদি মানসিক ঘটনাগুলি যে মনোবিকারের প্রকৃত কারণ, এ সত্যের সঙ্গে শিক্ষক আজ পরিচিত হয়েছেন। ফলে শিশুর জীবনে যাতে এই ধরনের কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে সেদিকে তিনি যত্ন নিতে পারেন।

শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিচার তার অচেতন মনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। অচেতনের অধিবাসী অসংখ্য অসামাজিক কামনাবাসনার তৃপ্তির অভ্যন্তরীণ তাগাদা এবং বাস্তব জগতের অনুশাসন ও দাবীর মধ্যে যতটুকু ও যেভাবে ব্যক্তি সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে সেইভাবেই তার ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। শিক্ষকের এই প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু জানা থাকলে তিনি উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে সুষ্ঠু বিকাশের পথে পরিচালিত করতে পারেন।

৩। শৈশবের গুরুত্ব

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের সব চেয়ে বড় দান হল শৈশবের উপর অসীম গুরুত্ব আরোপ করা। আগে মনে করা হত ব্যক্তির পরিণত জীবনে শৈশবের বিশেষ কোন প্রভাব থাকে না। কিন্তু বর্তমানে মনঃসমীক্ষণের নানা গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শৈশবই জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল এবং ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার অধিকাংশ সংগঠনটিই প্রস্তুত হয়ে যায় তার জীবনের প্রথম কয় বছরের মধ্যে। অতএব শিশু তার শৈশবে যাতে কোনরূপ আঘাতাত্মক (traumatic) অভিজ্ঞতা না পায় এবং তার ক্রমবিকাশ স্বাস্থ্যময় ও অভীষ্ট পথ ধরে এগোতে পারে সেটা দেখাই শিক্ষার প্রধান কাজ।

৪। মানসিক নির্ধারণ-বাদ

মনঃসমীক্ষণের দেওয়া মানসিক সংগঠনের পরিকল্পনাটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে অচেতনের পরিকল্পনাটি মানব আচরণের ব্যাখ্যায় যুগান্তর এনেছে। ব্যক্তির আচরণ কেবলমাত্র তার সচেতন মনের চিন্তা, ইচ্ছা এবং ধারণা থেকেই জন্মায় না বরং তার প্রতিটি আচরণের চরম নির্ণায়ক ও নির্ধারক হল তার অচেতন মনের অদৃশ্য শক্তিগুলি—এই অভিনব তথ্যটি আজ শিক্ষকের হস্তগত হওয়ায় শিক্ষার পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এই তত্ত্বটির নাম দেওয়া হয়েছে মানসিক নির্ধারণবাদ (Theory of

Psychic Determinism)। এই নতুন তত্ত্বটির পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর আচরণের স্বরূপ নির্ণয় ও সংব্যাখ্যান সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করেছে।

৫। মানসিক দ্বৈততা

মনঃসমীক্ষণের আর একটি অবদান হল মানব মনের চিরন্তন দ্বৈততাকে (duality) প্রকাশিত করা। মানুষের মনে বহু সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শক্তি পাশাপাশি থেকে মানুষের সমস্ত আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এরস (Eros) হল জীবন ও ভালবাসার শক্তি। তার পাশেই রয়েছে থ্যানাটস (Thanatos), ধ্বংস ও মৃত্যুর শক্তি।[১] ইদম্ অন্ধ ও যুক্তিহীন, নগ্ন কামনার প্রতিমূর্তি, তার পাশে থেকে কাজ করছে অহম্—আমাদের বাস্তব সচেতন মন ও বিচারবুদ্ধির বাহক।[২] অতএব মানুষের আচরণের মধ্যে বৈষম্য ও স্ববিরোধিতা থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং এই বিপরীতধর্মী প্রবণতাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই হচ্ছে শিক্ষার কাজ।

৬। শৈশবকালীন যৌনতা

শৈশবকালীন যৌনতার (Infantile sexuality) তত্ত্বটি মানবজ্ঞানভাণ্ডারে মনঃসমীক্ষণের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। শৈশবে শিশুর ব্যক্তিসত্তানির্ণয়ে যৌনশক্তির প্রভাবই যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান, এ তথ্যটি প্রথম মনঃসমীক্ষণই প্রকাশ করে। অবশ্য ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যানে মানবের আচরণের সকল স্তরেই যৌনতাই একমাত্র শক্তি। এ মতবাদটি আজ সর্বজনস্বীকৃত না হলেও, মানব আচরণের নির্ণায়ক রূপে যৌনতা যে একটি প্রধান শক্তি এ কথাটি আজ কাল সকলেই স্বীকার করে থাকেন। এই জন্যই আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর যৌন চাহিদাকে আর অবহেলা করা হয় না এবং নানা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তার তৃপ্তির আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই একই কারণে যৌনশিক্ষাও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে।

৭। আবেগমূলক শক্তি

মনঃসমীক্ষণে প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, অনুভূতি প্রভৃতি শক্তির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাধারণ প্রচলিত মনোবিজ্ঞানে যুক্তিমূলক ইচ্ছা, অভ্যাস, রিফ্লেক্স প্রভৃতিকেই আচরণের প্রধান উৎস বলে মনে করা হয়। কিন্তু মনঃসমীক্ষণের ব্যাখ্যায় ব্যক্তির প্রকৃত আচরণ-নির্ণয়ে এগুলির বিশেষ ক্ষমতা নেই এবং

১। পৃঃ ৬৬ ২। পৃঃ ৭০—পৃঃ ৮০

বাস্তব ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ আবেগমূলক শক্তিগুলিই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে পরাজিত করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

৮। অচেতন প্রেষণা

আমাদের আচরণের পেছনে যে প্রেষণা বা ইচ্ছা থাকে তার প্রকৃত স্বরূপ যে প্রায়ই আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে এই তথ্যটি অচেতনের মনোবিজ্ঞানের আর একটি অবদান। এর অর্থ হল যে আমাদের বহু আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় অচেতন প্রেষণার (Unconscious motivation) দ্বারা। যেমন প্রতিক্ষেপণ, অপব্যাখ্যান প্রভৃতি প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির ক্ষেত্রে আমাদের আচরণের প্রকৃত উৎস নিহিত থাকে আমাদের অচেতনের কোন অজ্ঞাত কামনায়।

৯। অবদমন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব

অবদমনের তথ্যটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক অনুশাসন, মাতাপিতার নিয়ন্ত্রণ, শাস্তির ভয় ইত্যাদি কারণে শিশু তার ইচ্ছাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে তার অচেতনে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে এবং তার শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এই জন্য সুশিক্ষার প্রথম কর্মসূচী হল শিশুর ইচ্ছাকে যতদূর সম্ভব পূর্ণ করাব ব্যবস্থা করা যাতে প্রতিকূল পরিবেশের চাপে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয় তা দেখা।

১০। যৌন-শিক্ষা

মনঃসমীক্ষণের আধুনিক আবিষ্কার থেকেই সাম্প্রতিক কালে যৌনশিক্ষাকে প্রাপ্তযৌবনদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার স্বপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিয়েছে। সব দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ উপলব্ধি করেছেন যে যৌনতা শিশুর ব্যক্তি-সত্তার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। সেই জন্য যৌনমূলক শিক্ষা দেওয়া শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্নাবলী

1. Write an essay on :—Unconscious and its bearing on the child's education.

Ans. (পৃঃ ১১২—পৃঃ ১২৫)

2. Show how the psychology of the unconscious can explain some of the strange behaviour of the pupils.

3. Write an essay on :—The influence of the psycho analytic school of psychology upon educational practices

4. How has the psychology of unconscious helped teacher in understanding the behaviours of the child.

5. Write an essay on--Psycho-analysis for school children.

Ans. (পৃঃ ১১৯—পৃঃ ১২৫)

বার

অন্তর্দ্বন্দ্ব (Conflict)

মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার প্রধানতম লক্ষণ হল অন্তর্দ্বন্দ্ব। মনের বিভিন্ন প্রবণতা ইচ্ছা, আবেগ ইত্যাদির মধ্যে যখন সামঞ্জস্য বজায় থাকে তখন ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি দেখা দেয় না। এই প্রক্ষোভমূলক সমতাই হল মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আর কোন কারণে যদি মনের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে বৈষম্য দেখা দেয় তখনই মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তির মধ্যে নানা রকম আচরণসমস্যার সৃষ্টি হয়। অন্তর্দ্বন্দ্ব হল এই ধরনের মনের সমতানাশক একটি ঘটনা।

যখন মনের দুটি ইচ্ছা পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠে কিংবা যখন ব্যক্তির ইচ্ছা এবং বাইরের জগতের শক্তিগুলির মধ্যে বিরোধিতা দেখা দেয় তখন ব্যক্তির মনে যে অপ্রীতিকর প্রক্ষোভমূলক মনোভাব সৃষ্টি হয় তাকেই অন্তর্দ্বন্দ্ব বলা হয়ে থাকে। ব্যক্তির মধ্যে যখন দুটি ইচ্ছা পরস্পরবিরোধী হয় তখন দুটি ইচ্ছাকেই একসঙ্গে তৃপ্তি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না এবং তার ফলেই তার মধ্যে স্বভাবত একটি সমস্যা দেখা দেয়। সেই সমস্যাটির সমাধান করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে ব্যক্তির মনে অপ্রীতিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ না সে এই দুটি ইচ্ছার একটিকে ত্যাগ করতে পারছে ততক্ষণ তার অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকে এবং তার মানসিক সমতাও ব্যাহত হয়। তেমনি আবার যখন ব্যক্তির ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তবের বিরোধিতা দেখা দেয় তখনও ব্যক্তি তার ইচ্ছাকে তৃপ্ত করতে পারে না এবং তার ফলে তার মধ্যে অতৃপ্তিজনিত অপ্রীতিকর মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

ফ্রয়েড এবং অন্যান্য মনঃসমীক্ষণবাদীদের মতে অচেতন মনের চাহিদাগুলির সঙ্গে তার অহংসত্তার সংঘর্ষ দেখা দেয়। তার ফলে তার অচেতন স্তরে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তবে এ অন্তর্দ্বন্দ্ব অচেতনেই নিহিত থাকে এবং ব্যক্তি তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। কিন্তু এই অচেতন দ্বন্দ্ব যদিও ব্যক্তির সচেতন মনে প্রকাশিত হয় না, তবু তা ব্যক্তির সচেতন আচরণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব প্রভৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

অতএব এদিক দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বকে আমরা দু'শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা, সচেতন অন্তর্দ্বন্দ্ব (Conscious conflict) এবং অচেতন অন্তর্দ্বন্দ্ব

(Unconscious conflict)। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে সত্যকারের অন্তর্দ্বন্দ্ব একমাত্র অচেতনেই ঘটে থাকে। অর্থাৎ অন্তর্দ্বন্দ্ব সবসময়েই অচেতনধর্মী।

পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টায় প্রতিটি শিশুর মধ্যে এমন কতক-গুলি ইচ্ছা জন্মায় যার সবগুলিকে তৃপ্তি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। শিশু যদি মনে করে যে কোন বিশেষ বাধার (যা সত্যকারের হতে পারে আবার কাল্পনিকও হতে পারে) জন্য তাব ইচ্ছাটি পূর্ণ হচ্ছে না তাহলে তার মধ্যে একটি প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আর এই ইচ্ছাব অতৃপ্তির জন্য সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তা থেকে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগে। এই ধরনের বাস্তবের সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত এবং তার ফলে ইচ্ছার অতৃপ্তি পশু থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তি সকলেব জীবনেই প্রতি নিয়ত ঘটছে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে অতি অল্প ক্ষেত্রেই সত্যকারের অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রায়ই পরস্পরবিরোধী ইচ্ছার সম্মুখীন হতে হয় এবং তখন সেই দুটি ইচ্ছার মধ্যে একটি তাকে বেছে নিতে হয়। ছোট শিশুর ক্ষেত্রেও এরকম ঘটনা বহু ঘটে থাকে। যেমন, মাঠে গিয়ে খেলা বা ঘরে বসে পড়া কোন্‌টা সে করবে, কিংবা শিক্ষকের বক্তৃতা শোনা বা ছবির বই দেখা কোন ইচ্ছাটি সে পূর্ণ করবে ইত্যাদি। কিন্তু এই ধবনের পরস্পরবিরোধী সকল ইচ্ছাকেই মনোবিজ্ঞানে প্রকৃত অন্তর্দ্বন্দ্ব বলা হয় না। অন্তর্দ্বন্দ্ব তাকেই বলা হয় যখন কোন ইচ্ছার অতৃপ্তির ফলে ব্যক্তির মধ্যে একটি ব্যক্তিগত ব্যর্থ-তার বোধ দেখা দেয় এবং তাই থেকে তার মধ্যে প্রক্ষোভমূলক অস্থিরতা জাগে। প্রত্যেক মানুষকেই দৈনিক বহু সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতেই তাকে কোনও একটি বিশেষ পন্থাকে গ্রহণ বা বর্জন করতে হয়। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় না। যখনই ব্যক্তি তার ইচ্ছার অপূর্ণতার জন্য ব্যক্তিগত ব্যর্থতা ও প্রক্ষোভমূলক অস্থিরতা অনুভব করে তখনই তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে বলা চলে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব অতি শৈশব থেকেই দেখা দেয়। যতদিন শিশুকে নিছক শারীরিক সঙ্গতিবিধান করতে হয় ততদিন তাকে খুব বেশী অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু যে দিন থেকে সে সামাজিক হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য লোকের সঙ্গে তাকে সঙ্গতিবিধান করে চলতে হয় সেদিন থেকেই তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিতে সুরু করে। যে বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে শিশুকে খাপ খাইয়ে নিতে হয় সে পরিস্থিতির বৈচিত্র্য এবং যে সব লোকের সঙ্গে তাকে মানিয়ে চলতে হয় তাদের সংখ্যার

উপর নির্ভর করে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিমাণ ও প্রকৃতি। যতই সে বড় হয়ে ওঠে ততই তার চাহিদা সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে বেড়ে ওঠে এবং তখন সে অপরের সঙ্গে নিজের সাফল্যের তুলনা করতে সুরু করে। যদি এই তুলনার ফল অপ্রীতিকর হয় তাহলে সে তার জন্য ব্যক্তিগত ব্যর্থতাকে দায়ী করে এবং তাই থেকেই তার মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব।

অন্তর্দ্বন্দ্বকে সব সময় অস্বাভাবিক এবং অবাঞ্ছিত বলা যায় না। প্রত্যেক শিশুর ক্ষেত্রেই অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগা একটি অতি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অন্তর্দ্বন্দ্ব শিশুকে অধিকতর সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার উচ্চাশাকে বাড়িয়ে তোলে। অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাড়া কোন ব্যক্তিসত্তাই ভাল করে গড়ে ওঠে না এবং অন্তর্দ্বন্দ্বহীন ব্যক্তি সমস্ত পরিস্থিতিকেই বিনা প্রতিবাদে এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে থাকে।

বস্তুত ব্যক্তির কামনা এবং তার পরিতৃপ্তির মধ্যে যে বৈষম্য বা ব্যবধান দেখা যায় তাই থেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগে। অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকলে ব্যক্তি তার কামনার পরিতৃপ্তির জন্য কোন চেষ্টা করত না এবং তার মধ্যে উদ্যম, উচ্চাশা প্রভৃতিও দেখা দিত না।

বুদ্ধি এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব

বুদ্ধির সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি নিকট সম্পর্ক আছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে সংখ্যা এবং জটিলতা অনেকখানি বুদ্ধির মাত্রার উপর নির্ভর করে। বুদ্ধিমান শিশু অল্পবুদ্ধি শিশুর চেয়ে তার পরিবেশ সম্পর্কে অধিকতর সংবেদনশীল হয় এবং তার ফলে তার নিজের কামনা এবং পরিতৃপ্তির মধ্যে বৈষম্য সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন হয়ে থাকে। উন্নত বুদ্ধি থাকার জন্য এই ধরনের শিশুরা তাদের পরিস্থিতিগুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং অতি সহজেই নিজেদের ব্যর্থতা বা অসুবিধার কারণ নির্ণয় করতে পারে। এই কারণেই বুদ্ধিমান শিশুরা অল্পবুদ্ধি শিশুদের চেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে বেশী ভোগে।

বুদ্ধিমান শিশুদের অন্তর্দ্বন্দ্ব যেমন সংখ্যায় বেশী তেমনি তারা নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসাও তাড়াতাড়ি করতে পারে। উন্নত বুদ্ধি, বিচারশক্তি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার দ্বারা তারা তাদের বিভিন্ন সমস্যাগুলির সমাধানে অতি সত্বর পৌঁছতে পারে। এই জন্য বুদ্ধিমান শিশুদের ক্ষেত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাদের মানসিক শক্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে এবং সেগুলিকে আরও শক্তিমান করে তুলতে সাহায্য করে। অন্তর্দ্বন্দ্ব এই সব শিশুদের নতুন নতুন বিষয়ে তাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, অধিকতর জ্ঞান অর্জনের উদ্বোধক রূপে কাজ করে এবং তাদের ব্যক্তি-

সত্তাকে আত্মনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। এই সব কারণে যদিও মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব কাম্য নয় বরং অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করাই মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের লক্ষ্য তবু কিছুটা পরিমাণ অন্তর্দ্বন্দ্ব শিশুর স্বাস্থ্যময় ব্যক্তিসত্তা গঠনের জন্য অপরিহার্য। সাধারণ স্তরের অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি যদি শিশুর মধ্যে দেখা না দেয় তাহলে তার মানসিক সমতা অক্ষুণ্ণ থাকে বটে, কিন্তু কৌতূহল, শেখার ইচ্ছা, উচ্চাশা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সৃজনমূলক কর্মপ্রচেষ্টা প্রভৃতি ঈপ্সিত বৈশিষ্ট্যগুলি তার মধ্যে জাগার সুযোগ পায় না।

কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব তখনই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে যখন অনুভূতির দিক দিয়ে দ্বন্দ্বটি অতি তীব্র হয়ে ওঠে এবং শিশুর প্রক্ষোভমূলক সমতাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাছাড়া সময় সময় অন্তর্দ্বন্দ্বটির দ্রুত সমাধান করার চেষ্টায় শিশু অনুচিত ও অবাঞ্ছিত আচরণও সম্পন্ন করে। এ ক্ষেত্রেও অন্তর্দ্বন্দ্বটি শিশুর ব্যক্তিসত্তার পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এখানে অন্তর্দ্বন্দ্বের বশবর্তী হয়ে শিশু নিজের ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পরিপন্থী আচরণ সম্পন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ, অন্তর্দ্বন্দ্বের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে কোন শিশু হয়তো নিজেকে অন্যান্য শিশুর চেয়ে অক্ষম ও অকর্মণ্য বলে মনে করতে সুরু করে। তার ফলে নিজের প্রকৃত গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে তার মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় এবং পরে সে একটি আত্মকেন্দ্রিক শিশু হয়ে ওঠে এবং সস্তা ধরনের কৃতিত্ব দেখিয়ে অপরের কাছ থেকে বাহবা পেতে চেষ্টা করে। সময় সময় এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে শিশুরা আক্রমণধর্মীও হয়ে ওঠে এবং কোনরূপ শৃঙ্খলা মানতে চায় না।

যে সব শিশু শারীরিক শক্তি বা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে আর সকলের তুলনায় দুর্বল তাদের মধ্যেও এই ধরনের ক্ষতিকর অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই সব শিশু স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যবান ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলায় যোগ দেয় না বরং নিজেদের হীনতা পূরণ করার জন্য তাদের চেয়ে ছোট বা হীনবল ছেলেমেয়েদের উপর নির্যাতন করে বা এমন সব আচরণ করে যাতে নিজেদের প্রতি অপরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এ ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব উপযুক্ত শিক্ষাদানের অভাবেই ঘটে থাকে এবং সুবিবেচনার সঙ্গে এই শিশুদের পরিচালনা করলে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর থাকে না।

যৌনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব

যৌনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব শৈশবকালের একটি অতি সাধারণ ঘটনা। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে কোন না কোন যৌনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে ভোগে। যৌনমূলক

অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ হল বিকৃত যৌনসংক্রান্ত তথ্যাদির আহরণ। অতি শৈশব থেকে শিশুর মধ্যে যৌনমূলক তথ্যাদি জানার জন্য তীব্র কৌতূহল জাগে। পিতামাতা বা শিক্ষকেরা শিশুদের এই কৌতূহল কখনও মেটান না এবং প্রায়ই ভুল বা বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে থাকেন। অত্যন্ত বিবেচক পিতামাতা ও শিক্ষকেরাও এত সংক্ষিপ্ত ও ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়ে থাকেন যে তা থেকে তাদের কৌতূহল তৃপ্ত হওয়া দূরে থাকুক তাদের মনে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই শিশুরাই যখন আবার ঐ একই ব্যাপার সম্পর্কে অন্য কোন পন্থায় সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তখন তাদের মধ্যে স্বভাবতই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতির উপর তাদের একটা স্বাভাবিক বিশ্বাস থাকার জন্য তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে এবং যতই তারা ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে ততই তাদের প্রক্ষোভ আরও সুতীব্র হয়ে ওঠে। সাধারণ সমাজে যৌন শিক্ষা দেবার কোন সুব্যবস্থা না থাকার ফলে শিশুর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সহজে দূর হয় না এবং দিনের পর দিন বেড়েই চলে।

খুব ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌন কৌতূহল দেখা দেয়। বিশেষ করে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে দৈহিক পার্থক্যটা তাদের কাছে একটা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং আমাদের সমাজে তাদের এই কৌতূহল মেটানো কোন রকম সন্তোষজনক ব্যবস্থা না থাকায় তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। শিশু যতই বড় হয় বিশেষ করে যখন প্রাপ্তযৌবন হয় তখন তার মধ্যে আরও নানা রকম যৌনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তাছাড়া যৌনঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে প্রত্যেক সমাজেই নানা বিধিনিষেধ ও অনুশাসন প্রচলিত আছে। এইগুলি অতি ছোট বয়স থেকেই শিশুদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এগুলির সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে তাদের পরিণত জীবনের যৌনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি। যৌবনাগমে শিশুর মধ্যে যৌন কৌতূহল এত প্রবল হয়ে ওঠে যে সে নানা বিচিত্র পন্থায় তার সেই যৌন কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করে এবং তার ফলে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অপরাধবোধ দেখা দেয়।

অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি (Conflict Situation)

যে যে পরিস্থিতিতে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় সেগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(ক) অভিগমন-অভিগমনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব, (খ) পরিহার-পরিহারমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব, (গ) অভিগমন-পরিহারমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং (ঘ) বহুবিধ অভিগমন-পরিহারমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব।

অভিগমন—অভিগমনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব
(Approach-Approach Conflict)

অনেক সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন দুটি সমভাবে আকর্ষণীয় বস্তু বা ঘটনার মধ্যে আমরা একটিকে নির্বাচন করতে বাধ্য হই। যেমন এক মহিলা শাড়ীর দোকানে গিয়ে দুটি বিভিন্ন রকমের কিন্তু সমানভাবে পছন্দসই শাড়ীর মধ্যে কোনটা কিনবেন সেই অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন, অথচ একটার বেশী শাড়ী কেনার মত তাঁর টাকা নেই। এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে আমরা অভিগমন-অভিগমনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব নাম দিতে পারি।

এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিটি নীচের ছবির সাহায্যে বোঝান যায়।

পরিহার—পরিহারমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব (Avoidance-Avoidance Conflict)

অনেক ক্ষেত্রে দুটি বস্তু বা ঘটনাই ব্যক্তির কাছে সমানভাবে অনাকর্ষণীয় বা বর্জনীয় হতে পারে, অথচ একটিকে তাকে গ্রহণ করতেই হবে। যেমন, স্ত্রীর অসুখ, টাকার দরকার। ভদ্রলোককে হয় তাঁর সখের গাড়ীটি বিক্রী করতে হবে, নয় তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা হবে না। কিংবা আরও গুরুতর ক্ষেত্রে এমন একটা রোগ হয়েছে যার জন্য হয় অপারেশন করতে হবে, নয় সেই রোগ নিয়ে সারাজীবন কাটাতে হবে। এই ধরনের ক্ষেত্রগুলিকে আমরা পরিহার-পরিহারমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব বলে বর্ণনা করতে পারি।

এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিটি নীচের চিত্রের সাহায্যে বোঝান যায়।

অভিগমন—পরিহারমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব (Approach-Avoidance Conflict)

এমন পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে যখন একই বস্তুর প্রতি ব্যক্তি আকৃষ্ট হতে পারে, আবার সেই সঙ্গে সেই বস্তু থেকে নিজেকে পরিহার করারও প্রবল ইচ্ছা তার হতে পারে। যেমন, একটি ছোট ছেলে একটি কুকুরকে আদর করতে হাত বাড়িয়ে ভয়ে হাতটা টেনে নিল। কিংবা কোন ব্যক্তি এক বন্ধুর বাড়ীতে

টাকা ধার করতে গিয়ে পাছে বন্ধু না বলে সেই ভয়ে দরজা থেকে ফিরে এল। এগুলি অভিগমন-পরিহারমূলক অন্তর্দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্ত।

এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিটি নীচের ছবির সাহায্যে বোঝান যায়।
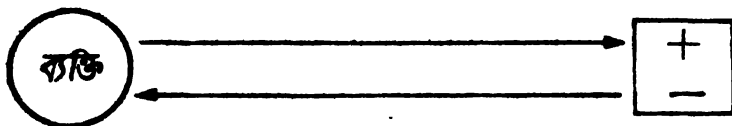
বহুবিধ অভিগমন—পরিহারমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব

(Multiple Approach-Avoidance Conflict)

অনেক সময় আমরা এমন জটিল পরিস্থিতিতে পড়ি যখন সেই পরিস্থিতির অন্তর্গত একই বস্তু একযোগে আমাদের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করতে পারে। যেমন, এক ভদ্রলোক বিয়ে করতে চান, বিয়ে করতে পারছেন না মায়ের জন্য। মা খুব অসুস্থ এবং তিনি চান না যে ছেলে বিয়ে করুক। সেইজন্য বিয়ে করতে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক পেছিয়ে আসছেন। আবার বয়স হয়ে যাচ্ছে মা'র কথার অবাধ্য হয়ে বিয়ে করার কথা চিন্তা করছেন, কিন্তু মা'র অসুস্থতার কথা ভেবে মা'র কথা মেনে নিচ্ছেন এবং বিয়ে করছেন না। এই জটিল পরিস্থিতিতে ভদ্রলোকের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃতি হল বিবাহের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আবার মায়ের প্রতিও আকর্ষণ ও বিকর্ষণ।

এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিটি নীচের চিত্রের দ্বারা বোঝান যায়।

হিতকর অন্তর্দ্বন্দ্ব

অন্তর্দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক মানুষ মাত্রের মধ্যেই সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং বুদ্ধি, বিচার-বোধ ও ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক বিকাশের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রয়োজন। যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যক্তিকে কোন কিছু পেতে বা কোন চেষ্টা করতে প্রবুদ্ধ করে এবং কোন বিশেষ কাজের পেছনে প্রেষণা জোগায় তাকেই আমরা হিতকর অন্তর্দ্বন্দ্ব বলতে পারি। তাছাড়া প্রয়োজনীয় সমস্যা নিয়ে যে সব অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় সেগুলিকেও আমরা হিতকর অন্তর্দ্বন্দ্বের পর্যায়ে ফেলতে পারি। কেননা সেগুলি ব্যক্তির মধ্যে সৃজনমূলক প্রচেষ্টার উদ্বোধকরূপে কাজ করে থাকে।

যদি কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব তীব্র হয়ে ওঠে তাহলে সেটি ব্যক্তির কিছু না কিছু উপকার করেই। যেমন, হীনমন্যতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যক্তিকে অধিকতর প্রচেষ্টা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার মধ্যে উদ্যম ও উৎসাহ এনে দেয়। অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে মানুষের সকল রকম কর্মপ্রচেষ্টা ও সাফল্যের মূলেই আছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড এ্যাডলারের মতে মানুষের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রাধান্য অর্জনের ইচ্ছা থেকে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাকেই ভিত্তি করে মানুষের সৃষ্টি ও অগ্রগতি জন্মলাভ করে।

যে ব্যক্তি নিজেকে অপরের চেয়ে হীন বলে মনে করে সে নিজের দুর্বলতা বা হীনতাকে দূর করার জন্য দ্বিগুণ তৎপর হয়ে ওঠে। একে আমরা পরিপূরক আচরণ বলতে পারি। এই ধরনের ব্যক্তির হাতের মধ্যে যত রকম উপায় বা সঙ্গতি আছে সে সবেরই প্রয়োগ করে তার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য। যে ব্যক্তি প্রথমে খুব ভীরু বা লাজুক থাকে এবং অপরের সঙ্গে ভালভাবে মিশতে পারে না সে পরে তার এই দুর্বলতা দূর করার চেষ্টায় মিশুকে সামাজিক হয়ে ওঠে।

এক কথায় অন্তর্দ্বন্দ্ব মাত্রেই ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে যদি ব্যক্তি তার দ্বারা অতিরিক্ত মাত্রায় অভিভূত না হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি নিজে নিজে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারে এবং তার প্রকৃত দুর্বলতা এবং অসুবিধা দূর করতে প্রয়াসী হয় তার কাছে অন্তর্দ্বন্দ্ব মঙ্গলকরই হয়ে ওঠে।

অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান (Solution of Conflict)

শিশুর মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষ করে শিশু যখন বড় হয়ে গৃহ ও বিদ্যালয়ের সমাজধর্মী পরিবেশে প্রবেশ করে তখন নানা পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছা ও পরিস্থিতির সে সম্মুখীন হয় এবং তার ফলে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের যদি সহজে মীমাংসা না হয় তাহলে শিশুর প্রক্ষোভমূলক সমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হয়। অতএব শিক্ষাসূচী মাত্রেরই প্রধানতম লক্ষ্য হল যাতে শিশু তার অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা সুসমাধানে আসতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা। অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধানের কয়েকটি পন্থার বর্ণনা দেওয়া হল।

ক। পরিপূরক আচরণ

সুবিবেচনা ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে শিশুকে পরিচালিত করলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অন্তর্দ্বন্দ্বের সন্তোষজনক মীমাংসা করা সম্ভব। মনে করা যাক কোন শিশু

লেখাপড়ার ক্ষেত্রে নিজের সঙ্গে অপর কোন শিশুর তুলনা করে নিজেকে হেয় বলে মনে করল। তার ফলে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার পন্থারূপে শিশুটি ভাল করে লেখাপড়া সুরু করতে পারে এবং কিছুদিনের মধ্যে অপরের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে। কিংবা লেখাপড়ায় যদি ভাল ফল দেখানো তার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে সে খেলাধূলা, অভিনয়, অঙ্কন বা বিতর্ক ইত্যাদি অন্য ক্ষেত্রে উৎকর্ষ দেখিয়ে নিজের হীনমন্যতা দূর করতে পারে। এ দুয়ের একটি পথও যদি তার পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব না হয় তাহলে সে অপরের মনোভাব বা মতামতকে অগ্রাহ্য করতে পারে এবং যেমন নিজের পছন্দমত চলছিল সেই রকম চলতে পারে। উপরের তিনটি উপায়েই শিশু তার অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারে বলা বাহুল্য এই তিন পন্থার মধ্যে প্রথম দুটি পন্থা অনেক ভালো ও বাঞ্ছনীয়।

এই ধরনের আচরণগুলিকে পরিপূরক আচরণ বলা হয়। এইভাবে পরিপূরণের দ্বারা অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা যে অনেক সময় শিশুর পক্ষে কাম্য এবং মঙ্গলকর হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিপূরক আচরণের ক্ষেত্রে শিশু অপরের প্রশংসা পাবার জন্য কিংবা নিজের উৎকর্ষ প্রমাণিত করার জন্য তার কোন বিশেষ একটি দুর্বলতা বা ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করে থাকে। তার ফলে শিশুর অগ্রগতি অধিকতর দ্রুত হয়ে ওঠে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নিজের হীনতার পরিপূরণ করতে গিয়ে শিশুর মধ্যে একটা প্রক্ষোভমূলক বিপর্যয় দেখা দেয় এবং তার ফলে তার অগ্রগতি হওয়া দূরে থাকুক সে নানা রকম বাধা ও অসুবিধার দ্বারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

অনেক সময় শিশু বিশেষ করে প্রাপ্তযৌবনেরা অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর পন্থায় তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করার চেষ্টা করে। শিক্ষকদের এই সব ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ভাল না পারায় শিশুটি এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে যে বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার কোন মূল্যই নেই এবং বিদ্যালয় ও লেখাপড়া সংক্রান্ত সব ব্যাপার সম্পর্কেই সে উপহাস বা বিদ্রূপ করা সুরু করে। নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য শিশুটি এখানে পরিপূরক আচরণের সাহায্য নিল বটে কিন্তু সে পরিপূরক আচরণটি কোন দিক দিয়েই তার কাছে বাঞ্ছনীয় বা হিতকর নয়। অনেক শিশু আবার প্রকৃত ঘটনাটি বিকৃত করে নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার ফলে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব সাময়িকভাবে কমলেও ভবিষ্যতে আবার তীব্র হয়ে ওঠে।

খ। পরিস্থিতির বিশ্লেষণ

এইজন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর উপায় হল পরিস্থিতির পূর্বপরিকল্পিত বিশ্লেষণ। এর অর্থ হল যে, যে পরিস্থিতিটির উদ্ভব হওয়াতে ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতিটিকে যদি স্থির মস্তিষ্কে আগে থেকে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে পরবর্তীকালের প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা ও অস্থিরতা ঘটার সম্ভাবনা খুব কম থাকে এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্বেরও একটা সুষ্ঠু মীমাংসা হয়। ব্যক্তিকে যে সব পরস্পরবিরোধী ঘটনা ও শক্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং তার ফলে তার নিজের ইচ্ছা এবং পরিতৃপ্তির মধ্যে যে সব বৈষম্য দেখা দেয় সেগুলিকে সে ভালভাবে পরীক্ষা করতে শিখবে। তার পরিতৃপ্তির অভাবের মূলে কোন প্রতিকূল ঘটনা বা শক্তি আছে এবং তার সামর্থ্যের অভাবই বা কতখানি তার ব্যর্থতার জন্য দায়ী এই তথ্যগুলি যদি তার কাছে পরিষ্কারভাবে জানা হয়ে যায় তাহলে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব নিজে নিজেই দূর হয়ে যায়। এই ধরনের মানসিক বিশ্লেষণের দ্বারাই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান সম্ভবপর।

পিতামাতা, শিক্ষক বা অন্যান্য বয়স্কদের উচিত শিশু যাতে নিজের প্রচেষ্টায় তার অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে শিক্ষা ও সাহায্য দেওয়া। উপযুক্ত আলোচনা ও পরামর্শের সাহায্যে শিশুর মনোভাব এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সে যেন অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা সন্তোষজনক সমাধান নিজে থেকেই করতে পারে। যখন শিশুর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে তার সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এ সময় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হল শিশুর বিশ্বাস অর্জন করা। সাধারণত যে সব শিশু প্রক্ষোভমূলক অস্থিরতায় ভোগে তাদের মধ্যে বিশ্বাস উৎপাদন করা খুবই কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ যদি শিশুর পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করা না যায় তাহলে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃত কারণটিও ঠিক জানা যাবে না এবং সেটি দূর করার ব্যবস্থা করাও সম্ভব হবে না।

সাধারণত শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করতে গিয়ে বয়স্করা দুটি ভুল করে বসেন। প্রথমত তাঁরা মনে করেন যে শিশুরা বড় হয়ে উঠলেই তাদের ছেলেবেলার প্রক্ষোভমূলক সমস্যাগুলি নিজে নিজেই দূর হয়ে যাবে। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভুল। প্রক্ষোভমূলক সমস্যার যদি যথা সময়ে কোন সমাধান না করা হয় তাহলে শিশু যতই বড় হোক্ না কেন সেগুলি নিজে থেকে কোনদিনই দূর হবে না। পরিণত

বয়সেও সেই সমস্যাগুলি ব্যক্তির মধ্যে থেকে যাবে এবং তার মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষুণ্ণ করে তুলবে। সেই রকম বয়স্কদের আর একটি বড় ভুল হল যে শিশুদের সঙ্গে তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার সময় তাঁরা প্রায়ই তাদের দুশ্চিন্তা ও সমস্যাগুলি ভুলে যেতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এটিও একটি ভুল উপদেশ। কোন মানুষ তার প্রক্ষোভজাত সমস্যা কখনই ভোলে না। সব সময়েই তার কিছু না কিছু প্রভাব মনের মধ্যে থেকে যাবেই।

শিশুদের সমস্যা ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্ প্রতিটি সমস্যাকেই বিনা দ্বিধায় ও অবিলম্বে সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। কোন সমস্যারই বাহ্যিক-প্রকাশ দেখে তার গুরুত্ব বিচার করা ভুল। কেননা বাহ্যিক অভিব্যক্তির উপর সব সময় সমস্যাটির তীব্রতা ও গুরুত্ব নির্ভর করে না। যথাসময়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান না হলে শিশু হয় সেটিকে অবদমিত করতে বাধ্য হয় কিংবা অবাস্তব কল্পনা ও দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সেটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

গ। অবাস্তব কল্পনা ও দিবাস্বপ্ন

এর মধ্যে অবাস্তব কল্পনা এবং দিবাস্বপ্ন অন্তর্দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে যাবার সবচেয়ে সহজ পন্থা। শিশু তার কামনার পরিতৃপ্তির চেষ্টায় বাস্তবে যে সব বাধার সম্মুখীন হয় দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সেগুলির অনুপস্থিতি সে কল্পনা করে নেয় এবং ঐ ভাবে নিছক কল্পনার সাহায্যে সে তার যে কোন অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তি পেতে পারে। কিন্তু অবাস্তব কল্পনা বা দিবাস্বপ্ন শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্বের স্থায়ী মীমাংসা আনতে পারে না। কল্পনার রাজ্য ছেড়ে তাকে এক সময় না এক সময় বাস্তব জগতে প্রবেশ করতে হবে এবং তখনই তার মধ্যে ব্যর্থতা দেখা দেবে। তাছাড়া অতিরিক্ত কল্পনা-বিলাসী হয়ে উঠলে শিশুর মধ্যে অনেক সময় নানা রকম অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়ে থাকে।

ঘ। অবদমন

অন্তর্দ্বন্দ্বের অবদমন মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর। অব-দমনের ফলে অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা ত কোনরকম হয়ই না বরং তার প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতিগুলি মনের মধ্যে তাদের সম্পূর্ণ তিক্ততা ও তীব্রতা নিয়ে নিহিত থাকে এবং সুযোগ পেলেই শিশুর সচেতন ও স্বাভাবিক আচরণকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

অন্তর্দ্বন্দ্বের চিকিৎসা (Treatment of Conflict)

সন্তোষজনকভাবে অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করার ক্ষমতা নির্ভর করে জীবনে ব্যর্থতা বা পরাজয়কে মেনে নেবার শক্তির উপর। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই সহজে ব্যর্থতা বা পরাজয়কে মেনে নিতে পারে না। সকলের মধ্যেই অসাধা-

-রণ কিছু হবার স্বপ্ন ছেলেবেলা থেকেই থাকে। পরে যখন তারা বড় হয় তখন তাদের এই স্বপ্ন এবং তাদের প্রকৃত সামর্থ্য এই দুয়ের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান দেখা দেয়। তার ফলে তারা বহুক্ষেত্রেই ব্যর্থতাকে বরণ করতে বাধ্য হয় এবং তার থেকেই তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নানারকম প্রক্ষোভঘটিত সমস্যা। এই সব ব্যক্তিদের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করতে হলে তাদের চাহিদা ও সামর্থ্যের মধ্যে যে ব্যবধান সে সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের চাহিদাকে পুনর্গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। অন্তর্দ্বন্দ্বের চিকিৎসার কয়েকটি পন্থার বর্ণনা দেওয়া হল।

ক। বিদ্যালয় পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ

এ ব্যাপারে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের সম্মিলিত কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এমন একটা সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করা যায় যে শিশুরা সে পরিবেশে এক সঙ্গে কাজ করে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে পারে এবং কারও মধ্যেই হীনমন্যতার মনোভাব বা অপরকে দমন করার প্রবণতা গড়ে ওঠে না। এদিক দিয়ে বিদ্যালয়কে মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের একটি অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম করে তোলা যায়। শিশুকে যদি বাস্তবের সম্মুখীন হতে শেখান যায় এবং তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছনর অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তাকে যদি সচেতন করে তোলা যায় তাহলে অন্তর্দ্বন্দ্ব নিজে নিজেই তার মন থেকে চলে যাবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশকে শিশুর সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী এমনভাবে পরিকল্পিত করতে হবে যাতে তার মধ্যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব না জাগে।

খ। প্রবোধন ও অনুভাবন (Persuasion and Suggestion)

অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন অতি গভীর ও তীব্র হয়ে দাঁড়ায় তখন শিক্ষক বা পিতামাতার পক্ষে তার চিকিৎসা করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন মনশ্চিকিৎসকদের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। মনশ্চিকিৎসকগণ অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরাময়ের জন্য যে সব পন্থা অবলম্বন করেন তার মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি প্রবোধন (Persuasion) এবং দ্বিতীয়টি অনুভাবন (Suggestion)। প্রবোধনের ক্ষেত্রে শিশুকে যুক্তির সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করা হয় যে সে যে সব অসুবিধা বা সমস্যা অনুভব করছে সেগুলির সত্যকারের কোন অস্তিত্ব নেই বা থাকলেও সেগুলিকে সে যতটা গুরুতর মনে করছে সেগুলি ততটা গুরুতর নয়। অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে জাত প্রক্ষোভমূলক সমস্যা যখন খুব তীব্র হয়ে ওঠে তখন প্রবোধনে বিশেষ কাজ হয় না। প্রবোধনের সাফল্য নির্ভর করে যুক্তির সাহায্যে সমস্যাটির বিচার করার উপর। কিন্তু ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত মাত্রায় প্রক্ষোভের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ে তাহলে তার পক্ষে যুক্তি অনুসরণ করে কোন কিছু বিচার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

অনুভাবনও বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে। সাধারণ পরামর্শ বা উপদেশ থেকে স্বরু করে কোন বিশেষ ধারণা বা বিশ্বাস ব্যক্তির মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সাধারণত কার্যকর এবং স্থায়ী অনুভাবন সম্মোহন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ব্যক্তিকে সম্মোহিত করে বলা হয় যে, সে যে সমস্যা বা মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে কষ্ট পাচ্ছে সম্মোহন থেকে জেগে উঠলে সেই মানসিক সমস্যা বা দ্বন্দ্ব তার আর থাকবে না। প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েদের কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মোহন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করা সম্ভব হলেও ছোট ছেলেমেয়েদের উপর এই প্রক্রিয়াটি কখনও প্রয়োগ করা হয় না। এই প্রক্রিয়াটি বয়স্কদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

গ। মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association)

মনঃসমীক্ষকগণ মনে করেন যে অন্তর্দ্বন্দ্ব মাত্রেই ব্যক্তির অচেতন মনে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং যতক্ষণ না অচেতনে নিহিত সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের উৎসটির সন্ধান করতে পারা যাচ্ছে ততক্ষণ অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরাময় করা সম্ভব নয়। এর জন্য তাঁরা যে পদ্ধতিটির অনুসরণ করেন তার নাম মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association)। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে তার মনের সকল কথা বিনা বাধায় বলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যক্তির প্রদত্ত সেই বিবরণ থেকে চিকিৎসক তার অচেতনে নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্বটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন। মনঃসমীক্ষকদের মতে ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বটিকে তার অচেতন বাসস্থান থেকে সচেতনে তুলে আনতে পারলেই তার রোগের নিরাময় হয়ে যায়।

ঘ। স্বপ্ন বিশ্লেষণ (Dream Analysis)

ফ্রয়েডের মতে অচেতনে পৌঁছবার রাজপথ হল স্বপ্ন। সেই জন্য আধুনিক মনশ্চিকিৎসকগণ অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করার জন্য ব্যক্তির স্বপ্নের বিশ্লেষণ করে থাকেন। স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় সেগুলির সাহায্যে তাঁরা ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃত সংব্যাখ্যান করতে পারেন।

প্রশ্নাবলী

1. What is a conflict? How does it develop in the child? Describe measures for removing the conflict.

Ans. (পৃঃ ১২৬—পৃঃ ১৩৭)

2. How does a conflict generate? What are the ill effects of a conflict? How can a conflict be solved?

Ans. (পৃঃ ১২৬—পৃঃ ১৩৭)

3. Discuss the role of conflict in the life of the child. How does a conflict help the child?

Ans. (পৃঃ ১২৬—পৃঃ ১৩১)

4. Under what conditions do conflicts arise? Indicate the effect of mental conflict on the mental health of an individual.

Ans. (পৃঃ ১২৬—পৃঃ ১৩১)

প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism)

মানুষের মনের মধ্যে সর্বদাই পরস্পরবিরোধী কতকগুলি শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে। ফ্রয়েড এই শক্তিগুলির নাম দিয়েছেন অহম, ইদম্ ও অধিসত্তা। ইদম্ আমাদের নগ্ন ও অবদমিত কামনার প্রতীক। অধিসত্তা হল আমাদের অন্তরবাসী সমালোচক ও নৈতিক মানের ধারক। আর আমাদের নিজস্ব সত্তাটির নাম অহম্। এই তিনে মিলে মানুষের অভ্যন্তরীণ শক্তিপুঞ্জকে সৃষ্টি করেছে। আজ- মানুষের বাইরের শক্তি হল বাস্তব বা তার সামাজিক পরিবেশ। মানুষ যত সভ্য হচ্ছে ততই এই বাস্তব জটিল ও স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে। ফলে দিন দিন বাস্তবের শক্তিগুলিও বহুমুখী, তীব্র ও অদম্য হয়ে উঠেছে।

অহম্‌কে তিনটি বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সর্বদাই সঙ্গতিবিধান করে চলতে হয় যথা, ইদম্, অধিসত্তা ও বাস্তব। কিন্তু ইদমের অধিকাংশ ইচ্ছাই বাস্তবের বিরোধী এবং অধিসত্তার দ্বারা অননুমোদিত। বাস্তবের চাপে ও অধিসত্তার অনুশাসনে অহম্ ইদমের কামনা বাসনাগুলির তৃপ্তি দিতে পারে না। কিন্তু বস্তুত সে কামনাগুলি অহমের নিজেরই কামনা এবং সেগুলির তৃপ্তিতে আনন্দ ও সন্তোষ পাবে অহম্‌ই। তার ফলে প্রায়ই এমন একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যখন অহমের অবস্থা বেশ সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। একদিকে সে ইদমের কামনাকে তৃপ্তি না দিয়েও পারে না আবার অপর পক্ষে বাস্তব বিরোধী কাজও করতে পারে না। তখন অহম্‌কে আত্মরক্ষার জন্য তার আচরণের ক্ষেত্রে কতকগুলি কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। এই কৌশলগুলিকে প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism) বলা হয়।

প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির উদ্দেশ্য দু'প্রকারের হতে পারে। প্রথমত, অবদমিত ইচ্ছাগুলির অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে অহমের আত্মরক্ষার প্রয়াস। আর দ্বিতীয়ত, ইদমের ইচ্ছাগুলিকে আংশিক তৃপ্তিদান। বাস্তবের সঙ্গে সন্তোষজনকভাবে নিজেকে মানিয়ে চলাও এই কৌশলগুলির আর একটি উদ্দেশ্য। এই জন্য এগুলিকে সঙ্গতি বিধানের কৌশল (Adjustment Mechanism) নামও দেওয়া হয়ে থাকে।

অবদমন (Repression)

প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় অবদমনের। ইদমের কামনাগুলি তৃপ্তিলাভের জন্য নিয়তই তাদের আবেদন নিয়ে অহমের কাছে হাজির হয়। কিন্তু তাদের অসামাজিক ও নীতিবিরোধী প্রকৃতির জন্য অহমের পক্ষে সেগুলির তৃপ্তিসাধন করা সম্ভব হয় না। তখন সেগুলিকে হয় আংশিক বা কৃত্রিম তৃপ্তি দিতে হয় কিংবা সেগুলিকে সম্পূর্ণ দাবিয়ে রাখতে হয়। এই দাবিয়ে রাখার কাজটিকে অবদমন বলে। সময় সময় চেতন মনেও এই ধরনের সমাজ-বিরোধী বা নীতিবিরুদ্ধ ইচ্ছা দেখা দেয়। তখনও অহম্ সেই ইচ্ছাটিকে তার অচেতনে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। অবদমনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে এটি একটি অচেতন প্রক্রিয়া এবং যে ইচ্ছা বা চিন্তাকে ব্যক্তি অবদমিত

করে সেটি সম্বন্ধে পরে কোন সচেতনতা তার মধ্যে আর থাকে না। সেই ইচ্ছা বা চিন্তাটি চেতন স্তর থেকে নেমে অচেতনে এসে আশ্রয় নেয় এবং তার ফলে ব্যক্তি-সেই চিন্তা বা কামনাটি সম্পূর্ণ ভুলে যায়।
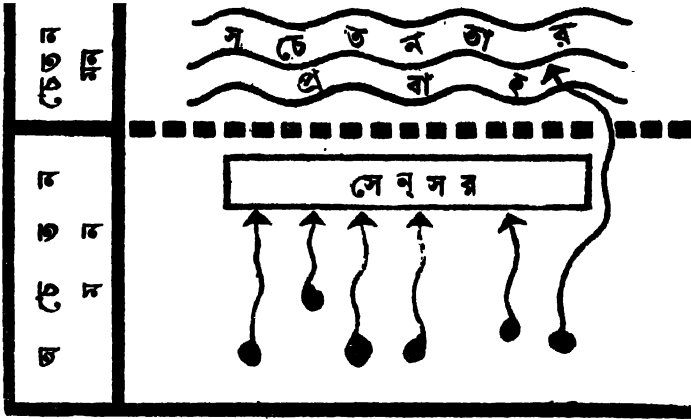
[চেতন মনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত কামনাবাসনাগুলি অচেতনে অবদমিত হয় এবং সেখান থেকে সেগুলি সচেতন স্তরে উঠে আসার জন্য বার বার চেষ্টা করে। কিন্তু অবদমনের শক্তি বা সেন্সর তাদের উপরে ওঠার সে প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে। অবশ্য কোন কোন অবদমিত কামনা কৌশলে সেন্সরকে এড়িয়ে সচেতন স্তরে পৌঁছয়।]

কিন্তু অচেতনে অবদমিত হলেও এই ইচ্ছা বা কামনাগুলি তাদের শক্তি বা আবেদন একটুও হারায় না। অনেকটা টাইম বোমার মত সেগুলি অচেতনে নিষ্ক্রিয় হয়ে অবস্থান করে এবং সময় ও সুযোগ পেলেই বিস্ফোরিত হয়। এই অননুমোদিত এবং বাতিল করা ইচ্ছাগুলিকে দাবিয়ে রাখার জন্য অহম্‌কে তাদের উপর একটা বাধা চাপিয়ে দিতে হয়। এই বাধার নাম দেওয়া হয়েছে সেন্সর। সেন্সরের কাজ হল ইদমের তৃপ্তিকামী ইচ্ছাগুলি পরীক্ষা করে দেখা। যে ইচ্ছাগুলি সেন্সরের বিচারের তৃপ্তিদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় সেগুলিকে সেন্সর চেতনে প্রবেশের অধিকার দেয় এবং যেগুলি তার বিচারে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় সেইগুলিকে সে জোর করে দাবিয়ে রাখে। এক কথায় সেন্সর অবদমিত ইচ্ছাগুলির পাহারাদার রূপে কাজ করে।

অবদমনের কাজে অধিসত্তার ভূমিকা প্রচুর। যদিও অধিসত্তা সরাসরি নিজে কোন ইচ্ছাকে অবদমিত করতে পারে না এবং অবদমন করাটা একমাত্র অহমেরই কাজ তবু অবদমনের প্রকৃতি নির্ধারণে অধিসত্তার অবদান সব চেয়ে বেশী। কোন্ ইচ্ছাটি চেতনে স্থান পাবার যোগ্য, আর কোন্‌টি নয় এটির চরম নিয়ন্ত্রক হল অধিসত্তা এবং সেন্সর পরিচালিত হয় অধিসত্তারই অনুশাসন অনুযায়ী।

প্রকৃতির দিক দিয়ে অবদমন হল সঙ্গতিবিধানের চরমতম এবং নিকৃষ্টতম কৌশল। কেননা এর মাধ্যমে ইদম্ সম্পূর্ণ অতৃপ্ত থেকে যায় এবং ইদম্-অহমের

দ্বন্দ্বের কোন প্রকৃত মীমাংসা ঘটে না। অবদমন যখন অতিরিক্ত মাত্রার হয়ে ওঠে তখন ইদম্‌-অহমের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতম রূপ ধারণ করে এবং তার ফলে ব্যক্তির মানসিক স্থৈর্য যে কোন মুহূর্তে বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ মানসিক বিকারের কারণই হল অতৃপ্ত ইচ্ছার অতিরিক্ত অবদমন।

প্রতিক্রিয়া সংগঠন (Reaction Formation)

কখনও কখনও কোন অবদমিত ইচ্ছাকে অস্বীকার করার জন্য ব্যক্তি সেই ইচ্ছার বিপরীত মনোভাবটি প্রকাশ করে বা প্রত্যাশিত আচরণের বিপরীত আচরণটি সম্পন্ন করে। এই কৌশলটিকে প্রতিক্রিয়া সংগঠন বলা হয়। উদাহরণ-স্বরূপ অবদমিত যৌন ইচ্ছা যৌন ভীতির রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। ঈডিপাস কমপ্লেক্স বা কাস্ট্রেশন কমপ্লেক্স থেকে জাত পিতার প্রতি বিদ্বেষ প্রতিক্রিয়া সংগঠনের ফলে পিতার জন্য অতিরিক্ত উদ্বেগে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

অপব্যাখ্যান (Rationalisation)

যখন আচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা কারণের পরিবর্তে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বা সমাজ অনুমোদিত কোন উদ্দেশ্য বা কারণ উপস্থাপিত করা হয় তখন সেই কৌশলটিকে অপব্যাখ্যান বলা যেতে পারে। এই কৌশলের দ্বারা অহম্‌ তার আচরণটির সত্যকার উদ্দেশ্য বা কারণটি প্রকাশ করার অবাঞ্ছিত কাজ থেকে রেহাই পায়। অবশ্য প্রকৃত কারণটি গোপন রেখে অন্য একটি কারণ উপস্থাপিত করার এই কাজ সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই অহমের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যে কারিগর তার নিজের অকর্মণ্যতার জন্য তার যন্ত্রপাতির দোষ দেয় বা যে নর্তকী তার নৃত্যকলার অজ্ঞতার দায়িত্ব উঠোনের উপর চাপায়, সেই কারিগর বা নর্তকী নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য অপব্যাখ্যানের আশ্রয় নিচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা ও আচরণে আমরা এই ধরনের বহু অপব্যাখ্যানের সাহায্য নিয়ে থাকি।

প্রতিক্ষেপণ (Projection)

প্রতিক্ষেপণ অপব্যাখ্যানের একটি বিশেষ প্রকার মাত্র। এই কৌশলটিতে ব্যক্তি তার ইদমের অতৃপ্ত কামনাটি বাইরের জগতের উপর প্রতিক্ষিপ্ত করে। যেমন, কোন স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অচেতন মনে নিহিত ঘৃণাটি প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীর মনে এই ধারণার সৃষ্টি করতে পারে যে তার প্রতিই তার স্বামীর আসক্তি নেই বা স্বামীই তাকে ঘৃণা করে। মানসিক বিকৃতির অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোগী নিপীড়নের বিভ্রান্তিতে (Delusion of Persecution) ভোগে। অর্থাৎ তার ধারণা হয় যে সকলেই তাকে নির্যাতন করছে। প্রকৃতপক্ষে তার অভ্যন্তরস্থ ধ্বংসাত্মক কামনাটি বা মরণ প্রবৃত্তিটি (Thanatos) বাইরের জগতে প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে তার মধ্যে নিপীড়নমূলক বিভ্রান্তির রূপ নিয়েছে।

উন্নীতকরণ (Sublimation)

সঙ্গতিবিধানের কৌশলরূপে উন্নীতকরণই সর্বোৎকৃষ্ট। কেননা এই প্রক্রিয়াটির দ্বারা অহমের পক্ষে ইদমের অতৃপ্ত কামনার আংশিক তৃপ্তি দেওয়া সম্ভব হয়।

ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর সকল কামনার লক্ষ্যই যৌনধর্মী। কিন্তু নানা ক্ষেত্রে ব্যক্তি সামাজিক অনুশাসনের চাপে লিবিডোর যৌনমূলক লক্ষ্যটিকে নিরুদ্ধ করে সেটিকে অন্যপথে পরিচালিত করতে বাধ্য হয় এবং এইভাবে তার ঐ চাহিদাটির আংশিক তৃপ্তি লাভ করে। একেই উন্নীতকরণ প্রক্রিয়া বলে। কোন কামনাকে তার নিম্নপ্রকৃতির লক্ষ্য থেকে সরিয়ে এনে কোন উন্নত প্রকৃতির লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করাই হল উন্নীতকরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যনিরুদ্ধ যৌনশক্তি তখন সৃজনমূলক নানা কাজের মধ্যে দিয়ে তৃপ্তিলাভ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ যৌন মিলনের ইচ্ছা উন্নীত হয়ে ক্লাব, পার্টি, সহনৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে নরনারীর মধ্যে অবাধ মেলামেশায় পরিণত হয়, আক্রমণাত্মক কামনা বক্সিং, কুস্তি ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার রূপ নেয়। দেখা গেছে যে এইভাবে লক্ষ্যনিরুদ্ধ লিবিডোর শক্তি শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি, সামাজিক কার্যাবলী, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, হবি অনুসরণ প্রভৃতি কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের তৃপ্তি খুঁজে নেয়।

অবাস্তব কামনা এবং দিবাস্বপ্ন (Fantasy & Day dreaming)

যে সকল ইচ্ছা বাস্তবে তৃপ্ত হয় না সেগুলিকে কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্তি আংশিকভাবে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। অবদমিত বাসনাকে তৃপ্তিদানের এই কৌশলটি খুবই সহজ এবং সকলেরই আয়ত্তাধীন। অনেক সময় অতৃপ্ত যৌনকামনাও অযৌন রূপ নিয়ে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে নিজেদের তৃপ্তি খুঁজে নেয়।

প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে দিবাস্বপ্ন সঙ্গতিবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য অস্ত্র। তাদের নানা কামনা বাস্তবের রূঢ় পরিবেশে ব্যাহত হয়ে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে আত্মতৃপ্তি আহরণ করে। যে সব ব্যক্তি জীবনযুদ্ধে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে না, তারাও এইভাবে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে নিজেদের ব্যর্থতাকে ভোলার চেষ্টা করে। এদিক দিয়ে দিবাস্বপ্নের উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। বরং ব্যক্তির অতৃপ্ত কামনার পরিতৃপ্তির একটি নির্দোষ মাধ্যম রূপে দিবাস্বপ্ন তার সঙ্গতিবিধানে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। অবশ্য অতিরিক্ত দিবাস্বপ্ন কোনও দিক দিয়েই কাম্য নয়। নিছক নিষ্ক্রিয়ভাবে দিবাস্বপ্নে মগ্ন থাকলে ব্যক্তি তার উদ্যম, প্রেরণা ও কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে।

রূপান্তরকরণ (Conversion)

কখনও কখনও অবদমিত ইচ্ছা কোনও বিশেষ শারীরিক অভিব্যক্তির রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তখন তাকে রূপান্তরকরণ বলা হয়। যেমন, রূপান্তরিত হিষ্টেরিয়ার (Conversion Hysteria) ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কোনও শারীরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তির বিশেষ একটি মানসিক দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটেছে। একটি মেয়ে দীর্ঘদিন তার অসুস্থ পিতার সেবা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠল অথচ পিতার প্রতি তার স্বাভাবিক কর্তব্যবোধ একটুও কমল না। ফলে জন্ম নিল মানসিক দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে মেয়েটির একটি হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে। এখানে তার পিতাকে সেবা করার মানসিক অনিচ্ছাটি শারীরিক লক্ষণ নিয়ে দেখা দিল।

অভেদীকরণ (Identification)

অভেদীকরণও ইদমের কামনাকে আংশিক তৃপ্তি দেবার একটি পন্থাবিশেষ। এই কৌশলের দ্বারা ব্যক্তি অপরের সঙ্গে বা অপরের কৃতিত্বের সঙ্গে নিজেকে বা নিজের কৃতিত্বকে অভিন্ন বলে মনে করে তৃপ্তি পায়। শৈশবে শিশু তার পিতার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে তৃপ্তি লাভ করে। আমরাও যে আমাদের পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব নিয়ে গর্ববোধ করি সেটিও একটি অভেদীকরণের দৃষ্টান্ত।

প্রত্যাবৃত্তি (Regression)

লিবিডো যখন বাস্তবের কোন বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না তখন সে বর্তমানকে ত্যাগ করে অতীতের শৈশবে ফিরে যায় এবং শৈশবের যে সকল আচরণে সে আনন্দ পেত সেই সকল আচরণ সম্পন্ন করতে সুরু করে। হিষ্টেরিয়া প্রভৃতি মনোবিকারের ক্ষেত্রে এই রকম লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি প্রায়ই ঘটে থাকে। দেখা গেছে যে মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী নিজের হাতে খাবার খেতে পারছে না বা নিজে নিজে পোষাক পরতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির লিবিডো তার বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পেরে তার শৈশবের আচরণে প্রত্যাবর্তন করেছে।

আসক্তি-সঞ্চালন (Transference)

মনোবিকারের রোগীদের অচেতন বিশ্লেষণ করার সময় মনঃসমীক্ষকগণ প্রায়ই দেখেন যে রোগীদের প্রাথমিক আসক্তির পাত্র থেকে তাদের প্রক্ষোভ বিচ্যুত হয়ে মনশ্চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ তারা মনশ্চিকিৎসককেই তাদের আসক্তির পাত্র করে তুলেছে। যেমন হিষ্টেরিয়া রোগীর আসক্তির পাত্র হল তার মা বা বাবা। হিষ্টেরিয়া রোগীকে যখন মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্যে চিকিৎসা করা হয় তখন দেখা যায় যে তার সেই ঈডিপাস কমপ্লেক্সজনিত আসক্তি তার মা বা বাবাকে ত্যাগ করে মনশ্চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত হয়েছে। একেই আসক্তি সঞ্চালন (Transference) বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

1. What is defence mechanism ? Name a few defence mechanisms with illustrations.

Ans. (পৃঃ ১৩৯—পৃঃ ১৪৩)

2. Why and when does the individual take to defence mechanism ? Why are they also known as adjustment mechanism ?

Ans. (পৃঃ ১৩৯—পৃঃ ১৪৩)

3. Elucidate the various psychic mechanisms involved in the fulfilment of repressed wishes.

4. Write notes on :—

Regression, Rationalisation, Identification., Projection, Reaction Formation, Sublimation, Conversion & Transference.

চৌদ্দ

শিশুর মৌলিক চাহিদা (Basic Needs of Child)

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রধানতম লক্ষ্য হল শিশুর মনের স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিপুষ্টিকে অব্যাহত রাখা। মনের স্বাস্থ্যময় বিকাশ নির্ভর করে শিশুর বিভিন্ন চাহিদার পরিতৃপ্তির উপর। শিশুর কোনও বিশেষ চাহিদা যদি অতৃপ্ত থাকে তাহলে তার মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে জাগে অপসঙ্গতি। অপসঙ্গতি কথাটির অর্থ হল পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য। শিশু হোক্, যুবক হোক্ বা বৃদ্ধ হোক্ সকলেরই সুষ্ঠু জীবনযাত্রা সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের উপর নির্ভর করে। অতএব মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কার্যসূচীর একটি প্রধান অঙ্গ হল শিশুর চাহিদাগুলি পর্যবেক্ষণ করা এবং সেগুলির যথাযথ তৃপ্তির আয়োজন করা।

চাহিদাই আচরণের উৎস

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানবজীবনে চাহিদার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা মানব আচরণের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্তিকেই সর্বপ্রধান স্থান দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে ব্যক্তির সকল আচরণই তার প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানব আচরণের এই অসীম বৈচিত্র্য ও অগণনীয়তার পেছনে আছে তার বহুবিধ চাহিদা। তাঁরা বলেন যে মানব আচরণ এত জটিল ও বৈচিত্র্যময় যে নিছক প্রবৃত্তির দ্বারা সেগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। যে সব নিত্য পরিবর্তনশীল অসংখ্য চাহিদা প্রতিনিয়তই মানব মনে দেখা দিচ্ছে একমাত্র সেগুলির সাহায্যেই অগণিত ও বৈচিত্র্যময় আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এক কথায় তাঁদের মতে শিশুর চাহিদাই হল তার সকল আচরণের প্রকৃত উৎস। চাহিদা কথাটির অর্থ হল অভাববোধ। প্রাণী যখন কোন বিশেষ বস্তুর অভাব বোধ করে তখন তার মধ্যে সেই বস্তুটির চাহিদা জাগে। আর যখনই সেই বস্তুটি সে পেয়ে যায় তখনই তার অভাববোধ দূর হয়ে যায় এবং তার চাহিদাও আর থাকে না। এই চাহিদার জাগরণ আর চাহিদার তৃপ্তির মধ্যে কয়েকটি স্তর বা সোপান আছে। প্রাণীর মধ্যে কোনও একটি বিশেষ চাহিদা জাগলে তার মধ্যে দেখা দেয় একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি (tension) এবং এই অস্বস্তিকর অনুভূতিই প্রাণীকে সক্রিয় করে তোলে। অর্থাৎ সে তার সেই অস্বস্তিকর অনুভূতিটি

দূর করার জন্য নানাবিধ আচরণ সম্পন্ন করতে সুরু করে। যতই তার এই চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় ততই এই অস্বস্তিকর অনুভূতি বেড়ে চলে এবং প্রাণীও বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণ করে চলে এবং চেষ্টা করে ঐভাবে তার অভাবের বস্তুটি পেতে ও তার চাহিদাটি মেটাতে। বস্তুত প্রাণীর মধ্যে কোনও চাহিদা জাগা মানে তার দেহমনোগত যে সাম্যাবস্থা (equilibrium)[১] পূর্বে ছিল তা নষ্ট হয়ে যাওয়া। আর যতক্ষণ না প্রাণীর এই সাম্যাবস্থা ফিরে আসছে ততক্ষণ প্রাণীর প্রচেষ্টার শেষ হয় না। যে মুহূর্তে সে তার অভাবের বস্তুটি পায় সে মুহূর্তেই তার চাহিদাও দূর হয়ে যায় এবং তার অস্বস্তিকর অনুভূতি চলে গিয়ে তার দেহমনের লুপ্ত সাম্যাবস্থা ফিরে আসে।

প্রাণীর মধ্যে কোন চাহিদার উৎপত্তি এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে তার পরিতৃপ্তি অনেকটা চক্রের আকারে সংঘটিত হয়ে থাকে। নীচের ছবি থেকে এ সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

(চাহিদা→লক্ষ্য চক্র)
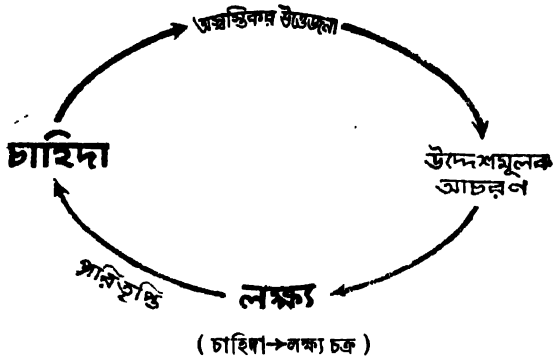
একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ক্ষুধা প্রাণী জীবনের একটি মৌলিক চাহিদা। এটি হল খাদ্যের অভাববোধ। প্রাণীর মধ্যে এই চাহিদাটি জাগলে তার দেহে মনে একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি দেখা দেয় এবং তা থেকে জন্ম নেয় খাদ্য-অন্বেষণরূপ আচরণটি। যতক্ষণ না প্রাণী তার সেই খাদ্য পাচ্ছে এবং তার দ্বারা তার ক্ষুধার চাহিদাটি মিটছে ততক্ষণ তার এই আচরণ চলতে থাকে। আর যেই তার সেই চাহিদাটি মিটে যায় সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণও বন্ধ হয়ে যায়। প্রাণীর সমস্ত আচরণই এইভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।

১। স্বাভাবিক অবস্থায় মানবদেহের সমস্ত দিকগুলির মধ্যে একটি সাম্যাবস্থা বিরাজ করে। তাকে শরীরতত্ত্বের ভাষায় দেহসাম্য (homoestasis) বলা হয়

অতএব দেখা যাচ্ছে যে চাহিদাই প্রাণীর সমস্ত কাজের প্রেষণা-শক্তি জুগিয়ে থাকে এবং চাহিদাই হল প্রাণী-আচরণের প্রধানতম উৎস।

চাহিদার প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ

মানব চাহিদাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, জৈবিক চাহিদা (Physiological or Organic Needs), আর দ্বিতীয়ত, মানসিক চাহিদা (Psychological Needs)। শেষোক্ত চাহিদাগুলিকে সামাজিক চাহিদাও Social Needs) বলা হয়।

জৈবিক চাহিদা

জৈবিক চাহিদা হল সেই সব চাহিদা যা শিশুকে তার দেহগত অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মেটাতে হয়। যেমন, অক্সিজেনের চাহিদা, বিশেষ একটা তাপমাত্রার চাহিদা, খাদ্য-জলের চাহিদা ইত্যাদি। এগুলি প্রধানত দেহের নানা যন্ত্রপাতির অভাব বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য দেখা দিয়ে থাকে এবং এগুলি থেকে উদ্ভূত আচরণ অপেক্ষাকৃত সরল ও সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়ে থাকে। এই চাহিদাগুলি সহজাত এবং সাধারণত যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলে থাকি অনেকটা সেই শ্রেণীর। যেহেতু এই চাহিদাগুলি নিয়ে প্রাণী জন্মায় সেহেতু এগুলিকে মৌলিক চাহিদাও (Primary Needs) বলা হয়ে থাকে। এই চাহিদাগুলি মোটামুটি সর্বজনীন এবং এগুলি থেকে উদ্ভূত আচরণগুলিও সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রায় একই রকমের হয়ে থাকে।

জন্মাবার পর শিশু যে সকল আচরণ সম্পন্ন করে সেগুলি এই জৈবিক বা মৌলিক চাহিদাগুলির দ্বারাই মূলত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তখন তার একমাত্র সমস্যা হল কেমন করে তার দেহগত অভাবগুলি মিটিয়ে সে পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখবে।

মানসিক বা সামাজিক চাহিদা

কিন্তু শিশু কিছুটা বড় হবার পর থেকেই জৈবিক অভাব ছাড়া আরও কতক-গুলি অভাব সে অনুভব করতে থাকে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের একটি বড় পার্থক্য হল এই যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের বাঁচাটা কেবলমাত্র দেহগত অর্থাৎ দেহের অভাব মেটাতে পারলেই তাদের কাজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বেঁচে থাকা দু'রকমের—প্রথমত, দেহগত, দ্বিতীয়ত, সমাজগত। দেহগত চাহিদাগুলি মেটাতে পারলেই দেহগত বাঁচার কাজ শেষ হল।

কিন্তু সামাজিক বাঁচার জন্য তাকে আরও অনেক চাহিদা মেটাতে হবে। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই এই সামাজিক বাঁচা তার কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ততই তার মধ্যে নিত্য নতুন অভাববোধ দেখা দেয়। তার কাছে ক্রমশ জৈবিক চাহিদার চেয়ে এই সামাজিক চাহিদাগুলির গুরুত্ব অধিক হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে এই ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাহিদাগুলি তার আচরণের প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। এই রকম একটি সামাজিক চাহিদা হল সহপাঠীদের মহলে শিশুর নিজের স্বীকৃতিলাভের চাহিদা। এই স্বীকৃতিলাভের জন্য শিশু বিভিন্ন ধরনের আচরণ করতে পারে এবং অনেক সময় স্বচ্ছন্দে তার জৈবিক চাহিদাকেও অস্বীকার করে থাকে।

এই সামাজিক বা মানসিক চাহিদার মধ্যে এমন কতকগুলি চাহিদা আছে যেগুলি তৃপ্ত না হলে শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক জীবনধারণ করা সম্ভব হয় না। জৈবিক চাহিদাগুলি অতৃপ্ত থাকলে যেমন শিশুর পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, তেমনই কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় মানসিক বা সামাজিক চাহিদা আছে যেগুলির পরিতৃপ্তি না হলে শিশুর সামাজিক বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। সেজন্য এগুলিকেও আমরা শিশুর মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

শিশুর এই সামাজিক চাহিদার সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না। এগুলি ক্রমবর্ধমান এবং পরিবর্তনশীল। পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী এগুলির প্রকৃতিও বিভিন্ন। তবে সাধারণ সভ্য মানুষের সমাজে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমতার জন্য তাদের পরিবেশের মধ্যে বেশ কিছুটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্য দেখা গেছে যে শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলি প্রায় সমস্ত সভ্য সমাজেই এক প্রকৃতির। সেগুলির একটি মোটামুটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

১। ভালবাসার চাহিদা

শিশুর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাটি হল ভালবাসার চাহিদা। ভালবাসার চাহিদাটি উভয়মুখী। শিশু চায় কাউকে ভালবাসতে আবার তেমনই চায় কারও ভালবাসা পেতে। ফ্রয়েডের মতে শিশুর ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা জন্মগত এবং তার এই ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা যদি কোন কারণে তৃপ্ত না হয় তাহলে তার মধ্যে দেখা দেয় গুরুতর প্রক্ষোভমূলক বিপর্যয়। তেমনই যদি সে কারও ভালবাসা না পায় তাহলেও তার মানসিক বিকাশ সব দিক দিয়ে ব্যাহত হয়ে ওঠে। শিশুর ক্রমবিকাশমান প্রক্ষোভগুলির স্বাস্থ্যকর বিকাশ ও সমন্বয়ন এই চাহিদাটির পরিতৃপ্তির উপর নির্ভর করে। এই কারণেই যে

সব শিশু অল্পবয়সে মা-বাবাকে হারায় বা কোনও কারণে তাদের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়, তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

২। দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদা

এই চাহিদাটির তৃপ্তি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। তার দৈহিক নিরাপত্তাবোধ তার মনের সুষ্ঠু বিকাশ ও প্রক্ষোভমূলক সমন্বয়নের জন্য অপরিহার্য। যদি কোনও কারণে শিশুর মনে দৈহিক নিরাপত্তাবোধের অভাব অনুভূত হয় তাহলে তার মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক সমতা বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং শিশুর মনে ভয় ও দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। যেখানে শিশুর দৈহিক নিরাপত্তার বোধ গুরুতর ভাবে ক্ষুণ্ণ হয় সেখানে মনোবিকারমূলক দুশ্চিন্তা (Anxiety Neurosis) সৃষ্টি হতে পারে। এই সব শিশুরা বড় হলে দুর্বল ব্যক্তিসত্তাসম্পন্ন অস্থিরমতি ও দৃঢ়সংকল্পহীন ব্যক্তি হয়ে ওঠে।

দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদা থেকে নানা রকম মানব আচরণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন, বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে পালান, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লওয়া, খাদ্য, জল অনুসন্ধান করা, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল তৈরী করা, ওষুধ আবিষ্কার করা, স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপন করা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা ইত্যাদি।

৩। সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা

দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদার পরই আসে সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা। শিশু যে সামাজিক পরিবেশে বাস করে সেই সমাজে তার একটি নিজস্ব ও স্বীকৃত স্থান থাকা প্রয়োজন। প্রথম জীবনে শিশু সামাজিক জীবনযাত্রার গুরুত্ব বোঝে না এবং সে একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন করে। একটু বড় হলেই তার মধ্যে সামাজিক প্রবণতা দেখা দেয়। তার একটি অভিব্যক্তি হল অপরের সঙ্গ খোঁজা ও নির্জনতা পরিহার করা। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই তার মধ্যে পিতামাতা, বাড়ী, স্কুল প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি অধিকার বোধ জাগতে থাকে। একে অন্তর্ভুক্তির চাহিদা (Need for Belongingness) বলা হয়। সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা শিশুর সুষ্ঠু মানসিক সংগঠনের পক্ষে অপরিহার্য। সমাজে সে যে পরিত্যক্ত নয় বরং তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব সমাজেরই এই ধারণা শিশুর মনে আত্মবিশ্বাস ও ভরসা সৃষ্টি করে। ফলে তার কোন প্রক্ষোভমূলক অপসঙ্গতি ঘটে না। আর যদি কোনও

কারণে এই চাহিদাটি অতৃপ্ত থাকে অর্থাৎ যদি শিশু বোঝে যে সমাজে সে পরিত্যক্ত বা সমাজে তার কোনও স্থান নেই তাহলে তার মধ্যে অতিগভীর প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি দেখা দেয়। শিশু বড় হলে এই চাহিদা থেকেই জন্মায় স্বদেশ, পূর্বপুরুষ, ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ।

সমাজে স্বীকৃতি লাভের এই চাহিদা থেকেই বহু বিভিন্ন আচরণের উৎপত্তি হতে পারে। সমাজ যাতে ব্যক্তিকে স্বীকার করে নেয় তার জন্য ব্যক্তি সমাজ-সৃষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলে এবং সমাজ নিষিদ্ধ আচরণগুলি থেকে নিবৃত্ত থাকে। বন্ধুত্ব, ভালবাসা, প্রতিবেশীর প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি নানা আচরণ এই চাহিদা থেকেই জন্মায়।

৪। আত্মস্বীকৃতির চাহিদা

শিশু যখন আরও বড় হতে স্বরু করে তখন এই চাহিদাটি তার মধ্যে দেখা দেয়। ছোট হোক্ বড় হোক্ প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের সম্বন্ধে একটি মূল্যবোধ আছে, সে মূল্য বেশীই হোক্ আর কমই হোক্। অপরের কাছে তার এই মূল্যের স্বীকৃতি পাওয়ার ইচ্ছাটাও মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। ছোট শিশুর মধ্যে এই চাহিদাটির আমরা পরিচয় পাই যখন দেখি যে তার সম্পন্ন করা কোন কাজের জন্য সে আমাদের প্রশংসার প্রত্যাশা করছে। যদি আমরা শিশুর কোন কাজের প্রশংসা করি তাহলে তার এই চাহিদাটির তৃপ্তি হয় এবং যদি তার কাজটিকে নিন্দা করি বা তাচ্ছিল্য করি তাহলে তার ঐ চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায়। বলা বাহুল্য এই চাহিদাটির তৃপ্তি থেকে শিশুর মধ্যে জাগে সন্তোষ, আত্মবিশ্বাস ও প্রক্ষোভমূলক সাম্য। এই কারণেই ছোট ছেলেমেয়েরা উল্লেখযোগ্য কিছু বললে বা করলে আমরা তাদের বিনা দ্বিধায় প্রশংসা করে থাকি। এই চাহিদার জন্যই শিশু পরীক্ষায় ভাল ফল করার, খেলার মাঠে অপরকে হারিয়ে দেবার বা অন্য কোনও উপায়ে নিজের পারদর্শিতা দেখানোর চেষ্টা করে। পরিণত জীবনে ঐশ্বর্যলাভ, যশ, ধন অর্জন বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের প্রচেষ্টা এই চাহিদারই অভিব্যক্তি। রাজনীতি, যুদ্ধ, রাষ্ট্রজীবন বা ছোট বড় সামাজিক অনুষ্ঠানে যাঁরা নেতৃত্ব গ্রহণ করে থাকেন—তাঁদের আচরণ মূলত এই চাহিদা থেকে জন্মে থাকে। আত্মসম্মানবোধ এই চাহিদারই অভিব্যক্তি এবং এই চাহিদার পরিতৃপ্তিতেই জন্মায় আত্মশ্লাঘা।

শিশুর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই চাহিদাটির তৃপ্তির প্রয়োজনীয়তা খুব

বেশী। শিশুর ক্রমবিকাশমান ইগো বা অহম্ এই চাহিদাটির পরিতৃপ্তি থেকেই তার পরিপুষ্টির খাদ্য সংগ্রহ করে। শিশুর জন্মের সময় অহম্ পূর্ণভাবে বিকশিত থাকে না। বাস্তবের সঙ্গে দৈনন্দিন সংঘাতে অহম্ ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে এবং ধীরে ধীরে পূর্ণরূপ গ্রহণ করে। এ সময় শিশুর অহমের বিকাশকে পরিপুষ্ট হতে সাহায্য করে তার আত্মস্বীকৃতির চাহিদাটির পরিতৃপ্তি। যে শিশুর এই চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় তার অহম্ পূর্ণ ও স্বাস্থ্যময় বিকাশের সুযোগ পায় না এবং দুর্বল হয়ে গড়ে ওঠে।

৫। নূতনত্বের চাহিদা

পরিতৃপ্তি মানুষের কাম্য হলেও কোনও বস্তুর অভাব পরিতৃপ্ত হলেই শিশুর সেই পুরাতন বস্তুটির প্রতি বিরাগ দেখা দেয় এবং তার মধ্যে নতুন বস্তু পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। এই নতুনত্বের আকাঙ্ক্ষা শিশুর নানা আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। নতুন জামাকাপড় পরা থেকে সুরু করে নতুন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া, নতুন কিছু সংগ্রহ করা, নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করা প্রভৃতি যে কোন নতুন অভিজ্ঞতালাভই এই চাহিদাটির পর্যায়ে পড়ে।

৬। সক্রিয়তার চাহিদা

শিশুর ক্ষেত্রে সক্রিয়তার চাহিদাও একটি অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা। সক্রিয়তা প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম। যে জীবনীশক্তি নিয়ে প্রাণী জন্মায় কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্য তার সবটা ব্যয়িত হয়ে যায় না। অবশিষ্ট শক্তি তখন নানা কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। এই জন্যই শিশুর আচরণের মধ্যে খেলা একটি বড় স্থান অধিকার করে আছে। খেলার মাধ্যমে শিশু তার সক্রিয়তার চাহিদাটি তৃপ্ত করে। তাছাড়া শিশুর অন্তর্নিহিত নানা রকম শক্তি এবং দক্ষতাও তার বিভিন্ন সৃজনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে এই সক্রিয়তার চাহিদা থেকে জন্ম নিয়েছে শিল্প-কলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি। খেলাধুলা, উৎসব, ভ্রমণ প্রভৃতিও এই চাহিদা থেকে সৃষ্ট হয়েছে। ছোট শিশুর মধ্যে এ চাহিদাটির প্রকাশ খুব বেশী দেখা যায় এবং এটিকে সৃজনমূলক পথে নিয়ে যেতে পারলে শিশুর সৃজনী-শক্তি সুষ্ঠু বিকাশলাভ করেতে পারে।

৭। স্বাধীনতার চাহিদা

ইচ্ছামত কথা বলা, কাজ করা এবং চলাফেরা করার চাহিদাও শিশুর

মৌলিক চাহিদাগুলির অন্তর্গত। বিশেষ করে প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান চাহিদা। শিশুরা যৌবনে পা দিলে তাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলা ফেরা করা, কাজ করা, দায়িত্ব বহন করা, নিজের উৎসাহে কিছু করা ইত্যাদি ইচ্ছাগুলি দেখা দেয়। এ চাহিদা থেকে জন্মায় সকল রকম বন্ধন, শাসন, নিয়ম-শৃঙ্খলা, বিধিনিষেধ প্রভৃতি থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রচেষ্টা। সাধারণত স্কুলে বা বাড়ীতে শিশুর এই চাহিদাটির প্রতি সুবিচার করা হয় না এবং শিক্ষার পরিবেশকে বিধিনিষেধের নাগপাশে এমন ভাবে শৃঙ্খলিত করে ফেলা হয় যার ফলে শিশুর মৌলিক চাহিদাটি তৃপ্ত হবার সুযোগ পায় না। এই জন্য অতিরিক্ত শাসনধর্মী বিদ্যালয় বা গৃহ পরিবেশ শিশুমাত্রেই এড়িয়ে চলে বা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায়। নতুন কিছু করা, নতুন জিনিষ সৃষ্টি করা, নতুন কোন চিন্তা করা—এ সবই মূলত এই চাহিদাটিরই অভিব্যক্তি।

৮। স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা

শিশুমাত্রেই শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য চায়। নিছক দেহগত অস্তিত্ব বজায় রাখাতেই সে সন্তুষ্ট নয়। দৈহিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের একটি ন্যূনতম মান তৃপ্তিকর জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য। পরিণত বয়সে এই চাহিদা থেকে উদ্ভূত আচরণ হল আর্থিক সঙ্গতি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, দারিদ্র্য থেকে দূরে থাকা, শারীরিক কষ্টকর বা মানসিক অস্বস্তিকর কিছু এড়িয়ে যাওয়া, চাকরি অনুসন্ধান করা, অর্থ সঞ্চয় করা ইত্যাদি।

৯। যৌনতৃপ্তির চাহিদা

এই চাহিদাটি মূলত শরীরতত্ত্বমূলক এবং যৌন-উত্তেজনার তৃপ্তিই এর প্রধান লক্ষ্য। যৌনমূলক সকল আচরণই এই চাহিদাটি থেকে প্রসূত হয়। পূর্বরাগ, বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন যাপন প্রভৃতি আচরণ এই পর্যায়ে পড়ে। শিশুর ক্ষেত্রে এই চাহিদাটি সাধারণত যৌন কৌতূহল ও যৌনবিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানার ইচ্ছারূপে দেখা দেয়।

শিশুর চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য

(Child's Needs and Mental Hygiene)

শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলির উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার দৈহিক ও মানসিক প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াগুলির সুষ্ঠু পরিণতি। যদি শিশুর কোন বিশেষ মৌলিক চাহিদা তৃপ্ত না হয় তবে চাহিদাজনিত যে অস্বস্তিকর উত্তেজনা তার

মধ্যে সৃষ্ট হয় তা কখনই দূর হয় না বরং ক্রমশ বেড়েই চলে। এর ফলে শিশু তার চাহিদা মেটানোর জন্য আরও নানা রকম নতুন নতুন আচরণ করে। তার পরিচিত ও অভ্যস্ত আচরণগুলি শেষ হয়ে গেলে সে নতুন ও অনভ্যস্ত আচরণ করে দেখে যে সেগুলি চাহিদা মেটাতে পারে কিনা এবং যতক্ষণ না অন্তত আংশিকভাবে বা বিকৃতরূপেও তার চাহিদা সে মেটাতে পারছে ততক্ষণ সে তার প্রচেষ্টা বন্ধ করে না। এই কারণে শিশুর মধ্যে চাহিদা জাগলে নানারূপ অদ্ভুত ও অসঙ্গত আচরণের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সাধারণত পিতামাতা বা শিক্ষকেরা এই আচরণগুলির যথার্থ কারণ নির্ণয় করতে পারেন না এবং মনে করেন যে দুষ্টবুদ্ধি বা খামখেয়ালের জন্যই শিশু এই রকম আচরণ করছে। বস্তুত যাকে আমরা সাধারণত সমস্যামূলক আচরণ (Problem behaviour) বলে থাকি সেটি স্বাভাবিক পন্থায় চাহিদা তৃপ্ত করতে না পারায় অস্বাভাবিক পথে তা তৃপ্ত করার জন্য অনুষ্ঠিত পরিপূরক আচরণ (Compensatory behaviour) ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছান যখন শিশুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন সে সেই লক্ষ্যের
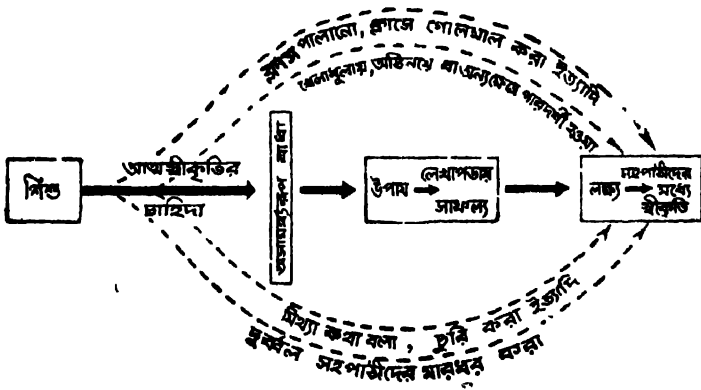
[স্বাভাবিক পথে চাহিদা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় শিশু নানাবিধ পরিপূরক আচরণ সম্পন্ন করে তার চাহিদা তৃপ্তির চেষ্টা করছে]

স্থানে একটি বিকল্প লক্ষ্য (Substituted goal) স্থাপন করে এবং সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌছানর মধ্যে দিয়ে নিজে চাহিদাটি তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। পরিবেশের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে খাপ খাওয়াতে না পারা বা সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্যকে অপসঙ্গতি (Maladjustment) এবং এই ধরনের শিশুদের অপসঙ্গতি-সম্পন্ন শিশু (Maladjusted child) বলা হয়।

যেমন স্কুল পরিবেশে সহপাঠীদের মধ্যে শিশুর আত্মস্বীকৃতি লাভের স্বাভাবিক পথ হল লেখাপড়ায় উৎকর্ষতা দেখান। এখন কোন কারণে যদি একটি বিশেষ শিশুর এ চাহিদাটি তৃপ্ত না হয় তাহলে সেই শিশু নানা পরিপূরক আচরণের আশ্রয় নেয়, যেমন ক্লাসে গোলমাল করা, ক্লাস পালান, মারামারি করা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা ইত্যাদি। এই সব আচরণের দ্বারা যে স্বীকৃতি স্বাভাবিক পন্থায় সে পায়নি সেই স্বীকৃতি সে অস্বাভাবিক পন্থায় পাবার চেষ্টা করে। অবশ্য সব সময়েই পরিপূরক আচরণটি যে অবাঞ্ছিত বা মন্দ হয় তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই বিকল্প আচরণটি আবার শিশু এবং সমাজের পক্ষে শুভও হতে পারে। যেমন, যে ছেলে লেখাপড়ায় ভাল হতে পারল না, সে হয়ত খেলাধুলা, অভিনয় বা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা দেখিয়ে তার ঈপ্সিত আত্মস্বীকৃতি আদায় করল। সেক্ষেত্রে অবশ্য আমরা শিশুটিকে অপসঙ্গতিসম্পন্ন বলে বর্ণনা করি না।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে চাহিদার সহজ ও স্বাভাবিক তৃপ্তি হল শিশুর সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তা গঠনের একমাত্র উপায়। এই জন্যই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রথম ও সর্বপ্রধান অনুশাসন হল শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখার জন্য তার মৌলিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করার আয়োজন করা। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্য থেকেই জন্ম নিয়েছে বর্তমান শতাব্দীর শিক্ষাকে শিশুর চাহিদা কেন্দ্রিক (need-centred) করে তোলার বিশ্বব্যাপী আন্দোলন।

শিক্ষক ও পিতামাতার কর্তব্য

এদিক দিয়ে শিক্ষক, পিতামাতা প্রভৃতিদের করণীয় অনেক কিছু আছে। যথা—

প্রথমত, গৃহে ও বিদ্যালয়ে শিশুর চাহিদাগুলি যাতে অনর্থক বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্য সমস্ত চাহিদার পূর্ণ তৃপ্তি সম্ভব নয়। সকল ক্ষেত্রে যাতে শিশু বাঞ্ছিত পরিপূরক আচরণ গ্রহণ করে সেদিকে যত্ন নিতে হবে এবং তার উপযোগী সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যে সব কাজকর্মকে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী বলা হয় সেগুলির পর্যাপ্ত আয়োজন রাখতে হবে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে। কারণ সেই সব বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর চাহিদা-গুলি পরিতৃপ্ত হতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার পরিবেশকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিশুর চাহিদাগুলি তৃপ্তিলাভের সুযোগ পায়। উদাহরণস্বরূপ, শিশুর ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদাটি একটি অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা। এই চাহিদাটির তৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। স্কুল পরিবেশটি

এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যেখানে শিশু সহজভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে এবং অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে মিলেমিশে সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে নিজের একটি সুনির্দিষ্ট স্থান বেছে নেবে। সেই রকম আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল তার আত্মস্বীকৃতির চাহিদা। এ চাহিদাটির তৃপ্তির উপর শিশুর ব্যাক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠন ও মানসিক শান্তি নির্ভর করে। তাই বিদ্যালয়ে এটির যথাযথ তৃপ্তির আয়োজন অবশ্যই রাখতে হবে। কেবলমাত্র লেখাপড়ায় ভাল হলেই স্বীকৃতি দানের যে সংকীর্ণ ব্যবস্থা সাধারণ স্কুলে প্রচলিত আছে তাতে বহু শিশুর আত্মস্বীকৃতির চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায়। সেইজন্য বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখিয়ে স্বীকৃতিলাভের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে সকল প্রকার প্রতিভা-সম্পন্ন শিশুই তার প্রাপ্য স্বীকৃতি পেতে পারে। সেই রকম শিশুর নতুনত্বের চাহিদা এবং সক্রিয়তার চাহিদা যাতে যথাযথ পরিতৃপ্তি লাভ করে তার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা শিশুকে দিতে হবে। খেলাধূলা, অভিনয়, অঙ্কন, ভাস্কর্য প্রভৃতি নানা নতুন ও সৃজনমূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশুর এই অতিপ্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি যাতে তৃপ্তিলাভ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

সব শেষে মনে রাখতে হবে যে শিশুর সমস্যামূলক আচরণের প্রকৃত কারণ হল তার মৌলিক চাহিদাগুলির অতৃপ্তি। অতএব যদি কোন অবাঞ্ছিত আচরণকে দূর করতে হয় তবে নিছক আচরণের চিকিৎসা না করে তার মূল কারণ যে অতৃপ্ত চাহিদাটি তার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক কালে যে সব শিশু পরিচালনাগার (Child Guidance Clinic) স্থাপিত হয়েছে সেগুলির কর্মসূচী মূলত এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ সম্বন্ধে 'তেইশ' পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

1. What is need? How does it influence human behaviours? How many kinds of needs are there?
   Ans. (পৃঃ ১৪৪—পৃঃ ১৫৩)

2. Give a short description of the basic needs of a child. Show how do they form the very foundation of his personality.
   Ans. (পৃঃ ১৪৭—পৃঃ ১৫৩)

3. How can a school environment help the satisfaction of the basic needs of a child and ensure the development of a healthy personality?
   Ans. (পৃঃ ১৫১—পৃঃ ১৫৪)

4. Write an eassay on Basic needs of children.
   Ans. (পৃঃ ১৪০—পৃঃ ১৫৪)

5. Mention a few basic psychological needs of children. Show how the mental health of children is dependent on the proper satisfaction of such needs.

   Ans. (পৃঃ ১৪৬—পৃঃ ১৫৪)

পনেরো

অপসঙ্গতি (Maladjustment)

আমরা ইতিপূর্বে শিশুদের আচরণসমস্যা ও অপরাধপরায়ণতা নিয়ে আলোচনা করেছি। সে প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে শিশুদেব সকল রকম মানসিক ব্যাধি বা বিকলতাব মূলেই আছে পবিবেশের সঙ্গে তাদের সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য। একেই এক কথায় নাম দেওয়া হয়েছে অপসঙ্গতি (maladjustment)।

শিশুমাত্রেই জন্মায় কতকগুলি চাহিদা নিয়ে, সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে জৈবিক চাহিদা। যেমন —অক্সিজেন, উত্তাপ, খাদ্য জল, ঘুম প্রভৃতিব চাহিদা। এগুলি তৃপ্ত না হলে শিশুর দেহগত অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে এবং তাব পক্ষে জীবনধাবণ কবা সম্ভব হয় না।

জৈবিক চাহিদাব চেয়ে অনেক শক্তিশালী এবং সংখ্যাতেও অনেক বেশী হল মানসিক বা মনোবিজ্ঞানমূলক চাহিদাগুলি। এগুলিব মধ্যে কতকগুলি চাহিদা ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপব প্রতিষ্ঠিত। আবার কতকগুলি হল তার সুষ্ঠু সামাজিক জীবনযাপনেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদাব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভালবাসার চাহিদা, নিবাপত্তাব চাহিদা, কৌতূহল তৃপ্তির চাহিদা, সক্রিয়তাব চাহিদা, আত্মতৃপ্তিব চাহিদা ইত্যাদি। এই চাহিদাগুলির তৃপ্তির উপর নির্ভর কবছে ব্যক্তির নিজস্ব প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিসাধন এবং ব্যক্তিসত্তাব সুষ্ঠু বিকাশ। মানসিক চাহিদাব দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে ব্যক্তির সামাজিক চাহিদাগুলি। যেমন, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, সমাজ জীবনের চাহিদা, সঙ্গলাভের চাহিদা। শিশুর সুষ্ঠু সমাজ জীবন যাপনের জন্য এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি অপরিহার্য।

শিশুব এই বিভিন্ন প্রকৃতির চাহিদাগুলি যদি যথাযথ তৃপ্ত হয় তবেই তার মানসিক সংগঠনের বিকাশ বাঞ্ছিত পথে অগ্রসর হবে এবং তার ব্যক্তিসত্তার সুষম পরিণতিতে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না। এক কথায় সে তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হবে। কিন্তু যদি কোন কারণে তার কোনও চাহিদার তৃপ্তি না হয় তাহলে তার মধ্যে দেখা দেবে প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি এবং মানসিক দ্বন্দ্ব। সেই প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি এবং মানসিক দ্বন্দ্ব তার বাহ্যিক আচরণকে প্রভাবিত করবে এবং তার ফলে সে নানা অবাঞ্ছিত ও

অসামাজিক আচরণ সম্পন্ন করবে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে অপসঙ্গতি। অতএব সাধারণভাবে বলা চলতে পারে যে অপসঙ্গতি মাত্রেরই কারণ হল শিশুর কোন চাহিদার তৃপ্তি না হওয়া। অবশ্য শিশুর সকল চাহিদার তৃপ্তি না হলেই অপসঙ্গতি দেখা দেবে তা নয়। শিশুর এমন বহু চাহিদা আছে যেগুলি অনেক সময়েই অতৃপ্ত থেকে যায় অথচ সেগুলি তার অপসঙ্গতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না বা সেগুলির জন্য সে কোন প্রকার অবাঞ্ছিত ও অস্বাভাবিক আচরণও সম্পন্ন করে না। বস্তুত শিশুর মধ্যে যখন কোন চাহিদা দেখা দেয় তখন সেই চাহিদাটির পরিণতি তিনটি বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। যথা—

প্রথমত, চাহিদাটি পূর্ণভাবে তৃপ্ত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, চাহিদাটি একেবারেই তৃপ্ত না হতে পারে।

তৃতীয়ত, চাহিদাটির আংশিক তৃপ্তি হতে পারে।

প্রথম ক্ষেত্রে শিশু প্রক্ষোভমূলক তৃপ্তি অনুভব করে, তার মানসিক সমতা অক্ষুন্ন থাকে এবং তার মধ্যে কোনরকম অপসঙ্গতি ঘটে না। মানসিক স্বাস্থ্য-বিধির দিক দিয়ে এটি মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার সব চেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে গুরুতর প্রাক্ষোভিক বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে, তার মানসিক সমতার মধ্যে বিপর্যয় আসতে পারে এবং তার ফলে সে নানা অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর আচরণ করতে পারে। অবশ্য চাহিদাটি যদি গুরুতর প্রকৃতির না হয় তাহলে শিশুর মানসিক দ্বন্দ্ব ক্ষণস্থায়ী হতে পারে এবং কিছুদিন পরে সে আবার তার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যত শিশু তার ব্যর্থতা বা অতৃপ্তির কথা ভুলে গেলেও অতৃপ্ত চাহিদাটি তার অচেতনে অবদমিত হয়ে বাস করে এবং সুযোগ পেলেই তার সচেতন আচরণকে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই প্রভাবিত করে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণভাবে শিশুর বাহ্যিক আচরণের মধ্যে কোন অপসঙ্গতি খুঁজে না পাওয়া গেলেও সেটি তার মনের গভীর তলদেশে গুরুতর অপসঙ্গতির রূপে বিস্ফোরকের শক্তি নিয়ে সুপ্ত থাকে এবং একদিকে যেমন তার মনে প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তেমনই সুযোগমত তার সচেতন আচরণকে বিপথগামী করে তোলে। এই দুটি চরম সম্ভাবনা ছাড়া তৃতীয় সম্ভাবনাটি হল চাহিদাটির আংশিক পরিতৃপ্তি। শিশু যদি তার আংশিক পরিতৃপ্তিকে মেনে নেয় তাহলে তার মধ্যে বিশেষ অপসঙ্গতি দেখা দেয় না। কিন্তু যদি সে তা না করে তাহলে তার চাহিদার বাকী অতৃপ্তিটুকুর জন্য তার

মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। তবে বলা বাহুল্য পূর্ণ অতৃপ্তির ক্ষেত্রের চেয়ে আংশিক অতৃপ্তির ক্ষেত্রে অপসঙ্গতির মাত্রা অনেক কম হয়ে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে অপসঙ্গতি নির্ভর করছে ব্যক্তির চাহিদাটির অতৃপ্তির উপর বিশেষ করে সেই অতৃপ্তির পরিমাণ বা মাত্রার উপর। চাহিদাটি ব্যক্তির কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তার অতৃপ্তি তার মধ্যে কতটা প্রাক্ষোভিক বিপর্যয় আনবে, এই দুটি ব্যাপারের দ্বারাই তার অপসঙ্গতির প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ধারিত হয়।

বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণ

(Substituted Goal and Compensatory Behaviour)

ব্যক্তির মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিলে তা তার মনের মধ্যে প্রাক্ষোভিক বিপর্যয় ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং বাইরে এক ধরনের বিশেষ আচরণের রূপ নেয়। এই আচরণকে আমরা পরিপূরক আচরণ (Compensatory behaviour) নাম দিতে পারি। ব্যক্তির চাহিদাটি তৃপ্ত না হওয়ায় যে ঈপ্সিত মানসিক তৃপ্তি থেকে সে বঞ্চিত হয় সেই মানসিক তৃপ্তি সে পেতে চেষ্টা করে অন্য আর এক ধরনের আচরণ সম্পন্ন করে। এই নতুন আচরণটি যদিও তাকে তার পূর্বের প্রকৃত লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে পারে না এবং অনেক সময় তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে নিয়ে যায়, তবু যে মানসিক তৃপ্তি সে তার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছলে পেত, সেই তৃপ্তিই সে পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পায় এই নতুন বা পরিবর্তিত লক্ষ্যে পৌছানর মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ সে তার প্রকৃত লক্ষ্যের স্থানে আর একটি নতুন বা বিকল্প লক্ষ্য স্থাপন করে এবং সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌছানর অসামর্থ্যকে পূরণ করে। অতএব অপসঙ্গতির ক্ষেত্রমাত্রকেই বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি স্তর পাই, যথা, (ক) ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছনর পূর্ণ বা আংশিক অক্ষমতা। এই অক্ষমতার কারণ ব্যক্তির নিজস্ব অসামর্থ্য হতে পারে আবার পারিবেশিক শক্তির প্রতিকূলতাও হতে পারে। (খ) প্রকৃত লক্ষ্যের স্থানে একটি বিকল্প লক্ষ্য (substituted goal) স্থাপন। (গ) সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌছানর জন্য পরিপূরক আচরণ সম্পাদন। এদিক দিয়ে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ মাত্রেই হচ্ছে বঞ্চিত তৃপ্তিকে অন্য পথে লাভ করার প্রচেষ্টা। অতএব সব অপসঙ্গতিমূলক আচরণকেই আমরা এক ধরনের পরিপূরক আচরণ বলতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ, একটি ছেলে ক্লাসে ভাল ফল করে সকলের কাছে তার

কৃতিত্বের স্বীকৃতি পেতে চায়। এখানে তার আত্মস্বীকৃতি বা সকলের কাছে নিজের পরিচিতি লাভের ইচ্ছাই হল তার চাহিদা। সাধারণ বিদ্যালয়ে এই চাহিদাটির তৃপ্তি হয় পরীক্ষায় ভাল ফল দেখালে বা প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি স্থান অধিকার করলে। অতএব ছেলেটির প্রকৃত লক্ষ্য হল পরীক্ষায় ভাল ফল দেখান। এখন মনে করা যাক যে ছেলেটি সামর্থ্যের অভাবের জন্য পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে পারল না, ফলে তার পরিচিতি লাভের চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে গেল। তখন সে পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে আত্মস্বীকৃতি লাভের পরিবর্তে অন্য উপায়ে, যেমন তার চেয়ে কম বয়সী ছেলেদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে নিজের বঞ্চিত আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করতে লাগল। অর্থাৎ সে প্রকৃত লক্ষ্যের পরিবর্তে একটি বিকল্প লক্ষ্য স্থাপন করল। এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য ছোট বা দুর্বল ছেলেদের উপর অত্যাচার করা রূপ পরিপূরক আচরণটি সম্পন্ন করা সুরু করল। এক কথায় ছেলেটির মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিল।

বিকল্প লক্ষ্য এবং এই পরিপূরক আচরণ যে সব সময়েই অবাঞ্ছিত এবং অসামাজিক রূপ নেবে তার কোন অর্থ নেই।[১] অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে প্রকৃত লক্ষ্যের পরিবর্তে শিশু যে সমস্ত বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণ সম্পন্ন করে সেগুলি বাঞ্ছিত এবং তাদের পক্ষে মঙ্গলকরও হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, উপরের দৃষ্টান্তে ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখাতে না পেরে যদি খেলাধূলা, অঙ্কন, সঙ্গীত বা অভিনয় ইত্যাদির কোন একটিতে পারদর্শিতা দেখিয়ে দশজনের কাছ থেকে তার কাম্য স্বীকৃতি আদায় করে তাহলে তার বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণ দুইই কাম্য ও মঙ্গলকর হয়ে দাঁড়ায়। মূলগতভাবে যদিও এও এক ধরনের অপসঙ্গতি তবু আমরা একে অপসঙ্গতি বলি না। কেবলমাত্র সেই সব পরিপূরক আচরণকেই আমরা অপসঙ্গতির পর্যায়ে ফেলি যেগুলি সমাজ অনুমোদিত নয় কিবা ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর। আবার ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর বলতে আমরা সেই সব আচরণকে বুঝি যেগুলি ব্যক্তির মনের দ্বন্দ্বের স্থায়ী মীমাংসা আনতে পারে না এবং ব্যক্তি তার মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয় না। সাধারণ অপসঙ্গতিমূলক আচরণগুলি সাময়িকভাবে এবং আংশিকভাবে ব্যক্তির চাহিদার তৃপ্তি আনতে সক্ষম হলেও সেগুলি ব্যক্তির মনের স্থায়ী শান্তি বা সমতা আনতে পারে না।

১। পৃঃ ১৫২ চিত্র দ্রষ্টব্য

চাহিদামাত্রেরই অতৃপ্তি অপসঙ্গতি সৃষ্টি করে না। এমন কতকগুলি চাহিদা আছে যেগুলির অতৃপ্তি মানসিক দ্বন্দ্ব ও প্রক্ষোভমূলক বিক্ষোভ সৃষ্টি করে বটে কিন্তু সেগুলি নিতান্তই সাময়িক প্রকৃতির এবং স্থায়ী নয়। কিন্তু বিশেষ কতকগুলি চাহিদা আছে যেগুলির প্রভাব প্রায় সকল মানুষেরই উপর বেশ উল্লেখযোগ্য এবং সেগুলির অতৃপ্তি মনের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটায়।

শিশুর সুষ্ঠু জীবন সংগঠনে সুসঙ্গতির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। বিশেষ করে যখন ছেলেমেয়েরা কৈশোর পার হয়ে যৌবনের তোরণদ্বারে প্রবেশ করে তখন তাদের মধ্যে কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার সৃষ্টি হয়। এই সব চাহিদা যদি যথাযথভাবে তৃপ্ত না হয় তাহলে প্রাপ্তযৌবনদের (Adolescent) জীবনে গুরুতর ব্যাঘাত দেখা দেয় এবং তাদের শিক্ষা, প্রাক্ষোভিক সংগঠন, ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ সবই বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হয়ে ওঠে।

অপসঙ্গতির কারণাবলী (Causes of Maladjustment)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির মধ্যে নানা কারণে অপসঙ্গতি ঘটতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা সেগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে অপসঙ্গতির প্রধান কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। সময় সময় এই কারণগুলি বাইরে থেকে ধরা যায়। কিন্তু এমন অনেক সময় আসে যখন অপসঙ্গতির কারণগুলি বাইরে থেকে বোঝা যায় না এবং মনঃসমীক্ষণমূলক বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। নীচে অপসঙ্গতির কয়েকটি প্রধান প্রধান কারণের বর্ণনা দেওয়া হল।

নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি (Sense of Insecurity)

নিরাপত্তার অভাববোধ অপসঙ্গতির একটি বড় কারণ। এই অনুভূতিটি দেখা দেয় যখন শিশু নিজেকে সকলের কাছে অবাঞ্ছিত বা পরিত্যক্ত বলে মনে করে এবং তার মনে ধারণা হয় যে তার পরিবেশের শক্তিগুলি তার নিরাপত্তা এবং মঙ্গলকে বিপন্ন করে তুলেছে। এই রকম মনোভাবের দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিদের স্কুলে, কলেজে, কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই দেখা যায়। এই ধরনের ব্যক্তিরা সব সময়ই সঙ্কুচিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে ও নতুন কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে ভয় পায়। স্কুলে এই শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা ক্লাসে পড়া বলতে ইতস্তত করে এবং সব সময়ই অপরের বিদ্রূপ বা নিন্দার ভয়ে নিজে থেকে কিছু করতে সাহস করে না। সাধারণত অতি শৈশবে এই নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি বেশী মাত্রায় থাকে।

অবশ্য যে সব পিতামাতা শিশুর বিভিন্ন চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং সেগুলির যথাযথ পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের পরিত্যক্ত বা অবহেলিত বলে মনে করে না এবং তাদের মধ্যে কোন নিরাপত্তাহীনতার বোধও জন্মায় না। কিন্তু যেখানে পিতামাতা এবং বয়স্করা শিশুর প্রতি প্রতিকূল বা বৈষম্যমূলক আচরণ করেন সেখানে শিশু নিজেকে পরিত্যক্ত এবং অবাঞ্ছিত বলে মনে করে। তার ফলে তার মধ্যে গুরুতর অপসঙ্গতি দেখা দেয় এবং তার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে।

স্কুলে নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ দেখা দেয়। তার মধ্যে বিশেষ কতকগুলির নাম করা যেতে পারে। যেমন, কঠিন কাজের চাপ, রূঢ় মন্তব্য, কঠোর বা নিষ্ঠুর শাস্তিদান, সহানুভূতির অভাব, অবহেলা, বিদ্রূপ ইত্যাদি। এছাড়াও পিতামাতার নিজেদের মধ্যে কলহ, জাতিগত বা ধর্মগত কারণ, বৃহত্তর সমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি কারণেও শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ জাগে।

নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতিকে দূর করতে হলে এই অনুভূতিটির মৌলিক কারণটি খুঁজে বার করতে হবে। স্কুল এবং বাড়ী উভয় স্থানেই এর চিকিৎসার আয়োজন করতে হবে। শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে সে সত্য সত্যই অবহেলিত বা অবাঞ্ছিত নয় এবং তার কাজের যথাযোগ্য সমাদর যাতে সে পায় তা দেখতে হবে। বিদ্রূপ, শ্লেষোক্তি, লজ্জা দেওয়া, ব্যক্তিগত সমালোচনা ইত্যাদি ঘটনাগুলিকে অতি সতর্কতার সঙ্গে বর্জন করতে হবে। তার নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ যাতে মুক্তি পায় তার পর্যাপ্ত সুযোগ তাকে দিতে হবে। খেলাধুলা, আঁকা, লেখা, নতুন নতুন জিনিষ তৈরী করা, বেড়ানো ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তার নিরাপত্তাহীনতার বোধকে যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের বোধে রূপান্তরিত করতে হবে।

আক্রমণমূলক মনোভাব (Sense of Hostility)

(অপসঙ্গতির আর একটি কারণ হল আক্রমণমূলক অনুভূতি। দেখা গেছে যে ব্যক্তির মধ্যে নানা কারণে বিভিন্ন প্রকৃতির আক্রমণাত্মক মনোভাব জন্মলাভ করে এবং তার ফলে তার আচরণের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা দেয়। তার এই আক্রমণাত্মক মনোভাব যে অন্যায় সে সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সচেতন থাকে এবং যাতে তার এই মনোভাব তার আচরণে প্রকাশ না পায় সে সম্বন্ধে সে সচেষ্ট হয়। তার ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তার বাহ্যিক আচরণ এই দ্বন্দ্বের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। কারেন হর্নের (Karen Horney) পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে মনোবিকারমূলক দুশ্চিন্তা অনেক ক্ষেত্রে এই আক্রমণাত্মক অনুভূতি থেকে জন্ম লাভ করে থাকে।

ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে আক্রমণমূলক মনোভাব নানা আচরণের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। ছোট ভাইবোনদের বা ক্লাসের অপেক্ষাকৃত দুর্বল

ছেলেমেয়েদের আঘাত করা বা উত্যক্ত করা এই মনোভাবের একটি সাধারণ অভিব্যক্তি। যাদের মধ্যে এই মনোভাব খুব বেশী তাদের প্রায়ই সমবয়সীদের সঙ্গে ঝগড়া, মারামারি করতে দেখা যায়। পশুপাখীদের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করাটাও অনেক সময় এই মনোভাব থেকে জন্মায়। উৎপীড়ক শিশু এ সব ক্ষেত্রে জানে যে পশুপাখীরা নিতান্তই অসহায় এবং কোনরূপ প্রতিশোধ নিতে পারবে না। অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে জড় বস্তুর প্রতি আক্রমণমূলক মনোভাব দেখা দিয়ে থাকে। ডেস্কে নাম লেখা বা খোদাই করা, জানালা, দরজা ভাঙ্গা, চেয়ারের গদি ছুরি দিয়ে কাটা, স্কুল, লাইব্রেরী বা সভাগৃহের অনিষ্ট করা প্রভৃতি আচরণগুলি আক্রমণমূলক মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ।

শিশুর মধ্যে আক্রমণমূলক অনুভূতি সৃষ্টি হবার প্রধানতম কারণ হল তার প্রতি তার পিতামাতা প্রভৃতির বৈষম্যমূলক আচরণ। যে সব পিতামাতা নিজেরাই মানসিক বিপর্যয়ে ভোগেন এবং যাঁদের নিজেদের মধ্যে নিরাপত্তা-বোধের অভাব থাকে তাঁরা তাঁদের শিশুদের মধ্যে এই অতি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার মনোভাবটি কখনই সৃষ্টি করতে পারেন না।

যে সব পিতামাতা স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণচেতা, পক্ষপাতপূর্ণ এবং ছেলেমেয়েদের আন্তরিকভাবে ভালবাসতে জানেন না তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তীব্র আক্রমণমূলক মনোভাব জেগে থাকে। তাছাড়া কোন বিশেষ ছেলে বা মেয়েকে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী ভালবাসা শিশুর মধ্যে আক্রমণমূলক মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার একটি বড় কারণ। অনেক সময় দেখা যায় যে ছেলেমেয়েদের প্রতি পিতামাতার আচরণ কখনও খুব কঠোর আবার কখনও খুব কোমল হয়। ফলে তাঁদের আচরণের মধ্যে কোন রকম সামঞ্জস্য বা সংহতি থাকে না। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এই ধরনের সামঞ্জস্যহীন বৈষম্যধর্মী আচরণের ফল নিছক কঠোর বা শাসনমূলক আচরণের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিকর। এ ছাড়া শিশুদের বন্ধু নির্বাচনে বাধাদান, তাদের কোন কাজ বা মতামতকে বিদ্রূপ করা, তাদের আচরণ বা লক্ষ্যের সমালোচনা করা প্রভৃতি আচরণও তাদের মধ্যে এই ধরনের বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলে।

শিশুদের মধ্যে থেকে এই আচরণমূলক অনুভূতি দূর করার সব চেয়ে কার্যকর পন্থা হল তাদের মনের নিরুদ্ধ প্রক্ষোভকে সহজ ও স্বাভাবিক পথে অভিব্যক্ত হবার সুযোগ দেওয়া। অবশ্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিশুর মধ্যে যে পরিত্যক্ত-

হবার মনোভাবটি জেগেছে সে মনোভাবটিকে দূর করা এবং আন্তরিক ভালবাসা ও সহানুভূতির সাহায্যে তাকে আপন করে নেওয়া। শিশুদের কাজের যথোচিত প্রশংসা এবং উৎসাহ দানের মাধ্যমে তার আত্মবিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনতে পারলে তার এই আক্রমণমূলক মনোভাব নিজে নিজেই চলে যাবে। সব শেষে তাকে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার সুযোগ দিতে হবে এবং যতটা সম্ভব তার কাজ বাধা না দেওয়া হয় সেদিকে যত্ন নিতে হবে। তার নিজের বন্ধু-নির্বাচন করা, কোন বিশেষ কাজে মনোযোগ দেওয়া, কোন বিশেষ হবি অনুসরণ করা ইত্যাদি ব্যাপারে শিশুকে যতটা সম্ভব স্বাধীনতা দিতে হবে।

অপরাধের অনুভূতি (Sense of Guilt)

অপসঙ্গতির আর একটি বড় কারণ হল অপরাধবোধ। ব্যক্তি অনেক সময় নিজেকে তার আচরণের জন্য অপরাধী বা দোষী বলে মনে করে এবং তার জন্য সর্বদা সন্ত্রস্ত ও সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। এর মূলে আছে ব্যক্তির নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে নিকৃষ্টতার ধারণা। অতি সাধারণ কাজের ক্ষেত্রেও এই সব ব্যক্তিরা নিজেদের অপরাধী বলে মনে করে এবং বিবেকের দংশন অনুভব করে। তারা সব সময়ই মনে মনে এই ভেবে ভীত বা সঙ্কুচিত হয়ে থাকে যে এই বুঝি তাদের আচরণে অপরে অসন্তুষ্ট বা অপমানিত হল।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অপরাধের বোধ নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়। আত্মগ্লানি বা আত্মনিন্দা এই অনুভূতির একটি প্রধান রূপ। ব্যক্তি মনে করে এবং অনেক সময় মুখে প্রকাশও করে যে সে কোন একটি অন্যায় অপরাধ বা পাপ কাজ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তি নিজেকে নানা রকম শাস্তি দেয় এবং সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার এই অপরাধবোধ অপরের উপর প্রতিফলিত করে এবং নিজের দোষত্রুটির জন্য অপরকে দোষী বা দায়ী করে।

অপরাধবোধের সব চেয়ে বড় কারণ হল নিজের সম্বন্ধে নিম্নতাবোধ। সাধারণত বয়স্কদের তীব্র সমালোচনা, নিন্দা, বিদ্রূপ, ভাল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুলনা ইত্যাদি থেকেই শিশুদের মধ্যে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া শিশু অনেক সময় কোন একটি দুর্ঘটনা বা অন্যায় কাজ হঠাৎ করে ফেলার পর থেকে যদি তাকে সব সময় সেই কাজের জন্য দোষী করে যাওয়া হয় তাহলে তার মধ্যে অপরাধবোধের সৃষ্টি হয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে বয়স্কদের দুটি ভ্রমাত্মক আচরণ শিশুদের মধ্যে প্রায়ই অপরাধবোধ সৃষ্টি করে থাকে। প্রথমটি হল তাদের যৌনঘটিত জ্ঞান অর্জনে বাধাদান। শিশুদের মধ্যে যৌন চেতনা জাগার সময় থেকে তাদের মধ্যে নিজেদের দেহের যৌনাঙ্গগুলি পর্যবেক্ষণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই সময় যদি তাদের বকাবকি, মারধোর বা লজ্জা দেওয়া হয় তাহলে তাদের মধ্যে ঐ ইচ্ছা আরও প্রবল কৌতূহলের আকার নিয়ে দেখা দেয়। ফলে তারা ঐ কাজগুলি গোপনে করতে সুরু করে এবং তাদের মধ্যে তীব্র অপরাধের অনুভূতি জাগে। যৌবনপ্রাপ্তির সময় থেকে এই সব যৌন আচরণ স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে থাকে এবং সাধারণ সমাজে এই ধরনের যৌন আচরণকে প্রায়ই এত মন্দ ও ক্ষতিকর বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে অতি তীব্র মাত্রায় অপরাধবোধ সৃষ্টি হয় এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে ওঠে।

ছেলেমেয়েদের মনে অপরাধবোধ সৃষ্টির আর একটি বড় কারণ হল তাদের উপর ধর্মসম্বন্ধীয় অনুশাসনগুলি প্রয়োগ করা। এই সব অনুশাসন মূলত অপরাধ ও পাপ সম্বন্ধে সচেতনতা এবং তার জন্য শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের ভীতি প্রদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এগুলি ছেলেমেয়েদের মনে তীব্র অপরাধবোধ, ভীতি, দুশ্চিন্তা, আত্মগ্লানি প্রভৃতি জাগিয়ে তোলে এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে।

অপরাধবোধ হল জটিল অপসঙ্গতির একটি উদাহরণ। সাধারণ প্রচেষ্টায় এটিকে দূর করা যায় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের (Psychiatrist) সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শিশুর মন থেকে অপরাধ-বোধ দূর করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন শিশুর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা এবং তার অহংসত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া। তার জন্য শিশুর স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে হবে, তার উদ্দেশ্য, মতামত ও কাজের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে এবং তাকে বুঝতে দিতে হবে যে সে আর দশজনের মত স্বাভাবিক ও সহজ একজন মানুষ। নিজের যৌনাঙ্গ পর্যবেক্ষণটি শিশুদের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক ব্যাপারই এবং যথাসময়ে এ অভ্যাসটি চলে যায়। অতএব এ ব্যাপারটিকে অনর্থক অতিরঞ্জিত করে শিশুদের মধ্যে ভুল ধারণা ও অপরাধবোধ সৃষ্টি না করা উচিত। ধর্মমূলক শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ধর্মের নামে অনর্থক ভীতি প্রদর্শন করে শিশুর অপরাধবোধ, পাপ

সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি সৃষ্টি না করে উচ্চ আদর্শ, নীতিবোধ, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি ধর্মশিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিশুর মধ্যে জাগিয়ে তোলা উচিত। হঠাৎ একটি বা দুটি ঘটনার দ্বারা শিশুর মধ্যে অপরাধের সৃষ্টি হয় না। বহুদিনের পুঞ্জীভূত গ্লানি বা অন্যায়ের সচেতনতা থেকে তা ধীরে ধীরে জন্মায় অতএব এর চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ সময়, সতর্ক প্রয়াস ও সযত্ন পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব (Conflict)

সকল প্রকার অপসঙ্গতিরই সাধারণ লক্ষণ হল অন্তর্দ্বন্দ্ব।[১] যে কোন কারণ থেকেই অপসঙ্গতি জন্ম নিক না কেন, তা প্রথমে ব্যক্তির মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবেই এবং তাই থেকেই শেষে অপসঙ্গতি দেখা দেবে। এই দিক দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বকে অপসঙ্গতির বিশেষ কারণ না বলে সাধারণ বা সর্বজনীন কারণ বলাই সঙ্গত।

অন্তর্দ্বন্দ্ব বলতে বোঝায় একটি অপ্রীতিকর প্রক্ষোভধর্মী মনোভাব। এই মনোভাব দুটি কারণে ব্যক্তির মনে জাগতে পারে, প্রথম যখন ব্যক্তির মধ্যে একাধিক পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা জাগে, আর দ্বিতীয় যখন ব্যক্তির ইচ্ছাটির সঙ্গে বাস্তবের সংঘর্ষ দেখা দেয়। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির মধ্যে একটি আশাভঙ্গ বা ব্যর্থতার মনোভাব দেখা দেয় এবং এই ব্যক্তিগত ব্যর্থতার বোধ থেকেই তার তার মনের মধ্যে প্রক্ষোভমূলক দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে।

এই পরস্পরবিরোধী ইচ্ছাগুলির মধ্যে যদি সে যথাযথ মীমাংসা করে নিতে না পারে তাহলেই তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যেমন, স্কুলের পড়া তৈরী করবে, না বাইরে খেলতে যাবে—এ দুটি পরস্পর বিরোধী ইচ্ছা যখন শিশুর মধ্যে দেখা দেয় তখন তা থেকে তার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব জাগে। এখন যদি ছেলেটি ওই দুটি ইচ্ছার মধ্যে একটি সুষ্ঠু মীমাংসা করে নিতে পারে তাহলে তার দ্বন্দ্ব স্থায়ী হয় না। কিন্তু মনে করা যাক ছেলেটি স্কুলের পড়া না করে শুধু খেলেই কাটাল। ফলে তার মধ্যে স্কুলের পড়া না করার জন্য জাগল দুশ্চিন্তা, ভীতি এবং অপরাধবোধ এবং তা থেকে কালক্রমে তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হয়ে উঠতে পারে। এত গেল সাধারণ স্তরের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা। পরিস্থিতি অনুযায়ী আরও অনেক গুরুতর ও জটিল প্রকৃতির অন্তর্দ্বন্দ্ব শিশুর মনে জাগতে পারে এবং প্রায়ই সেগুলি সহজে মীমাংসা করা শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না। তার ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর হানি ঘটে থাকে।

১। পৃঃ ১২৮ : ১২'র পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য.

অপসঙ্গতির কয়েকটি রূপ (Some Forms of Maladjustment)

যে শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না, অর্থাৎ যার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, তার আচরণ সহজ ও স্বাভাবিক পথ ত্যাগ করে অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক পথে অগ্রসর হয়। একেই আমরা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বলে থাকি। এই অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কয়েকটি প্রচলিত ও সাধারণ অপসঙ্গতির উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

ভীরুতা (Timidity)

যে সব ছেলেমেয়ে ক্লাসে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকে, কোন রকম গোলমাল করে না. তাদের এতদিন শিক্ষকেরা ভাল ছেলেমেয়েদের দলে ফেলে এসেছেন এবং পরম সুনজরেই দেখে এসেছেন। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ফল থেকে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃতপক্ষে গুরুতর অপসঙ্গতির শোচনীয় উদাহরণ। এই সব ছেলে-মেয়ে বাস্তবের সংস্পর্শে এসে সন্তোষজনকভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারেনি। তাদের বিশেষ কোন চাহিদা অপূর্ণ থেকে গেছে এবং তারা সেই ব্যর্থতাকে মেনে নিয়েছে। যাতে তাদের অধিকতর ব্যর্থতাকে মেনে নিতে না হয় সেইজন্য তারা বাস্তব থেকে নিজেদের অপসৃত করে নিয়েছে। এই আচরণ নিঃসন্দেহে এক ধরনের সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা। কিন্তু এ. প্রচেষ্টা নিতান্তই অসার্থক ও অমঙ্গলকর। এর দ্বারা তাদের মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব যেমন তেমনই থেকে যায়, তার কোন মীমাংসা হয় না। উপরন্তু বাস্তব থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার ফলে তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। অবহেলিত অনাদৃত ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভীরুতা প্রায়ই গড়ে উঠতে দেখা যায়। যখন তারা বুঝতে পারে যে, তাদের ইচ্ছাপূরণের সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প তখন তারা ব্যর্থতার দুঃখ এড়াইবার জন্য নিজেদের বাস্তব থেকে প্রত্যাহৃত করে নেয়। আবার যে সব ছেলেমেয়ে নিপীড়নমূলক বা অতিরিক্ত শৃঙ্খলা-শাসিত আবহাওয়ায় মানুষ হয় তাদের স্বাধীন ইচ্ছা বারবার আশাহত হতে থাকে, ফলে তারাও নিজেদের বাইরের জগৎ থেকে সরিয়ে নেয় এবং ভবিষ্যতে ভীরু ও দুর্বলচিত্ত হয়ে ওঠে। ইউঙ্-এর শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী এদের অন্তর্বৃত্ত (Introvert) বলা যায়। এদের অহংসত্তা বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য এই ধরনের ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ অস্বাভাবিক ও গুরুতর রূপে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এদের ভীরুতা দূর করতে হলে এদের অপহৃত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। এদের মনের মধ্যে সঞ্চিত অবহেলার গ্লানি দূর করে এদের মধ্যে সাহস ও ভরসা সৃষ্টি করতে হবে। এরা যাতে কাজে

সাফল্য লাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। যে বাস্তবকে এরা ভয়ে এড়িয়ে যেত সেই বাস্তবকে যাতে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তারা মেনে নিতে পারে সে শিক্ষা তাদের দিতে হবে। তবে যে বিশেষ ঘটনা বা কারণের জন্য এদের মধ্যে ভীরুতার সৃষ্টি হয়েছে সেটিকে সর্বাগ্রে খুঁজে বার করা এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে তা দূর করে তাদের মধ্যে মানসিক সমতা ফিরিয়ে আনাই হল এদের চিকিৎসার প্রথম সোপান।

অবশ্য ক্লাসে শান্তশিষ্ট নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলেই যে কোন শিশুকে অপসঙ্গতির ক্ষেত্র বলে মনে করতে হবে তা নয়। অনেক সময় দেখা গেছে যে ক্লাসে যা পড়ানো হচ্ছে তা হয়ত শিশুটি কোন কারণে অনুসরণ করতে পারছে না, ফলে বাধ্য হয়ে সে নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তার ঐ অসুবিধাটুকু দূর করতে পারলেই তার নিষ্ক্রিয়তা দূর হয়ে যাবে। সেইজন্য আধুনিক মনশ্চিকিৎসকগণ শিশুর ভীরুতা সত্যকারের অপসঙ্গতিমূলক কিনা জানবার জন্য দেখেন যে ভীরুতার সঙ্গে অন্য কোন অস্বাভাবিক উপসর্গ আছে কিনা। উদাহরণস্বরূপ যদি দেখেন যে নখকাটা, তোৎলামি, অস্থিরতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য ইত্যাদি উপসর্গগুলিও ভীরুতার সঙ্গে রয়েছে তাহলে তারা সেটিকে প্রকৃত অপসঙ্গতির ক্ষেত্র বলে ধরে নেন। আর ভীরুতার সঙ্গে তেমন কোন উপসর্গ না দেখা গেলে সেটিকে তারা সাধারণ ভীরুতার ক্ষেত্র বলে মনে করেন।

অপসঙ্গতির অন্যান্য রূপ

এ ছাড়া অপসঙ্গতি আরও নানারূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। যথা— আক্রমণধর্মিতা, ক্লাসপালানো, মিথ্যাভাষণ, অপহরণ, নেতিমনোভাব, যৌন-অপরাধ ইত্যাদি। ইতিপূর্বে অপরাধপ্রবণতার পরিচ্ছেদে (পৃঃ ৩২—পৃঃ ৪১) অপসঙ্গতির এই দৃষ্টান্তগুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সেগুলি পঠিতব্য।

প্রশ্নাবলী

1. What is maladjustment ? Under what circumstances is the child maladjusted ? Name a few cases.

Ans. (পৃঃ ১৫৫—পৃঃ ১৬৬)

2. Examine the following cases of maladjustment of children and suggest means of dealing with them. (a) Lying (b) Stealing (c) Truancy (d) Negativism

3. Show how the school may be a cause of maladjustment among its pupils. Illustrate your answer.

Ans. (পৃঃ ১৫৯—পৃঃ ১৬৬)

4. Give a brief account of some problems of maladjustment of adolescent students with their academic and social surroundings.

Ans. (পৃঃ ১৫৫—পৃঃ ১৬৬)

ষোল

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের তিনটি দিক

(Three Aspects of Mental Hygiene)

বর্তমানে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে কারও মনে সন্দেহের কোন স্থান নেই। একথাও সর্বজনস্বীকৃত যে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ আমাদের সুষ্ঠু ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের তিনটি দিক আছে। যথা, ১। সংরক্ষণমূলক (Conservative), ২। প্রতিরোধমূলক (Preventive) এবং ৩। প্রতিকারমূলক (Curative)।

১। সংরক্ষণমূলক দিক (Conservative Aspect)

সাধারণ শিশু যেমন স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন দেহ নিয়ে জন্মায় তেমনই নির্দোষ মন নিয়েও জন্মায়। স্বাভাবিক পরিবেশে থাকলে এই মন স্বাভাবিক-ভাবেই বেড়ে ওঠে। শিশুর পরিবেশ যদি সুস্থ দেহের সহায়ক হয় তাহলে তার স্বাস্থ্য যেমন ভাল হয়, তেমনই তার যদি পরিবেশ মনের সুষ্ঠু ও বাঞ্ছিত বৃদ্ধির অনুকূল হয় তাহলে স্বাস্থ্যসম্পন্ন মন নিয়ে শিশু বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই পরিবেশের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক শক্তির সৃষ্টি হয় তখনই মনের বিভিন্ন দিকগুলি সেই শক্তির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না এবং তার ফলে শিশুর মনের মধ্যে দেখা দেয় নানা ব্যাধি। একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে অস্বাভাবিক ক্ষেত্র ছাড়া প্রত্যেক শিশুই তার পরিবেশের সঙ্গে মেলামেশা করতে, সমাজ-নির্দিষ্ট আচরণগুলি সম্পন্ন করতে, স্কুলে যেতে ও পড়াশোনা করতে যথেষ্ট স্বাভাবিক আগ্রহ বোধ করে থাকে। কিন্তু নানা অস্বাভাবিক ঘটনার চাপে তার মধ্যে অসামাজিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পড়শোনায় অমনোযোগ ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। অতএব শিশুর এই সহজাত মানসিক স্বাস্থ্যটি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং প্রতিকূল পরিবেশের চাপে যাতে তা বিকৃত হয়ে না ওঠে সেটা দেখাই মানসিক স্বাস্থ্যবিধির প্রথম কাজ। এটিকেই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সংরক্ষণমূলক দিক বলা হয়।

এর জন্য প্রয়োজন শিশুর বাড়ী, স্কুল, খেলার মাঠ এক কথায় সমগ্র পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিগুলি যাতে প্রতিকূল না হয়ে ওঠে তা দেখা। বাড়ীতে শিশুর প্রতি বয়স্কদের মনোভাব ও আচরণ, স্কুলে ক্লাসের সংগঠন, শিক্ষণপদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়াই হল মানসিক স্বাস্থ্যবিধির সংরক্ষণমূলক কর্মসূচী।

২। প্রতিরোধমূলক দিক (Preventive Aspect)

সংরক্ষণমূলক দিকটি হল সামগ্রিক প্রকৃতিব। এতে ব্যক্তিগত সমস্যা বা চাহিদার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না, কেবল সমষ্টিমূলক ভাবে মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিধিনিষেধগুলি যাতে পালন করা হয় তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিরোধমূলক দিকটিতে ব্যক্তিব নিজস্ব চাহিদা, সমস্যা ও বৈশিষ্ট্য-গুলির প্রতি বিশেষ করে দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং সেগুলির উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। বিশেষ করে যাদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাদের নিজস্ব সমস্যাগুলি অনুধাবন করা এবং সেগুলিকে প্রতিরোধ করার উপযোগী ব্যবস্থা আগে থেকে অবলম্বন করাই হল প্রতিবোধ-মূলক দিকটির কাজ। মানসিক স্বাস্থ্য সত্যকারের বিপন্ন হবার আগেই তার কারণটি খুঁজে বার করে সেটিকে দূর করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। উদাহবণস্বরূপ দেখা যাচ্ছে যে একটি ছেলে মাঝে মাঝে স্কুল পালায়। ছেলেটির এই অস্বাভাবিক আচরণের পেছনে কি ধরনের মানসিক বিকার আছে তা নির্ণয় করা এবং সেই মত তার চিকিৎসা করা দরকার। যদি তা না করা হয় তাহলে এই আপাতসামান্য মানসিক অসঙ্গতি কঠিন ব্যাধির আকার নিতে পারে এবং শিশুটিকে ভবিষ্যতে অপরাধপ্রবণ করে তুলতে পারে। তাব এই আচবণটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে একটি স্থায়ী মানসিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়াবার আগেই যদি সেটির কারণ খুঁজে বার করা যায় এবং তা দূর করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ছেলেটিকে একটি কঠিন মানসিক ব্যাধি থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

মনে রাখতে হবে যে সংরক্ষণমূলক প্রচেষ্টা হল সমষ্টিমুখী। কিন্তু প্রতিরোধ-মূলক প্রচেষ্টা হল ব্যক্তিমুখী। প্রতিরোধমূলক প্রচেষ্টায় বিশেষ কোন ব্যক্তিব নিজস্ব চাহিদা ও সমস্যার বিচার করে তার ব্যাধির কারণ দূর করার চেষ্টা করা হয়।

৩। প্রতিকারমূলক দিক (Curative Aspect)

প্রতিরোধমূলক দিকের পরই আসে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অভাব হলে অনেক সময় ব্যক্তির মানসিক সংগঠনে এমন ক্রটি দেখা যায় যা সাধারণ উপায়ে দূর করা সম্ভব হয় না। তখন তার জন্য বিশেষ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হয়। শিক্ষকদের এই সময়ে যথেষ্ট বিবেচনা ও সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হয়। কেননা শিক্ষার্থীর মানসিক ব্যাধির গুরুত্বের উপরই নির্ভর করছে যে শিক্ষক নিজেই তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তার ব্যাধির চিকিৎসা করবেন, না বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেবেন। যদি শিক্ষার্থীর রোগ তেমন গুরুতর না হয় তাহলে শিক্ষক তাঁর নিজের বিবেচনা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। কিন্তু যদি ব্যাধি জটিল আকার ধারণ করে তাহলে শিক্ষকের নিজের পক্ষে কোন কিছু করা মোটেই সঙ্গত নয়। তখন তাঁর উচিত অবিলম্বে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া। জটিল মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য উন্নত জ্ঞান ও বিশেষধর্মী পদ্ধতির প্রয়োগের প্রয়োজন এবং সেটা সাধারণ শিক্ষক বা পিতামাতার কাছ থেকে আশা করা যায় না। অসাবধানতা বা অজ্ঞতাবশত যদি কোন ভুল পন্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে শিশুর মানসিক ব্যাধিকে আরও গুরুতর করে তোলা হবে এবং শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় ডেকে আনা হবে।

শিশু পরিচালনাগার (Child Guidance Clinic) নামে আধুনিক কালে নতুন এক ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এগুলির প্রধান কাজ হল শিশুদের মানসিক ব্যাধির কারণ নির্ণয় করা এবং সেগুলির প্রয়োজনমত চিকিৎসা করা। স্কুলে বা বাড়িতে যখনই শিশুর মধ্যে কোন মানসিক অসুস্থতা দেখা যায় তখন তাদের এই শিশু পরিচালনাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে শিশুর মানসিক অসুস্থতার কারণ নির্ণয় করে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তার যথাযথ চিকিৎসা করা হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the three aspects of Mental Hygiene and their respective functions ?

Ans. (পৃঃ—১৬৭—পৃঃ ১৬৯)

2. What do you understand by conservative and preventive aspects of Mental Hygiene ? How are they interrelated ?

Ans. (পৃঃ ১৬৭—পৃঃ ১৬৮)

সতেরো

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পদ্ধতি ও প্রয়োগ-কৌশল

(Methods & Techniques of Mental Hygiene)

পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানরূপে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের জন্ম অতি সাম্প্রতিক। সুপ্রতিষ্ঠিত কোন বিজ্ঞানের সংগঠন এবং পদ্ধতির মত এই শাস্ত্রটির কোন সুনির্দিষ্ট প্রয়োগকৌশল বা পদ্ধতি এখনও গড়ে ওঠে নি। বস্তুত মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এখনও তার বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে অবস্থিত। বর্তমানে যে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সঙ্গে আমরা পরিচিত তা বিভিন্ন বিজ্ঞানের অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের (Psycho-analysis) অবদান যেমনই গভীর তেমনই ব্যাপক। মানুষের মনের অচেতনের প্রকৃতি ও অদ্ভুত কার্যাবলীর সঙ্গে যেদিন ফ্রয়েড আমাদের পরিচিত করে দিলেন সেদিন থেকেই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সত্যকারের যাত্রা সুরু হয়। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ ছাড়া মনোবিকারমূলক মনোবিজ্ঞানের (Abnormal Psycho-logy) অবদান বড় কম নয়। মনোবিজ্ঞানের এই দুটি শাখা ছাড়া অন্য যে শাস্ত্রটি মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছে সেটি হল সাধারণ চিকিৎসা-শাস্ত্র। বর্তমানে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল এই বিবিধ বিজ্ঞানের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলির আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি সাধারণত প্রকৃতিতে চিকিৎসা-ভিত্তিক (Clinical)। বস্তুত, অধিকাংশ পদ্ধতিই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করার সময় গড়ে উঠেছে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিভিন্ন চিকিৎসাগারেও বিভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যে মনশ্চিকিৎসক (Psychiatrist) চিকিৎসা করেন তাঁকে আশ্রয় করেই তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিগুলি গড়ে ওঠে। এই জন্যই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির নাম করা যায় না। তাছাড়া বিভিন্ন মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রে প্রয়োগকৌশলও বিভিন্ন ও বিশেষধর্মী। তবে সাধারণত মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে যে সব পদ্ধতির ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হয় সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

সাক্ষাৎকার (Interview)

এই পদ্ধতিটি অপরিহার্যভাবে সব চিকিৎসাগারেই অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যে ব্যক্তির সমস্যার সমাধান করতে হবে তার সঙ্গে সামনাসামনি

সাক্ষাৎ করা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় এ কথা বলা বাহুল্য। এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে মনশ্চিকিৎসক ব্যক্তির মনোভাব, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী; বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তার ধারণা ও বিশ্বাস প্রভৃতি নানা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তার সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ সম্বন্ধে একটি ধারণা গঠন করতে পারেন। কেবল কারণ নির্ণয়ই নয় অনেক সময় রোগীর রোগের চিকিৎসাও সুপরিকল্পিত সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়েই সম্পন্ন করা যায়।

সাক্ষাৎকার অপরিহার্য হলেও পদ্ধতিরূপে এটি সব সময় নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা বহুক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি সত্য না হতেও পারে। বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের মনের কথা বলতে অনিচ্ছুক সে সব ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসক প্রত্যাশিত উত্তর পান না। অনেক ক্ষেত্রে রোগী ভুল বা মিথ্যা উত্তর দিয়ে মনশ্চিকিৎসককে বিভ্রান্তও করতে পারে। এই সব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মানসিক ব্যাধির কারণ নির্ণয়ে সাক্ষাৎকারের উপযোগিতা যে প্রচুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্নাবলী (Questionnaire or Inventory)

অনেক সময় মুদ্রিত পুস্তিকার আকারে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন ব্যক্তিকে দেওয়া হয় এবং তাকে সেগুলির উত্তর লিখতে বলা হয়। এই প্রশ্নগুলি এমনভাবে গঠিত যে সেগুলির যথাযথ উত্তর দিলে ব্যক্তির মনের অভ্যন্তরীণ কোন বিশেষ সংগঠনের রূপটি মনশ্চিকিৎসকের কাছে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য ব্যক্তি যদি প্রশ্নগুলির উত্তর ঠিক মত না দেয় তাহলে এই পদ্ধতিটির কোনরূপ কার্যকারিতাই থাকে না। সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নাবলী মূলত একই ধরনের পদ্ধতি। তবে সাক্ষাৎকারের তুলনায় প্রশ্নাবলীর একটি বড় উপযোগিতা হল যে অনেক সময় সামনাসামনি ব্যক্তি তার মনের সব কথা খুলে বলতে লজ্জা বা সংকোচ অনুভব করে। প্রশ্নাবলীর ক্ষেত্রে এই ধরনের ভয় বা সংকোচ তাকে অনুভব করতে হয় না। তেমনি আবার সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সংগে মনশ্চিকিৎসকের যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে, প্রশ্নাবলীর ক্ষেত্রে সেটি হবার সম্ভাবনা থাকে না। সামনাসামনি সাক্ষাৎকার থেকে রোগীর সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য মনশ্চিকিৎসক সংগ্রহ করতে পারেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাক্ষাৎকার এবং প্রশ্নাবলী দুটি পদ্ধতিই এক সংগে প্রয়োগ করা হয়।

ব্যক্তির মনোভাব. মনোবিকারমূলক প্রবণতা, মানসিক সংগঠনের প্রকৃতি

প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সুনির্দিষ্ট ও আদর্শায়িত (Standardised) অভীক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা আজকাল তৈরী করেছেন। এগুলির মধ্যে উডওয়ার্থ পার্সনাল ডেটা সীট, বেল এ্যাডজাষ্টমেণ্ট ইনভেণ্টরি, বার্নরয়টার ইনভেণ্টরি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩। কেস হিষ্ট্রি পদ্ধতি (Case History Method)

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে এই পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে। যখনই কোন ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতার কারণ নির্ণয় করতে হয় তখনই তার অতীত জীবনের ঘটনাগুলি মনশ্চিকিৎসকের জানা একান্তভাবে দরকার। মানসিক অসুস্থতার কারণগুলির মধ্যে পরিবেশ একটি প্রভাবশালী শক্তিরূপে কাজ করে থাকে। অতএব ব্যক্তির অসুস্থতার প্রকৃত কারণ জানতে হলে তার অতীত এবং বর্তমান পরিবেশ উভয়কে ভাল করে জানতে হবে। এই জন্যই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের চিকিৎসাগারে রোগীর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ এক ধরনের কর্মী থাকেন। তাঁদের সামাজিক কর্মী (Social Worker) বলা হয়। এই সামাজিক কর্মীরা বিভিন্ন উৎস থেকে ব্যক্তির অতীত জীবন সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সেই সব তথ্য দিয়ে তার অতীত ইতিহাসটিকে পুনর্গঠিত করে থাকেন। সাধারণত যে সব বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে সেগুলি হল :—

১। ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, জন্মদিন, বয়স, জন্মস্থান ইত্যাদি। ২। যে ব্যাধি বা সমস্যার জন্য পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার বিবরণ। ৩। পরিবার—মা, বাবা, ভাই বোন, অন্যান্য আত্মীয়দের পরিচয়—বাড়ীতে তার প্রতি অন্য সকলের কি ধরনের মনোভাব। ৪। শিক্ষা—পরিবারের শিক্ষার মান। ব্যক্তির নিজস্ব আদর্শ ও তার পরিবারের শিক্ষার আদর্শের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব আছে কিনা। ৫। স্বাস্থ্য—শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও দেহগত অন্যান্য তথ্য। যৌন বিকাশের বিবরণ। ৬। বুদ্ধির মান ও বিকাশ। ৭। প্রক্ষোভগত বিকাশ। ৮। সামাজিক বিকাশ ও আচরণমূলক সমস্যাদি ৯। বৃত্তি—আর্থিক অবস্থা। ১০। বিশেষ আগ্রহ, হবি ইত্যাদি।

৪। প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Test)

আধুনিক কালে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে প্রতিফলিত অভীক্ষার বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। এই অভীক্ষায় ব্যক্তিকে একটি বিশেষ কাজ করতে বা বিশেষ

একটি সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া হয়। কিন্তু এই কাজ বা সমস্যাটির সংগঠন এমনই অনির্দিষ্ট এবং অসম্পূর্ণ প্রকৃতির যে সেটি সম্পন্ন বা সমাধান করতে গেলে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি তার নিজের ধারণা, মনোভাব, ইচ্ছা, ভয়, দুশ্চিন্তা প্রভৃতির স্বরূপ মনশ্চিকিৎসকের কাছে ব্যক্ত করে ফেলে। প্রতিফলন অভীক্ষা নাম দেওযার কারণ হল যে ব্যক্তি এই অভীক্ষাগুলি সমাধান করতে গিয়ে তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের প্রকৃত সত্তাকে বাইরে প্রতিফলিত করে এবং তার মনের গোপন স্তরে নিহিত অজ্ঞাত বৈশিষ্ট্যগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। সাধারণত যে সব প্রতিফলন অভীক্ষা চিকিৎসাগারে ব্যবহৃত হয় সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওযা হল। যেমন—

ক। রর্সা ইঙ্কব্লট অভীক্ষা (Rorschach Inkblot Test)

প্রতিফলন অভীক্ষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রখ্যাত ও বহুল প্রচলিত হল রর্সা ইঙ্কব্লট অভীক্ষাটি। এই অভীক্ষাটি সুইজারল্যাণ্ডবাসী হারম্যান রর্সা (Herman Rorschach নামে একজন মনশ্চিকিৎসক উদ্ভাবন করেন।

[রর্সা ইঙ্কব্লট টেস্টের একটি উদাহরণ]

একটি কাগজের উপর একবিন্দু কালি রেখে যদি কাগজটিকে ঠিক ঐ বিন্দুটির মাঝামাঝি ভাঁজ করা হয় তাহলে ঐ বিন্দুটি থেকে এমন একটি কালির ছবি সৃষ্টি হবে যার খণ্ডার্ধ দুটি মোটামুটি একই রকমের দেখতে।

এই ধরনের দশটি কালির ছাপ নিয়ে রর্সার অভীক্ষাটি গঠিত। এই কালির ছাপ দিয়ে তৈরী ছবিগুলি একটির পর একটি ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেগুলি দেখে তার মনে যে সব ধারণার বা কল্পনার উদয় হয় তাকে সেগুলি বর্ণনা করতে বলা হয়। ছবিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে সেগুলি এমনই অনির্দিষ্ট প্রকৃতির যে সেগুলি ব্যক্তির মনে বহু বিভিন্ন ধরনের ভাব ও চিন্তার সৃষ্টি করে থাকে। ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক সংগঠন, মনঃপ্রকৃতি (Temperament), বিশ্বাস, দৃঢ়বদ্ধ ধারণা প্রভৃতির দ্বারাই এই ভাব ও চিন্তার স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত হয়। সেইজন্য ছবিগুলি দেখে ব্যক্তি যে ধরনের ব্যাখ্যা দেয় তা থেকে তার মানসিক সংগঠন, আচরণপ্রবণতা, মনোভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় এবং সেগুলির উপর ভিত্তি করে তার মানসিক ব্যাধির কারণ নির্ণয় করা সহজ হয়ে ওঠে।

খ। কাহিনী সংবোধন অভীক্ষা

(Thematic Apperception Test or TAT)

আর একটি অতি প্রচলিত প্রতিফলন অভীক্ষার নাম হল মারে (Murray) ও মর্গান (Morgan) কর্তৃক উদ্ভাবিত কাহিনী-সংবোধনের অভীক্ষা। এই অভীক্ষাটি ১৯টি ছবি নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি ছবির বিষয়-বস্তু অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং সেগুলির বহু রকমের ব্যাখ্যা হতে পারে। অভীক্ষার্থীকে এই ছবিগুলি দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকটির উপর একটি করে ছোট নিবন্ধ বা কাহিনী লিখতে বলা হয়। অভীক্ষার্থী ঐ ছবিগুলির উপর যে ধরনের কাহিনী লেখে বা সেগুলির যে ধরনের ব্যাখ্যা সে দেয় তা থেকে তার অপ্রকাশিত মানসিক ইচ্ছা বা দ্বন্দ্বের স্বরূপ অভীক্ষকের নিকট ব্যক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী একটি কাহিনী

[কাহিনী সংবোধন অভীক্ষার একটি ছবি]

সংবোধন অভীক্ষাও তৈরী হয়েছে। এটি শিশু সংবোধন অভীক্ষা (Children's Apperception Test or CAT) নামে পরিচিত।

গ। অন্যান্য প্রতিফলন অভীক্ষা

উপরের অভীক্ষাগুলি ছাড়াও প্রতিফলন অভীক্ষার শ্রেণীভুক্ত বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র অভীক্ষা বর্তমানে উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন, বাক্য-সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা' রোজেনউইগের ব্যর্থতামূলক চিত্র পর্যবেক্ষণ অভীক্ষা, অসম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন অভীক্ষা ইত্যাদি। বাক্যসম্পূর্ণকরণ অভীক্ষাটিতে এমন কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় যেগুলি বিভিন্ন পন্থায় সম্পূর্ণ করা যায়। এই সম্পূর্ণকরণের প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তির মনোভাব, প্রবণতা ও মানসিক সংগঠনের একটি নির্ভরযোগ্য রূপ পাওয়া যায়। তেমনই চিত্রসম্পূর্ণকরণ অভীক্ষায় কতকগুলি অসম্পূর্ণ চিত্র অভীক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ করতে দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীর সম্পূর্ণকরণের পন্থা দেখে তার মানসিক সংগঠন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়। রোজেনউইগের ব্যর্থতামূলক চিত্র পর্যবেক্ষণের অভীক্ষাটিতে কতকগুলি সাধারণ ব্যর্থতা বা আশাভঙ্গের দৃষ্টান্ত ছবির আকারে দেওয়া থাকে এবং সেগুলি দেখে অভীক্ষার্থীর মনে কি ধরনের মনোভাবের সৃষ্টি হয় তা বর্ণনা করতে বলা হয়।

কাহিনী সংবোধন অভীক্ষার আর একটি ছবি]

ঘ। শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা (Word Association Test)

এই অভীক্ষাটি প্রতিফলন অভীক্ষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ একটির পর একটি করে অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং একটি শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই যে কথাটি বা চিন্তাটি অভীক্ষার্থীর মনে আসে সেইটি তাকে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়।

শব্দটি শোনার পর অভীক্ষার্থীর উত্তর দিতে যতটা সময় লাগে সেই সময় এবং

প্রদত্ত উত্তরের প্রকৃতি এ দুয়েরই বিচার করা হয়। যদি অভীক্ষার্থী উত্তর দিতে ইতস্তত বা দেরী করে তাহলে সিদ্ধান্ত করা হয় যে সে তার প্রথম মনে আসা শব্দটি কোন কারণে বলতে চায় না। অভীক্ষার্থী শব্দগুলি শুনে যে উত্তর দেয় সেই উত্তরের প্রকৃতি বিচার করে চিকিৎসক অভীক্ষার্থীর অচেতনে নিহিত মানসিক দ্বন্দ্ব এবং অবদমিত ইচ্ছার সন্ধান পান। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইউঙ্ (Jung) এই শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। কেণ্ট ও রোজানফ (Kent and Rosanoff) মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার উপকরণ রূপে ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা প্রস্তুত করেন।

৩। প্রবোধন (Persuasion)

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে প্রবোধন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রবোধনের সাহায্যে চিকিৎসা করার অর্থ হল ব্যক্তির বিচারবুদ্ধির কাছে আবেদন করা। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে বোঝান হয় যে তার মধ্যে রোগের যে সব লক্ষণ দেখা দিয়েছে সেগুলি নিতান্ত অবাস্তব ও যুক্তিবর্জিত। দেখা গেছে যে রোগী যদি এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে তাহলে যে সব কারণে তার মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয় সেগুলি ধীরে ধীরে লোপ পায়। সাধারণত এই পদ্ধতিতে রোগের লক্ষণগুলি কি ভাবে দেখা দিয়েছে এবং সেগুলির পিছনে প্রকৃতপক্ষে কি কি কারণ আছে তা রোগীর কাছে ব্যাখ্যা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, তাকে বলা যায় যে কাজের দায়িত্ব এড়াবার প্রবণতা থেকেই তার মাথা ধরা রোগটি দেখা দিয়েছে কিংবা কোন বিশেষ অপরাধ সচেতনতা থেকেই তার মধ্যে কতকগুলি দৃঢ়বদ্ধ ভুল ধারণা (Obsession) সৃষ্টি হয়েছে ইত্যাদি।

ব্যাধির কারণ নির্ণয় করেই প্রবোধনের কাজ শেষ হয় না। ব্যাধিমুক্ত হওয়ার জন্য ব্যক্তির পক্ষে কি কি করণীয় এ পদ্ধতিতে সে সম্পর্কেও নির্দেশ দেওয়া হয়। সাধারণত কিভাবে ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় এবং কিভাবে অবরুদ্ধ প্রক্ষোভকে মুক্ত করা সম্ভব সে সম্বন্ধেও ব্যক্তিকে এ পদ্ধতিতে উপদেশ দেওয়া হয়। যেমন, যে ব্যক্তি হীনমন্যতায় ভুগছে তাকে বোঝান হয় যে সে সত্য সত্যই অক্ষম নয় এবং তার ফলে তার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে পারে। একজন শিক্ষিকার সব সময় মনে ভয় ছিল যে তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের আঘাত করে ফেলবেন। তাছাড়া মহিলাটি ছেলে মেয়েদের ভাল করে শাসন করতেও পারতেন না। তখন তাঁকে বলা

হল যে তাঁর অচেতন মনের আক্রমণধর্মিতার জন্যই তাঁর মনে ভয় দেখা দিয়েছে। আশ্চর্যের কথা এর পর মহিলাটির এ দুটি অবাঞ্ছিত লক্ষণই চলে গেল। এর কারণ হল যে আসলে মহিলাটি নিজেকে খুব দুর্বল প্রকৃতির বলে মনে করতেন। যেই তিনি শুনলেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে আক্রমণধর্মী এবং দুর্বল নন, তখনই তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে এল এবং তাঁর ভয় ও দুর্বলতা সব কেটে গেল।

প্রবোধন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করার কতকগুলি বিশেষ উপকারিতা আছে। প্রথমত ব্যাধি যদি খুব জটিল না হয় তাহলে এই পদ্ধতির দ্বারা বিশেষ কাজ পাওয়া যায়। বস্তুত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়তই আমরা অপরের দোষ ত্রুটি সংশোধন করা বা অপরকে কোন ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত করা বা কোন কাজে প্রবৃত্ত করা ইত্যাদি ব্যাপারে প্রবোধন পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকি। দ্বিতীয়ত, অনেক জটিল ক্ষেত্রেও প্রবোধন পদ্ধতির প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া গেছে যেমন, কোন ব্যক্তির মানসিক ব্যাধির জন্য হয়ত তার মনে হয়েছে যে তার হাতটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে যদি তার হাতটা একটু নাড়িয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে সে সত্যই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়নি তাহলে তার সে ভুল ধারণাটা ভেঙ্গে যেতে পারে। তৃতীয়ত, মানসিক ব্যাধির ভয়ে ব্যক্তির মনে যে ভীতি এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয় তা প্রবোধন পদ্ধতির সাহায্যে দূর করা যায়। ব্যক্তিকে যদি তার লক্ষণগুলির প্রকৃত কারণ দেখিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ব্যক্তির মন থেকে ভীতি ও অনিশ্চয়তা যে কেবলমাত্র দূর হয়ে যায় তাই নয় অনেক সময় তার লক্ষণগুলি একেবারে চলে যায়। অন্তত পুরোপুরি চলে না গেলেও সেগুলি মেনে নেবার মত তার মনের জোর দেখা যায়। চতুর্থত, ভীতি, দুশ্চিন্তা ও মানসিক ব্যাধির ফলে যখন ব্যক্তির মধ্যে এই সব লক্ষণ দেখা দেয় তখন তার মনে চরম হতাশা ও আত্মগ্লানির সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রবোধন পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তির এই ভুল ধারণাটি দূর করা যায় এবং তার ফলে তার চিকিৎসা করাও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

৬। অনুভাবন (Suggestion)

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় অনুভাবন পদ্ধতিটি বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই পদ্ধতিটির বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারা ব্যক্তির মনে একটি বিশেষ ধারণা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাই থেকে তার মনে একটি প্রক্ষোভ-মূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা হয়। বলা বাহুল্য যে ব্যক্তির মন যখন গ্রহণোন্মুখ

এবং নমনীয় থাকে তখনই তাকে অনুভাবিত করা সম্ভব হয়। অনুভাবন বলতে বোঝায় এক ব্যক্তি থেকে আর এক ব্যক্তিতে একটি ধারণা বা বিশ্বাসের সঞ্চালন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক তা গ্রহণ। যে মানসিক অবস্থায় এই সঞ্চালন এবং গ্রহণ কার্য সম্ভব হয় তাকে বলে অনুভাবনীয়তা। অনুভাবনীয়তার বৈশিষ্ট্য হল যে মনের তখন প্রতিবাদ বা সমালোচনা করার মত কোনও চেষ্টা থাকে না। তখন সেই ব্যক্তিকে যে কথা বলা হয় সেটি সে পুরোপুরি বিশ্বাস করে নেয়। একদিক দিয়ে অনুভাবনীয়তাকে এক ধরনের মানসিক নিষ্ক্রিয়তা বলে বর্ণনা করা যায়। ব্যক্তির মনে এই অনুভাবনীয়তা বা মানসিক নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি করাই হল অনুভাবনের মাধ্যমে চিকিৎসার প্রথম সোপান।

প্রকৃতপক্ষে অনুভাবনীয়তার অর্থ হল মানসিক নির্ভরপ্রবণতা। ছোট শিশু যেমন দেহের দিক দিয়ে অপরের উপর নির্ভরশীল থাকে অর্থাৎ তার মধ্যে দৈহিক নির্ভরপ্রবণতা থাকে তেমনি ব্যক্তির মধ্যে মনের দিক দিয়েও অপরের উপর নির্ভরপ্রবণতা থাকতে পারে। যখন এই মানসিক নির্ভরপ্রবণতা কারোর মধ্যে দেখা দেয় তখন সে অপরের চিন্তা, অনুভূতি, কাজ, কথা প্রভৃতি বিনা প্রতিবাদে এবং বিনা সমালোচনায় গ্রহণ করে।

মনের অনুভাবনীয় অবস্থার সৃষ্টি করতে হলে কতকগুলি বিষয়ের উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমত, যে সব ব্যক্তি সব সময় অপরের উপর নির্ভরশীল তাদের মধ্যে সহজেই অনুভাবনীয়তা দেখা দেয়। এই ধরনের ব্যক্তি বুদ্ধিমানই হোক, আর নির্বুদ্ধিই হোক তাদের অনুভাবনীয়তার মাত্রা একই হয়। দ্বিতীয়ত, যে সব ব্যক্তি সকল সময় অপরের আজ্ঞা বহন করে চলে তারা সাধারণ ব্যক্তির চেয়ে বেশী বাধ্য এবং বশ্যতাধর্মী হয়ে থাকে, যেমন নাবিকরা বা সৈন্যরা। তার ফলে তারা সহজেই অনুভাবেনের পাত্র হতে পারে। তৃতীয়ত, অতিরিক্ত মাত্রায় যদি কোন প্রক্ষোভ জাগে তাহলে ব্যক্তি সহজেই অপরের দ্বারা অনুভাবিত হয়ে ওঠে। কেননা প্রক্ষোভ মানুষের বিচারবুদ্ধিকে অবরুদ্ধ করে তোলে। এইজন্য ব্যক্তি যখন খুব ভয় পায় তখন তাকে অযৌক্তিক কোন পরামর্শ দিলেও সে সেটি মেনে নেয়। কিংবা অত্যন্ত রাগের সময় ব্যক্তিকে অন্য কারও সম্পর্কে অত্যন্ত অবিশ্বাস্য কিছু বললেও সে তা বিশ্বাস করে। চতুর্থত, জনতার মধ্যে অনুভাবনীয়তার মাত্রা খুব বেশী থাকে। তার কারণ হল যে ব্যক্তি যখন জনতার মধ্যে থাকে তখন সে নিজেকে দলের সঙ্গে অভিন্ন করে নেয় এবং দলের মতামতের কাছে নিজের মতামত বিসর্জন দেয়। এই সময় সে তার নিজের বিচারবুদ্ধি বা সমালোচনা শক্তির কোনও ব্যবহার করে না। পঞ্চমত,

কতকগুলি বিশেষ প্রকৃতির মাদক দ্রব্য আছে যেগুলি প্রয়োগ করলে মানুষের মধ্যে অনুভাবনীয়তা দেখা দেয়।

অনুভাবনীয়তার মাধ্যমে চিকিৎসা করার কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। একটি পদ্ধতিতে ব্যক্তির দেহ ও মনকে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় করে আনা হয় এবং তার মধ্যে ঘুমের ভাব দেখা দেয়। এই অবস্থায় ব্যক্তির আর সমালোচনা করার মত ক্ষমতা থাকে না এবং তখন সহজেই তাকে অনুভাবিত করা যায়। আর একটি পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে একটি আলো বা অন্য কোন বস্তুর উপর গভীরভাবে মনঃসংযোগ করতে বলা হয়। কোন একটি বিশেষ বিষয়ে বা বস্তুতে যখনই আমরা গভীর মনোযোগ দিই তখন আমরা অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ি। তার ফলে সেই সময় আমাদের সমালোচনা বা প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও আমরা হারিয়ে ফেলি। এই অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে অনুভাবনীয়তার মাত্রা অনেক বেড়ে যায় এবং তাকে সহজেই কথার দ্বারা প্রভাবিত করা যায়। যে সব চিকিৎসক সম্মোহনের সাহায্যে চিকিৎসা করে থাকেন তাঁরা অনেক সময় এই পদ্ধতির অনুসরণ করেন। আবার আলোর পরিবর্তে কখনও কখনও ব্যক্তিকে একটানা একটি শব্দের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে বলা হয়। এই পদ্ধতিতেও ব্যক্তির মনে এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তা দেখা দেয় এবং সেই সময়ে তাকে সহজেই প্রভাবিত করা সম্ভব হয়।

অনুভাবন সম্পর্কে অনেকের একটি ভুল ধারণা আছে যে এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তির মধ্যে মিথ্যা বা ভুল কোন কিছু বিশ্বাস করানো হয়। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। বস্তুত মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে যে অনুভাবনের ব্যবহার করা হয় তার দ্বারা ব্যক্তির মন থেকে মিথ্যা বা ভুল ধারণা দূরই করা হয়। যেমন, হিষ্টেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তি মনে মনে বিশ্বাস করে যে তার চলার শক্তি নেই এবং তার ফলে সে সত্য সত্যই চলতে পারে না। অনুভাবনের সাহায্যে তার মন থেকে এই ভুল ধারণা দূর করে দেওয়া যায় এবং তার ফলে সে তার চলার ক্ষমতা ফিরে পেতে পারে। অতএব অনুভাবনের প্রকৃত কাজ হল কোন কিছুর সম্ভাবনা সম্পর্কে ব্যক্তির মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং সেই বিশ্বাসের দ্বারা সেই সম্ভাবনাকে সত্য করে তোলা। বস্তুত অনুভানের মাধ্যমে চিকিৎসা করা অনেকখানি ব্যক্তির বিশ্বাস সৃষ্টির উপর নির্ভর করে। সব রকম রোগের চিকিৎসায় বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও স্থায়ী। যে হিষ্টেরিয়া রোগীর মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে তার চলার শক্তি নেই তার মধ্যে যদি এ বিশ্বাস সৃষ্টি করানো যায় যে তার সত্য সত্যই চলার শক্তি আছে, তাহলে

সে প্রকৃতই চলতে পারবে। ঐ রোগীর মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করাই হল অনুভাবনের কাজ।

তা ছাড়া অনুভাবনের আর একটি বড় কাজ হল ব্যক্তির মধ্যে মঙ্গলকর ও স্বাস্থ্যসম্মত ইচ্ছা সৃষ্টি করা। অধিকাংশ রোগীর মধ্যে যে হীনমন্যতা দেখা যায় তার কারণ হল যে তারা অপরের চেয়ে নিজেদের ছোট বা হেয় বলে মনে করে। তাছাড়া তাদের এই মানসিক রোগ না সারার একটি বড় কারণ হল যে তারা নিজেরাই রোগ থেকে মুক্ত হতে চায় না। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এই অসুস্থ হয়ে থাকার একটি বিকৃত ইচ্ছা এক প্রকার সর্বজনীন বললেই চলে। অনুভাবনের সাহায্যে ব্যক্তির মন থেকে এই বিকৃত ও অস্বাস্থ্যকর মনোভাব দূর করা যায়, তার ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করে তোলা যায় এবং তার মনে স্বাস্থ্যবান হয়ে বেঁচে থাকার শুভ ইচ্ছাকে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

অনুভাবনের ক্ষেত্রে একটি বড় অসুবিধা হল যে মানসিক ব্যাধির রোগী যেমন তার সচেতন মনে সেরে উঠতে চায় তেমনি আবার তার অচেতনে অসুস্থ থাকার একটি প্রবল ইচ্ছাও বলবৎ থাকে। তার ফলে চিকিৎসকের আরোগ্য করার উদ্দেশ্যে অনুভাবন এবং রোগীর মধ্যে অসুস্থ হয়ে থাকার একটি দৃঢ়বদ্ধ ধারণা এই দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। রোগীর ঐ ধারণা যত বেশী গভীর ও দৃঢ় হয় অনুভাবনের ফলও তত দুর্বল হয়ে ওঠে।

৭। বিশ্লেষণ (Analysis)

আধুনিক মনশ্চিকিৎসার একটি বড় আবিষ্কার হল যে মানসিক ব্যাধির প্রকৃত কারণগুলি ব্যক্তির শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত থাকে। এই পরোক্ষ কারণগুলি প্রত্যক্ষ কারণগুলির চেয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু এই অতীত অভিজ্ঞতাগুলি ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার জন্য সেগুলিকে সহজে মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যায় না।

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করতে গিয়ে ফ্রয়েড একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি দেখেন যে মানসিক ব্যাধি মাত্রেই অবদমন (Repression) থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেই জন্য ব্যক্তির অচেতনে অবদমিত তথ্য ও চিন্তাগুলি আবিষ্কার করার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজন। অচেতনের স্বরূপ নির্ণয়ের এই পদ্ধতিটির নাম দেওয়া হয়েছে বিশ্লেষণ (Analysis)।

শিশু জন্মাবার পর থেকে সে যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে তা

মধ্যে কতকগুলি অভিজ্ঞতা তিক্ত ও বেদনাদায়ক হয়ে থাকে। সে যত বড় হতে থাকে ততই এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাগুলির স্মৃতি তার মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই স্মৃতিগুলি তার সচেতন মনে না থাকলেও সেগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েও যায় না। তার মনের অচেতন স্তরে সেগুলি তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে বিরাজ করে এবং কালক্রমে নানা রকমের মানসিক ব্যাধি, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিকৃত মনোভাবের জন্ম দেয়। এই অবাঞ্ছিত ও অবদমিত অভিজ্ঞতাগুলিকে যদি অচেতন স্তর থেকে সচেতন মনে উঠিয়ে আনা যায় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তার ঐ মানসিক ব্যাধি বা অসঙ্গতি দূর হয়ে যায়।

ক। সম্মোহন বিশ্লেষণ (Hypno-Analysis)

অচেতনে নিহিত পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করাকেই বিশ্লেষণ নাম দেওয়া হয়েছে। ক্রয়ার নামে একজন ফরাসী মনশ্চিকিৎসক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে মানসিক ব্যাধির গুপ্ত কারণগুলি আবিষ্কার করার পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তন করেন। তিনি রোগীকে সম্মোহিত করে তার প্রতিরোধের ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিয়ে তার ঐ বিস্মৃত অভিজ্ঞতাগুলি বিশ্লেষণ করতেন। এইজন্য তাঁর ঐ পদ্ধতিকে আমরা সম্মোহন-বিশ্লেষণ (Hypno-Analysis) নাম দিতে পারি। এই পদ্ধতিতে রোগীকে প্রথমে সম্মোহিত করা হয়। তার পর নানা প্রশ্নের সাহায্যে তার অচেতন মনের অবদমিত চিন্তা ও ইচ্ছাগুলিকে উদ্ঘাটিত করা হয়। ক্রয়ার এইভাবে সম্মোহন-বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে অনেক মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির রোগ সারাতে সক্ষম হন।

ফ্রয়েড এই সময় ক্রয়ারের সহকর্মী রূপে যোগ দেন। তিনিও প্রথম দিকে সম্মোহনের সাহায্যে মানসিক ব্যাধির কারণ বিশ্লেষণ করতেন। পরে এই পদ্ধতির অনেক অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি দেখে ফ্রয়েড একটি সম্পূর্ণ নতুন ও নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিটি বর্তমানে মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) নামে প্রসিদ্ধ। ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমীক্ষণে ব্যক্তির অচেতনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার জন্য মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association) নামে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেন।

সম্মোহনের সাহায্যে মানসিক ব্যাধির কারণ বিশ্লেষণ এখনও একটি কার্যকর পদ্ধতিরূপে গণ্য হয়ে থাকে। বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে রোগী কোন কারণে তার স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে সে সব ক্ষেত্রে সম্মোহনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ যথেষ্ট সুফল এনে থাকে। তাছাড়া রূপান্তরিত হিস্টেরিয়ার (Conversion Hysteria) জন্য যেখানে রোগী মাথাব্যথা, শারীরিক যন্ত্রণা, বদহজম, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে ভোগে সে সব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করলে বেশ সুফল

পাওয়া যায়। কিন্তু যখন অবসেসন (Obsession) বা কোন দৃঢ়বদ্ধ ভুল ধারণায় রোগী ভোগে সে সব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষ কার্যকর হয় না। কেননা অবসেসনের রোগীকে সহজে সম্মোহিত করা যায় না। বিশেষ করে এই সব ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে সম্মোহনের চেয়ে মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে আরো সহজে এবং আরো ভালো ভাবে মনের বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। যুদ্ধের সময় যে সব সৈন্যের মধ্যে হিষ্টেরিয়া দেখা দেয় তাদের সম্মোহন-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজেই চিকিৎসা করা সম্ভব হয়। কেননা সৈন্যদের মধ্যে আনুগত্য, নির্ভরশীলতার মনোভাব এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার অভ্যাস আগে থেকেই তৈরী হয়ে থাকে। যদি সকল রোগীকেই ভালভাবে সম্মোহিত করা সম্ভব হত তাহলে সম্মোহন-বিশ্লেষণ পদ্ধতিটিকে মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার সহজতম পদ্ধতি বলে গণ্য করা যেত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খুব অল্পসংখ্যক রোগীকেই পূর্ণভাবে এবং সন্তোষজনক ভাবে সম্মোহিত করা সম্ভব হয়। এইজন্য সম্মোহন-বিশ্লেষণ পদ্ধতির সর্বজনীন ব্যবহার সম্ভব নয়।

খ। মাদকদ্রব্যের সাহায্যে বিশ্লেষণ (Narco-Analysis)

সকল রোগীকে সম্মোহন করা সম্ভব হয় না বলে আজকাল অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের জন্য মাদকদ্রব্যের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। নেমবুটাল (Nembutal), এভিপান (Evipan), পেনটোথাল (Pentothal) প্রভৃতি বিশেষ ধরনের মাদক দ্রব্য আছে যেগুলি রোগীর উপর প্রয়োগ করলে সম্মোহনের মতই ফল পাওয়া যায়। এই সব মাদকদ্রব্যের প্রয়োগের ফলে রোগীর মধ্যে থেকে অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের ক্ষমতা চলে যায় এবং সে তখন নিজের অনুভূতিকে বিনা বাধায় প্রকাশ করতে পারে। এইভাবে রোগীর অচেতনে অবদমিত স্মৃতিগুলিকে জাগিয়ে তোলা যায় এবং মনশ্চিকিৎসক সেইগুলি পর্যবেক্ষণ করে রোগের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন। এই পদ্ধতিটিকে মাদক-দ্রব্যের সাহায্যে বিশ্লেষণ (Narco-Analysis) বলা হয়। এই পদ্ধতিটির সব চেয়ে বড় উপকারিতা হল যে এটি থেকে অতিদ্রুত কাজ পাওয়া যায় এবং অতি সহজে ও একরকম সর্বজনীন ভাবে এটির প্রয়োগ করা চলে। যে সব বড় বড় হাসপাতাল ও চিকিৎসাগারে অতি স্বল্প সময়ে চিকিৎসা শেষ করার দরকার পড়ে সে সব স্থানে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করলে খুব শীঘ্র ও সুনিশ্চিত ফল পাওয়া যায়। কিন্তু মাদকদ্রব্যের সাহায্যে চিকিৎসার একটি বড় দোষ হল যে এই পদ্ধতিটি বারবার প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না, কেননা মাদকদ্রব্যের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফল রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। তাছাড়া

মাদকদ্রব্য প্রয়োগের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি হল যে মাদকদ্রব্য রোগীর অবরুদ্ধ প্রক্ষোভকে মুক্ত করতে পারলেও তার অধিসত্তাকে (Super-ego) স্পর্শ করতে পারে না। আর অধিকাংশ' ক্ষেত্রে অধিসত্তার অপরিবর্তনীয় মনোভাবই সফল বিশ্লেষণের সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এইজন্য শেষ পর্যন্ত মুক্ত অনুষঙ্গের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তবে যেখানে রোগীর অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ খুব শক্তিশালী সেখানে প্রথমে মাদকদ্রব্যের প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং একবার প্রতিরোধ ভেঙ্গে গেলে মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হয়। এক কথায় ক্ষেত্র বিশেষে মুক্ত অনুষঙ্গের পূর্ব সোপানরূপে মাদকদ্রব্যের প্রয়োগকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ। স্বপ্ন বিশ্লেষণ (Dream Analysis)

আর একটি বহুল প্রচলিত বিশ্লেষণ পদ্ধতি হল স্বপ্ন বিশ্লেষণ। ফ্রয়েডই প্রথম আমাদের স্বপ্নের একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দেন এবং প্রমাণ করে দেন যে আমাদের অবদমিত চিন্তা ও কামনাগুলিই স্বপ্ন রূপে দেখা দেয়। তাঁর মতে স্বপ্নগুলির অন্তর্নিহিত রহস্য যদি ভেদ করতে পারা যায় তাহলে ব্যক্তির মনের অজ্ঞাত চিন্তা ও কামনাগুলির স্বরূপ জানা যাবে। এক কথায় স্বপ্ন হল অচেতনে পৌঁছবার রাজকীয় পথ। ফ্রয়েডের এই আবিষ্কারে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় স্বপ্নবিশ্লেষণের ব্যাপক ব্যবহার সুরু হয় এবং বর্তমানে অধিকাংশ মনশ্চিকিৎসকই রোগের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য রোগীর স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে থাকেন।

স্বপ্ন অচেতনের অভিব্যক্তি হলেও স্বপ্ন-বিশ্লেষণকে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় নির্ভরযোগ্য উপকরণরূপে কাজে লাগাবার পথে কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা আছে। প্রথমত, স্বপ্ন মনের চিন্তা ও সমস্যাকে সোজাসুজি প্রকাশ করে না, প্রকাশ করে নানা রকমের প্রতীকের মধ্যে দিয়ে। এই প্রতীকগুলির যথাযথ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করছে স্বপ্নের প্রকৃত ব্যাখ্যা। কিন্তু দেখা গেছে যে বিভিন্ন মনশ্চিকিৎসক এই সব প্রতীকের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। যেমন, স্বপ্নে দেখা জল কারও মতে বোঝায় পবিত্রতা, কারও মতে জন্ম, কারও মতে আবার জলে ডোবার আশঙ্কা, ইত্যাদি। স্বপ্নের বাহ্যিক রূপ ও স্বপ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ—দুটি সম্পূর্ণ পৃথক। এই অন্তর্নিহিত অর্থটি ঠিক মত ধরতে পারাই হচ্ছে স্বপ্নের বিশ্লেষণ। বিভিন্ন মনশ্চিকিৎসক একই স্বপ্নের বিভিন্ন অন্তর্নিহিত অর্থ ধরে নিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকেন।

এই সব কারণে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় স্বপ্ন বিশ্লেষণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। তবে স্বপ্ন বিশ্লেষণের যে উপকারিতা নেই তা নয়। স্বপ্ন

বিশ্লেষণ করে মনশ্চিকিৎসকগণ রোগীর মানসিক সংগঠন ও অবদমিত ইচ্ছা সম্বন্ধে যে অতি মূল্যবান তথ্য লাভ করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদিও সম্পূর্ণ প্রতীকধর্মী হওয়ার জন্য স্বপ্ন ব্যক্তির সমস্যার নিখুঁত ও সুনির্দিষ্ট রূপটি আমাদের কাছে তুলে ধরতে পারে না, তবু স্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্তির সমস্যার গুরুত্ব ও পরিমাণ যে ভালভাবেই উদ্ঘাটিত হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অতএব মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বপ্ন বিশ্লেষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক পদ্ধতিরূপে খুবই নেওয়া যেতে পারে।

ঘ। মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association)

মানসিক অসুস্থতার কারণ নির্ণয় করার যে পদ্ধতিটি ফ্রয়েড প্রবর্তন করেছেন সেই পদ্ধতিটি মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association) নামে পারিচিত। সাধারণত আমাদের মনের চিন্তা, ধারণা, স্মৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে। সেই জন্যই একটি কথা বা বিষয় মনে করলে আর একটি কথা বা বিষয় আমাদের মনে আসে। এই বিভিন্ন কথা বা বিষয়গুলির মধ্যবর্তী সংযোগকে অনুষঙ্গ বলা হয়। কোন্ বিষয়টির সঙ্গে কোন্ বিষয়টি বা কোন্ ধারণার সঙ্গে কোন্ ধারণাটি সংযুক্ত থাকবে তা নির্ভর করে মনের প্রকৃতি, সংগঠন ও পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর। কিন্তু সাধারণত আমরা যখন বাস্তব জীবনে কথা বলি তখন আমরা আমাদের মনের ধারণা বা চিন্তাগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে বাইরে প্রকাশ করি না। আমাদের কতকগুলি চিন্তা বা ইচ্ছার অনুষঙ্গ এমন প্রকৃতির হয়ে থাকে যে সেগুলিকে আমরা বাইরে প্রকাশ করতে চাই না। অর্থাৎ আমাদের মনের মধ্যে অনুষঙ্গগুলি যেভাবে আছে সেভাবে প্রকাশ না করে আমরা আমাদের প্রয়োজনমত সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করে প্রকাশ করি। সে ক্ষেত্রে আমাদের অনুষঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত অনুষঙ্গ (Controlled Association) বলা চলে। এর বিপরীত প্রক্রিয়াটি হল মুক্ত অনুষঙ্গ। এতে মনের স্বতস্ফূর্ত চিন্তাধারায় কোন রূপ বাধার সৃষ্টি না করে মনের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা ও ইচ্ছাগুলির অনুষঙ্গ যেভাবে আছে সেভাবেই প্রকাশ করা হয়।

ফ্রয়েডের মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে মনের উপর কোনরূপ বাধা আরোপ না করে সব কিছু খোলাখুলি ভাবে বলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথমে ব্যক্তিকে একটি আরামপ্রদ কক্ষে শান্ত পরিবেশে ইজিচেয়ার বা শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর তাকে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীনভাবে তার মনের কথা চিকিৎসকের কাছে বলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। দেখা গেছে যে, এই সময়

ব্যক্তি যে সব কথা বলে সেগুলি থেকে তার মনের অন্তর্নিহিত বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যক্তি তখন তার মনের অবদমিত স্তরের বহু ঘটনা ও অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করতে পারে। সম্মোহনের সাহায্যে যে ধরনের ফল পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক ভাল ফল মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে পাওয়া যায়। তবে এই প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট কার্যকর হলেও সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শক্ত বলে এটি চিকিৎসাগারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটিকে মনশ্চিকিৎসকেরা নিজেদের প্রয়োজন মত পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে ব্যবহার করে থাকেন।

ফ্রয়েডের মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিটির সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া বিশেষভাবে জড়িত আছে। সেটির নাম দেওয়া হয়েছে অভিসঞ্চালন (Transference)। অভিসঞ্চালনের হর্থ হল যে মানসিক বিশ্লেষণের সময় রোগীর অবরুদ্ধ প্রক্ষোভ তার আসক্তির প্রকৃত পাত্র থেকে চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত হয়ে যায়। যেমন, হয়ত কারও প্রতি ভালবাসা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে রোগীর মধ্যে মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে। এখন মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধাতিতে এই রোগের কারণ বিশ্লেষণ করার সময় এই প্রত্যাখ্যাত ও অচেতনে অবদমিত ভালবাসা চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত হয়ে যায়। ফ্রয়েড এই অভিসঞ্চালন প্রক্রিয়াটিকে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি পরম সহায়ক প্রক্রিয়া বলে গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে অভিসঞ্চালন ছাড়া মানসিক ব্যাধির সুষ্ঠু চিকিৎসা সম্ভবই নয়। অনেক আধুনিক মনশ্চিকিৎসক ফ্রয়েডের এই তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। তাঁদের মতে মানসিক ব্যাধিব চিকিৎসার অভিসঞ্চালন অপরিহার্য ত নয়ই, নবং অনেক সময় ক্ষতিকরই। তাঁদের প্রবর্তিত বিশ্লেষণ পদ্ধতিটির তাঁরা নাম দিয়েছেন প্রত্যক্ষ লঘুকবণমূলক বিশ্লেষণ (Direct Reductive Analysis) পদ্ধতি।

ঙ। প্রত্যক্ষ লঘুকরণমূলক বিশ্লেষণ (Direct Reductive Analysis)

এই পদ্ধতিটি ফ্রয়েডের মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিটির উপরই সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী চিকিৎসকেরা রোগীর রোগের লক্ষণগুলিকে ভিত্তি করে চিকিৎসা সুরু করেন। বিশেষ করে যে লক্ষণগুলি সম্বন্ধে রোগী অভিযোগ করে সেগুলির উপরই তাঁরা বেশী মনোযোগ দেন। প্রথমে চিকিৎসক মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্যে সেই লক্ষণগুলি কোথা থেকে সৃষ্টি হল তা নির্ণয় করেন, অর্থাৎ যে সব অবদমিত প্রক্ষোভমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব ঐ লক্ষণগুলির

কারণ সেগুলিকে খুঁজে বার করেন এবং যাতে ঐ অন্তর্নিহিত কারণগুলি দূর হয় তার ব্যবস্থা করেন। অবরুদ্ধ শৈশবকালীন প্রক্ষোভকে মুক্তি দেওয়াই এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু চিকিৎসক এখানে বিশেষ যত্ন নেন যেন এই নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ চিকিৎসকের প্রতি সঞ্চালিত না হয়ে যায়। তাঁরা চেষ্টা করেন যাতে রোগীর এই নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত না হয়ে যে ব্যক্তির প্রতি প্রথম থেকেই উদ্দিষ্ট ছিল তার প্রতি সঞ্চালিত হয়ে যায়। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে রোগীর নিরুদ্ধ প্রক্ষোভের মুক্তিদান বা লঘুকরণের মাধ্যমেই তার মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

অভিসঞ্চালন প্রক্রিয়াকে এই মনশ্চিকিৎসকেরা বর্জন করলেও অভিসঞ্চালন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই এবং এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে চিকিৎসা পদ্ধতি যে অনেক বেশী সুষ্ঠু ও সুনিশ্চিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৮। খেলাভিত্তিক চিকিৎসা (Play Therapy)

মনশ্চিকিৎসার যে সব পদ্ধতির বর্ণনা করা সেগুলি খুব ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে সব সময় প্রয়োগ করা যায় না। অথচ তাদের মানসিক ব্যাধির কারণ নির্ণয়ের জন্য তাদের অচেতনে নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ জানা খুবই দরকার। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নানা রকম প্রশ্ন করে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায় সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ধরনের সংগৃহীত তথ্যাবলী কখনও পর্যাপ্ত হয় না। তার প্রধান কারণ হল ছোট শিশুরা তাদের মনের কথা ভাল ভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতিও খুব ছোট শিশুদের উপর প্রয়োগ করা যায় না। একটু বড় ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক মনশ্চিকিৎসক সাফল্যের সঙ্গে মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন বলে শোনা গেছে। কিন্তু ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটিকে যে সব সময় কার্যকর করে তোলা যায় না তা বলা বাহুল্য। ছোট শিশুদের বেলাতে মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের কথা ত ওঠেই না। এই জন্য আধুনিক মনশ্চিকিৎসকেরা ছোট শিশুদের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ জানার জন্য খেলাভিত্তিক চিকিৎসা (Play Therapy) পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। শিশুর কাছে খেলা নিজেকে বাইরে অভিব্যক্ত করার মাধ্যম স্বরূপ। শিশুর মনোভাব, ইচ্ছা, রুচি, কামনা, ঘৃণা, ভালবাসা সবই খেলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। এমন কি নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে মনের মধ্যে আঁকা কাল্পনিক ছবিটি তার খেলার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। অতএব শিশুর খেলাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে তার

মনের বিশেষ করে তার অবদমিত ইচ্ছার একটি নিখুঁত ছবি পাওয়া যেতে পারে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই খেলাভিত্তিক চিকিৎসার পরিকল্পনাটি গঠিত হয়েছে।

খেলাভিত্তিক চিকিৎসায় শিশুর সামনে নানারকম খেলাব সামগ্রী ধরে দেওয়া হয় এবং সেগুলি নিয়ে তাকে যেমন খুশী খেলতে বলা হয়। শিশু যখন খেলা সুরু করে তখন চিকিৎসক তাকে নানাদিক দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। সে কোন্ ধরনের খেলার সামগ্রী পছন্দ করে, তার খেলা ধ্বংসমূলক কি সৃজনমূলক ইত্যাদি তথ্যগুলির সাহায্যে চিকিৎসক শিশুর মনোভাব ও তার অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সেগুলির উপরেই ভিত্তি করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মনশ্চিকিৎসকেরা বিশ্বাস করেন যে শিশুর খেলা একটি উদ্দেশ্যসম্পন্ন প্রক্রিয়া এবং যদি তাকে সব রকম খেলাব বস্তু দেওয়া হয় তাহলে সে তার অন্তর্নিহিত মনোভাব এবং মানসিক দ্বন্দ্বটিকে খেলার বস্তু নির্বাচন ও খেলার স্বরূপেব মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করবে। এই পদ্ধতিতে শিশু যাতে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করতে পাবে সেজন্য তাকে পর্যাপ্ত পবিমাণে খেলার উপকরণ দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনেব পুতুল, বাড়ী, গাড়ি প্রভৃতি খেলনা, ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম, নানাবকম জিনিষ তৈরী করার উপযোগী মাটি, বালি, কার্ডবোর্ড, কাঁচি, কাগজ প্রভৃতি বস্তু এ পদ্ধতিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৯। বৃত্তিমূলক চিকিৎসা (Occupational Therapy)

মানসিক ব্যাধিব চিকিৎসা করার সময় অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে কোন বিশেষ কাজে বা বৃত্তিতে নিযুক্ত করা হয়। ঐ বিশেষ কাজ বা বৃত্তিটি সম্পন্ন করার মধ্যে দিয়ে মানসিক ব্যাধিটির নিরাময় হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। প্রথমত, এই ধরনের বৃত্তিতে বা কাজে ব্যস্ত থাকার সময় রোগী তার নিজের দুশ্চিন্তা ভুলে যায় এবং তার ফলে তারা সমস্যার মাত্রা ও গুরুত্ব অনেক কমে আসে। দ্বিতীয়ত, বৃত্তিমূলক চিকিৎসায় রোগীর নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ সুষ্ঠু ও শোভন উপায়ে মুক্তি লাভের সুযোগ পায়। অধিকাংশ মানসিক ব্যাধির মূলেই আছে কোন না কোন ও প্রত্যাখাত অবদমিত প্রক্ষোভ। কাজের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির সেই অবদমিত প্রক্ষোভ তৃপ্তি লাভ করার সুযোগ পায়। তৃতীয়ত, যদি কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তাহলে রোগীর মধ্যে তার হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে এবং তার ফলে খুব শীঘ্রই তার রোগ সেরে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু বৃত্তিমূলক চিকিৎসার একটি বড় দোষ হল যে এই পদ্ধতিতে প্রকৃত সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। তার ফলে যেগুলি প্রকৃতপক্ষে মানসিক ব্যাধি (Neurosis) সে সব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষ কার্যকর হয় না। তবে যে সব ব্যাধি মনোবিকার (Psychosis) পর্যায়ের সে সব ক্ষেত্রে রোগীকে প্রায়ই তার মানসিক জগৎ থেকে বস্তুমূলক জগতে টেনে আনার দরকার পড়ে এবং সে সব ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক চিকিৎসার সাহায্যে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

১০। যৌথ চিকিৎসা (Group Therapy)

এই পদ্ধতিতে একাধিক রোগীর এক সংগে চিকিৎসা করা হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যৌথ মনশ্চিকিৎসা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। যৌথ চিকিৎসার মৌলিক নীতি হল যে ব্যক্তিমাত্রেই যে দল বা গোষ্ঠীতে থাকে তার দ্বারা সে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। যখন কোন ব্যক্তি দল থেকে প্রত্যাখ্যাত বা বর্জিত হয় তখন সে নিজেকে বিশেষভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করে। আর যখন সে দলের দ্বারা গৃহীত হয় তখন তার আত্মবিশ্বাস প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। মানুষ মাত্রেরই একটি সর্বজনীন প্রচেষ্টা হল যে সে যখন দলের মধ্যে থাকে তখন সে দলের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি সৎ, শ্রদ্ধাবান, বন্ধুভাবাপন্ন ও বিবেচক হবার চেষ্টা করে। যৌথ চিকিৎসায় মানুষের এই আন্তরিক সদিচ্ছাটিকেই ভিত্তি করে চিকিৎসা করা হয়। একটি দলের মধ্যে রোগীকে যখন রাখা যায় তখন সে স্বভাবতই দলের আর সকলের সংগে মানিয়ে চলার চেষ্টা করে এবং তার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ এবং আত্মসচেতনতা জেগে ওঠে। দেখা গেছে যে এইভাবে দলগত আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে রোগীর মানসিক স্বাস্থ্য প্রচুর পরিমাণে উন্নত হয়ে উঠেছে। প্রক্ষোভমূলক বিপর্যয়, আচরণসমস্যা, সঙ্গতিবিধান-ঘটিত সমস্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যৌথ চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রদ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

1. Describe various methods and techniques of treatment followed in Mental Hygiene.

Ans. (পৃঃ ১৭০—পৃঃ ১৮৮)

2. Discuss the role of analysis in the treatment of mental disease. Describe the nature and utility of the various types of analysis employed now-a-days.

Ans. (পৃঃ ১৮০—পৃঃ ১৮৬)

3. Write notes on :

Case History Method, Dream Analysis, Narco-Analysis, Hypno-Analysis, Free Association, Play Therapy. Group Therapy and Occupational Therapy.

আঠার

মানসিক স্বাস্থ্য ও প্রক্ষোভ (Mental Health and Emotion)

মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে প্রক্ষোভের খুব নিকট সম্পর্ক। প্রক্ষোভমূলক সমতার উপরই মানসিক স্বাস্থ্য মূলত নির্ভর করে। আর যদি কোন কারণে প্রক্ষোভমূলক বৈষম্য দেখা দেয় তাহলে মানসিক স্বাস্থ্যের হানি ঘটে। এইজন্য মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও তার প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার।

প্রক্ষোভের প্রকৃতি

মনের কোন বিশেষ ধরনের প্রক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত অবস্থাকে প্রক্ষোভ বলা হয়। রাগ, হিংসা, আনন্দ, ভয় প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আমরা এই বিশেষ অবস্থাগুলিকে বুঝিয়ে থাকি। যে কোন প্রক্ষোভঘটিত অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তার তিনটি দিক দেখতে পাই। যথা, বাহ্যিক আচরণ, অভ্যন্তরীণ আচরণ বা প্রতিক্রিয়া এবং প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি বা সচেতনতা।

বাহ্যিক আচরণ

যখনই প্রাণীর মধ্যে কোনও প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতা দেখা দেয় তখনই সে কতকগুলি বাহ্যিক আচরণ সম্পন্ন করে। যেমন ভয় পেলে মানুষ পালায়। রাগ করলে হাত পা ছোঁড়ে ইত্যাদি। এই আচরণগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি সংহতিনাশক। প্রাণীর আচরণ ধারার মধ্যে সাধারণ অবস্থায় যে সংহতি থাকে সেটি প্রক্ষোভঘটিত আচরণের সময় নষ্ট হয়ে যায়।

অভ্যন্তরীণ আচরণ

প্রক্ষোভের সময় যেমন কতকগুলি বাহ্যিক আচরণ ঘটে তেমনই দেহের মধ্যে কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনগুলি নানা প্রকৃতির হতে পারে। যেমন রক্তচলাচলঘটিত, গ্রন্থিঘটিত, স্নায়ুঘটিত ইত্যাদি। এই অভ্যন্তরীণ আচরণগুলি বিভিন্ন প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে প্রায় একরকমই হয়ে থাকে, যদিও বিভিন্ন প্রক্ষোভের অনুভূতি বা সচেতনতা বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। তবে প্রক্ষোভের বিভিন্নতা অনুযায়ী এই অভ্যন্তরীণ আচরণগুলি মাত্রা এবং বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বদলে যায়। এই অভ্যন্তরীণ দৈহিক প্রক্রিয়াগুলিও সংহতিনাশক অর্থাৎ যখন এগুলি দেখা দেয় তখন দেহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। তবে একথাও সত্য যে প্রক্ষোভের জাগরণ প্রথম প্রথম সংহতিনাশক

হলেও পরবর্তী আচরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রক্ষোভই তাকে সেগুলি সম্পন্ন করার উপযোগী প্রেষণা ও সংহতি জুগিয়ে থাকে।

প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি ও সচেতনতা

প্রক্ষোভ জাগরণের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রক্ষোভ সম্পর্কে অনুভূতি বা সচেতনতা। যখনই প্রাণীর মধ্যে কোনও প্রক্ষোভ জাগে তখনই প্রাণী সেই প্রক্ষোভ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। যেমন, যখন ব্যক্তি রেগে ওঠে বা ভয় পায় তখন তার মধ্যে রাগ বা ভয় সম্পর্কে একটি সচেতনতা দেখা দেয়। এই সচেতনতার কেন্দ্রে থাকে অনুভূতি, যেটা হয় সুখকর, নয় দুঃখকর হয়ে থাকে। সাধারণত প্রক্ষোভ জাগলে এই অনুভূতিটি অত্যন্ত তীব্রভাবে দেখা দেয়।

প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ

প্রক্ষোভমূলক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করলে আমরা প্রক্ষোভ জাগরণের একাধিক কারণের সন্ধান পাই।

পারিবেশিক উত্তেজনা ব্যক্তির মধ্যে বহু প্রক্ষোভের সৃষ্টি করে থাকে। দেখা গেছে যে উচ্চশব্দ, আলোর ঝলকানি, হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা প্রভৃতি আকস্মিক, অস্বাভাবিক ও অতি-তীব্র পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভ জাগাতে পারে। এগুলিকে সেইজন্য প্রক্ষোভের সহজাত উদ্দীপক রূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু এগুলি শৈশবেই বিশেষভাবে কার্যকর থাকে। শিশু যত বড় হতে থাকে ততই এগুলির পরিবর্তে নতুন নতুন শেখা বস্তুগুলি তার প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ হয়ে ওঠে, যেমন, অন্ধকার, উঁচু খোলা বা বদ্ধ জায়গা, রুক্ষদর্শন মানুষ, জীবজন্তু ইত্যাদি। পরিণত বয়সে প্রক্ষোভের কারণগুলি অধিকাংশই সামাজিক প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং অপর ব্যক্তির সামান্য কথা, মন্তব্য, আচরণ বা ইঙ্গিতই আমাদের প্রক্ষোভ জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট হয়ে ওঠে।

পারিবেশিক উত্তেজনার চেয়ে প্রক্ষোভ জাগরণের আরও শক্তিশালী কারণ রূপে কাজ করে পারিবেশিক উত্তেজক সম্বন্ধে সচেতনতা এবং সে সম্বন্ধে চিন্তা। যেমন কোনও ব্যক্তির মন্তব্য বা আচরণ আমাদের মনে যতটা প্রক্ষোভ জাগাতে না পারুক তার চেয়ে অনেক বেশী পারে সে সম্বন্ধে আমাদের মানসিক

জল্পনা কল্পনা। অনেক সময়ে এই মানসিক আলোড়ন থেকে ধীরে ধীরে প্রক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ প্রায় এভাবেই সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই ধরনের প্রক্ষোভসৃষ্টির পেছনে থাকে মনের একটি প্রক্ষোভ-মূলক সংগঠন যেটি অতীতের সমশ্রেণীর অভিজ্ঞতা থেকেই গঠিত হয়ে থাকে।

গ্রন্থিজনিত উত্তেজনাকেও প্রক্ষোভ সৃষ্টির কারণ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই গ্রন্থিজনিত উত্তেজনা অবশ্য সংঘটিত হয় প্রক্ষোভ জাগরণের ফলেই। কিন্তু একবার গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠলে সেগুলি প্রক্ষোভকে তীব্রতর করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ গ্রন্থিজাত উত্তেজনা একাধারে প্রক্ষোভ জাগরণের ফল এবং কারণও। এনডোক্রিন গ্ল্যাণ্ড বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি থেকে যে সব রস নির্গত হয় সেগুলি যে প্রক্ষোভের জাগরণ এবং পরিবর্ধনের পক্ষে অপরিহার্য তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া

প্রাণীর উপর প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া তীব্রতা ও বৈচিত্র্যের দিকে দিয়ে নানা শ্রেণীর হতে পারে। সামান্য উত্তেজনাবোধ থেকে সুরু করে পরিপূর্ণভাবে আত্ম-সংযমের বিলোপ পর্যন্ত প্রক্ষোভের ফলরূপে দেখা দিতে পারে। এই প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ অবশ্য নির্ভর করে প্রক্ষোভের মাত্রার উপর এবং প্রক্ষোভ যখন তীব্রতর হয়ে ওঠে তখন এমন হতে পারে যে প্রাণী সম্পূর্ণভাবে নিজের আচরণের উপর তার কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে এবং পরিস্থিতির সঙ্গে কোন রকমেই খাপ খাওয়াতে পারে না, যেমন খরগোসের ছানা যখন বাঘের সামনে বা হরিণ যখন অজগর সাপের সামনে পড়ে তখন তারা এত ভয় পেয়ে যায় যে তারা নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে, ছুটে পালাতেও পারে না।

শরীরতত্ত্বমূলক প্রতিক্রিয়া

প্রক্ষোভের সময় নানারকম অন্তর্দৈহিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন রক্তের চাপ, নাড়ীর স্পন্দন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, গ্রন্থিরস নিঃসরণ, পরিপাচন (digestive function) প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে এই পরিবর্তনগুলি নিখুঁতভাবে মাপার জন্য নানারকম জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়েছে। যেমন নাড়ীর স্পন্দন মাপার যন্ত্রের নাম স্ফিগ্মোগ্রাফ (Sphygmo-graph), রক্তের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম স্ফিগ্মোনোমিটার (Sphygmonometer) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পরিমাপের যন্ত্রের নাম নিউমোগ্রাফ (Pneumograph) ইত্যাদি।

পরিপাচন ক্রিয়ার উপর প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া বেশ উল্লেখযোগ্য। ক্যাননের (Cannon) পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে প্রক্ষোভের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর কাজ ও পরিপাচন-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। খুব রেগে গেলে বা খুব উত্তেজিত হলে খাদ্য হজমের কাজ স্থগিত থাকে।

গ্রন্থিরস (Hormone) নিঃসরণ প্রক্ষোভ জাগরণের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। অ্যাড্রেনালিন (Adrenalin) নামক গ্রন্থিরসটি রাগ; উত্তেজনা প্রভৃতি প্রক্ষোভের জাগরণের সময় নির্গত হয় এবং শরীরের বিভিন্ন উত্তেজনাকর কাজ সম্পন্ন করার শক্তি যোগায়।

প্রক্ষোভের সময় হৃদ্‌পিণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতি স্থানে রক্তপ্রবাহের মধ্যে বেশ পরিবর্তন দেখা যায়। রাগ, উত্তেজনা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেমন রক্তপ্রবাহের গতি বেড়ে যায় তেমনই আনন্দ, তৃপ্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে রক্তের চাপ কমে আসে।

সাইকোগ্যালভানোমিটার (Psychogalvanometer) নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে প্রক্ষোভের তীব্রতা এবং উত্তেজনার স্বরূপ মাপা হয়ে থাকে। প্রাণী দেহ মৃদু বিদ্যুৎপ্রবাহ কতটা সহ্য করতে পারে তা এই যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়। দেখা গেছে যে প্রক্ষোভের বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রাণীর সাইকোগ্যালভানোমূলক প্রতিক্রিয়া (Psychogalvanic Response or P. G. R.) বিভিন্ন রূপের হয়ে থাকে। আজকাল প্রক্ষোভ পরিমাপ করার কাজে সাইকোগ্যালভানোমূলক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপক সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

মস্তিষ্ক তরঙ্গেও (Brain wave) প্রক্ষোভে জাগরণের সময় প্রচুর পরিবর্তন দেখা যায়। সাধারণ অবস্থায় মস্তিষ্ক আলফা তরঙ্গের আবর্তন প্রতি সেকেণ্ডে ৮ থেকে ১২ বার হয় কিন্তু প্রক্ষোভের সময় মস্তিষ্ক তরঙ্গের আবর্তনের হার সেকেণ্ডে ৮ বারের নীচে নেমে যায়।

সামাজিক প্রতিক্রিয়া

প্রক্ষোভজাত প্রতিক্রিয়ার উপর সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভয় পেয়ে ছুটে পালান, আনন্দিত হলে জোরে চীৎকার করা, রাগ করলে আক্রমণ করা ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক হলেও সামাজিক অনুশাসনের চাপে এগুলি নানা রূপান্তর গ্রহণ করে। লোক-নিন্দা, সমালোচনা, সমাজের তিরস্কার ও শাস্তিদান প্রভৃতির ভয়ে ব্যক্তি তার প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলিকে প্রায়ই পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং পরিবেশের উপযোগী

থেকেই জন্মলাভ করেছে মানুষের অন্তহীন আচরণ-বৈচিত্র্য। প্রক্ষোভমূলক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধানের জন্য মানুষ নানা বিচিত্র আচরণধারার সাহায্য নিয়ে থাকে।

অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী (Autonomic Nervous System)

প্রক্ষোভঘটিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে সব দৈহিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেগুলির পেছনে আছে বিশেষ একটি স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ। এটির নাম অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী। এই স্নায়ুমণ্ডলীটি মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড থেকে নির্গত হয়ে শরীরের নানা গ্রন্থি, হৃদ্‌যন্ত্র, পাকস্থলীর মাংসপেশী, দেহচর্ম প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে স্নায়বিক উত্তেজনা এই স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে গ্রন্থি, হৃদ্‌যন্ত্র প্রভৃতিতে পৌছয় এবং ঐগুলিকে সক্রিয় করে তোলে। অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীর আবার দুটি ভাগ আছে, সিমপ্যাথেটিক (Sympathetic) এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক (Parasympathetic)। এই দুটি ভাগের কাজ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সিমপ্যাথেটিক বিভাগটি সাধারণত দেহাংশগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগটি সেগুলিকে প্রশমিত করে। যেমন, সিমপ্যাথেটিক বিভাগটির সক্রিয়তার ফলে হৃৎস্পন্দন বাড়ে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, কিডনীতে সঞ্চিত শর্করা মুক্ত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে, রক্তসঞ্চালনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের মধ্যে নানা উত্তেজনামূলক পরিবর্তন ঘটে। প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয়ে উঠলে হৃদ্‌স্পন্দনের বেগ কমে আসে, শরীরের উত্তাপ হ্রাস পায়, রক্তপ্রবাহ মন্থর হয় এবং অন্যান্য প্রশমনমূলক পরিবর্তনগুলি শরীরের মধ্যে দেখা দেয়। যে সকল গ্রন্থিরস শরীরের উত্তেজনামূলক কাজের পক্ষে সহায়ক সেগুলি সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনার ফলে নির্গত হয়ে থাকে। যেমন অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে যে রস নির্গত হয় তার নাম অ্যাড্রেনালিন। এই অ্যাড্রেনালিন ব্যক্তিকে উত্তেজনামূলক কাজ করার উদ্যম ও সামর্থ্য জুগিয়ে থাকে। তেমনই যে সকল গ্রন্থিরস শরীরের শান্ত অবস্থার পক্ষে সহায়ক সেগুলি প্যারাসিমপ্যাথেটিকের সক্রিয়তার সময় নিঃসৃত হয়। সাধারণভাবে যদিও সিমপ্যাথেটিক বিভাগের সক্রিয়তা উত্তেজনাধর্মী এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগের সক্রিয়তা প্রশমনধর্মী, তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে সিমপ্যাথেটিক বিভাগকেও প্রশমন বা অবদমনের কাজ করতে দেখা গেছে। যেমন, পাকস্থলীর বিভিন্ন কাজগুলির সুষ্ঠু সম্পাদন সিমপ্যাথেটিক বিভাগের কর্মতৎপরতার উপর নির্ভর করে।

দৈহিক প্রক্রিয়ার দিক দিয়ে প্রক্ষোভকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, বীপ্সামূলক (appetitive) বা বৃদ্ধিমূলক (vegetative) প্রতিক্রিয়া আর দ্বিতীয়, আকস্মিক (emergency) বা প্রস্তুতিমূলক (preparatory) প্রতিক্রিয়া। প্রথম পর্যায়ে পড়ে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন উত্তেজনা প্রভৃতি ঘটিত প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াগুলি। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে রাগ, ভয় প্রভৃতি জনিত প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াগুলি। যখন এক শ্রেণীর প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া সক্রিয় হয় তখন অপর শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াগুলি নিরুদ্ধ থাকে। প্রথম শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে একটি তৃপ্তি ও প্রশান্তির ভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সিমপ্যাথেটিক বিভাগটি ক্রিয়াশীল হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে বর্ধিত মাত্রায় উত্তেজনা ও সক্রিয়তা দেখা দেয়। পলায়ন বা আক্রমণ উভয় প্রকার পরিস্থিতির জন্যই তখন সে দেহে মনে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এই জন্য এই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াকেই আকস্মিক বা প্রস্তুতিমূলক আচরণ বলা হয়ে থাকে।

প্রাক্ষোভিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে পরিপাচন ক্রিয়া যে বন্ধ হয়ে যায় সেটি একটি পরীক্ষণ প্রমাণিত সত্য। পশুর আহারের সময় তাকে ক্রুদ্ধ বা ভয়গ্রস্ত করে দেখা গেছে যে সে সময় তার পাকস্থলীর কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে গেছে।

সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুবিভাগের সক্রিয়তার সঙ্গে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থিরসের নিঃসরণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। বস্তুত রাগ, ভয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে সকল শারীরিক উত্তেজনা দেখা দেয় সেগুলি প্রধানত অ্যাড্রেনালিন নামক গ্রন্থিরসের নিঃসরণের প্রভাবেই হয়ে থাকে। ক্যাননের (Cannon) ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে এই তথ্যটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

ভয় (Fear)

রাগের মত ভয়ও মাত্রা এবং প্রকাশের দিক দিয়ে নানা প্রকারের হতে পারে। সামান্য আশঙ্কা বোধ করা থেকে শুরু করে ভয়ে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতেও পারে। শিশুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে উচ্চ শব্দ বা হঠাৎ পড়ে যাওয়া এ দুটি কারণই একমাত্র ভয় জাগাতে পারে। অথচ পরিণত মানুষের ক্ষেত্রে ভয় জাগাতে সক্ষম এমন উদ্দীপক সংখ্যায় যেমন প্রচুর, প্রকৃতিতেও তেমনি বহুবিধ।

বিভিন্ন পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে শিশুর ভয় জাগরণের উৎস তিন প্রকারের। প্রথম, কতকগুলি ভয় শিক্ষাপ্রসূত বা অভিজ্ঞতাপ্রসূত। স্বাভাবিক

ভয়ের কারণগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অবান্তর বিষয়ে শিশুর ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়। যেমন, উচ্চশব্দ অন্ধকারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে শিশু অনেক নির্দোষ বস্তুকেও ভয় করতে শেখে। দ্বিতীয়, ভীত ব্যক্তিকে অনুকরণ করে শিশু অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন বস্তুকে ভয় করতে শেখে। যেমন, ভূমিকম্প, ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদিকে শিশু ভয় করতে শেখে তার মা-বাবা, বড় ভাই-বোনদের ভীতিমূলক আচরণ দেখে। তৃতীয়, অনেক ভয়ের উৎস হল অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা। যেমন কড়া মেজাজের শিক্ষক, দাঁতের ডাক্তার, হাসপাতাল, বড় বড় জন্তু, অমার্জিত রুক্ষ মানুষ ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে শিশু ঐ সব বস্তুকে ভয় করতে শেখে। অপ্রীতিকর স্বপ্ন থেকেও শিশুর মনে ভয় জেগে থাকে।

অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ইচ্ছা করে ভয় করতে শেখান হয়ে থাকে। বহু ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে শিশুর আচরণকে আমরা প্রভাবিত করি এবং তাদের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দিই। এইভাবে অন্ধকার, গোলমাল, জীবজন্তু, পুলিশ, শিক্ষক প্রভৃতির ক্ষেত্রে শিশুর ভয় সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন, শিক্ষক যদি এমন একটা ভাব দেখান যে তাঁর আচরণ সম্বন্ধে কেউ কোনও কথা বলতে পারবে না তাহলে স্বভাবতই শিশু তাঁকে ভয় করতে শিখবে। জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক্ শিশুর মধ্যে আমরা যে ভয় সৃষ্টি করি তার উদ্দেশ্য হল তার আচরণটি নিয়ন্ত্রিত করা এবং আমাদের ঈপ্সিত পথে তাকে পরিচালিত করা। বস্তুত ভয়ের সাহায্যে শিশুর আচরণকে খুব সহজে এবং দ্রুত ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করা চলে। কিন্তু এভাবে ভয়ের সাহায্য নেওয়ার প্রথাটি শিশুর পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয় এবং সময় সময় তা খুব অবাঞ্ছিত ফলের সৃষ্টি করে।

ভয়ের উদ্দীপক যতই বিভিন্ন হোক না কেন, এক কথায় বলা চলে যে যখনই প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের সামর্থ্যের চেয়ে উদ্দীপকের চাহিদা আকস্মিকভাবে বেড়ে যায় তখনই প্রাণীর মধ্যে ভয় জাগে। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের অক্ষমতা সম্বন্ধে প্রাণীর সচেতনতার নামই ভয়। শৈশবে এই অক্ষমতা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়মূলক বা দৈহিক সঙ্গতিবিধানে সীমাবদ্ধ থাকে। পরে শিশু যত বড় হয় ততই তার ভয় দৈহিক সঙ্গতিবিধানের গণ্ডী ছেড়ে সামাজিক সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয়। সাধারণত ভয় দুশ্রেণীর। কারণজাত (rational) ও কারণহীন (irrational)। অনেক ভয় প্রকৃত ও বাস্তব কারণ থেকে জন্মায়, আবার অনেক ভয় মিথ্যা বা অবাস্তব কোন ধারণা বা

বিশ্বাস থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে। তবে কারণজাতই হোক্ আর কারণহীনই হোক্- ভয় মাত্রেই শিশুর অভিজ্ঞতা থেকে জন্মায়।

ওয়াটসন ব্যাপক পরীক্ষণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে ভয় হচ্ছে একটি সহজাত প্রক্ষোভ এবং মাত্র দুটি উদ্দীপকই নবজাতকের মধ্যে ভয় জাগাতে সমর্থ হয়। প্রথমটি হল উচ্চশব্দ, দ্বিতীয়টি হল হঠাৎ ভারসাম্য হারান। নবজাতকের ভয় এই দুটি প্রাথমিক উদ্দীপক থেকে পরে আরও অন্যান্য উদ্দীপকে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে যায়।

অতি শৈশব কাল থেকেই ভয়ের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। শিশুর পড়াশোনায় আগ্রহ, সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা, শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং তার সামাজিক অভিজ্ঞতার স্বরূপ সবই তার শৈশবকালীন ভয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু যদি সামাজিক পরিবেশে আনন্দ পায় তাহলে সে সামাজিক-প্রকৃতির লোক হবে, আর যদি সে অপরিচিত ব্যক্তিদের ভয় করে চলে তাহলে সে অসামাজিক ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে।

ভয়মূলক আচরণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল অবাঞ্ছিত উদ্দীপক থেকে সরে আসা। কিন্তু শিশু যত বড় হতে থাকে তত সে পরিবেশ ও সামাজিক অনুশাসনের চাপে তার ভয়কে অবদমিত করতে বাধ্য হয়; তার ফলে তার প্রক্ষোভমূলক জীবনের শান্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। অনেক সময় ভয়কে দমন করার জন্য ব্যক্তি দুঃসাহসিক কাজ করে বসে।

ক্লান্তির সঙ্গে ভয়েরও সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। ক্লান্তির সময় মানুষ তার স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে। তার ফলে ভয় তার মনকে সহজে প্রভাবিত করতে পারে। ক্লান্তি থেকে ভয় দেখা দেয়, ভয় থেকে দুশ্চিন্তা, দুশ্চিন্তা থেকে আবার ক্লান্তি। এইভাবে দুর্বল স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তি একটি বিষময় চক্রের মধ্যে আবর্তন করতে থাকে।

প্রথম প্রথম শিশুর ভয় নিছক মূর্তবস্তু এবং তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু তিন চার বৎসর বয়স থেকেই কাল্পনিক এবং দূরবর্তী নানা উদ্দীপকে তার ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়। এই সময় শিশুর ভয়মূলক উদ্দীপকের সংখ্যা অগণিত হয়ে ওঠে। আর একটু বড় হলে তার এই অমূলক ভয়ের কারণগুলি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয় এবং প্রকৃত বস্তু বা বাস্তব পরিস্থিতিতে ভয় কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই শৈশবকালীন ভয়ের কারণগুলি দূর হয় না এবং বহু পরিণত ব্যক্তির মধ্যে অন্ধকার, উচ্চশব্দ, ভূত-প্রেত প্রভৃতি শৈশবকালীন ভয়ের উদ্দীপকগুলি সমানভাবে শক্তিশালী থেকে যায়।

দশ বার বছরের শিশুর মধ্যে বাস্তব বস্তুর চেয়ে কাল্পনিক বা অবাস্তব বস্তু সম্বন্ধে ভয় বেশী জাগতে দেখা যায়। ভূত, প্রেত ইত্যাদি দৈব বা অপ্রাকৃত বস্তু, দৈত্য, দানব প্রভৃতি নানা কাল্পনিক প্রাণী, মৃত্যু, আঘাতপ্রাপ্তি, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, নানা গল্পে পড়া বা শোনা বা সিনেমায় দেখা বিভিন্ন ভীতিকর চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে ভয় তার মধ্যে জন্ম নেয়।

শিশু আর একটু বড় হলে ভয়ের কারণ ব্যক্তিগত স্তর থেকে সামাজিক স্তরে উন্নীত হয়ে যায়। তখন অপরের নিন্দা, বিরাগ, সামাজিক লাঞ্ছনা প্রভৃতিকে শিশু শারীরিক বিপদের চেয়ে বেশী ভয় করতে শুরু করে।

শৈশবকালীন ভয়ের মধ্যে অন্ধকারের ভয় একটি প্রধান স্থান অধিকার করে; ওয়াটসনের মতে উচ্চশব্দ থেকে অনুবর্তিত হয়ে অন্ধকারেতে শিশুর ভয় সঞ্চালিত হয়। শৈশবকালের আর একটি ভয় হল একা একা থাকা বা পরিত্যক্ত হবার ভয়। শিশুর অসহায়ত্ব ও দুর্বলতাই তাকে অপরের উপর নির্ভরশীল করে তোলে এবং তাই থেকেই একা থাকা বা পরিত্যক্ত হবার ভয় তার মধ্যে বিশেষ করে দেখা দেয়। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শৈশবকালে শিশুর যৌন আসক্তি জন্মায় এবং সে ভয় পায় যে তার অবৈধ কামনার শাস্তিস্বরূপ পিতা তার যৌনাঙ্গের ক্ষতি করবেন। ফ্রয়েড এই শৈশবকালীন ভীতির নাম দিয়েছেন কাষ্ট্রেসান কমপ্লেক্স (Castration Complex)।

ভয় একজনের কাছ থেকে নানা উপায়ে আর এক জনেতে সঞ্চালিত হতে পারে। অপরকে ভীত হতে দেখে ব্যক্তি ভীত হতে পারে। অপরের ভয় পাওয়ার গল্প শুনে ব্যক্তি ভয় পেতে পারে। কখনও সাপ না দেখলেও সাপের সাংঘাতিক ক্ষমতার কথা শুনে শিশু সাপকে ভয় করতে শুরু করে। বিভিন্ন অসুখের ক্ষতিকর ফলের কথা শুনে শিশুর মনে অসুখ সম্বন্ধে ভীতি জাগতে পারে। স্কুল সম্পর্কে যদি প্রতিকূল কিছু শোনে তাহলে শিশু স্কুলকেও ভয় করতে শেখে। যদি পরিবারের লোকেরা শিশুর মনের উপর তাঁদের আচরণ ও কথাবার্তার এই অসীম প্রভাবের কথা চিন্তা করেন এবং তাকে মিথ্যা ভয়গ্রস্ত না করে কেমন করে জীবনের সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হবে তাই শেখান তাহলে শিশুর ব্যক্তিসত্তা সুষম ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

আধুনিক যুগে শিশুর মনের ভয় সৃষ্টির একটি বড় মাধ্যম হল সিনেমা। এইচ

জে ফরম্যান তাঁর 'আওয়ার মুভি মেড চিলড্রেন' বইতে বিশদ্ ভাবে দেখিয়েছেন যে, যে সব ছবিতে বিপজ্জনক বা ভয়াবহ ঘটনা থাকে সেগুলি শিশুর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং পরবর্তী জীবনে স্থায়ী দাগ রেখে যায়। দেখা গেছে যে সিনেমা দেখার সময় ছেলেমেয়েরা ভীষণভাবে উত্তেজিত হয় এবং কেউ নখ কামড়ায়, মুখ চেপে ধরে, আসন ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে. কখনও বা ঘর ছেড়ে ছুটে পালিয়ে যায়। কেউ কেউ অন্ধকারে বাড়ী যেতে চায় না. অনেকেই রাত্রে ঘুমোতে পারে না এবং মাঝ রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে ওঠে।

অবাস্তব ভয় বা ফোবিয়া (Phobia)

প্রায়ই একই ধরনের ভয় দেখা যায় যার কোন বাস্তব কারণ বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এগুলিকে আমরা অবাস্তব ভয় বা ফোবিয়া বলতে পারি। ছোট শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে এই ধরনের অবাস্তব ভয় দেখা যায়। এগুলিকে মনোবিজ্ঞানে মনোবিকারমূলক ভয় (Pathological fear) বলা হয়। কেননা এগুলি সাধারণ বা স্বাভাবিক কারণ থেকে জন্মায় না এবং ব্যক্তির কাছে এর কারণটি জানাও থাকে না।

দুশ্চিন্তা ভয়ের সহগামী। বহু অবাস্তব ভয় পরিণত বয়সে দুশ্চিন্তার রূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং সুস্থ মানসিক প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। এই ধরনের অবাস্তব ভয় মানসিক শক্তি ও সহজাত সম্ভাবনাগুলি নষ্ট করে দেয় এবং অনেক সময় গুরুতর মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি করে।

অবাস্তব ভয় মাত্রেই কোনও না কোন মানসিক বিকার থেকে জন্মে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে ভয়ের বস্তুটি প্রতীকমূলক হয়ে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি যে বস্তুকে ভয় পায় প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুটি অন্য কোনও বস্তু বা ধারণা বা ঘটনার প্রতীক মাত্র। যেমন, ময়লা, ভিড়, উঁচু জায়গা, বন্ধ ঘর, জল ইত্যাদি অতি সাধারণ জিনিষ দেখেও ব্যক্তির মনে এই ধরনের ভিত্তিহীন ভয় বা ফোবিয়া তৈরী হতে পারে।

যার মধ্যে এই ধরনের অবাস্তব ভয় জাগে সে তার ভয়ের কারণ বর্ণনা করতে পারে না এবং নিজের অনুভূতিকে ভাল করে ব্যাখ্যাও করতে পারে না। বরং সে তার ভয়কে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। যেমন, কেউ যদি ভিড়কে ভয় করে, তাহলে সে এই বলে ব্যাখ্যা করে যে গোলমাল চেঁচামেচি ভালবাসে না। কেউ যদি বন্ধ ঘরে ভয় পায় তাহলে সে এই বলে ব্যাখ্যা করে যে সে মুক্ত হাওয়ায় থাকতে ভালবাসে।

অবাস্তব ভয়ের কারণ খুঁজে বার করতে হলে ব্যক্তির অচেতন মনটিকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়। সাধারণত দেখা গেছে যে শৈশবের কোনও বিশেষ ঘটনা বা অভিজ্ঞতা তার শিশুমনে এমন একটি তীব্র ভীতির সৃষ্টি করে যার ফলে ঐ ঘটনা বা অভিজ্ঞতাটি শিশু সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেলেও তার অচেতনে ঐ ভীতি পূর্ণশক্তি নিয়ে বিরাজ করে এবং সারা জীবন তার সচেতনের চিন্তা ও আচরণ ধারাকে প্রভাবিত করে যায়। অনেক সময় ফোবিয়ার কারণ শিশুর জীবনের প্রথম দু'এক বৎসর বয়সের অভিজ্ঞতায় নিহিত থাকে। যেমন, যে ব্যক্তির বন্ধ ঘরে থাকতে ভয় করে হয়ত শৈশবে বন্ধ ঘরে আটকে থাকার কোনও ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল কিংবা বন্ধ ঘর সম্পর্কে কোন অপরাধবোধ তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। যে কোনও কারণে হোক ঐ শৈশব-কালীন অভিজ্ঞতাটি ব্যক্তি তার অচেতনে অবদমিত করে এবং পরে তার মনে বন্ধ ঘর সম্বন্ধে এক অবাস্তব ভয় দেখা দেয়। ফোবিয়ার একটি বড় কারণ হল অপরাধবোধ। কোন অপরাধজনক কাজের স্মৃতি অবদমিত করলে তা থেকে শিশুর মনে অবাস্তব ভয় সৃষ্টি হয়। সেজন্য যাতে শিশুদের মধ্যে অপরাধবোধ সহজে না জন্মায় সেদিকে বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন।

ভয়ের উপকারিতা (Uses of Fear)

কারও কারও মতে ভয়ের উপকারিতাও আছে। উদাহরণস্বরূপ, ভয় মানুষকে দুঃসাহসিক কাজ থেকে বিরত করে, অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করে, সমাজনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত আচরণ করতে বাধ্য করে এবং তাকে নিয়মানুবর্তী ও অনুগত করে তোলে।

একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অন্যায় বা অবাঞ্ছিত কাজ থেকে নিবৃত্ত করার ব্যাপারে ভয়ই প্রবলতম শক্তিরূপে কাজ করে থাকে। সামাজিক সংগঠনের শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুন বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভয় যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমাজে প্রচলিত অনুশাসন ও বিধিনিষেধগুলি এবং সেগুলির সঙ্গে সংযুক্ত শাস্তির প্রতি বিরাগ ও পুরস্কারের প্রলোভন শিশুর মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই অসামাজিক কাজ সম্বন্ধে ভীতি জাগিয়ে তোলে এবং পরবর্তী জীবনে এই ভীতিই তাকে সমাজ অনুমোদিত পথে জীবন কাটাতে বাধ্য করে। অসাধুতা, অপহরণ, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি অসামাজিক আচরণ থেকে ব্যক্তি প্রধানত সমাজের নিন্দা বা শাস্তির ভয়ে বিরত থাকে।

সেদিক দিয়ে ভয় অনেক সময় কাম্য হতে পারে। যুক্তিধর্মী ভয় মানুষের বহুক্ষেত্রে উপকার করে থাকে। ভয় যদি সুনিয়ন্ত্রিত ও যুক্তিভিত্তিক হয় তাহলে তা অনেক সময়ে ব্যক্তির ক্ষতি না করে উপকারই করে। সাধারণত অনিয়ন্ত্রিত ভয় ব্যক্তির কাজে বাধার সৃষ্টি করে এবং তার উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যদি ভয় ব্যক্তির আয়ত্তাধীন থাকে এবং যদি তা অস্বাভাবিক প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার আকার ধারণ না করে তাহলে তা ব্যক্তিকে সংগঠনমূলক কাজে সহায়তা করতে পারে। যেমন, ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর বা তার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত এমন কাজ থেকে ব্যক্তিকে ভয়ই নিবৃত্ত করে থাকে।

মানুষের প্রক্ষোভগুলির মধ্যে যেগুলি তাকে কাজে প্রবৃত্ত করে সেগুলি হল রাগ, ঘৃণা, হিংসা বা অত্যধিক ভালবাসা। এগুলি অতি প্রবলমাত্রায় জাগ্রত হলে ব্যক্তি সব রকম কাজই করতে উদ্যত হয়। এই সময় তাকে যে প্রক্ষোভটি নিবৃত্ত বা নিয়ন্ত্রিত করে সেটি হল ভয়। ভয়ের চাপেই ব্যক্তি তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারে না, পারলেও তার মাত্রা বা তীব্রতা কমে যায়। কারও উপর অত্যন্ত রাগ হওয়ায় তাকে খুন করতে ইচ্ছা হল। কিন্তু শাস্তির ভয়ই ব্যক্তিকে প্রকৃতপক্ষে ঐ কাজটি করা থেকে নিবৃত্ত করল। এইজন্য ভয়কে আমরা ভারসাম্য রক্ষাকারী প্রক্ষোভ বলে বর্ণনা করতে পারি। বস্তুত সাধারণ ব্যক্তি যে সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে এবং অনেক সামাজিক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে দেখা যায় সেগুলি ব্যক্তির জীবনে ভয়ের গঠনমূলক ভূমিকার ফল।

ভয়ের উপকারিতা থাকলেও শিশুকে ভয় দেখিয়ে কাজ করান অত্যন্ত ক্ষতিকর। অনেক মাতা পিতা, শিক্ষক আছেন যাঁরা শিশুকে পড়াশোনায় প্রবৃত্ত করার বা কোন বাঞ্ছিত আচরণ করানোর জন্য ভয় দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু এইভাবে ভয় দেখিয়ে শিশুকে লেখাপড়া বা কাজ করানোর প্রচেষ্টা থেকে কখনই ভাল ফল হতে পারে না। কেননা, এখানে উদ্দীপকটি হল নেতিবাচক। এতে শিশু সত্যকারের কোন সৃজনমূলক কিছু করতে পারবে না। শিশুকে কোন ব্যাপারে সতর্ক করা বা সংযত রাখার জন্য ভয়ের ব্যবহার চলতে পারে। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভয়ের ব্যবহার থেকে কুফলই হয়। বিশেষ করে শিশুকে যদি অত্যন্ত বেশী মাত্রায় ভয় দেখান যায় তাহলে তার কোন সুফলই হতে পারে না। বরং তা তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাই নষ্ট করে দেয়। ভয় বেশী হলে ব্যক্তির যুক্তিধর্মী চিন্তা করার শক্তি থাকে না। ফলে তার পক্ষে তখন গঠনমূলক কোন কাজ করা সম্ভব হয় না।

যে ড্রাইভার গাড়ী চালাচ্ছে তার মধ্যে এ ভয় থাকা উচিত যে সে যদি গাড়ী চালানোর নিয়মকানুন মেনে না চলে বা সে যদি অসতর্ক হয়ে ওঠে তাহলে তার বিপদ হতে পারে।' কিন্তু যদি তার এই ব্যাপারে ভয় অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে তাহলে তার পক্ষে গাড়ী চালানোই সম্ভব হয় না।

ভয়ের নিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরণ (Control and Cure of Fear)

অতএব শিশুর মন থেকে যাতে ভয় দূর হয়ে যায় এবং সে যাতে ভয়কে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে তার জন্য তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। যে সব ক্ষেত্রে শিশুর মনে অতিরিক্ত ভয় জাগে সেই ক্ষেত্রগুলি যাতে শিশু নিজের আয়ত্তে আনতে পারে সেই মত তাকে নির্দেশ দিতে হবে। যে সব উদ্দীপক শিশুর মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত ভয়ের সৃষ্টি করে, হয় সেই উদ্দীপকগুলি দূর করতে হবে, নয় যাতে শিশু আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে সেগুলির সম্মুখীন হতে পারে সেই ভাবে তাকে তৈরী করতে হবে।

যেমন, কোন শিশু হয়ত কুকুর দেখলে অতিরিক্ত ভয় পায়। তার যাতে এ ধরনের ভয় চলে যায় সেইভাবে তাকে শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে পাগলা কুকুর কামড়ালে বিপদের আশঙ্কা আছে এবং সেইজন্য রাস্তার কুকুর-গুলো যাতে সে এড়িয়ে চলতে শেখে তারও শিক্ষা তাকে দিতে হবে। তেমনই রাস্তা পার হবার সময় শিশু মোটর গাড়ীর ধাক্কা খাওয়াকে ভয় করতে শিখবে, আগুনকে ভয় করতে শিখবে যাতে সে আগুনে হাত না পুড়িয়ে ফেলে বা আগুন নিয়ে খেলা না করে, সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলতে শিখবে যাতে সে কোনও রকম বিপদে না পড়ে, অপরের সঙ্গে কুব্যবহারকে ভয় করতে শিখবে যাতে লোকে তার নিন্দা না করে ইত্যাদি।

একথা অনস্বীকার্য যে শিশুকে যত কম ভীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে ততই তার ব্যক্তিসত্তার সংগঠন সুষ্ঠু হবে। পিতামাতা ও শিক্ষকেরা পরিবেশ থেকে ভয়মূলক উদ্দীপকগুলি যতদূর সম্ভব সরিয়ে দেবেন বা সেগুলি সম্বন্ধে ভীতির মাত্রা যাতে কমে যায় তার ব্যবস্থা করবেন। শিশুর ভয় কমানোর একটি বড় উপায় হল যাতে বিভিন্ন বিষয়ে তার অজ্ঞতা চলে যায় এবং যাতে তার সাধারণ জ্ঞান বাড়ে তা দেখা। বস্তুত অজ্ঞাত বিষয় বা বস্তু থেকে আমাদের ভয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেইজন্য বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শিশু যত বেশী জানতে পারবে ততই সে বিষয়গুলিতে তার ভয়ের কারণ কমে যাবে। এই জন্য পিতামাতা এবং শিক্ষকদের কর্তব্য হল শিশুকে নানা ধরনের তথ্যের সঙ্গে পরিচিত করা।

সেই সঙ্গে ভীতি-উদ্দীপক বিষয় বা বস্তুগুলি থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে। সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও প্রভৃতির ভয় সৃষ্টিকারী প্রোগ্রাম, ভূতের গল্প বা ভীতিকর এ্যাডভেঞ্চারের বই ইত্যাদি শিশুর মধ্যে ভয়ের উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করে তোলে। অতএব শিশুর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর ভীতি যাতে না হয় তাঁর জন্য এগুলি থেকে শিশুকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

তবে সামাজিক শাস্তি, নিন্দা প্রভৃতি সম্পর্কে ভয়কে কিছুটা সমর্থন করা যায়। এই ধরনের ভয়ের সাহায্যে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়ে থাকে। কিন্তু যুক্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে শিশুর মধ্যে সামাজিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা উচিত তার মধ্যে সামাজিক সচেতনতা জাগানোর মাধ্যমে, ভয় বা অন্য কোন পন্থার সাহায্যে নয়।

প্রক্ষোভ হিসাবে ভয় নিকৃষ্টতম ও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই প্রক্ষোভটি ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত করে ও তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ভয়ের প্রভাব ধ্বংসমূলক। সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য থেকে ভয় জন্মায়। কিন্তু ভয় বাড়তে থাকলে সেই অসামর্থ্য আরও বেড়ে যায় এবং যতটুকু সঙ্গতিবিধান ব্যক্তির আয়ত্তাধীন ততটুকু সম্পন্ন করাও তার পক্ষে তখন সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ভয় ব্যক্তির মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দেয়। ভীত ব্যক্তি সব চেয়ে বেশী করুণা করে নিজেকেই। ভয় থেকে মুক্তি পাবার পর ব্যক্তির মধ্যে প্রায়ই আত্মগ্লানি বা হীনমন্যতার বোধ দেখা যায়।

দুশ্চিন্তা (Anxiety and Worry)

ভয়ের পরেই যে প্রক্ষোভটি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে সেটি হল দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তা হল ভয়েরই কাল্পনিক রূপ। শিশুর প্রত্যক্ষ পরিবেশে অবস্থিত কোন উদ্দীপক থেকে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয় না। কোন পরিস্থিতি বা অবস্থা যা ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে এবং যদি দেখা দেয় তাহলে তা ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপদ্‌গ্রস্ত করতে পারে—এই ধরনের পরিস্থিতি বা অবস্থার কল্পনা থেকেই দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। নিজের নিরাপত্তা বা ভবিষ্যৎ কল্পনা বা আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে ছোটখাট দুশ্চিন্তা স্বাভাবিকভাবে সকলের মধ্যেই থাকে। কিন্তু যখন এই দুশ্চিন্তা অতিরিক্ত হয়ে ওঠে ও মনের স্বাভাবিক প্রাক্ষোভিক অবস্থাকে বিপন্ন করে তোলে তখন সেই দুশ্চিন্তা সত্যই মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।

দুশ্চিন্তা নানা বস্তু থেকে সৃষ্টি হতে পারে। বই, সিনেমা, রেডিও ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে শিশুর মনে দুশ্চিন্তা জন্মাতে পারে। কাল্পনিক বস্তু থেকে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয় বলেই খুব ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে দুশ্চিন্তা বিশেষ দেখা যায় না। অন্তত যে বয়সে না পৌছলে শিশুর সামনে অনুপস্থিত বস্তুকে কল্পনা করে নেবার মত মানসিক পরিণতি তার মধ্যে দেখা না দেয় সে বয়সের আগে তার পক্ষে দুশ্চিন্তা করা সম্ভব হয় না। ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলে তাদের মধ্যে যে সব ভয় দেখা দেয় সেগুলি সত্যকারের ভয় নয়। সেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে দুশ্চিন্তা বলাই সঙ্গত, কেননা সেগুলির অধিকাংশই তাদের পরিবেশের কোন বস্তু থেকে উদ্ভূত নয়। সেগুলি বিভিন্ন কাল্পনিক কারণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। জারসিল্ডের (Jersild) একটি পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই ভূতের ভয় করে, যদিও কখনও তারা ভূত দেখেনি। অনেক ছেলেমেয়ে আবার জন্তু-জানোয়ারকে ভয় করে, যদিও কোন দিনই জন্তু-জানোয়ারের দ্বারা তাদের কেউই আক্রান্ত হয় নি। আবার দেখা গেছে যে অনেক ছেলেমেয়েই পরীক্ষায় ফেল করার ভয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে, যদিও তারা পড়াশোনায় খুবই ভাল এবং পরীক্ষায় সব সময় ভাল ফলও করে এসেছে।

অতএব এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে শিশুদের দুশ্চিন্তা অধিকাংশই ভিত্তিহীন এবং সম্ভাব্য ঘটনার অতি রঞ্জিতরূপ মাত্র। কিন্তু এ কথাও সত্য যে দুশ্চিন্তা শিশুদের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং সব রকম শিশুদের মধ্যেই দুশ্চিন্তা কম বেশী মাত্রায় দেখা দেয়। বিশেষ করে যখন বিভিন্ন শিশু এক সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তখন তারা পরস্পরের দুশ্চিন্তার কথা জানতে পারে এবং তার ফলে তাদের দুশ্চিন্তা সংখ্যা ও মাত্রার দিকে বেড়ে যায়।

বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। তাছাড়া বিভিন্ন বয়সে দুশ্চিন্তার প্রকৃতিও এক হয় না। তবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কতকগুলি দুশ্চিন্তাকে আমরা সাধারণ দুশ্চিন্তা বলে বর্ণনা করতে পারি। সেগুলি প্রায় সব ছেলেমেয়েদের মধ্যেই এক রকম অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে পড়ে মা বাবার বকুনি খাবার বা শাস্তি পাবার দুশ্চিন্তা, পরিবারের ব্যক্তিদের ভাল থাকা সম্পর্কে দুশ্চিন্তা, নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে দুশ্চিন্তা, নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা এবং সবশেষে আসে স্কুল সম্পর্কে নানা রকমের দুশ্চিন্তা। স্কুল সম্পর্কে দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে স্কুলে দেরীতে পৌছবার আশঙ্কা, পড়া না পারার দুর্ভাবনা, শিক্ষক শিক্ষিকার কাছে বকুনি

খাবার ভীতি, ক্লাসে প্রমোশন না পাবার দুশ্চিন্তা ইত্যাদি। বাড়ী এবং স্কুল সম্পর্কে দুশ্চিন্তা ছাড়া ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বীকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্পর্কে নানারকম দুশ্চিন্তা ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। তবে স্কুল সম্পর্কিত দুশ্চিন্তাই সাধারণত অন্য সব দুশ্চিন্তার চেয়ে বেশী পরিমাণে শিশুর মন জুড়ে থাকে। নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশী দুশ্চিন্তা করে থাকে।

শিশুদের দুশ্চিন্তার স্বরূপ ও মাত্রা নির্ণয়ে সামাজিক চাপের ভূমিকাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চাশ বৎসর আগে যে সব ব্যাপারে শিশুরা দুশ্চিন্তা বোধ করত এখন সেগুলি সম্পর্কে তাদের আর দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু তার পরিবর্তে নানা নতুন বিষয়ে তাদের মনে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন, আগেকার ছেলে-মেয়েদের কাছে পাপ বা নৈতিক মান, রোগ বীজাণু, যক্ষ্মা, দুর্ঘটনা ইত্যাদির দুশ্চিন্তা খুব বেশী মাত্রায় ছিল। কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা ঐ সব ব্যাপার সম্পর্কে আর তেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নয়। তার পরিবর্তে সাজ পোষাক, পিতামাতার সামাজিক মর্যাদা, যুদ্ধ, খাদ্যসমস্যা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে দুশ্চিন্তা এখনকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশী করে দেখা দেয়।

ক্যারল (Carrol) দুশ্চিন্তার চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—(১) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনোবিকারমূলক ভীতি, (২) মানসিক অস্থিরতা (৩) অসহায়তার অনুভূতি এবং (৪) রাগ।

দুশ্চিন্তার মাত্রা যখন বেড়ে যায় তখন ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের মনোবিকৃতি দেখা দেয় এবং খুব খারাপ কিছু ঘটবে একরকম একটা ভয় তার মনে সৃষ্টি হয়। তখন তার মধ্যে দেখা দেয় প্রচণ্ড উত্তেজনা, অস্থিরতা, হতাশা এবং প্রায় ক্ষেত্রেই সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। নিজের কাজে তখন তার কোন বিশ্বাস বা আত্মনির্ভরতা থাকে না। আরও গুরুতর ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা নানা রকম শারীরিক লক্ষণের রূপ গ্রহণ করে। হর্নের (Horney) মতে দুশ্চিন্তাকে দূর করার চারটি উপায় আছে। সে উপায় চারটি হল (১) নিজের কাছে দুশ্চিন্তার একটি অপব্যাখ্যান দেওয়া (rationalize), (২) দুশ্চিন্তাকে অস্বীকার করা, (৩) মাদক দ্রব্যের সাহায্যে দুশ্চিন্তা ভুলে যাওয়া এবং (৪) যে সব চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ এবং পরিস্থিতি দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করতে পারে সেগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া।

শিশুর মনকে যখন কোন দুশ্চিন্তা পীড়াগ্রস্ত করে তখন তার মধ্যে একটা হীনমন্যতার মনোভাব দেখা দেয় এবং সে অনুভব করে যে সে যেন তার

পরিবেশের সঙ্গে সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ নয়। যে সব পরিস্থিতির সঙ্গে ভালভাবে সঙ্গতিবিধান করার ব্যাপারে শিশু নিজেকে ঠিকমত প্রস্তুত নয় বলে মনে করে সেই সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেই তার মধ্যে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়।

অতএব শিশুর দুশ্চিন্তা দূর করতে হলে এবং তার সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে হলে তাকে দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশের এখানে উল্লেখ করা যায়।

১। প্রতিটি সমস্যার সম্মুখীন হবার জন্য কার্যকর সমাধান-সম্পন্ন সুনির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।

২। সমস্যাটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং এই সব প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য দ্বিধাহীনভাবে অপরের সাহায্য নিতে হবে।

৩। নিজে দুশ্চিন্তার সরাসরি সম্মুখীন হতে হবে এবং তার কারণটির গুরুত্ব কতটা সেটি জানার চেষ্টা করতে হবে।

৪। যদি দুশ্চিন্তার কারণটি আবিষ্কার করা যায় তবে সেটিকে দূর করার জন্য যা দরকার তা করতে হবে।

৫। গুরুতর দুশ্চিন্তার ক্ষেত্রে অপরের সহযোগিতা ও সাহায্য নিতে হবে।

রাগ (Anger)

বৈচিত্র্য ও তীব্রতার দিক দিয়ে রাগ নানা শ্রেণীর হতে পারে। সামান্য বিরক্ত হওয়া থেকে শুরু করে রেগে আগুন হয়ে যাওয়া সবই এই প্রক্ষোভটির অভিব্যক্তির অন্তর্গত। হিংসার ক্ষেত্রে রাগই ভয়ের সঙ্গে, কখনও বা দুঃখের সঙ্গে জড়িত থাকে। ঘৃণায় থাকে রাগ এবং ভয়।

অতি শৈশবে শিশুর রাগ হয় প্রধানত যখন তার কাজে বা ইচ্ছায় কেউ বাধা দেয়। কিন্তু পরে বড় হলে তার ইচ্ছা, পরিকল্পনা, সম্মান, কার্যাবলী প্রভৃতিতে সত্যকার বাধাদান ছাড়াও কেবলমাত্র বাধাদানের আশঙ্কাও রাগের সৃষ্টি করে। রাগ মানেই হচ্ছে একপ্রকার দুর্বলতা। ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে আশঙ্কা এবং তার প্রকৃত যোগ্যতা—এ দু'য়ের মধ্যে যত বেশী পার্থক্য বা বৈষম্য দেখা দেবে তত বেশী তার রাগের কারণ ঘটবে।

শৈশবে রাগের প্রকাশ থাকে সর্বদৈহিক। সমস্ত দেহ দিয়েই শিশু প্রথম প্রথম রাগ প্রকাশ করে কিন্তু সে যত বড় হয় ততই তার রাগের অভিব্যক্তিগুলি বিশেষধর্মী ও সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়ে ওঠে। পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাগের প্রকাশ নিছক রক্তচক্ষুতে বা ভ্রূকুঞ্চনে পর্যবসিত হতে পারে।

ব্যক্তির দেহ এবং মন উভয়ের পক্ষেই ক্রোধের প্রকাশ ক্ষতিকর। রাগের সময় অ্যাড্রেনালিনের নিঃসরণ, দৈহিক যন্ত্রপাতির অস্বাভাবিক কর্মতৎপরতার বৃদ্ধি, অতিরিক্ত শর্করার নিঃসরণ এবং পরিপাচনক্রিয়ার স্থগিত ভবন ইত্যাদি দেহের সাম্যভাবকে নষ্ট করে দেয়। তাছাড়া মনের সমতা ও স্বাস্থ্যের উপরও রাগের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর।

মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর কোন্ বয়সে কি কি কারণে রাগ জন্মায় তার একটি বিবরণী দিয়েছেন। শিশুর ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা কর্মপ্রয়াসের উপর যখনই কোন রকম বাধা বা প্রতিরোধ আরোপিত হয় তখনই তার মধ্যে রাগ দেখা দেয়। প্রথম শৈশবে রাগ দৈহিক কারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শরীরের সঞ্চালনে বাধা, শারীরিক অস্বস্তি, স্নান, খাওয়া, পোষাক পরা ইত্যাদি সাধারণ কাজে অসামর্থ্যবোধ প্রভৃতি কারণেই খুব শৈশবে শিশুর রাগ সৃষ্টি হয়ে থাকে যেমন, ঠিকমত মুখে খাবার তুলতে না পারলে বা পোষাক না পরতে পারলে শিশুর মধ্যে রাগ দেখা দেয়।

তাছাড়া নিজের অক্ষমতা বা অসুবিধা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না বলে শিশুর রাগ আরও বেড়ে যায়। শিশু যদি বোঝে যে তার উপর যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না তাহলেও সে রেগে যায়।

আর একটু বড় হলে নানা মানসিক ও প্রাক্ষোভিক কারণে শিশুর রাগ দেখা দেয়। নিজের কোন সম্পত্তি বা অধিকারের সামগ্রীতে যদি কেউ হস্তক্ষেপ করে তাহলে সে রেগে যায়। সমবয়সীদের সঙ্গে খেলনা নিয়ে এ সময়ে প্রায়ই মারামারি লেগে থাকে। যদি তাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় বা তার কোনও কাজে বা খেলায় বাধার সৃষ্টি করা হয় তাহলেও রাগ দেখা দিয়ে থাকে। শিশুকে বকাবকি করলে বা শাস্তি দিলে তার রাগ হয়। নিজে যদি কোন ভুল করে ফেলে বা যদি কোন খেলনা বা বস্তু ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারে তাহলেও সে রেগে ওঠে। ছেলেমেয়েদের রাগমাত্রেরই একটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য হল যে তারা যখন কোন রকম বাধ্যতামূলক চাপ অনুভব করে তখনই তারা রেগে যায়। যেমন, কোন কাজ করতে বা না করতে শিশুকে বাধ্য করা

হচ্ছে কিংবা তার কোন ইচ্ছাকে দমন করতে সে বাধ্য হচ্ছে কিংবা জোর করে তাকে কোন অসুবিধা ভোগ করানো হচ্ছে ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিশুর রাগ জন্মায়।

পরিণত ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগ সৃষ্টির প্রধান কারণগুলি হল, ইচ্ছা দমন, কাজে বাধাদান, আচরণের দোষ ধরা, সমালোচনা করা, বিরক্ত করা, বক্তৃতা দেওয়া বা লম্বা উপদেশ দেওয়া, অপ্রীতিকর তুলনা করা ইত্যাদি। তাছাড়া অবহেলিত হওয়া, ভৎর্সিত হওয়া অপরের হাস্য ও বিদ্রূপের পাত্র হওয়া, অন্যায়ভাবে শাসিত হওয়ার বোধ জন্মানো, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলিও পরিণত বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগসৃষ্টির শক্তিশালী কারণ রূপে কাজ করে থাকে। পরে যখন তার আগ্রহ ক্রমশ গৃহের প্রাচীর ডিঙিয়ে বাইরের সমাজে সঞ্চালিত হয় তখন বহির্জগতের নানা প্রতিবন্ধক ও অসুবিধা তাকে প্রতিপদে বিরক্ত করে তুলতে থাকে।

প্রাপ্তযৌবনে এই প্রতিবন্ধকের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ছেলেমেয়েদের রাগের তীব্রতাও সেইভাবে বেড়ে চলে। এই বয়সে রাগের একটি সাধারণ কারণ হল যে তাদের মনে ধারণা জন্মায় যে তারা অন্যায়ভাবে শাসিত বা ভৎর্সিত হচ্ছে। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের নিজেদের ঈপ্সিত লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌছনোর ক্ষমতা—এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধানই হল এই বয়সে রাগের আর একটি বড় কারণ। এ ব্যবধান যত বাড়তে থাকে তত রাগের তীব্রতা বাড়ে।

আরও পরিণত বয়সে নানা কারণে ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গ ঘটতে পারে। ব্যক্তির নিজের সুখ-সুবিধা, প্রিয়জনের আনন্দ ও উন্নতি, সামাজিক স্বীকৃতি, অর্থ, মান, প্রতিপত্তির কামনা প্রভৃতি ব্যক্তির নানা মৌলিক প্রয়োজনের তরঙ্গ বহির্জগতের রূঢ় বাস্তবের শৈলে ধাক্কা লেগে ব্যক্তির কাছে ফিরে আসে এবং তার ফলে ব্যক্তির মধ্যে রাগের সৃষ্টি হয়।

রাগের প্রকাশও শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম প্রথম নিছক শারীরিক অভিব্যক্তিতেই রাগ সীমাবদ্ধ থাকে। তারপর যত শিশু বাইরের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয় ততই সে তার রাগের বহিঃপ্রকাশকে সঙ্কুচিত করতে বাধ্য হয়। তার ফলে রাগের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হয়ে নানা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। ক্রমশ চীৎকার, কান্না, হাত-পা ছোঁড়া প্রভৃতি শৈশবের আচরণগুলি সংযত হয়ে মার্জিত ও সমাজসম্মত আকার নেয়।

তবে সময় সময় রাগের কিছু উপকারিতাও দেখা যায়। রাগ ব্যক্তির আলস্য, উদাসীনতা ও নিরুৎসাহ প্রভৃতি দূর করে দিয়ে তাকে কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে। কখনও কখনও শিশুর রাগ দেখে পিতামাতা বা শিক্ষক প্রভৃতি নিজেদের ব্যবহারের ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাগ ব্যক্তির এবং তার পরিবেশের আর সকলের পক্ষে অমঙ্গলকর হয়ে থাকে।

বারবার রাগ হতে হতে শেষে রাগ অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন শিশুর পক্ষে রাগকে সংযত করা দুরূহ হয়ে ওঠে। এই জন্য শিশুর রাগের কারণটি আগে থেকে দূর করতে হবে এবং যাতে শিশুর রাগ অভ্যাসে পরিণত না হয় সেদিক সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

অবশ্য সব সময় শিশুর রাগ জোর করে দমন করা উচিত নয়। যেখানে ব্যর্থতা থেকে রাগ হয় সেখানে ব্যর্থতা দূর করার কোন ব্যবস্থা না করে কেবল-মাত্র রাগ দমন করলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণই হয়। সেজন্য শিশুর রাগকে অসামাজিক পথে অভিব্যক্ত হতে না দিয়ে সমাজ-সম্মত পথে যাতে তা প্রকাশ পায় তার ব্যবস্থা করাই হল সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়।

শিশুর রাগের কারণগুলি যাতে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রথম দরকার। অনর্থক তার আচরণ বা ইচ্ছায় বাধা সৃষ্টি না করা উচিত। যে সকল কাজ শিক্ষার্থীর কাছে রুচিকর নয় সেগুলি তাকে করতে না দেওয়াই ভাল। দুরূহ কাজ, একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি, অনর্থক বাধাদান, অসম্ভব দাবী ইত্যাদি যতদূর সম্ভব বর্জন করা উচিত। শিশুকে হুকুম করা বা তার অসাফল্য নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার অভ্যাস সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে। তাছাড়া জোর করে বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে শিশুর কাছ থেকে কাজ আদায় করার প্রথাটিও অত্যন্ত ক্ষতিকর।

শিক্ষার্থীর রাগের চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজে রেগে যাওয়া সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর। যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে ও সংযতভাবে শিক্ষার্থীর রাগের কারণ নির্ণয় করা এবং উপযুক্ত সহানুভূতি ও বিবেচনার সঙ্গে তার মীমাংসা করাই হল পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্তব্য।

বদমেজাজ (Temper Tantrum)

প্রায়ই ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে বদমেজাজের প্রকাশ দেখা যায়। উচ্চস্বরে চীৎকার, একনাগাড়ে কান্না, জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলা, ভাঙ্গা, হাত-পা ছোঁড়া প্রভৃতি হল বদমেজাজের বহিঃপ্রকাশ। আসলে বদমেজাজ হল রাগেরই এক রকম অভিব্যক্তি এবং কোন কিছু পাওয়ার বা আদায় করার উদ্দেশ্যে ছোট

ছেলেমেয়েরা বদমেজাজের আশ্রয় নেয়। শিশু খুব অল্প বয়সেই বুঝে নেয় যে এই ধরনের আচরণ করলে মা বাবার কাছ থেকে তার ঈপ্সিত বস্তু বা তাঁদের মনোযোগ সে আদায় করতে পারবে। বিশেষ করে যে সব ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে মা বাবারা খুব বেশী উদ্বেগ প্রকাশ করেন তাদের মধ্যেই বদমেজাজ বেশী দেখা যায়।

শিশুর মনে যখন একটা হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি হয় তখনই সে তার বদমেজাজের সাহায্যে সেই মনোভাবটিকে পরিপূরণ করতে চেষ্টা করে। আর যদি শৈশবে বদমেজাজেব সাহায্যে শিশুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে পরিণত বয়সেও তার সেই বদমেজাজ থেকে যায়। তবে শিশু যখন বড় হয়ে ওঠে তখন তার বদমেজাজের অভিব্যক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। পরিণত বয়সে ব্যক্তি বহু ক্ষেত্রে তার বদমেজাজকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। তখন তার এই বদমেজাজ অন্য রূপ ও আকৃতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

রাগের নিয়ন্ত্রণ (Control of Anger)

রাগ বহুলাংশে নির্ভর করে উদ্দীপকেব উপব এবং যে উদ্দীপক থেকে শিশুর রাগ সৃষ্টি হয সেই উদ্দীপকটি শিশুর সামনে থেকে সরিয়ে নিলে শিশুর রাগ স্বভাবতই চলে যায়। পিতামাতা এবং শিক্ষকেরা ঐ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করলে রাগ দমন কবা ও তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করা শিশুর পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে। যখনই দেখা যাবে যে বিশেষ একটি উদ্দীপক থেকে শিশুব মধ্যে রাগ দেখা দিয়েছে তখনই উচিত হচ্ছে যে ঐ বিশেষ উদ্দীপকটি থেকে যাতে শিশুব মনোযোগ সরে অন্য কোনও উদ্দীপকে যায় তার আয়োজন করা। দেখা গেছে যে এই প্রক্রিয়ায় শিশুর প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা বেশ কমে যায়। যেমন, শিশু হয়ত এমন বিশেষ কোনও বস্তু চাইছে যা তাকে দেওয়া যাবে না এবং তার ফলে তার মধ্যে রাগ দেখা দিয়েছে। এখানে যেমন ঐ বিশেষ বস্তুটি তাকে দেওয়া হবে না বা দেওয়া যাবে না তেমনই তার বিকল্প রূপে সে পছন্দ করে এমন কোনও বস্তু তাকে দিতে হবে বা এমন কোন কাজ তাকে করতে দিতে হবে। তবেই তার বাগ চলে যাবে। মনে বাখতে হবে যে শিশুর রাগের উত্তেজনাকে যত শীঘ্র সম্ভব দূর করতে হবে। শিশুকে যে বিকল্প বস্তুটি দেওয়া হবে সে বস্তুটি যেন তার মনোযোগকে সম্পূর্ণভাবে আকৃষ্ট করতে পারে এবং যাতে তার মধ্যে রাগের পরিবর্তে তৃপ্তির মনোভাব দেখা দেয়। বিকল্প বস্তুর নির্বাচন ঠিকমত না হলে এই পদ্ধতিটি কার্যকব হবে না।

এই বিকল্প উদ্দীপক উপস্থাপন পদ্ধতিটি যে কেবলমাত্র শিশুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়, বড় বড় ছেলেমেয়ে, বয়স্ক ব্যক্তি প্রভৃতি সকলের ক্ষেত্রেই রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করা যায়। রাগ হলে যে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুণতে বলা হয় কিংবা ১০০ থেকে উল্টো দিকে গুণে যেতে বলা হয় তার মূলেও এই উদ্দীপক পরিবর্তনের নীতিটি আছে। প্রকৃত রাগের পাত্র থেকে মনোযোগ সরিয়ে এনে অন্য কোনও বস্তুতে ব্যক্তির মনোযোগ নিবদ্ধ করাই হল এই পদ্ধতিগুলির উদ্দেশ্য।

শিশুর রাগকে নিয়ন্ত্রিত করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে যে তার পেছনে প্রকৃতপক্ষে শিশুর কোন্ উদ্দেশ্য বা চাহিদাটি আছে। এইটি যদি পিতামাতা ও শিক্ষক ঠিকমত ধরতে পারেন তাহলে শিশুর রাগ দূর করা সহজ হয়ে উঠবে। প্রায়ই দেখা যায় যে, অল্পস্বল্প প্রশংসাবাক্য, মিষ্টি কথা ইত্যাদিতেই শিশুর মানসিক ক্ষোভ চলে যায়। রাগের সময় যুক্তি দেখিয়ে শিশুর সঙ্গে বিতর্ক করলে ফল ভাল হয় না, বরং তাতে তার রাগ আরও বেড়ে যায়। তার চেয়ে মিষ্টি কথায় বোঝানোর চেষ্টা করা অনেক ভাল। প্রীতি ও ভালবাসা রাগের পরম প্রতিষেধক।

ঈর্ষা (Jealousy)

শিশুদের মধ্যে আর যে প্রক্ষোভটি ব্যাপকভাবে দেখা যায় সেটি হল ঈর্ষা। ভলমারের (Vollmer) মতে ভালবাসা হারাবার প্রকৃত বা কল্পিত বা আসন্ন কারণ থেকেই ঈর্ষা জন্মায়। ঈর্ষাকে বিশ্লেষণ করলে অনেকগুলি অনুভূতি পাওয়া যায়, যেমন, হীনমন্যতা, ভয় এবং রাগ। সময় সময় এর সঙ্গে ভালবাসার অনুভূতিও জড়িয়ে থাকে। সাধারণত কোন ব্যক্তির উপর রাগ থেকেই ঈর্ষা জন্মায়। রাগ ব্যক্তি, বস্তু এমন কি নিজের প্রতিও উদ্দিষ্ট হতে পারে, কিন্তু ঈর্ষা কেবলমাত্র কোন ব্যক্তির প্রতিই সৃষ্টি হতে পারে। ঈর্ষার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন রূপের হতে পারে। কখনও ঈর্ষা বদমেজাজের রূপ গ্রহণ করে, কখনও বা বাইরে অপ্রকাশিত চাপা রাগের অনুভূতি রূপে শিশুর মধ্যে থাকতে পারে।

ঈর্ষা একমাত্র সামাজিক পরিস্থিতি থেকেই সৃষ্টি হতে পারে। যখন বড়দের ভালবাসা ও মনোযোগ পাবার প্রচেষ্টায় শিশু দেখে যে সে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে তখনই তার মধ্যে ঈর্ষা জাগে। বাড়ীতে ভাই বা বোন নতুন জন্মালে তার প্রতি শিশুর ঈর্ষা জাগে। কিংবা স্কুলে কোন সহপাঠী তার চেয়ে কোনও ব্যাপারে বেশী কৃতিত্ব দেখালে শিশু তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে

ওঠে। অনেক সময় বাড়ীতে বড় ভাইবোনেরা যে সব অতিরিক্ত অধিকার বা সুবিধা ভোগ করে তা দেখেও শিশুর মধ্যে ঈর্ষা জাগে।

যে সব বাড়াতে বা স্কুলে প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয় সে সব বাড়ার শিশুদের মধ্যে ঈর্ষা বেশী করে জাগে। প্রতিযোগিতামূলক মনোবৃত্তির ফলে শিশুদের মধ্যে প্রীতি, সৌহার্দ্য, সহানুভূতি ইত্যাদি মনোভাবগুলি ভালভাবে জাগতে পারে না এবং তারা পরস্পরকে ঈর্ষা ও ঘৃণা করতে শেখে। এই জন্য আধুনিক মনশ্চিকিৎসকদের মতে মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে বাড়ীতে এবং স্কুলে যতদূর সম্ভব শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রথাটি পরিহার করতে হবে।

ঈর্ষা শিশুর মধ্যে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি করে থাকে। শিশুর উত্তেজনা নানা ধরনের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। হারলক, (Hurlock) ঈর্ষার কয়েকটি প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল, প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে শত্রুতা, প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে নিজেকে অভেদীকরণ, প্রিয়জনের কাছ থেকে দূরে সরে আসা, অবদমন, আত্ম-উৎপীড়ন এবং উন্নীতকরণ (sublimation)। ঈর্ষাক্রান্ত শিশু এই সব আচরণের মধ্যে দিয়ে তার ঈর্ষাকে প্রকাশ করে থাকে।

ঈর্ষার প্রকাশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। ঈর্ষাজনিত আচরণের মধ্যে সব সময়েই একটি অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব থাকে। সেইজন্য তার কোন সত্যকারের প্রতিদ্বন্দ্বী থাক আর না থাক, শিশু চেষ্টা করে প্রতিহিংসা নিতে কিংবা নিজের আধিপত্য প্রমাণ করতে। সাধারণত বড়দের মনোযোগ আকর্ষণ করা, আঙুল চোষা, ভাষায় নিজের রাগ ব্যক্ত করা, মা-বাবার প্রতি অভিমান দেখান, আবার কখনও কখনও কোন দৃঢ়বদ্ধ ভুল ধারণা পোষণ করা (obsession) ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে শিশুর ঈর্ষা বাইরে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

ঈর্ষার প্রতিক্রিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, প্রত্যক্ষ (direct) এবং অপ্রত্যক্ষ (indirect)। যখন শিশু তার ঈর্ষার পাত্রের প্রতি সরাসরি বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং তাকে কামড়ানো, ধাক্কা দেওয়া, কামড়ে খামচে দেওয়া, মারা ইত্যাদি আচরণের মাধ্যমে তাকে আক্রমণ করে তখন তার ঈর্ষার প্রতিক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। আর যখন তার ঈর্ষার প্রতিক্রিয়া অন্ত কোন পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে তখন সেই প্রতিক্রিয়াকে পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া বলা হয়। যেমন, শিশুর ঈর্ষার প্রতিক্রিয়া তার অতি শৈশবের আচরণ ধারায় প্রত্যাবৃত্ত করতে পারে, তার

মধ্যে খাদ্য-সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, দুষ্টামি ও ধ্বংসপ্রবণতা জাগাতে পারে, খেলনা বা জীবজন্তুর উপর আক্রমণের রূপ নিতে পারে ইত্যাদি। সাধারণত ছোট শিশুর মধ্যেই ঈর্ষার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি দেখা যায়। শিশু একটু বড় হয়ে উঠলে তার ঈর্ষা নানা পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ার রূপ গ্রহণ করে।

ঈর্ষা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। হারলকের মতে প্রতি তিনজন ঈর্ষাক্রান্ত শিশুর মধ্যে দুজনই মেয়ে। বিভিন্ন বয়সে ঈর্ষার তীব্রতা বা মাত্রাও বিভিন্ন। সাধারণত তিন থেকে চার বৎসর বয়সের মধ্যে ঈর্ষা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছয়। আর একবার ঈর্ষা তার সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছয় যৌবনাগমের সময়। আবার দেখা গেছে যে সব ছেলেমেয়ের মধ্যে বুদ্ধি এবং মননশক্তি বেশী তারা নিম্নস্তরের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী ঈর্ষাপ্রবণ হয়ে থাকে।

পরিবারের মধ্যে বয়সে সব চেয়ে যে বড় প্রায়ই সে তার পরের ভাইবোনদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। তার কারণ হল যে একদিন সে বাড়ীর সকলের মনোযোগের একমাত্র পাত্র ছিল। কিন্তু তার পরে একটির পর একটি ভাইবোন আসার ফলে তার প্রাপ্য মনোযোগ ও আদরের অংশীদারদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যায় এবং তার ফলে তার ভাইবোনদের প্রতি ঈর্ষা ও রাগ দেখা দেয়। মেয়েতে মেয়েতে ঈর্ষা যতটা দেখা যায়, ছেলেতে ছেলেতে বা ছেলেতে মেয়েতে তত-বেশী দেখা যায় না। দু-তিনটি ছেলেমেয়ে-সম্পন্ন ছোট পরিবারে ঈর্ষা বেশী দেখা যায়। একশিশু সম্পন্ন বা বহু শিশু-সম্পন্ন পরিবারে ঈর্ষা অপেক্ষাকৃত কম হতে থাকে।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঈর্ষার সৃষ্টিতে মা বাবার ভূমিকাও অবহেলার নয়। বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের প্রতি মা কি ধরনের মনোভাব পোষণ করেন এবং তাদের উপর বাড়ীতে কি ধরনের শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার উপরই ছেলেমেয়েদের মনে ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া নির্ভর করে। যে সব মা বাবা সব সময়ে ছেলেমেয়েদের আদর দেন বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনোযোগ দেন সে সব ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তেমনি আবার যে সব মা বাবা শিশুদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করার ব্যাপারে কোন সুষম নীতি অনুসরণ করেন না কিংবা নিজের কোন ছেলে বা মেয়ের দোষ দেখলে অন্যান্য ভাইবোন বা অন্য বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুলনা করেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও ঈর্ষার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ফষ্টার, রস, সিওয়াল, বসার্ড, জারসিল্ড প্রভৃতি শিশু মনোবিজ্ঞানীদের ব্যাপক

গবেষণা থেকে এই কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুর ঈর্ষার তীব্রতা নির্ভর করে মায়ের ভালবাসার মাত্রার উপর। শিশু যত বেশী তার মাকে ভালবাসবে তত বেশী তার মধ্যে ঈর্ষার প্রবণতা সৃষ্টি হবে। যখন সেই মা তার প্রতি বিমুখ হয়ে উঠবেন বা অবহেলা করবেন তখন সে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠবে।

প্রক্ষোভ ও ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধান

(Emotion and Individual Adjustment)

ব্যক্তির জীবনে প্রক্ষোভের মূল্য অপরিসীম। মানুষ নিজেকে বুদ্ধিজীবি প্রাণী বলে বর্ণনা করলেও বাস্তবে সে এখনও পুরোপুরি প্রক্ষোভশীল প্রাণীই আছে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের মানব আচরণগুলি বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে যে সেগুলির অধিকাংশই বুদ্ধি বা বিচার ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত নয় বরং কোন না কোন প্রক্ষোভ থেকেই উদ্ভুত ও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

বস্তুত ব্যক্তির আচরণ থেকে সুরু করে তার দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব, ধর্মবিশ্বাস, শিখন, এমন কি স্বাস্থ্য পর্যন্ত প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হয় ব্যক্তির প্রক্ষোভের দ্বারা। ছোট শিশুর আচরণধারার স্বরূপ নির্ধারণ করে তার প্রক্ষোভই। যে ভাবে শিশুর বিভিন্ন প্রক্ষোভগুলি সংগঠিত হয় সেইভাবেই তার সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলিও গড়ে ওঠে। যেমন, যে শিশু সমাজের আর দশজনের সঙ্গে সহযোগিতা করে আনন্দ পেতে শিখেছে তার আচরণ একরকম হবে। আর যে শিশু কেবলমাত্র নিজের স্বার্থ সিদ্ধিতে আনন্দ পেতে শিখেছে তার আচরণ আর একরকমের হবে। বলা বাহুল্য যে এই প্রক্ষোভের সংগঠনে পিতামাতার মনোভাব ও আচরণের প্রভাব প্রচণ্ড। কেননা তাঁদেরই শিক্ষণের ফলে শিশুর প্রক্ষোভ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে। প্রত্যেক পিতামাতার একথা সব সময়েই মনে রাখা উচিত যে শিশুর আচরণের চরম রূপদানের ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাঁদেরই উপর সব সময় ন্যস্ত থাকে।

শিশুর সমস্ত শিখণকেও সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে শিশুর প্রক্ষোভ। থর্নডাইকের ফললাভের সূত্র অনুযায়ী যে প্রচেষ্টার শেষে শিশু তৃপ্তিকর ফল লাভ করে সেই প্রচেষ্টা থেকেই স্থায়ী ও সার্থক শিক্ষা হয় এবং যে প্রচেষ্টার শেষে অতৃপ্তিকর অনুভূতি থাকে সেই প্রচেষ্টা থেকে কোনও স্থায়ী ও সার্থক শিক্ষা লাভ করা যায় না।

থর্নডাইকের এই সংব্যাখ্যানটি সকলে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করলেও একথা

সকলেই স্বীকার করেন যে শিখন যদিও একটি জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া তবুও সমস্ত শিখন প্রক্রিয়ারই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল প্রক্ষোভ। বস্তুত, শিশুর শিখন প্রক্রিয়াটি কোন্ ধরনের পরিণতি লাভ করবে তা নির্ধারিত হয় তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রক্ষোভ-মূলক অনুভূতির দ্বারা।

তাছাড়া শিখনপ্রক্রিয়া নির্ভর করে প্রেষণার উপর। যদি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা ঠিকমত না জাগে তাহলে তার শিখন সম্ভব হতে পারে না। আর প্রেষণা বলতে বোঝায় শিখনের ফল বা লক্ষ্যটিতে পৌছনর আগ্রহ। এই আগ্রহ যে অনেকখানি প্রক্ষোভধর্মী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই জন্য স্বাভাবিক প্রেষণা না জাগলে প্রশংসা বা পুরস্কারের সাহায্যে কিংবা নিন্দা বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে তার মধ্যে কৃত্রিম প্রেষণা তৈরী করা হয়ে থাকে। প্রশংসা এবং পুরস্কারের ক্ষেত্রে তার মধ্যে আনন্দ জাগান হয় আর নিন্দা এবং শাস্তির ক্ষেত্রে তার মধ্যে ভীতি জাগান হয়ে থাকে। এই দুই প্রক্ষোভকে উত্তেজিত করে সাধারণত শিশুকে শিখনে প্রবৃত্ত করা হয়ে থাকে।

এক কথায় স্বাভাবিকই হোক্ আর কৃত্রিমই হোক্ প্রেষণামাত্রেই প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল। এইজন্য শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের মনে রাখা উচিত যে যদি অনুকূল প্রক্ষোভ শিশুর মধ্যে না জাগে তাহলে তার শিখন সন্তোষজনক হতে পারে না। যে সব শিক্ষক শিক্ষাদানের সময় শিশুকে বিরক্ত, ক্রুদ্ধ বা আহত করে তোলেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কাজই করেন, কেননা প্রতিকূল প্রক্ষোভসম্পন্ন শিশুর পক্ষে কোনও কিছু শেখা একপ্রকার অসম্ভব বললেই চলে।

৮

ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব, ধর্মাসক্তি প্রভৃতির সৃষ্টিতেও প্রক্ষোভের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির সংগঠনে যেমন জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতার অবদান আছে তেমনই আছে তার প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির প্রভাব। নিছক কোন ঘটনা বা ধারণার জ্ঞান থেকে সে সম্বন্ধে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী বা মনোভাব তৈরী হয় না। দৃষ্টি-ভঙ্গী এবং মনোভাব তৈরী হয় ব্যক্তি একটি বিশেষ ধারণা বা ঘটনাকে কি ভাবে গ্রহণ করে তাই থেকে। অর্থাৎ জ্ঞান এবং প্রক্ষোভ দু'য়ের মিশ্রণেই ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব ইত্যাদি গড়ে ওঠে। ধর্মবিশ্বাসের বেলাতেও একই কথা। যখন মানুষ দৃশ্যমান জগতের অভিজ্ঞতা থেকে তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পায় না, তখন সে ধর্মের আশ্রয় নেয়। সেই জন্য ধর্মবিশ্বাস মাত্রের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে একটি নির্ভরশীলতা ও আশ্বস্তবোধের পরিতৃপ্তি। সময় সময় ধর্মজাত প্রক্ষোভের

মাত্রা এত তীব্র হয়ে ওঠে যে ব্যক্তি তার বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিধর্মিতা হারিয়ে ফেলে এবং আমরা তখন তাকে ধর্মান্ধ বলে বর্ণনা করে থাকি।

ব্যক্তির স্বাস্থ্যও প্রচুর পরিমাণে প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল। ক্যাননের একটি পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে অতিরিক্ত রাগ বা উত্তেজনার সময় আমাদের পরিপাচনক্রিয়া বন্ধ থাকে। তাছাড়া অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির উপর সাম্প্রতিক যে সব পরীক্ষণ হয়েছে সেগুলি থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রক্ষোভ জাগরণের ফলে শরীরের মধ্যে নানারকম গ্রন্থিরসের নিঃসরণ হয় এবং আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর সেগুলির প্রভাব প্রচুর। বিশেষ করে রাগ ভয় ইত্যাদি প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে গ্রন্থিরসের নিঃসরণে সমস্ত শরীর উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়া দ্রুত ও অধিকতর তীব্র হয়।

এই সব কারণে আজকাল চিকিৎসকেরা এ বিষয়ে একমত যে সুষ্ঠু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রক্ষোভের স্বাভাবিক জাগরণ একান্ত প্রয়োজন। অস্বাভাবিক প্রক্ষোভ-মাত্রেই স্বাস্থ্যকে ক্ষুন্ন করে তোলে।

অতএব আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। যে সব প্রক্ষোভ আমরা অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছিত মনে করি সেই সব প্রক্ষোভ যদি ব্যক্তির জীবনে বার বার দেখা দেয় তাহলে তার সঙ্গতিবিধান বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হবেই। আর ব্যক্তির সঙ্গতিবিধান ক্ষুন্ন হওয়ার অর্থ হল ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক জগতে আরও বিপর্যয় ঘটা এবং এই প্রক্ষোভমূলক বিপর্যয় থেকে স্বাভাবিকভাবে দেখা দেবে তীব্রতর ও আরও বিপজ্জনক অপসঙ্গতি। এই ভাবে ধাপে ধাপে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি ঘটবে এবং শেষ পর্যন্ত চরম বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা থাকবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা-শিক্ষক প্রভৃতির উপর শিশুর মনের প্রক্ষোভমূলক দিকটির সুষ্ঠু ও সুষম সংগঠন অনেকখানি নির্ভর করে। যদি তার প্রক্ষোভগুলি প্রথম থেকেই মাত্রাহীন ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে গঠিত হয় তাহালে তার সঙ্গতিবিধান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে উঠবে এবং তার ভবিষ্যৎ জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তার পিতামাতা-শিক্ষকগণ যদি শিশুর প্রক্ষোভমূলক সংগঠনকে প্রথম থেকেই যত্ন ও দুরদৃষ্টির সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করেন তাহলে তার সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টা সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক হয়ে উঠবে এবং তার ভবিষ্যৎ জীবনে আসবে পূর্ণতা ও সার্থকতা।

প্রশ্নাবলী

1.* Discuss the effects of fear on the child's mental life. How can the fear of the child be controlled and cured ?

Ans. (পৃঃ ১৯৪—পৃঃ ২০২)

2. What are the causes behind the origin of fear in the child ? Discuss its utilities in the social and mental life of the child.

Ans. (পৃঃ ১৯৪—পৃঃ ২০১)

3. Describe some abnormal forms of fear. Suggest probable causes and remedial measures.

Ans. (পৃঃ ১৯৪—পৃঃ ২০২)

4. Discuss the role of anger in the child's mental life. How does anger help and inhibit the proper adjustment of the child ? What are the good effects of anger, if any ?

Ans. (পৃঃ ২০৫—পৃঃ ২১০)

5. Discuss of the causes the origin of jealousy in the child. Suggest a few methods of curing the child's jealousy.

Ans. (পৃঃ ২১০—পৃঃ ২১৩)

6. Describe the roles of fear and anger in the child's emotional integration. How do they affect the child's mental health ?

Ans. (পৃঃ ১৯৪—পৃঃ ২১০)

7. Discuss the effect on the child's adjustment process. Why is anxiety caused ? How can it be cured ?

Ans. (পৃঃ ২০২—পৃঃ ২০৫)

8. Discuss the relation between emotion and child's adjustment. Suggest a few measures for ensuring better emotional adjustment of the child.

Ans. (পৃঃ ২০৬—পৃঃ ২১৫)

9. Write notes on : Temper-Tantrum and Phobia

উনিশ

মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association)

আধুনিক মনশ্চিকিৎসায়, মানসিক ব্যাধির কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসার যে পদ্ধতিটি এক প্রকার সর্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেটি হল ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতি। সাধারণত দেখা গেছে যে সম্মোহিত অবস্থায় ব্যক্তি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সম্মোহন ভেঙে গেলে ব্যক্তি সে অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যায়। একে আমরা সম্মোহনমূলক বিস্মৃতি বলে থাকি। কিন্তু বার্নহিম (Bernheim) একটি পরীক্ষা করে দেখান যে যদি ব্যক্তির উপর যথেষ্ট চাপ দেওয়া যায় তাহলে সম্মোহনকালীন বিস্মৃত অভিজ্ঞতাও তার মনে পড়ে যায়। ফ্রয়েড এই থেকে সিদ্ধান্ত করলেন যে যদি চাপ দিয়ে সম্মোহনকালীন বিস্মৃতিকে জাগান যায় তাহলে যে সব স্বাভাবিকভাবে বিস্মৃত অভিজ্ঞতার জন্য মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয় সেগুলিকে একই উপায়ে চাপ দিয়ে জাগান সম্ভব হবে। এই সিদ্ধান্ত থেকেই ফ্রয়েড মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন এবং মনশ্চিকিৎসার রাজ্যে আজও এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলে পরিগণিত হয়। ব্যক্তির বিস্মৃত অতীতে পৌঁছবার পদ্ধতি বলতে একমাত্র সম্মোহন প্রক্রিয়াটিই এতদিন চিকিৎসকদের জানা ছিল। কিন্তু সম্মোহন প্রক্রিয়ার অসুবিধা ও অসম্পূর্ণতা ছিল প্রচুর। মুক্ত অনুষঙ্গ সেদিক দিয়ে বহুলাংশে ত্রুটিশূন্য এবং সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য।

মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে শান্ত পরিবেশে নির্জন কক্ষে একটি আরাম কেদারা বা বিছানায় রোগীকে শুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর তাকে বিনা দ্বিধায় মনের উপর কোনরূপ বাধা আরোপ না করে যে সব চিন্তা বা স্মৃতি তার মনে আসে সে সব চিকিৎসকের কাছে বর্ণনা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। দেখা গেছে যে এইভাবে বর্ণনা করতে করতে ব্যক্তি তার বহুদিনের বিস্মৃত অতীতে চলে যায় এবং যে সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা তার অতি শৈশবে ঘটেছিল এবং যেগুলি সে তার পরিণত বয়সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে সেগুলি একের পর এক তার মনে আসতে সুরু করে। ব্যক্তির এই বর্ণনা থেকে মনশ্চিকিৎসক তার মনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং বিশেষ করে তার ব্যাধির সৃষ্টির পেছনে যে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বটি মনের অচেতনে নিহিত থাকে সেটি সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এই তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করেই মনশ্চিকিৎসক তার ব্যাধির সফল চিকিৎসা করতে সক্ষম হন।

সাধারণত মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে নানা প্রণালীতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রথম প্রণালীতে রোগীকে একটি বিশেষ কোন অভিজ্ঞতার উপর মনোনিবেশ

করতে বলা হয় এবং তা থেকে তার যা মনে আসে তা বিনা বাধায় বলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কখন রোগীর কোন একটি বিশেষ চিন্তা বা তার দেখা কোন একটি বিশেষ স্বপ্ন দিয়ে মুক্ত অনুষঙ্গ সুরু করা হয় এবং ঐ বিশেষ চিন্তা বা স্বপ্নটি সম্পর্কে তার মনে যে সব কথার উদয় হয় তাকে সেগুলি অবিকল বর্ণনা করে যেতে বলা হয়। আবার কখন বা কোন রকম বিশেষ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন না করেই রোগীকে তার মনে যে সব কথা স্বভাবতই উদয় হয় সেগুলি বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সময় রোগীকে যত বেশী আরামদায়ক অবস্থায় রাখা যাবে তত বেশী সে বাধাহীনভাবে তার বিস্মৃত অতীতের সঙ্গে অনুষঙ্গ স্থাপন করতে পারবে অর্থাৎ তত বেশী সে তার বিস্মৃত অভিজ্ঞতাগুলির কথা বলতে পারবে। এইজন্যই মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে নির্জন ঘর, শান্ত পরিবেশ এবং আরামদায়ক শয্যা বা কেদারার ব্যবহার করা হয়। যখন মুক্ত অনুষঙ্গ পূর্ণমাত্রায় গিয়ে ওঠে তখন ব্যক্তি বাস্তব থেকে অর্ধবিচ্ছিন্ন ও এক ধরনের অর্ধসম্মোহিত অবস্থায় গিয়ে পৌছয়। সে তার বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে এবং যে অতীত অভিজ্ঞতার কথা সে বর্ণনা করে তখন মনে মনে সে সেই অতীত অভিজ্ঞতার রাজ্যে ফিরে যায়। কেবল তাই নয় সে সময় তার সেই অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রক্ষোভটিও সে পূর্ণমাত্রায় অনুভব করে।

ফ্রয়েডের মতে সকল প্রকার মানসিক ব্যাধির মূলেই আছে এক ধরনের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তাই থেকে তার মধ্যে সঞ্জাত প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ। এই প্রতিরুদ্ধ প্রক্ষোভের মুক্তি ব্যক্তির মানসিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্য অপরিহার্য। মুক্ত অনুষঙ্গের মাধ্যমেই ব্যক্তির বিস্মৃত অতীতের অবরুদ্ধ প্রক্ষোভ মুক্তিলাভ করতে পারে। অনেক সময় মুক্ত অনুষঙ্গে ব্যক্তি তার অতীত অভিজ্ঞতাগুলি প্রক্ষোভবর্জিত অবস্থায় বর্ণনা করে যায়। যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি অনুভব করে যে সে নিজেই তার অতীতের ঐ অভিজ্ঞতাগুলি পুনরায় অর্জন করছে এবং ঐ অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রক্ষোভও সে একইভাবে আবার অনুভব করছে সে সব ক্ষেত্রে তার অবরুদ্ধ প্রক্ষোভ সহজে বন্ধনমুক্ত হয় এবং তার মানসিক ব্যাধিও দূর হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে বর্ণিত অভিজ্ঞতাগুলি অনেকাংশে কাল্পনিক এবং তার জীবনে সত্যকারের সংঘটিত অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে সেগুলির খুব কমই মিল। কিন্তু এ ধরনের কাল্পনিক অভিজ্ঞতার বর্ণনাও তার প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে ব্যক্তির বর্ণিত এই অভিজ্ঞতাগুলি কাল্পনিক হলেও তার শৈশব জীবনে সত্যকারের

সংঘটিত কোন ঘটনার উপর আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কিংবা সম্পূর্ণভাবে শৈশবকালীন যৌন কামনা থেকে প্রসূত।

অনেক সময় মুক্ত অনুষঙ্গে রোগী যে চিত্রটি কল্পনায় জাগিয়ে তোলে সেটি শৈশবকালে প্রকৃত অভিজ্ঞতার একটি অতিরঞ্জিত রূপ মাত্র। যেমন মুক্ত অনুষঙ্গের সময়ে অনেক রোগীকে শৈশবকালীন নানা রকম যৌন আক্রমণের বর্ণনা করতে দেখা যায়। কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে এ ধরনের কোন ঘটনাই তার জীবনে সত্য ঘটে নি। ফ্রয়েডের মতে এই সব বর্ণনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। সেগুলি কিছু পরিমাণে সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরে রোগী সেগুলিকে তার কল্পনার দ্বারা পরিবর্ধিত ও অতিরঞ্জিত করে নেয়। আবার সময় সময় অনেক বর্ণনাই যে নিছক শৈশবকালীন যৌন কামনা থেকে প্রসূত তাও ফ্রয়েড স্বীকার করেন। কখনও কখনও এর বিপরীত ঘটনাও আবার ঘটতে দেখা গেছে। মুক্ত অনুষঙ্গের সময় এমন অনেক অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি রোগীর মনে এসে উদয় হয়েছে যেগুলি রোগী সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছে যে সেগুলির সবই সত্য। এই ধরনের ঘটনার্গির ব্যাখ্যা হল যে রোগী যে সব স্মৃতিকে বেদনাদায়ক বা অপ্রীতিকর বলে তার অচেতনে একবার অবদমিত করেছে সেগুলি তার মনে উদিত হলে সে সেগুলিকে চিনতেই পারে না এবং স্বভাবতই সেগুলিকে সে সত্য বলে স্বীকার করতে রাজী হয় না।

এখন একটি প্রশ্ন হল যে মুক্ত অনুষঙ্গ সত্যকারের কতটা মুক্ত। ভাল করে বিচার করলে দেখা যাবে যে মুক্ত অনুষঙ্গ পরিপূর্ণভাবে মুক্ত নয়। মুক্ত অনুষঙ্গের মৌলিক নীতিটি হল যে যদি ব্যক্তিকে কোনরূপ বাধা আরোপ না করে চিন্তা করতে বলা হয় তাহলে দেখা যাবে যে শেষ পর্যন্ত তার চিন্তা তার কোন কমপ্লেক্সে বা অচেতনে অবদমিত কোন ধারণায় গিয়ে পৌছয়। অতএব এই চিন্তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বা মুক্ত বলা যায় না। কেননা অচেতনের অন্তঃস্থলে নিহিত কমপ্লেক্স বা ধারণাগুলির দুর্দম অমোঘ শক্তিই ব্যক্তির চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। তবে সাধারণ চিন্তার মত সচেতন মনের দ্বারা পরিচালিত হয় না বলেই এর নাম মুক্ত অনুষঙ্গ দেওয়া হয়েছে।

মুক্ত অনুষঙ্গকে মানসিক চিকিৎসার শাস্ত্রে ফ্রয়েডের একটি অমূল্য অবদান বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তবে ফ্রয়েডের মৌলিক আবিষ্কারগুলি প্রায় সকলে মেনে নিলেও নানা কারণে ফ্রয়েডের সঙ্গে সম্পূর্ণ মতের মিল হয়নি এমন অনেক মনোবিজ্ঞানী আছেন। বিশেষ করে মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতিটি পুরোপুরি মেনে

নেন নি এমন অনেক প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানীর নাম করা যায়। তাঁদের মধ্যে ইয়ুং (Jung), এ্যাডলার (Adler), ষ্টেকেল (Stekle) প্রভৃতির নাম আগেই করতে হয়। তবে এঁরা ফ্রয়েডের মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতির সাহায্যে রোগের বিশ্লেষণ না করলেও ফ্রয়েডের প্রবর্তিত অচেতনের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াতে পুরোপুরি বিশ্বাসী এবং তাঁরা নিজেদের ধারণার উপযোগী স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছেন।

অভিসঞ্চালন (Transference)

মুক্ত অনুষঙ্গ প্রসঙ্গটি আলোচনার সময় অভিসঞ্চালন (Transference) প্রক্রিয়াটির উল্লেখ করতেই হবে। ফ্রয়েড মুক্ত অনুষঙ্গের মাধ্যমে যখন মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ রোগীব অচেতন বিশ্লেষণ করতে সুরু করেন সে সময় তিনি দেখতে পান যে রোগীর অচেতনে যে প্রক্ষোভ এতদিন অবরুদ্ধ হয়েছিল সেই প্রক্ষোভ বিশ্লেষণের ফলে মুক্তি লাভ করে এবং চিকিৎসকের প্রতি সঞ্চালিত হয়ে যায়। অর্থাৎ যে প্রক্ষোভ অতৃপ্ত ও অচেতনে অবদমিত হওয়ার জন্য রোগীর মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছিল, মুক্ত অনুষঙ্গের মধ্যে দিয়ে যখন সেই প্রক্ষোভ বন্ধনমুক্ত হয় তখন সেটি তার পুবাতন পাত্রটিকে ছেড়ে চিকিৎসকের উপর আরোপিত হয়। এই অদ্ভুত মানসিক প্রক্রিয়াটির ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন অভিসঞ্চালন যেমন, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মধ্যে প্রায়ই পিতার প্রতি শৈশবকালীন ভালবাসা অতৃপ্ত হয়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় অচেতনে অবদমিত থাকে এবং তার মানসিক ব্যাধিটি এই ঈডিপাস জনিত কামনার অতৃপ্তি ও অবদমন থেকে জন্মায়। হিষ্টিরিয়া রোগীর মানসিক বিশ্লেষণের সময় সেই ঈডিপাস-জনিত ভালবাসা মুক্তিলাভ করে এবং পিতার প্রতি শৈশবকালীন অবদমিত ভালবাসা চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত হয়। তার ফলে রোগিণী চিকিৎসককে ভালবেসে ফেলে এবং তার কাছ থেকে তার ভালবাসার প্রতিদান আশা করে। ব্রুয়ারই প্রথম মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার সময় এই অভিসঞ্চালন প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করেন এবং এর ফল তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে এই ভয়ে তিনি এই পন্থায় মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাই ছেড়ে দেন। কিন্তু ব্রুয়ার যাকে বিপজ্জনক প্রক্রিয়া বলে মনে করেছিলেন ফ্রয়েড তার মধ্যেই মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার অভিনব এক পদ্ধতি দেখতে পেলেন। তিনি এই প্রক্রিয়াটি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা সুরু করলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এই অভিসঞ্চালন প্রক্রিয়াটিকে যদি ঠিক মত পরিচালনা করা যায় তাহলে এর সাহায্যে রোগিণীর চিকিৎসা আরও সহজে ও সাফল্যের সঙ্গে করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে ফ্রয়েড তাঁর চিকিৎসক জীবনে রোগিণীর অবরুদ্ধ প্রক্ষোভকে নিজের উপর সঞ্চালিত হতে দিয়ে অতি সাফল্যের সঙ্গে বহু রোগিণীকে নিরাময় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ফ্রয়েড এই সিদ্ধান্তে আসেন যে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় চিকিৎসকের উপর রোগীর অবরুদ্ধ প্রক্ষোভের এই ধরনের অভিসঞ্চালন একটি অপরিহার্য ঘটনা এবং এই অভিসঞ্চালনের সাহায্য ছাড়া সাফল্যজনক চিকিৎসা করাই সম্ভব নয়। এই জন্য ফ্রয়েডপন্থী মনশ্চিকিৎসকদের সকলেই অভিসঞ্চালনকে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করে থাকেন এবং চিকিৎসা চলার সময় যাতে এই অভিসঞ্চালন প্রক্রিয়াটি পূর্ণভাবে এবং বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় তার জন্য সচেষ্ট থাকেন।

ফ্রয়েডের ভাষায় অভিসঞ্চালন হল এমন কারও প্রতি রোগীর প্রক্ষোভ সংশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়া যার প্রতি এটি পূর্বে সংশ্লিষ্ট ছিল না। এই সঞ্চালন দুশ্রেণীর হতে পারে, অস্তিবাচক (positive) ও নেতিবাচক (negative)। যখন রোগীর ভালবাসা, সহানুভূতি, দয়া প্রভৃতি প্রক্ষোভ চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত হয় তখন সেই অভিসঞ্চালনকে অস্তিবাচক বলা হয়। আর যখন রোগীর রাগ, ঘৃণা, বিরক্তি, প্রভৃতি প্রক্ষোভ চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত হয় তখন সেই অভিসঞ্চালনকে নেতিবাচক বলা হয়। ফ্রয়েডের মতে যে কোনও এক ধরনের অভিসঞ্চালনই মানসিক ব্যাধিটির পূর্ণ নিরাময়ের জন্য অত্যাবশ্যক। অস্তিবাচক অভিসঞ্চালনের ক্ষেত্রে রোগের নিরাময় খুব সহজে ও দ্রুত সম্ভব হয়। আর নেতিবাচক অভিসঞ্চালনের ক্ষেত্রে অত দ্রুত ও সহজে রোগের নিরাময় হয় না। তবে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় এই উভয় প্রকার অভিসঞ্চালনই অতিশয় কার্যকর।

কিন্তু বহু আধুনিক মনশ্চিকিৎসক ফ্রয়েডের এই তত্ত্ব স্বীকার করেন না : তাঁরা বলেন অভিসঞ্চালন প্রক্রিয়াটি অস্বাভাবিক এবং মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় এর ব্যবহার করা উচিত নয়। তাঁদের মতে রোগীর অবরুদ্ধ প্রক্ষোভটিকে চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত হতে না দিয়ে প্রকৃতপক্ষে যার প্রতি সেটি পূর্বে সংশ্লিষ্ট ছিল তার উপর সঞ্চালন হতে দেওয়াই অধিকতর কার্যকর ও বিচক্ষণ পন্থা। এই পন্থায় অভিসঞ্চালন হলে চিকিৎসক জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবেন এবং চিকিৎসাও স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হবে। চিকিৎসক যদি নিজেকে রোগীর অবরুদ্ধ প্রক্ষোভের পাত্র না করে তোলেন তাহলে যে রোগের চিকিৎসা করাই যাবে না ফ্রয়েডের এই তত্ত্ব বহু মনশ্চিকিৎসকই মানতে রাজী নন। তাঁরা বলেন যে রোগীর প্রক্ষোভের যে প্রকৃত পাত্র তার উপর তার অবরুদ্ধ

প্রক্ষোভটিকে বন্ধনমুক্ত করা সম্ভব এবং সেইভাবে তার রোগের সাফল্যজনক চিকিৎসা করা যাবে। তাঁরা তাঁদের এই অভিসঞ্চালনবর্জিত বিশ্লেষণ পদ্ধতির নাম দিয়েছেন প্রত্যক্ষ লঘুকরণমূলক বিশ্লেষণ (Direct Reductive Analysis)[১]।

এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অভিসঞ্চালনকে এড়িয়ে যাওয়া যায় সন্দেহ নেই। কিন্তু অভিসঞ্চালন পদ্ধতিটির যে বিশেষ উপকারিতা আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যে যখন একটি প্রক্ষোভমূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন রোগীর উপর চিকিৎসকের যথেষ্ট অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ জন্মায় একথা স্বীকার করতেই হবে। বিশেষ করে অস্তিবাচক অভিসঞ্চালনের ক্ষেত্রে চিকিৎসক অতি সহজেই রোগীকে নিজের পছন্দমত পথে পরিচালিত করতে পারেন। এই অবস্থায় রোগী তাঁর কথার অত্যন্ত বাধ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তখন অতি সাফল্যের সঙ্গেই রোগীর চিকিৎসা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে। ফ্রয়েড অনেক জটিল রোগ এইভাবে চিকিৎসা করে সারিয়েছেন। অবশ্য নেতিবাচক অভিসঞ্চালনের ক্ষেত্রে এতটা সুবিধা পাওয়া যায় না একথা সত্য। কিন্তু তবুও চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যে অভিসঞ্চালনের ফলে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা থেকে চিকিৎসক রোগীর রোগের কারণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন এবং তার ফলে তাঁর পক্ষে চিকিৎসা করাও অনেক সহজ হয়ে ওঠে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ফ্রয়েডের মুক্ত অনুষঙ্গ প্রক্রিয়াটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, মুক্ত অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে শৈশবকালের কামনা অতৃপ্ত থাকার ফলে ব্যক্তির অচেতনে যে প্রক্ষোভ নিরুদ্ধ হয়ে থাকে তা থেকেই মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির কামনার অবদমনই যে মানসিক ব্যাধির কারণ একথা ফ্রয়েড অনেক আগেই আবিষ্কার করেন, কিন্তু মুক্ত অনুষঙ্গ প্রক্রিয়াটি উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে ফ্রয়েডের সেই তত্ত্বটি সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকল না। দ্বিতীয়ত, মুক্ত অনুষঙ্গ প্রক্রিয়াটি থেকে আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে। সেটি হল ব্যক্তির যে অতিশৈশবকালীন নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ থেকে মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়ে থাকে সেই প্রক্ষোভটিকে যদি তার অতীতের সংবন্ধনের স্থান থেকে কেবলমাত্র মুক্ত করা যায় তাহলেই তার মানসিক ব্যাধিটি সেরে যাবে। এই শৈশবকালীন সংবন্ধনের ঘটনাটি ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে বলেই

১ পৃঃ ১৮৫

তার অচেতনে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকে এবং তার মানসিক ব্যাধির লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। কিন্তু যদি কোন ভাবে ব্যক্তি তার সেই অচেতনের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে তাহলে তার সেই অন্তর্দ্বন্দ্বটি তখনই লোপ পায় এবং মানসিক ব্যাধির লক্ষণগুলিও সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। ফ্রয়েড এবং তার পূর্ববর্তী মনশ্চিকিৎসকদের এই তথ্যটি জানা থাকলেও মুক্ত অনুষঙ্গের প্রক্রিয়াটি থেকেই এই তথ্যটি পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তৃতীয়ত, মুক্ত অনুষঙ্গ থেকে মনশ্চিকিৎসার আর একটি মূল্যবান তথ্য প্রমাণিত হয়। সেটি হল যে প্রক্ষোভের সংবদ্ধনের ফলে মানসিক ব্যাধিটির সৃষ্টি হয়, সেই নিরুদ্ধ প্রক্ষোভটি রোগীকে পুনরায় পূর্ণভাবে অনুভব করতে হবে। যেমন, কোন রোগী অতি শৈশবে তার মার প্রতি ভালবাসাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। ফলে তার শৈশবকালীন অচেতনে সেই ভালবাসাটি নিরুদ্ধ হয়ে বাস করে এবং তাই থেকে তার পরিণত বয়সে মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়। এখন ব্যক্তির এই মানসিক ব্যাধিটি দূর করতে হলে প্রয়োজন হল ব্যক্তি কর্তৃক ঐ শৈশবকালীন অবরুদ্ধ ভালবাসাটি পুনরায় অনুভব করা। এইটিই অভিসঙ্কালনের মধ্যে দিয়ে সম্ভব হয়। সব শেষে মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ব্যক্তিকে যদি সম্পূর্ণ বাধাহীন ভাবে চিন্তা করতে দেওয়া হয় তাহলে সে তার অতি শৈশবকালের সম্পূর্ণ বিস্মৃত অতীতের অভিজ্ঞতাতেও ফিরে যেতে পারে। সমাজ বা অন্য কোন শক্তির চাপে যে সব চিন্তা ও কামনা ব্যক্তি দমন করতে বাধ্য হয় সেগুলি তার অচেতনে বাস করে। সেগুলিকে সচেতনে উঠিয়ে আনার জন্য নানা পদ্ধতি মনশ্চিকিৎসকেরা এতদিন অনুসরণ করে এসেছেন। কিন্তু সেগুলির কোনটিই তাঁদের কাছে সন্তোষজনক এবং পূর্ণভাবে কার্যকর বলে এতদিন প্রমাণিত হয় নি। ফ্রয়েডের উদ্ভাবিত মুক্ত অনুষঙ্গ প্রক্রিয়াটিই প্রথম অচেতন বিশ্লেষণের একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রকৃতপক্ষে ফলপ্রদ পদ্ধতির সন্ধান দেয়।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the method of Free Association. What are its special features and merits ?

Ans. (পৃঃ ২১৭—পৃঃ ২২৩)

2. What is Transference ? How is it related to the treatment of mental diseases ?

Ans. (পৃঃ ২২০—পৃঃ ২২৩)

কুড়ি

মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষক (Mental Health and Teacher)

আধুনিক সমাজে শিশুর জীবনের সঙ্গে শিক্ষকের জীবন অতি নিবিড়ভাবে জড়িত। শিক্ষা যে এখন সভ্য মানুষের জীবনযাপনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ এই কথা আজ সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। আর শিক্ষা যদিও শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমার্থক, তবুও একজন পরিচালক বা পথপ্রদর্শক না হলে প্রক্রিয়াটির সুষ্ঠু সম্পাদন সম্ভব হয় না। সেই জন্যই শিশুর শিক্ষায় শিক্ষকদের স্থানও অবিতর্কিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষকের গুরুত্ব ও কাজ

আধুনিক শিক্ষকের কাজ কেবল শিক্ষাদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং শিক্ষাদান কথাটি আধুনিক শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যই হয় না। প্রকৃত শিক্ষা শিশু আহরণ করে বাস্তব জীবন থেকে নিজের বহুবিধ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। শিক্ষকের কাজ শিশুকে তার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য করা ও তাকে অভীষ্ট পথে পরিচালিত করা। কোন্ কোন্ বিষয় পড়তে হবে, কোন্ পদ্ধতিতে বিষয় বস্তুর উপর সত্যকারের আগ্রহ আসবে, কতটুকু পড়া হল এবং তা কি ভাবে বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিমাপ করতে হবে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি শিক্ষকের কর্মসূচীর অন্তর্গত। কেবল তাই নয় শিক্ষার্থীকে তার সাফল্যে উৎসাহিত করতে হবে এবং তার ব্যর্থতায় তাকে নতুন প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বস্তুত শিশুর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে শিক্ষকের এই কাজগুলি বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন এবং তার ভবিষ্যৎ জীবনের রূপটি অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষকের এই কাজগুলির উপর। অনেক আধুনিক শিক্ষাবিদের মতে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজেকে যতটা সরিয়ে আনতে পারবেন শিশুর শিক্ষা ততটাই ভাল হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রাচীনকালের শিক্ষকের মত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের সর্বব্যাপী আধিপত্যকে সমর্থন করা না গেলেও তাঁর আত্ম অবলুপ্তিকেও সমর্থন করা যায় না। বস্তুত বিদ্যালয়, বই, পাঠাগার, গবেষণাগার, শিক্ষার অন্যান্য সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি শিক্ষার যত বিভিন্ন উপাদানই থাকুক না কেন সেগুলির সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য শিক্ষকের সাহায্য অপরিহার্য।

শিক্ষার কাজে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া শিক্ষার্থীর জীবনে শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাবের মূল্যও কম নয়। শিক্ষার আহরণে শিশুকে শিক্ষকই উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারেন। এইজন্য শিক্ষক তাঁর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির সঙ্গে কেবলমাত্র যে পরিচিত থাকবেন তাই নয়, সেই বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে তাঁর আয়ত্তাধীন হবে। শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশই শিক্ষকের কাছে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হবে। তার সামাজিক সত্তাটিকে বিকশিত করাই শিক্ষকের একমাত্র লক্ষ্য হবে না। তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও যাতে সেই সঙ্গে পূর্ণ অথচ সুষমভাবে গড়ে ওঠে তা দেখাও শিক্ষকের অন্যতম লক্ষ্য হবে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। যেখানে এই সম্পর্কটি নিছক জ্ঞানের আদানপ্রদান প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং যেখানে শিক্ষক উপলব্ধি করেন যে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কটি আন্তরিক ও প্রীতিময় হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থী যেন শিক্ষককে কেবলমাত্র একটি জ্ঞানের ভাণ্ডার বা নিছক শিক্ষাদাতা রূপে মনে না করে। শিক্ষক তার কাছে হবেন পথ প্রদর্শক, একজন অনুকরণীয় আদর্শ ব্যক্তি বিশেষ, একজন অভিজ্ঞ পরিচালক এবং অকৃত্রিম বন্ধু।

বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে শিশুর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করাও শিক্ষকের অন্যতম কাজ। যে বিরাট শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর জ্ঞানের অন্তরালে পড়ে রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে শিশুর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করাই হল শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুলি জানার জন্য শিশু যাতে আগ্রহ অনুভব করে এবং বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি যে সব অজস্র সমস্যা আমাদের চারদিকে ঘিরে আছে সেগুলির সমাধান করার প্রচেষ্টায় আনন্দ পেতে পারে তার ব্যবস্থা একমাত্র শিক্ষকই করতে পারেন। একথা অনস্বীকার্য যে শৈশবে বিভিন্ন বিষয়ে শিশুর যে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তার পরিণত জীবনে যে আগ্রহ সক্রিয় অনুশীলনের রূপ গ্রহণ করে—সে সবের পেছনেই আছে শিক্ষকের প্রভাব ও পরিচালনা। এই কারণেই যে সব শিক্ষক বিচক্ষণ হন তাঁরা শিশুকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনাটি সুষ্ঠুভাবে গঠনে অত্যন্ত কার্যকর সাহায্য করতে পারেন।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিচারে শিক্ষার অনুকরণ ও অনুভাবনাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। শিশু অধিকাংশ আচরণই শেখে অনুকরণ করে।

যে সব শিক্ষককে শিশু শ্রদ্ধা করে বা ভালবাসে তাঁদের বাচনভঙ্গী, চালচলন, আচরণবৈশিষ্ট্য প্রভৃতি শিশুরা কখনও অচেতনভাবে কখনও বা সচেতনভাবে অনুকরণ করে থাকে। বাহ্যিক আচরণ যেমন শিশু অনুকরণ করে তেমনই শিক্ষকের চিন্তাধারা, ধারণা, বিশ্বাস, মনোভাব প্রভৃতিও সে আয়ত্ত করে নেয়। অতএব একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে শিশুর আচরণগত এবং মানসিক সংগঠন উভয়েরই স্বরূপ বহুলাংশে নির্ধারিত হয় শিক্ষকের আচার, ব্যবহার ও চিন্তাধারার দ্বারা।

শিক্ষক ও তাঁর সঙ্গতিবিধান

(Teacher and his adjustment)

শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে শিক্ষকের কার্যাবলীর যখন এতই গুরুত্ব তখন শিক্ষকের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উভয়ই যে সন্তোষজনক থাকা দরকার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বিশেষ করে শিক্ষকের মানসিক সুস্থতা শিক্ষাপ্রক্রিয়ার সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য যে এক প্রকার অপরিহার্য এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

শিক্ষকের কাজগুলি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ এবং সেগুলি সম্পন্ন করতে গিয়ে তার স্নায়ুর উপর প্রায়ই প্রবল চাপ পড়ে থাকে। ভাল করে ভেবে দেখতে গেলে শিক্ষককে বহু জটিল ও স্নায়ুপীড়াকর কাজ সম্পন্ন করতে হয়। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার খাতা তাঁকে নিয়মিত বাড়ীতে নিয়ে যেতে হয়, তাঁর অবসর সময়ে প্রত্যেকটি খাতা দেখে তাঁকে সেগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করতে হয় এবং যেখানে যেখানে দরকার ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা করে তার ভুল দেখিয়ে দিতে হয়। যদি কোন শিক্ষার্থী খুব খারাপ উত্তর লিখে থাকে তাহলে শিক্ষক তার জন্য মনে মনে কষ্ট পান, দুশ্চিন্তায় ভোগেন এবং অনেক সময় নিজেকে অপরাধী ভাবেন। এর দ্বারা শিক্ষকের মনের উপর যথেষ্ট চাপ পড়ে এবং প্রায়ই তাঁকে মানসিক ক্লান্তিতে ভুগতে হয়। তাছাড়া শিক্ষককে অজস্র ছোট ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়। যেমন, ক্লাসে পড়াবার আগে তাঁকে পাঠ পরিকল্পনা রচনা করতে হয়, শিক্ষাদানের বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণ তৈরী করতে হয়, পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র রচনা করতে হয়, শিক্ষাদানের সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করতে হয়, পরীক্ষা গ্রহণের জটিল কাজগুলি সম্পন্ন করতে হয়, পরীক্ষায় তদারক করতে হয়, বিদ্যালয়ের পাঠক্রম বহির্ভূত নানা কাজের আয়োজন

করতে হয় ইত্যাদি। পড়াবার সময় ক্লাসের শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজটিও শিক্ষকের স্নায়ুর উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এর জন্য তাঁকে সব সময় সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। ক্লাসে তাঁর শিক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও তৃপ্তির যতক্ষণ তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন ততক্ষণই ক্লাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয়। ছোট ও সুনিয়ন্ত্রিত ক্লাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখা বিশেষ সমস্যা না হলেও যদি ক্লাস একটু বড় হয়ে ওঠে এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ যদি তেমন সুনিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে ক্লাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখা বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারটি যে শিক্ষকদের মানসিক শান্তিকে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পরীক্ষায় ছেলেমেয়েরা কেমন ফল দেখাবে এটাও শিক্ষকের কাছে বিশেষ দুশ্চিন্তার বিষয়। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ভাল ফল এবং মন্দ ফলের উপর নির্ভর করে শিক্ষকের ব্যক্তিগত সুনাম ও দুর্নাম। বিশেষ করে প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় অনগ্রসরতা ও ব্যর্থতার জন্য শিক্ষককেই দায়ী করে থাকেন, যদিও ন্যায্যতার দিক দিয়ে খুব অল্প ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের এ ব্যাপারের জন্য দায়ী করা যায়। তার ফলে শিক্ষকমাত্রেই পরীক্ষার ব্যাপার নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটান। আর সত্য সত্যই যখন ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় না তখন শিক্ষকদের মানসিক অশান্তির আর সীমা থাকে না।

বাইরের লোকদের মন্তব্য বা কর্তৃপক্ষের অসন্তোষের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রবলতর শক্তিরূপে কাজ করে শিক্ষকের নিজের বিবেক ও আদর্শবোধ। বহুবর্ষের সঞ্চিত ঐতিহ্যের প্রভাবেই হোক্ আর শিক্ষকের নিজের আদর্শ উপলব্ধি থেকেই হোক্ প্রত্যেক শিক্ষকই মনে মনে বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবন অনেকাংশেই তাঁর উপর নির্ভর করছে এবং ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে যখনই কোনরকম কর্তব্যবিচ্যুতি, অবহেলা বা কর্মে শিথিলতা নিজের মধ্যে দেখা দেয় তখন তিনি মনে মনে আত্মগ্লানিতে ও ক্ষোভে কষ্ট পান।

এই সব মনের উপর চাপ দেহের স্তরে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং শিক্ষক নানারকম দৈহিক ব্যাধিতে ভোগেন। বিশেষ করে অবাঞ্ছিত প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা থেকে তাঁর নিদ্রা ও পরিপাচন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত দেখা দেয় এবং অল্প বয়সেই তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

শিক্ষকদের সাধারণ স্বাস্থ্যের মান অত্যন্ত নীচু। অধিকাংশ শিক্ষকই উপযুক্ত

ব্যায়াম বা স্বাস্থ্যকর খেলাধূলার কোন সুযোগ ও সময় পান না। তাঁদের বেতনও স্বল্প। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা তাঁদের কাছে বিলাসিতার নামান্তর। বস্তুত দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতাকে শিক্ষাবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য বললেই চলে।

দেহগত স্বাস্থ্যের অবনতির অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে দেখা দেয় মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি এবং তার ফলে তাঁর শিক্ষণের মানও ক্ষুন্ন হয়ে ওঠে। শিক্ষণের মান ক্ষুন্ন হওয়ার অর্থ হল শিক্ষকের পক্ষে তাঁর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে অধিকতর অসামর্থ্য, যা থেকে দেখা দেয় মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকতর অবনতি।

সাধারণতঃ নতুন শিক্ষকগণ যখন প্রথম কাজে যোগ দেন তখন তাঁদের মধ্যে সঙ্গতিবিধানের অসুবিধা বিশেষভাবে দেখা দেয়। এর প্রধান কারণ হল যে তখনও তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয় নি এবং শিক্ষকতায় তাঁরা কোন সুনাম অর্জন করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে যখনই তাঁরা নিজেদের উপর বিশ্বাস গড়ে তুলতে পারেন এবং শিক্ষকতায় কিছুটা প্রশংসা অর্জন করেন তখনই তাঁদের পক্ষে সঙ্গতিবিধান করা অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে। যে সব শিক্ষক সুশিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান এবং শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেন তাঁরা শিক্ষকবৃত্তির জটিল দায়িত্বগুলিকে অনেক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে প্রক্ষোভ-মূলক বিপর্যয় এবং অপসঙ্গতি অনেক কম ঘটে। এমন অনেক শিক্ষক আছেন যারা নিজেদের শিক্ষার মান বাড়াবার জন্য রীতিমত লেখাপড়া করেন এবং সময় পেলেই নতুন পদ্ধতি ও কৌশলের অনুশীলন করেন। যত দিন যায় এই সব শিক্ষক তত অধিকতর সাফল্য ও প্রশংসা লাভ করেন এবং তার ফলে তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। এঁদের কাজের পরিমাণ ও দায়িত্ব বেড়ে গেলেও এঁদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কেননা, যে কাজগুলি অপরের কাছে বিরক্তি ও ব্যর্থতা আনে সেই কাজগুলিই এঁদের কাছে তৃপ্তি ও সাফল্যের বাহক হয়ে দাঁড়ায়। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে প্রকৃত অপসঙ্গতি কাজের পরিমাণ থেকে দেখা দেয় না, দেখা দেয় দুশ্চিন্তা, অসাফল্যের ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে। কাজ যদি প্রীতিকর হয় তাহলে তা সঙ্গতিসাধনকে সহজ করে এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে দৃঢ়তর করে তোলে।

শিক্ষণে সাফল্য লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করা সব দিক দিয়ে ভাল সন্দেহ

নেই। কিন্তু একটি বিষয়ে সতর্ক হতে হবে যেন এই প্রচেষ্টা মাত্রাতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক স্তরে গিয়ে না ওঠে। 'শিক্ষণে সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কেবলমাত্র প্রচেষ্টা থেকে আসে না, তা অনেকাংশে শিক্ষকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। অতএব পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আহরণের পূর্বে যে সব শিক্ষক নিছক প্রচেষ্টার সাহায্যে পূর্ণ শিক্ষণসাফল্য অর্জনের চেষ্টা করেন তাঁরা সব সময় তাঁদের বাঞ্ছিত ফল পান না। শিক্ষণের কাজে তাঁরা সাময়িক সাফল্যলাভ করলেও কালক্রমে তাঁদের মনোভাব ও আচরণধারার মধ্যে অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য প্রবেশ করে এবং শিক্ষকরূপে তাঁরা সাফল্য লাভ করলেও ছাত্রপ্রিয়তার সৌভাগ্য থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন। পরবর্তীকালে তাঁরা যখন প্রথম জীবনের উৎসাহ ও উদ্যম হারিয়ে ফেলেন তখন তাঁদের শিক্ষণ কৃত্রিম ও যন্ত্রবৎ হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয় পরিবেশের অস্বাভাবিকতাও শিক্ষকের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম ক্ষতিকর। অনেক বিদ্যালয়ে নীতিগতভাবে শিক্ষার্থীদের এক সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও অবাস্তব পরিবেশে মানুষ করা হয় এবং এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের এই ধরনের অস্বাভাবিক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। বিদ্যালয়ে অনুসৃত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য তাঁদের নিজেদের স্বাভাবিক আচরণধারার মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন আনতে হয় এবং অনেক সময় সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধান অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে শিক্ষকেরা মানসিক স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগেন।

শিক্ষকদের প্রতি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মনোভাবও তাঁদের সঙ্গতিবিধানের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অনেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের উপর অত্যন্ত নিপীড়নমূলক ও কঠোর নিয়মকানুন প্রবর্তিত করে থাকেন। তার ফলে নবাগত শিক্ষকদের মধ্যে ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব দেখা দেয় এবং তাঁরা নিজেদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। বলা বাহুল্য তার ফলে তাঁদের শিক্ষাদানের কাজটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে সব বিদ্যালয়ে উদার নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয় সে সব বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে পারেন।

শিক্ষকদের মধ্যে অপসঙ্গতি সৃষ্টি করার আর একটি বড় কারণ হল যে তাঁরা চিত্তবিনোদনের সুযোগ ও অবকাশ খুব কমই পান। শিক্ষাবৃত্তিতে যে সব অবকাশ ও অবসর পাওয়া যায় সেগুলি যদি শিক্ষকেরা তাঁদের মানসিক উত্তেজনার প্রশমন ও প্রক্ষোভমূলক তৃপ্তিদান করতে পারে এমন সব কাজে ব্যয়

করার সুযোগ পান তাহলে তাঁদের মানসিক অপসঙ্গতি ঘটার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। কিন্তু আমাদের সমাজে কতকগুলি প্রচলিত রীতিনীতি, সংস্কার ও দৃঢ়বদ্ধ ধারণা এমনভাবে শিক্ষাবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে যে এ ব্যাপারে শিক্ষকদের স্বাধীনতা বেশ সীমাবদ্ধ। আধুনিক মনশ্চিকিৎসকদের মতে শিক্ষকেরা তাঁদের অবকাশ যাপন করবেন সম্পূর্ণভাবে চিন্তাবর্জিত তৃপ্তিকর ও হাল্কা ধরনের চিত্ত-বিনোদনমূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এবং তার ফলেই তাঁরা মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। কিন্তু এই ধরনের কাজকর্ম বলতে সাধারণত বোঝায় নাচ, গান, পার্টি, তাসখেলা, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানগুলি। কিন্তু সব সমাজেই শিক্ষকদের এই সব বিনোদনমূলক কাজ বা ঐ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে সমাজের কঠোর অনুশাসন আছে এবং কোনও সমাজেই পিতামাতা, অভিভাবক ও সমাজনেতারা শিক্ষকদের এই সব আমোদ-প্রমোদে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা পছন্দ করেন না। খেলাধূলা সম্বন্ধে এতটা সামাজিক বাধা না থাকলেও তার সুযোগ সব শিক্ষক সব সময় পান না এবং তার চেয়ে বড় কথা হল খুব অল্প শিক্ষকেরই খেলাধূলায় ভালভাবে যোগ দেবার দক্ষতা থাকে।

সামাজিক মেলামেশা মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের একটি বড় উপকরণ। কিন্তু এখানেও বড় প্রতিবন্ধক আছে। শিক্ষকগণ আর্থিক সঙ্গতির দিক দিয়ে সমাজে যে মর্যাদার অধিকারী তা এতই নিম্নস্তরের যে তাঁরা সমাজে আর সকলের মত অবাধ মেলামেশার খুব অল্প সুযোগই পান। যে ধরনের সামাজিক সম্মেলনে যোগ দিলে তাঁদের চিত্তবিনোদন হতে পারে সে ধরনের সামাজিক সম্মেলনে যোগদানের সৌভাগ্য তাঁদের বেশী হয় না। সমাজের উচ্চস্তরে যাঁরা বাস করেন তাঁদের অনুষ্ঠিত সামাজিক সম্মেলনগুলির আমন্ত্রণলিপি শিক্ষকদের দরজায় গিয়ে পৌঁছয়ই না।

সামাজিক মেলামেশা বা চিত্তবিনোদনমূলক কাজে যোগ দেবার পথে শিক্ষকদের আর একটি বড় প্রতিবন্ধক হল তাঁদের অপরিসীম দারিদ্র্য এবং পারিবারিক কর্তব্যভার। অত্যন্ত অল্প আয়ে সংসার চালাতে বাধ্য হন বলে শিক্ষকেরা তাঁদের পারিবারিক কর্তব্যগুলি যথাসময়ে এবং যথাযথভাবেই পালন করতে পারেন না এবং সব সময়েই অসমাপ্ত ও অর্ধসমাপ্ত কার্যভারের বোঝা তাঁদের বহন করে চলতে হয়। সেই জন্য শিক্ষকবৃত্তি থেকে যে অবকাশ

তাঁরা পান তার সবটুকুই তাঁরা তাঁদের সেই অসমাপ্ত ও অর্ধসমাপ্ত পারিবারিক দায়িত্বগুলি সমাপ্ত করার পিছনে ব্যয় করতে বাধ্য হন। নিজেদের মানসিক তৃপ্তি বা আনন্দের জন্য ব্যয় করার মত কোন সময়ই তাঁরা পান না। পারিবারিক দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের দেনা মেটাতেই তাঁরা নিঃস্ব হয়ে পড়েন।

শিক্ষকদের দারিদ্র্যও এক্ষেত্রে একটি বড় কারণ। যে কোনও ধরনের সম্মেলন বা আমোদ প্রমোদে অংশ গ্রহণ করতে হলে কিছু না কিছু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু পরিবারের ভরণপোষণ ও নিজেদের নিম্নতম প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে তাঁদের এমন কিছু অবশিষ্ট থাকে না যা তাঁরা এই ধরনের চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যয় করতে পারেন। ফলে ইচ্ছা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকেরা চিত্তবিনোদনে যোগ দিতে পারেন না।

আর একটি ক্ষেত্রেও শিক্ষকের সঙ্গতিবিধানের বিশেষ অসুবিধা দেখা যায়। সেটি হল তাঁদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও কৌশলের ক্ষেত্রে। শিক্ষা একটি সতত পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল প্রক্রিয়া বিশেষ। সময়ের পরিবর্তন ও ভাব-বৈচিত্র্যের পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার বিষয়বস্তু, ধারা, পদ্ধতি সবই বদলে যায়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্য ও সংগঠনেরও পুনর্বিন্যাস দরকার হয়।

কিন্তু এ ব্যাপারে অনেক শিক্ষকই সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে অসামর্থ্য বোধ করেন এবং তার ফলে তাদের মধ্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেক শিক্ষকই, বিশেষ করে যাঁরা বহুবর্ষ ধরে পুরাতন পন্থায় শিক্ষকতা করে আসছেন, তাঁরা সহজে এই নতুনের অনুপ্রবেশকে স্বীকার করতে রাজী হন না। তাঁদের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা এতই গভীর ও দৃঢ়বদ্ধভাবে তাঁদের মনকে অধিকার করে থাকে যে যা কিছু নতুন ও আধুনিক তাকেই তাঁরা প্রগল্ভতা ও লঘুচিত্ততা বলে বাতিল করে দেন। তাঁরা তাঁদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে এই নতুন ভাবধারাগুলি পরীক্ষা করে দেখেন না এবং সেগুলির প্রয়োজনীয়তা ও উৎকর্ষকে একেবারেই স্বীকার করেন না। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে অনুসন্ধান করলে এমন বহু শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া যাবে যাঁরা ২০/৩০ বৎসর ধরে একই পদ্ধতি, একই কৌশল, একই পঠনধারা অনুসরণ করে আসছেন এবং তাঁদের চারপাশে যে অপরিসীম পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে চলেছে সেগুলির প্রতি তাঁদের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। এই সব শিক্ষকের কাছে নতুন পদ্ধতি ও শিক্ষণ-

কৌশলের কথা বললে তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং প্রচণ্ডভাবে সেগুলির নিন্দা করে থাকেন। আমেরিকার একটি স্কুলে একজন মহিলা ৫০ বৎসর ধরে শিক্ষকতা করেছিলেন। তিনি এই ৫০ বৎসর একই ক্লাসে পড়িয়েছিলেন এবং একই পাঠ্যপুস্তক, একই শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করে এসেছিলেন। সেই অঞ্চলে এমন অনেক পরিবার ছিল যে পরিবারের দিদিমা, মা এবং মেয়ে এই তিন পুরুষকেই তিনি পর পর পড়িয়ে এসেছেন। তিনি যা পড়াতেন তা খুব ভালই পড়াতেন কিন্তু কোনও নতুন তথ্য বা আধুনিক ভাবধারাকে তিনি তাঁর শিক্ষণের মধ্যে প্রবেশ করতে দিতেন না। যখন নতুন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাঁর শিক্ষণপদ্ধতিটি সময়োচিত ও প্রগতিশীল করার নির্দেশ দিলেন তখন তিনি এই বলে কাজ ছেড়ে দিলেন যে এই সব অর্থহীন আধুনিক আড়ম্বরগুলিই একদিন আমেরিকার ধ্বংস আনবে এবং সেগুলি অনুসরণ করার চেয়ে তিনি কাজ ছেড়ে দেওয়াই ভাল বলে মনে করেন।

অতিরক্ষণশীল শিক্ষকরা যেমন সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না, তেমনি আবার অতি প্রগতিশীল শিক্ষকরাও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করেন।

এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা যা কিছু নতুন বা আধুনিক দেখেন তাই অন্ধভাবে অনুসরণ করেন, সেগুলির ভাল মন্দ উৎকর্ষ ও মূল্যের কোনও বিচার করেন না। বলা বাহুল্য এঁদের প্রায় সব দিক থেকেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের অতি আগ্রহের জন্য তাঁরা শিক্ষার্থীদের উপর ক্ষতিকর পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু চাপিয়ে দেন।

শিক্ষা ও অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিক্ষক

শিক্ষক যদি অপসঙ্গতিসম্পন্ন হন তাহলে তাঁর পক্ষে সুষ্ঠু ও সার্থক শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীদের কাছেও তাঁর এই প্রক্ষোভমূলক অপসঙ্গতি প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তাঁর কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাগ্রহণ করা তাদের পক্ষেও শক্ত হয়ে ওঠে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মান শোচনীয় ভাবে নীচু হয়ে যায় এবং সমগ্র শিক্ষাকার্যটিই ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে। এই ধরনের সমস্যামূলক শিক্ষকদের (Problem teachers) সম্পর্কে শিক্ষার্থীর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় সে সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণার ফল থেকে দেখা গেছে যে শিক্ষকদের মানসিক অপসঙ্গতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা খুবই সচেতন থাকে এবং তাঁদের অস্বাভাবিক আচরণগুলি তাদের মধ্যে অনুকম্পা,

ভয়, ঘৃণা, রাগ, বিরক্তি ইত্যাদি নানা বিরূপ অনুভূতির সৃষ্টি করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা নিন্দা, শাস্তি কিংবা পরীক্ষায় ব্যর্থতার ভয়ে এই আচরণগুলি মেনে নিতে বাধ্য হয়। একথা অনস্বীকার্য যে এই সব সমস্যামূলক শিক্ষকদের শিক্ষার্থীরা কখনই ভালো চোখে দেখে না এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা বা আন্তরিক প্রীতিও তারা অনুভব করে না।

শিক্ষার্থীদের বিচারে শিক্ষকের কাম্য ও অকাম্য গুণাবলী

কোন্ ধরনের শিক্ষককে শিক্ষার্থীরা সত্যকারের পছন্দ করে এবং আদর্শ শিক্ষক বলে মনে করে এ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে বিভিন্ন ধরনের ফল পাওয়া গেলেও শিক্ষকের কতকগুলি বাঞ্ছিত গুণ সম্পর্কে অধিকাংশ শিক্ষার্থীকেই একমত হতে দেখা গেছে। সেই গুণগুলির তালিকা নীচে দেওয়া হল। যথা—

১। সহযোগিতাপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক মনোভাব
২। দয়া এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দান
৩। ধৈর্য
৪। ব্যাপকধর্মী আগ্রহ
৫। প্রীতিকর চেহারা এবং আচার-ব্যবহার
৬। নিরপেক্ষতা এবং ন্যায়নিষ্ঠা
৭। রসজ্ঞান
৮। সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ
৯। শিক্ষার্থীর সমস্যার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ
১০। পরিবর্তনশীলতা
১১। প্রশংসা করা এবং স্বীকৃতিদান
১২। কোন বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদানের উল্লেখযোগ্য দক্ষতা

সুশিক্ষকের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীদের প্রিয় সে সম্বন্ধে যেমন ব্যাপক গবেষণা করা হয়েছে তেমনই শিক্ষকের কোন্ কোন্ দোষ শিক্ষার্থীরা পছন্দ করে না সে সম্বন্ধেও নানা গবেষণা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বিচারে যে সব দোষ শিক্ষকের থাকা উচিত নয় সেগুলিরও একটি স্বতন্ত্র তালিকা করা হয়েছে। যেমন—

১। বদমেজাজ এবং অসহিষ্ণুতা
২। অন্যায্যতা এবং পক্ষপাতিত্ব
৩। শিক্ষার্থীদের কাজে আগ্রহ প্রকাশ না করা এবং তাদের সাহায্য করতে অনিচ্ছা
৪। যুক্তিহীন দাবী

৫। বিমর্ষতা ও উদাসীনতা
৬। বিদ্রূপ এবং শ্লেষোক্তির প্রয়োগ
৭। রুক্ষ চেহারা
৮। অসহিষ্ণুতা এবং রক্ষণশীলতা
৯। অতিরিক্ত কথা বলার অভ্যাস
১০। নিজের মতের দ্বারা শিক্ষার্থীদের বক্তব্যকে দাবিয়ে দেওয়ার অভ্যাস
১১। কর্তৃত্বপ্রয়াস এবং সঙ্কীর্ণতা
১২। রসজ্ঞানহীনতা

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে সব শিক্ষক কোনও কারণে তাঁদের পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে পারেন না তাঁরা যেমন প্রক্ষোভমূলক অশান্তিতে কষ্ট পান, তেমনই শিক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করতেও তাঁরা পারেন না। সফল শিক্ষক হতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন স্বাভাবিক ও সরল মানসিক স্বাস্থ্য। আধুনিক কালে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটি যেমন জটিল তেমনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে শিক্ষাদান কাজটিকে একটি সামাজিক-প্রাক্ষোভিক-মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। অতএব এই তিন দিক দিয়েই যদি শিক্ষক সার্থক সঙ্গতি বিধান করে উঠতে পারেন তবেই তাঁর পক্ষে যথার্থ শিক্ষাদান করা সম্ভব হবে।

শিক্ষকের সুসঙ্গতিবিধানের সর্তাবলী

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিক্ষকের সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের জন্য কতকগুলি সর্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে প্রত্যেক শিক্ষকেরই উচিত এই সর্তগুলি পালনের যথাযথ চেষ্টা করা। সেই সর্তগুলি হল—

১। নিজেকে ভাল করে বুঝতে এবং নিজের অক্ষমতা ও সামর্থ্য দুইই ভাল করে জেনে নিজেকে মেনে নেওয়া সর্বপ্রথম দরকার। শিক্ষক সেই সঙ্গে এও জানবেন যে তাঁর ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তন করা সম্ভব এবং প্রয়োজন হলে তাঁর নিরাপত্তাহীনতার কোন কারণ দূর করার জন্য তাঁর ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তন করতেও হতে পারে।

২। শিশুদের ভাল করে বুঝতে ও মেনে নিতে হবে। শিক্ষামূলক পরিবেশে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের জন্য এই সর্তটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৩। সমাজকে ভাল করে চিনতে হবে। এর অর্থ হল যে শিক্ষক

যে সমাজে কাজ করবেন সেই সমাজের সংগঠন, প্রয়োজন ও প্রত্যাশার সঙ্গে তিনি ভালভাবে পরিচিত হবেন। শিক্ষক যদি তাঁর চতুষ্পার্শ্বের সমাজকে ভাল করে চিনতে পারেন তাহলে কি ভাবে সেই সমাজের প্রয়োজন মেটাবার কাজে তিনি নিজেকে নিযুক্ত করতে পারবেন তাও বুঝতে পারেন।

৪। নিজের জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে হবে। দেখতে হবে যেন এই লক্ষ্যটি নিজেব সামর্থ্য অনুযায়ী হয়। যদি শিক্ষকের লক্ষ্য এবং ক্ষমতার মধ্যে বৈষম্য দেখা যায় তাহলে তাঁর পক্ষে সাফল্য অর্জন করা শক্ত হয়ে ওঠে এবং তা থেকে প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি দেখা দেয়। দেখতে হবে যে, লক্ষ্যটি যেমন একদিকে আয়ত্তাধীন হবে তেমনই অপরপক্ষে সেটি তৃপ্তিকরও হবে।

৫। অপরের সঙ্গে সন্তোষজনক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষককে প্রতিদিনই বহুলোকের সঙ্গে আদানপ্রদান করতে হয় এবং এই আদানপ্রদানের সুষ্ঠুতার উপরই তাঁর সাফল্য নির্ভর করে। শিক্ষার্থী, সহকর্মী, অভিভাবক, বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ, সাধারণ জনসমাজ প্রভৃতি সকলের সঙ্গে যে শিক্ষক সন্তোষজনক সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারেন তাঁর মানসিক শান্তি ব্যাহত হবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

৬। চারপাশের বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে তিনি যেভাবে সঙ্গতি-বিধান করে আসছেন সেই সঙ্গতিবিধানকে যাতে উন্নত ও প্রগতিশীল করে তোলা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকবেন। এর অর্থ হল যে শিক্ষক আন্তরিক চেষ্টা করবেন কিভাবে তাঁর আচরণকে আরও কার্যকর এবং অপরের কাছে আরও তৃপ্তিকর করে তোলা যায়। তিনি সব সময়ে চেষ্টা করবেন নতুন কিছু করতে বা নতুন কোন কৌশল অবলম্বন করতে। এর জন্য প্রয়োজন কল্পনাশক্তির ব্যবহার করা এবং তার দ্বারা নতুন ভাবধারা ও কাজের উদ্ভাবন করা। শিক্ষক সর্বদাই চেষ্টা করবেন তাঁর উপর ন্যস্ত কার্যভারটি কি করে আরও ভাল এবং সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারেন।

৭। বন্ধুত্ব যত বেশী করা যায় ততই ভাল। সত্যকারের সহানুভূতিশীল বন্ধু মানসিক অশান্তির সময় সান্ত্বনা, অসময়ে উৎসাহ এবং সাফল্যের সময় তৃপ্তি দিতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় বন্ধুত্ব একটি শক্তিশালী উপকরণ।

৮। অবসর সময় যথাসম্ভব চিত্তবিনোদনে ব্যয় করতে হবে। শিক্ষক-বৃত্তির শ্রমবহুল কার্যভার বহন করার ফলে যে মানসিক ক্লান্তি ও নিপীড়ন দেখা দেয় তা দূর হতে পারে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দিয়ে। এই ধরনের

আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে শিক্ষকদের নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ মুক্তি পায় এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় থাকে।

৯। প্রত্যেক শিক্ষকেরই উচিত সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করা এবং যে সমাজে শিক্ষক বাস করেন সেই সমাজের উন্নয়নসূচীতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়া। তার ফলে শিক্ষকের যেমন প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধানে সুবিধা হয়, তেমনই সমাজে তাঁর পদমর্যাদা আরও বাড়ে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে তিনি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা পান। তাছাড়া প্রত্যেক শিক্ষকেরই কর্মসূচীর অন্তর্গত হল গণতন্ত্রের আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়া এবং জনসাধারণকে তার প্রয়োগমূলক দিকটির সঙ্গে পরিচিত করা।

১০। অবরুদ্ধ প্রক্ষোভকে মুক্ত হতে দেবার একটি খুব কার্যকর পন্থা হল সৃজনমূলক কিছু করা। নানা কারণে ব্যক্তির বাইরের সঙ্গে পরিবেশের আদানপ্রদান আশানুরূপ হয়ে ওঠে না এবং ফলে তার মধ্যে প্রক্ষোভের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ ব্যাহত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শিক্ষকদের প্রায়ই এই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। এখন যদি শিক্ষক কোনও প্রকার সৃজনমূলক কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারেন তাহলে অন্যক্ষেত্রে অবরুদ্ধ বা প্রতিহত প্রক্ষোভ সেই কাজের মধ্যে দিয়ে মুক্তিলাভ করতে পারে। সৃজনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদাটি পূর্ণ হয় এবং মানসিক তৃপ্তি আসে। সৃজনমূলক কাজ বলতে অনেক কিছু হতে পারে, যেমন, সাহিত্যচর্চা, ছবি আঁকা, ভাস্কর্য, সঙ্গীতচর্চা, অভিনয় বা কোনও বিশেষ হবির অনুসরণ ইত্যাদি। এই ধরনের সৃজনধর্মী কোন কাজ যদি শিক্ষক নিয়মিত অনুসরণ করেন তাহলে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রক্ষোভটি তার বহিঃপ্রকাশের একটি স্বাভাবিক ও তৃপ্তিকর পথ খুঁজে পায়।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the importance of Mental Hygiene in the life of the teacher. How can his mental health be ensured?

Ans. (পৃঃ ২২৬—পৃঃ ২৩৬)

2. What are the factors that contribute to the difficulties of adjustment in the teaching profession? How can they be counteracted?

Ans. (পৃঃ ২২৬—পৃঃ ২৩৬)

3. Discuss the importance of teacher in modern education. What procedures should be adopted by the teacher to ensure better adjustment in the trying situations that he has to face constantly?

Ans. (পৃঃ ২২৪—পৃঃ ২৩৬)

মানসিক অসঙ্গতির স্বরূপ ও কারণ

(Nature and Causes of Mental Disorders)

মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের একমাত্র উপায় হল পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সুষ্ঠু এবং সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধান। সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের অর্থ হল ব্যক্তির নিজের চাহিদার পরিতৃপ্তি এবং যে পরিবেশে সে বাস করে সেই পরিবেশ যে সব দাবী তার কাছে উপস্থাপিত করে সেগুলির যথাযথ পূরণ। এই দ্বিবিধ কাজ যদি ব্যক্তি ঠিকমত করতে পারে তাহলে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানে কোন রকম ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকে না।

কিন্তু অনেক সময় নানা কারণে ব্যক্তির পক্ষে এই সঙ্গতিবিধান সন্তোষজনকভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে না। ব্যক্তির নিজের চাহিদা বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপক এবং বাইরের সমাজের দাবী বা বাহ্যিক উদ্দীপক এই দু'টির সঙ্গে ব্যক্তি হয়ত সাফল্যজনকভাবে সঙ্গতিবিধান করে উঠতে পারে না। তার ফলে সে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় সেই পরিস্থিতিটি তার আয়ত্তের বহির্ভূত হয়ে পড়ে এবং তার আচরণধারা অস্বাভাবিক রূপ গ্রহণ করে। অর্থাৎ এক কথায় তার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। এই অপসঙ্গতি যখন অল্প মাত্রার হয় তখন তা ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তেমন ক্ষতিকর হয় না। কিন্তু যখন এই অপসঙ্গতি গুরুতর প্রকৃতির হয়ে দাঁড়ায় তখন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য, আচরণধারা, চিন্তার প্রকৃতি প্রভৃতি সব কিছুর মধ্যেই বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এই অবস্থাকেই আমরা মানসিক অস্বাভাবিকতা বা অসঙ্গতি নাম দিয়ে থাকি। ব্যক্তির মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিলে ব্যক্তি দু'ধরনের আচরণ করতে পারে। একটি পলায়নধর্মী, আর একটি আক্রমণধর্মী। পলায়নধর্মী আচরণের অন্তর্গত হল পরিস্থিতিটি থেকে চলে আসা, মনে মনে রাগ বা ঈর্ষা পোষণ করা, মদ্যপান বা অন্য কোন নেশার আশ্রয় নেওয়া, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়া, আত্মহত্যা করা ইত্যাদি। আবার আক্রমণধর্মী আচরণের অন্তর্গত হল, যুদ্ধ করা, আক্রমণ করা, ক্লাস থেকে পালানো, নিষ্ঠুর আচরণ করা প্রভৃতি সমগোষ্ঠীর অন্যান্য আচরণ।

মানসিক অসঙ্গতির শ্রেণীবিভাগ

মানসিক অসঙ্গতির কারণ বলতে বহু ঘটনা ও বস্তুর নাম করা যায়। বস্তুত এগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভবও নয়। তবে সাধারণভাবে যে সব ঘটনা থেকে মানসিক অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়ে থাকে সেগুলির মধ্যে পড়ে

১। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য লেখকের অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান নামক পুস্তকটি পঠিতব্য।

আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা (Trauma), দুষ্ট রোগে ভোগা, অতিরিক্ত সুরাপান, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার এবং জন্মগত কোন মস্তিষ্কের দোষ।

মানসিক অসঙ্গতির বহু শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত আছে। বিভিন্ন ধরনের মানসিক অসঙ্গতি বোঝাবার জন্য বিভিন্ন মনশ্চিকিৎসক বিভিন্ন নামেরও ব্যবহার করে থাকেন। আমরা বর্তমান বইটিতে নীচের নাম ও বিভাগটি গ্রহণ করছি।

মানসিক অসঙ্গতিকে দুটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, সাইকোসিস (Psychosis) বা গুরুতর মনোবিকার এবং দ্বিতীয়ত, নিউরসিস (Neurosis) বা অল্প মাত্রার মনোবিকার বা মনোব্যাধি। অনেক মনোবিজ্ঞানী নিউরসিসকে সাইকোনিউরসিস (Psychoneurosis) নামও দিয়ে থাকেন। আমরা বাংলায় সাইকোসিসকে মনোবিকার এবং নিউরসিসকে মনোব্যাধি নাম দেব।

১। সাইকোসিস বা মনোবিকারের স্বরূপ ও বিভিন্ন শ্রেণী
[Nature and Types of Psychosis]

সাইকোসিস ও মনোবিকারকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। অঙ্গগত (Organic) এবং আচরণগত (Functional)। যে সাইকোসিস বা মনোবিকারের কারণ রোগীর মস্তিষ্কের কোন গঠনগত বা মস্তিষ্কে পরে সৃষ্ট কোন ত্রুটির মধ্যে নিহিত থাকে তাকে অঙ্গগত মনোবিকার বলা হয়। আর যে মনোবিকারের পেছনে কোন রকম অঙ্গগত ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা পাওয়া যায় না, তাকে আচরণগত মনোবিকার বলা হয়। সাধারণত মনশ্চিকিৎসকেরা বিশ্বাস করেন যে সমস্ত সাইকোসিস বা মনোবিকারের মূলেই কোন না কোন ধরনের অঙ্গগত ত্রুটি আছে। আচরণগত মনোবিকারের ক্ষেত্রগুলিতে যদিও লক্ষণীয় কোন অঙ্গগত ত্রুটি পাওয়া যায় না, তবুও মনশ্চিকিৎসকেরা বিশ্বাস করেন যে এগুলির পেছনে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধরনের বা সংগঠনগত কোন রকম ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা আছে। মস্তিষ্কের গঠনগত ত্রুটি থেকে সাইকোসিসের সৃষ্টি হয় বলে এখনও পর্যন্ত সাইকোসিস সম্পূর্ণ নিরাময় করার কোনও সন্তোষজনক পন্থা আবিষ্কৃত হয় নি।

অঙ্গগত মনোবিকার নানা রকমের হতে পারে। সিফিলিস প্রভৃতি দুষ্ট ব্যাধি, মস্তিষ্কের রোগ, মস্তিষ্কে কোনও গুরুতর আঘাত, অতিরিক্ত সুরাপান বা তীব্র বিষের প্রয়োগ, অতিবার্ধক্যজনিত মস্তিষ্কের শীর্ণতা বা জন্মগত কোনও মস্তিষ্কের ত্রুটি প্রভৃতি থেকেই অঙ্গগত মনোবিকার দেখা দিয়ে থাকে।

যে বিশেষ অঙ্গগত ত্রুটি থেকে মনোবিকারের সৃষ্টি হয় সেই অঙ্গগত ত্রুটি দূরীকরণের উপরেই মনোবিকারের চিকিৎসা ও নিরাময় নির্ভর করে।

আচরণগত মনোবিকারকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা—

(১) স্কিৎসোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)
(২) ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ (Manic-depressive)
(৩) প্যারানইয়া (Paranoia)

নীচে এই তিন শ্রেণীর আচরণগত মনোবিকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল।

১। স্কিৎসোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)

বিভিন্ন আচরণগত মনোবিকারের মধ্যে এই রোগটিই সব চেয়ে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। দেখা গেছে যে যতগুলি মনোবিকারের রোগী সাধারণত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসে তাদের ২৫%ই স্কিৎসোফ্রেনিয়ার রোগী। এই রোগের বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়। সাধারণত উদাসীনতা, অবাস্তব ধারণা, অনুভূতিহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ রোগীর মধ্যে প্রকাশ পায়। যত দিন যায় রোগীর এই লক্ষণগুলি ক্রমশ বাড়তে থাকে। শেষে রোগী কোন কাজই করতে পারে না এবং বাস্তব জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে সর্বদা দিবাস্বপ্নে মগ্ন থাকে। এই মনোভাবের অবনতি হতে হতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যে বাস্তবের সঙ্গে রোগীর আর কোনও রূপ সংস্পর্শ থাকে না এবং তার চারপাশে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে সে দিন কাটায়। আগেই বলা হয়েছে যে মনোবিকারের প্রকৃত কারণ এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে মস্তিষ্কের তন্তুগুলির (brain tissue) অপুষ্টির জন্যই এই সব রোগ দেখা দিয়ে থাকে। স্কিৎসোফ্রেনিয়া ১৪/১৫ বৎসর বয়স থেকে সুরু করে ২৬।২৭ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। সেইজন্য স্কুল এবং কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্কিৎসোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্র বলে সন্দেহ হলে শিক্ষকদেরই সে বিষয়ে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। ক্লাসে যদি ভীরু, নিশ্চেষ্ট, শান্ত এবং বন্ধুবিহীন কোন ছেলে বা মেয়ে দেখা যায় তখনই শিক্ষকের উচিত তাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা এবং তার সেই অস্বাভাবিক আচরণের কারণ খুঁজে বার করা। এই ধরনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকেই সাধারণত স্কিৎসোফ্রেনিয়া রোগীর সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোনও রকম মনোবিকারের চিকিৎসাই সাধারণভাবে

বাড়ীতে হওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন হাসপাতালের ব্যাপক আয়োজন সাজসরঞ্জাম এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য। অতএব প্রথম অবস্থাতেই যদি স্কিৎসোফ্রেনিয়া রোগ ধরা যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হয় এবং তার ফলে তার নিরাময়ের অধিকতর সম্ভাবনা থাকে।

২। ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস (Manic-depressive Psychosis)

ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ কথাটি দুটি বিপরীতধর্মী মানসিক অবস্থার পরিচায়ক। ম্যানিক অবস্থা বলতে বোঝায় অতিরিক্ত উত্তেজনা ও উল্লাসের অবস্থা। আর ডিপ্রেসিভ বলতে বোঝায় তার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ বিষণ্ণতা ও নিরুৎসাহের অবস্থা। ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই দুটি অবস্থার মধ্যে পরিভ্রমণ করে। অর্থাৎ কিছু কালের জন্য তারা ম্যানিক বা উল্লসিত ও উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। আবার কিছু সময় তারা ডিপ্রেসিভ বা বিমর্ষ ও নিরুৎসাহ হয়ে সময় কাটায়। যখন তারা ম্যানিক অবস্থায় থাকে তখন তারা অতিরিক্ত মাত্রায় উদ্যমশীল, অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এই সময় নাড়ীর গতি দ্রুত হয়ে যায়, নানা-রকম অদ্ভুত ধারণা মনে উদয় হয় এবং রোগী উত্তেজনাপূর্ণ কাজকর্ম করে এবং নানা রকম ভুল বা মিথ্যা দৃশ্য দেখে। সময় সময় রোগী চিৎকার করে ওঠে এবং এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে তাকে আয়ত্তে রাখা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। ডিপ্রেসিভ বা অবসন্নতার অবস্থায় এর ঠিক বিপরীতটি ঘটে। ব্যক্তির মধ্যে তখন কোনও রকম উৎসাহ বা উদ্যম দেখা যায় না এবং শরীর ও মনের দিক দিয়ে সে নিজেকে প্রচণ্ড রকমের অক্ষম ও অকর্মণ্য বলে মনে করে। এই পর্যায়টি যখন বেশী তীব্র হয়ে ওঠে তখন ব্যক্তির কাছে বাইরের বস্তুজগতের জ্ঞানও অস্পষ্ট হয়ে আসে এবং কোন কিছু করার সামর্থ্য তার আর থাকে না। এই দুটি পর্যায় সাধারণত একটির পর একটি দেখা দিয়ে থাকে। কখনও কখনও এই দুটি পর্যায়কে একই সময়ে আবির্ভূত হতেও দেখা গেছে।

রোজানফের মতে স্কিৎসোফ্রেনিয়ার চেয়ে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভের সৃষ্টিতে ব্যক্তির বংশধারার প্রভাব অনেক বেশী। ফলে এর উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বন্ধ করার ব্যাপারে সাধারণভাবে পিতামাতা ও শিক্ষকের বিশেষ কিছু করার নেই। তবে একথা সত্য যে বাড়ী বা স্কুলের পরিবেশ অনেক সময় এই রোগের বিকাশে বেশ সাহায্য করতে পারে। যেমন অনেক সময় শিশু কোন অপ্রিয়

পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে প্রচণ্ড ধরনের প্রক্ষোভমূলক বিস্ফোরণের আশ্রয় নেয়। শিশুর এই আচরণকে যথাসময়ে নিয়ন্ত্রিত না করা হলে পরে তা অভ্যাসে পরিণত হতে পারে এবং পরিণত বয়সে একই ধরনের পরিস্থিতিতে ঐ শিশু একই ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ সম্পন্ন করতে পারে। যে সব শিশুর মধ্যে এই ধরনের মনোবিকারমূলক প্রবণতা থেকে যায় তাদের মধ্যে পরে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগের সৃষ্টি হয়। এই কারণে বাড়ীতে বা স্কুলে শিশু যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুনিয়ন্ত্রিত আচরণ করতে শেখে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অতিরিক্ত নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে রাখলেও তার মধ্যে প্রক্ষোভমূলক বৈষম্য দেখা দেয় এবং এই বিশেষ প্রকৃতির মনোবিকারটি সৃষ্টি হতে পারে। স্কিৎসোফ্রেনিয়ার মত ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ মনোবিকারের চিকিৎসা বাড়িতে করা চলে না এবং এই রোগের সূত্রপাত দেখলেই অবিলম্বে রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা উচিত।

৩। প্যারানইয়া (Paranoia)

প্যারানইয়াও একটি আচরণগত মনোবিকার। এই রোগেও কোনও সুনির্দিষ্ট বা উল্লেখযোগ্য অঙ্গগত ভিত্তি পাওয়া যায় না। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হল যে রোগী বিশেষ এক ধরনের সুসংহত ভ্রান্তিমূলক ধারণা মনে মনে পোষণ করে। অথচ তার আচারে ব্যবহারে অন্য কোন অপসঙ্গতি বা বৈষম্য দেখা যায় না। কিংবা অন্য কোন দিক দিয়েও তার মধ্যে কোনও মানসিক অবনতির লক্ষণ থাকে না। অন্যান্য মনোবিকারের রোগীর মত অবসন্নতা বা অতিরিক্ত উল্লাস প্রভৃতি লক্ষণগুলিও তার মধ্যে প্রকাশ পায় না। সাধারণত প্যারানইয়া রোগী দু'ধরনের ভ্রান্তিতে ভোগে। এক, বিরাটত্বের ভ্রান্তি (Delusion of Grandeur), অর্থাৎ নিজেকে কোন একটি বিশেষ দিক দিয়ে সে সকলের চেয়ে বড় বলে মনে করে। দুই, উৎপীড়নের ভ্রান্তি (Delusion of Persecution), অর্থাৎ সে নিজেকে অপরের দ্বারা সর্বদা উৎপীড়িত বলে মনে করে। এই শেষের ভ্রান্তিটি বেশীর ভাগ প্যারানইয়া রোগীর মধ্যেই দেখা যায়। এই বিশেষ ভ্রান্তিটির লক্ষণ হল যে রোগী সব সময় মনে করে যে অপরে তার উপর অত্যাচার বা উৎপীড়ন করছে। তার ফলে অপরের প্রতি তার একটা গভীর ক্রোধের সৃষ্টি হয় এবং নিজের সম্পর্কে অপরের উদ্দেশ্যকে সে সন্দেহ করতে সুরু করে। এমন কি সে নিজের পরিবারস্থ ব্যক্তি এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও সন্দেহ

করে। শেষে তার নিজের ব্যর্থতা এবং নিরাপত্তার অভাবের জন্য তার প্রতি অপরের মনোভাব ও আচরণকে সে সম্পূর্ণ দায়ী করে থাকে।

প্যারানইয়া রোগের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এই রোগে ব্যক্তি কেবলমাত্র অবাস্তব ভ্রান্তির ক্ষেত্রটুকু ছাড়া আর সব দিক দিয়েই বেশ সুসংহত ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করে থাকে। এইজন্যই অনেক সময় যে সব প্যারানইয়া রোগী বিরাটত্বের ভ্রান্তিতে ভোগে তারা পরে বিপজ্জনক ব্যক্তি হয়ে ওঠে। সে মনে মনে এই আশা পোষণ করে যে একদিন তার বুদ্ধির জোরে সে আর সকলকে হারিয়ে দিয়ে তার ঈপ্সিত বিরাটত্বকে পেতে পারবে।

সাধারণত প্যারানইয়া একটু বেশী বয়সের ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়। ৪০ থেকে ৫০ বৎসর বয়সের ব্যক্তিদের মধ্যেই প্যারানইয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও এই রোগ দেখা যায়। তবে প্যারানইয়া রোগীর সংখ্যা বেশ কম। বিভিন্ন প্রকারের মনোবিকারের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে মাত্র শতকরা দু'ভাগের মত প্যারানইয়া রোগ দেখা যায়।

মনশ্চিকিৎসকেরা প্যারানইয়াকে দুরারোগ্য ব্যাধি বলে মনে করেন। তবে আধুনিক যুগে অস্ত্রচিকিৎসার সাহায্যে মস্তিষ্কের অংশবিশেষ অপসারণের (**Lobotomy**) যে পদ্ধতিটি উদ্ভাবিত হয়েছে তার দ্বারা প্যারানইয়া কিছু কিছু সারানো সম্ভব হয়েছে।

২। নিউরসিস বা মনোব্যাধির স্বরূপ ও বিভিন্ন শ্রেণী

(Nature and Types of Neurosis)

যে সব মানসিক ব্যাধি তেমন কঠিন প্রকৃতির নয় এবং যেগুলি কোনরূপ অঙ্গগত ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থেকে সৃষ্টি হয় না অর্থাৎ যে ব্যাধিগুলি সম্পূর্ণ মানসিক স্তরের শ্রেণীভুক্ত সেগুলিকে সাইকোনিউরসিস বা নিউরসিস নাম দেওয়া হয়েছে। আমরা এগুলিকে মনোব্যাধি নাম দিয়েছি। সাইকোসিসের সঙ্গে নিউরসিসের প্রধান পার্থক্য হল যে সাইকোসিসের পেছনে কোনও না কোনরূপ অঙ্গগত ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকে কিন্তু নিউরসিসের বেলায় সেরূপ কোনও মস্তিষ্কগত দোষ থাকে না। এটি সম্পূর্ণ মানসিক অসঙ্গতি বা কোনরূপ অবদমিত অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে সৃষ্ট হয়। তাছাড়া মাত্রার দিক দিয়েও সাইকোসিস নিউরসিসের চেয়েও অনেক বেশী তীব্র ও জটিল হয়ে থাকে।

সাধারণত নিউরসিস বা মনোব্যাধিকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

১। হিষ্টিরিয়া (Hysteria)
২। সাইকাসথেনিয়া (Psychasthenia)
৩। নিউরাসথেনিয়া (Neurasthenia)
৪। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থা (Anxiety State)

এই চার শ্রেণীর মনোব্যাধি বা নিউরসিসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

১। হিষ্টিরিয়া (Hysteria)

নিউরসিসের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত ব্যাধিটি হল হিষ্টিরিয়া। হিষ্টিরিয়াকে এক ধরনের গুরুতর মানসিক বা প্রক্ষোভমূলক অপসঙ্গতির ক্ষেত্র বলে বর্ণনা করা যায়। ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব বা ইচ্ছা বা আবেগ সৃষ্টি হয় যা সে তার অচেতনে অবদমিত করতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে সেটিকে সে সম্পূর্ণ ভুলেও যায়। কিন্তু তা থেকে তার মধ্যে দেখা দেয় কতকগুলি জটিল ও গুরুতর লক্ষণ বা অস্বাভাবিক আচরণ। হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, একেবারে কথা না বলা, গা হাত পা কাঁপা, হাত পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়া, স্মৃতি-ভ্রংশ হওয়া, কাঁদা, লাফালাফি করা ইত্যাদি। এই সব লক্ষণ হিষ্টিরিয়া রোগীর জানা কোন না কোন দৈহিক ব্যাধি বা আঘাত থেকেই সাধারণত জন্মে থাকে। কিন্তু রোগীর মধ্যে সম্পূর্ণ অচেতন ভাবেই এই রোগের লক্ষণগুলি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

যারা কাজে ফাঁকি দিতে চায় বা দায়িত্ব এড়াতে চায় তারাও এই ধরনের রোগের লক্ষণগুলি নিজেদের মধ্যে তৈরী করে থাকে। কিন্তু হিষ্টিরিয়া রোগী-দের সঙ্গে তাদের তফাৎ হল এই যে হিষ্টিরিয়া রোগী এই রোগের লক্ষণগুলি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতসারে। সে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে যে এইগুলি তার কোনও সত্যকার রোগ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আসলে হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণগুলি কোন দৈহিক রোগ থেকে সৃষ্ট নয়। সেগুলি তার অচেতনে নিহিত কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করার প্রচেষ্টা মাত্র। এই রোগের লক্ষণগুলি রোগীর তৈরী করা হলেও এগুলি এমনই নিখুঁত প্রকৃতির হয়ে থাকে যে অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসক ছাড়া সেগুলি যে নকল তা কেউ বুঝতে পারে না।

হিষ্টিরিয়ার শ্রেণীবিভাগ (Types of Hysteria)

হিষ্টিরিয়া প্রধানত দু'শ্রেণীর হয়ে থাকে। ১। রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়া (Conversion Hysteria) এবং ২। দুশ্চিন্তামূলক হিষ্টিরিয়া (Anxiety Hysteria)। রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়াতে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব নিজের

মধ্যে কোন একটি সমাধানে পৌঁছতে না পেরে একটি বিশেষ দৈহিক ব্যাধির লক্ষণে রূপান্তরিত হয়। যখন কোন অপ্রীতিকর কাজ করতে ব্যক্তি খুব অনিচ্ছা বোধ করে তখন সেই কাজটি এড়াবার জন্য তার মধ্যে সত্যকারের রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। আবার যখন সেই কাজটি করার আর সময় বা প্রয়োজনীয়তা থাকে না তখন সেই লক্ষণগুলি আপনা থেকেই চলে যায়। যেমন, অফিসে কাজে যেতে যে ব্যক্তির খুব অনিচ্ছা সে ব্যক্তির ঠিক অফিস যাবার সময়ই মাথা ধরল, আর যেই অফিস যাবার সময় চলে গেল আশ্চর্যজনক ভাবে তখনই তার মাথা ধরাও সেরে গেল। যে ছেলে স্কুলে যেতে চাইছে না তার স্কুলে যাবার সময় হঠাৎ পেটে ব্যথা দেখা গেল কিংবা জ্বর হল। কিন্তু স্কুলে যাবার সময় চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যজনক ভাবে তার সেই রোগ সেরে গেল। এখানে ঐ ব্যক্তির বা ছেলেটির ব্যাধির লক্ষণগুলি হিষ্টিরিয়ামূলক। সময় সময় রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়া খুব জটিল ও কঠিন আকার ধারণ করতে পারে। সম্পূর্ণ বধিরতা, বাক্‌রোধ, পক্ষাঘাত ইত্যাদি গুরুতর ব্যাধির লক্ষণগুলি হিষ্টিরিয়ার লক্ষণরূপে দেখা দিতে পারে। ফ্রয়েডের উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে একটিতে দেখা যায় যে রোগিণী তার অসুস্থ পিতার সেবা করতে করতে এমনই বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত তার হাতটি পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে পড়েছিল। অপ্রীতিকর সেবা করা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত এই শারীরিক ব্যাধির আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

দুশ্চিন্তামূলক হিষ্টিরিয়ার প্রধান লক্ষণ হল যে রোগী সব সময় নিজের কোন ক্ষতি হবার অমূলক ভয়ে ভীত হয়ে থাকে। এই মনোবিকারমূলক ভয় নানারূপ হতে পারে যেমন, বদ্ধ জায়গার ভয়, খোলা জায়গার ভয়, উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাবার ভয়, অসুস্থ হবার ভয়, অপারেশনের ভয়, দুর্ঘটনার ভয়, নির্জনতার ভয় ইত্যাদি। এগুলি প্রকৃত পক্ষে তার শৈশবের অবদমিত প্রাথমিক ভয়ের পুনঃপ্রকাশ।

হিষ্টিরিয়ার পরোক্ষ কারণ (Predisposing Causes of Hysteria)

রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়াতে রোগী যেমন অপরের দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য মাথা ব্যথা বা হাতে পক্ষাঘাত বা অন্য কোন শারীরিক লক্ষণের সৃষ্টি করে তেমনি দুশ্চিন্তামূলক হিষ্টিরিয়ার রোগীও অপরের মনোযোগ ও দৃষ্টি পাবার উদ্দেশ্যে মনোবিকারমূলক ভয়ের আশ্রয় নেয়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই তাদের প্রক্রিয়াগুলি অচেতনধর্মী। দুশ্চিন্তামূলক হিষ্টিরিয়ার রোগী কোন অপ্রীতিকর কাজ বা পরিস্থিতিকে এড়াবার জন্য অসুস্থ হতে চায়। এই ব্যাপারে রূপান্তরিত

মানসিক অসঙ্গতির বিভিন্ন শ্রেণী
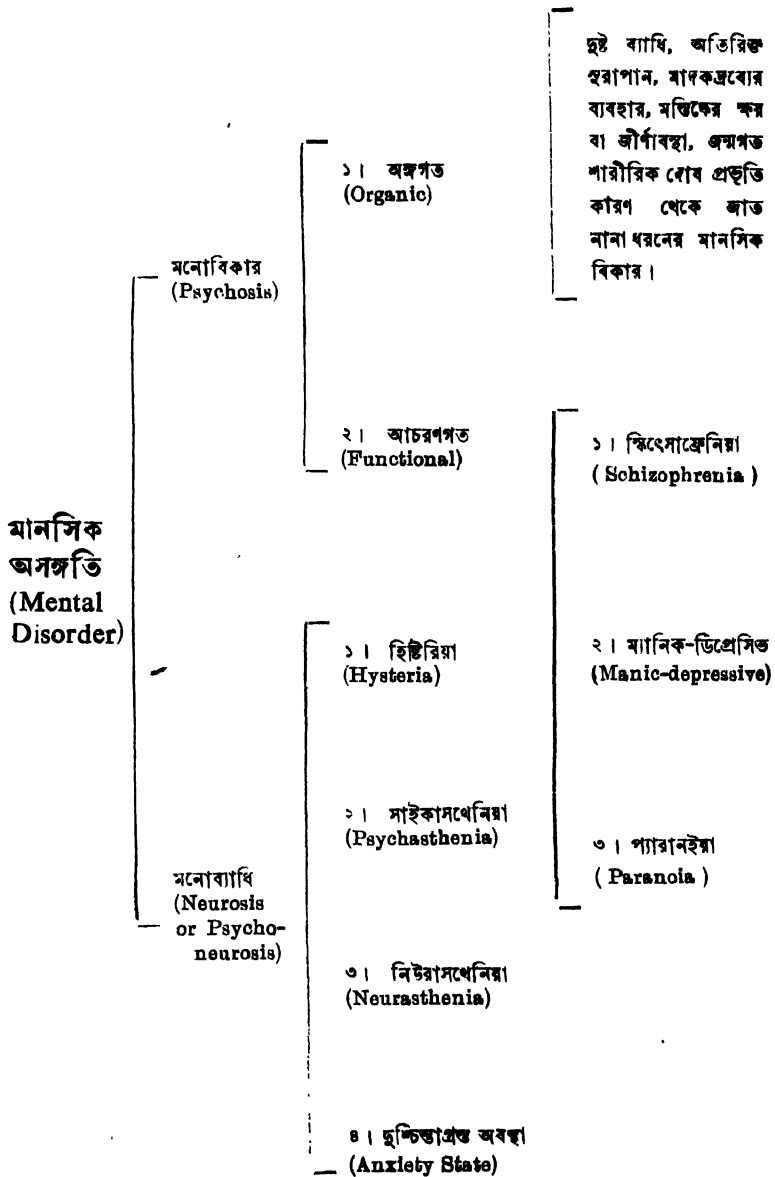
হিষ্টিরিয়ার রোগীর সঙ্গে তার খুবই মিল আছে। কিন্তু রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়ার রোগী সত্য সত্যই অসুস্থতার স্থষ্টি করে এবং সেই অসুস্থতার সাহায্যেই সে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছয় কিন্তু দুশ্চিন্তামূলক হিষ্টিরিয়ার রোগীর ইচ্ছা থাকলেও সে নিজের মধ্যে রোগের স্থষ্টি করতে পারে না তার কারণ হল, যে রোগটি সে স্থষ্টি করতে চায় সেই রোগটি তার ছেলেবেলায় সত্য সত্যই হয়েছিল এবং রোগের ফলকে সে ভয় করে। ফলে তার দুটি বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এক হল রোগের ইচ্ছা আর এক হল রোগের ভয়। এই থেকেই তার মনে স্থষ্টি হয় নিজের ইচ্ছাকে ভয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে রোগী তার শৈশবের ভয়কে তার বর্তমান সমস্যার সমাধানের উপকরণরূপে ব্যবহার করছে। এই শৈশবের ভয়টি বহু বর্ষ ধরে অবদমিত হয়ে তার অচেতনে নির্বাসিত হয়ে বাস করছিল এবং তার মনও স্বাধীন, আত্মবিশ্বাসী ও ভীতিশূন্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরিবেশের চাপে সেই অচেতনের বন্ধ দ্বার ভেঙ্গে যায় এবং তার মধ্যে থেকে তার শৈশবের সেই ভয় বেরিয়ে আসে। এখানে অতি শৈশবকালীন অচেতনে অবদমিত ভয়কে আমরা পরোক্ষ কারণ বলতে পারি এবং পরিবেশের চাপ বা আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ কারণ বলতে পারি।

শারীরিক অসহায়তা বা অক্ষমতা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে নিছক জৈবিক ঘটনা মাত্র এবং সেগুলির নিজস্ব কোনও উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু হিষ্টিরিয়া রোগীর ক্ষেত্রে এই শারীরিক অসহায়তা এবং অক্ষমতাই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, প্রাণীর ক্ষেত্রে বিপদের সময় চলৎশক্তিবিহীন হয়ে যাওয়া একটা অস্বাভাবিক রিফ্লেক্স মাত্র, কিন্তু হিষ্টিরিয়া রোগী সেই চলৎশক্তি-হীনতার দ্বারাই অপরের সহানুভূতি অর্জন করে থাকে। এক কথায় যে ব্যক্তি অসুখের ভান করে কাজে ফাঁকি দেয় সে ব্যক্তির সঙ্গে হিষ্টিরিয়া রোগীর আচরণ এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। তবে তফাতের মধ্যে হল যে কাজের ভয়ে যে ব্যক্তি অসুখের ভান করে সে অসুখের লক্ষণগুলি সচেতনভাবে তার মধ্যে স্থষ্টি করে থাকে। কিন্তু হিষ্টিরিয়ার রোগী অচেতনভাবেই ব্যাধির লক্ষণগুলি নিজের মধ্যে স্থষ্টি করে। অর্থাৎ হিষ্টিরিয়া হল কাজ বা দায়িত্বকে ফাঁকি দেওয়ার এক ধরনের প্রচেষ্টা। তবে সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অচেতনধর্মী। সাধারণ কাজে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ বা দায়িত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধটি হয় বাহ্যিক, কিন্তু হিষ্টিরিয়ার ক্ষেত্রে সেই প্রতিরোধই হয় অভ্যন্তরীণ। হিষ্টিরিয়ার রোগী বাহ্যত তার সেই কাজের দায়িত্বকে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা বা চেষ্টা কিছুই করে না। তার কারণ

হল তার সেই প্রতিরোধ অভ্যন্তরীণ হওয়ায় সে সেই প্রতিরোধ সম্বন্ধে কোন কিছুই জানে না এবং সে সম্বন্ধে তার কোন বাহ্যিক ভয় বা প্রচেষ্টাও থাকে না।

মনোবিকারের দিক দিয়ে রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়া হল প্রাপ্য ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবার অনুভূতি থেকে সৃষ্ট হওয়া এক ধরনের মনোবিকারমূলক প্রতিক্রিয়া মাত্র। যেমন, একটি শিশু তার মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু যখন তার গলার অসুখ দেখা দিয়েছে তখনই সে সেই মায়ের মনোযোগ ও যত্ন পেয়েছে। এই শিশু তার শৈশবের ভালবাসার আকাজ্ক্ষাকে অবদমিত করতে বাধ্য হল। কিন্তু বড় হয়ে যখন তার জীবনে আবার ঐ রকম ভালবাসার ব্যর্থতা দেখা দিল তখন সে সেই ছেলেবেলার গলার অসুখের আশ্রয় নিল এবং শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে বাক্‌রুদ্ধতা দেখা দিল।

অবশ্য সমস্ত ভালবাসার কামনা থেকেই যে মনোব্যাধির সৃষ্টি হয়ে থাকে তা নয়। যখন ব্যক্তি তার ভালবাসার কামনাকে অতিরঞ্জিত করে তোলে তখনই তার মধ্যে মনোব্যাধি দেখা দেয়। এই অতিরঞ্জিত ভালবাসার কামনা যখন নতুন ভাই বা বোনের জন্ম বা মা-বাবার মৃত্যু প্রভৃতি কোন বিশেষ কারণের জন্য অতৃপ্ত থেকে যায় তখন তা শিশুর মনে অবদমিত হয়ে যায়। সেই অবদমিত কামনার প্রতিক্রিয়া রূপে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় আত্ম-অনুকম্পা, রাগ এবং দুশ্চিন্তা। কিন্তু এই মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি অস্বাভাবিক হলেও এগুলির সৃষ্টি থেকেই সব সময়ে মনোব্যাধি দেখা দেয় না। মনোব্যাধি তখনই দেখা দেয় যখন এই প্রতিক্রিয়ামূলক বৈশিষ্ট্যগুলিও ঐ কামনার সঙ্গে সঙ্গে অবদমিত হয়ে যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি যে কেবলমাত্র অবদমিতই হয় তাই নয় সেই সঙ্গে ব্যক্তি নিজের মধ্যে একটি অধিসত্তা (Super-Ego) গঠন করে নেয়। এই অধিসত্তাটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল তার নিজের জৈবিক চাহিদা এবং সামাজিক অনুশাসন— এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ সম্পন্ন করে যাতে সে চলতে পারে তা দেখা। এই অধিসত্তাটির কাজ বিবিধ। প্রথমত, তার চারপাশের যে সব ব্যক্তির উপর তার সাফল্য নির্ভর করছে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ রাখা। আর দ্বিতীয়ত, নিজের আত্ম-অনুকম্পা, আক্রমণধর্মিতা, যৌনকামনা প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে দাবিয়ে রাখা। আর তাছাড়া যদি সম্ভব হয় তাহলে এই অবদমিত মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমাজ অনুমোদিত পন্থায় মুক্ত হতে সাহায্য করা। অতএব দেখা যাচ্ছে যে হিষ্টিরিয়া রোগীর অধিসত্তা যেমন একদিকে সামাজিক দাবীগুলি মিটিয়ে চলে তেমনই ব্যক্তির মৌলিক

অবদমিত চাহিদাগুলিকেও যথা সম্ভব তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এই অধিসত্তা স্বার্থহীনতা, নিষ্ঠা ও সহযোগিতার রূপে প্রকাশ পায়। এই শ্রেণীর হিষ্টিরিয়াতে ব্যক্তির অবদমিত ভালবাসার ইচ্ছাই সব চেয়ে প্রবল থাকে এবং অধিসত্তা সেই অবদমিত ভালবাসার চাহিদাটির প্রতিক্রিয়া রূপে ঐ মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু দুশ্চিন্তামূলক হিষ্টিরিয়াতে ব্যক্তির মধ্যে কোনও আদিম বা অতি শৈশবকালীন ভয়ই প্রবল থাকে এবং সেই ভয়ের প্রতিক্রিয়া রূপে অধিসত্তা সাফল্য, শক্তি, বাহাদুরী, আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি মনোভাবেরই প্রকাশ করে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে হিষ্টিরিয়া রোগীর ক্ষেত্রে অধিসত্তা হল আপোষমূলক। একদিকে সে যেমন সামাজিক দাবী মেটাবার চেষ্টা করে তেমনই অপর দিকে ব্যক্তির নিজের মৌলিক অবদমিত চাহিদাগুলিকেও অভিব্যক্ত করে। হিষ্টিরিয়া রোগীর অধিসত্তা এবং স্বাভাবিক ব্যক্তির অধিসত্তার মধ্যে তফাৎ এখানেই। স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে অধিসত্তা হল একটি পরিচালক শক্তিবিশেষ, আপোষধর্মী নয়। আমাদের স্বভাবজাত প্রবণতাগুলিকে দমন করা অধিসত্তার কাজ নয়। অধিসত্তার কাজ হল সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা ও পরিচালিত করা। অধিসত্তার এই ভূমিকা যুক্তিভিত্তিক এবং আমাদের স্বাভাবিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অধিসত্তা হল অস্বাভাবিক, অতিস্ফীত এবং অসুস্থ।

হিষ্টিরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ (Precipitating Causes of Hysteria)

হিষ্টিরিয়ার যে কারণগুলি আলোচনা করা হল সেগুলিকে হিষ্টিরিয়ার পরোক্ষ কারণ বলা যেতে পারে। হিষ্টিরিয়া সৃষ্টি হওয়ার জন্য এগুলি অপরিহার্য। কিন্তু কেবলমাত্র পরোক্ষ কারণ থাকলেই হিষ্টিরিয়া হতে পারে না। সমস্ত মনোব্যাধির ক্ষেত্রেই দু'রকম কারণ থাকা দরকার। পরোক্ষ কারণ (**Predisposing Causes**) এবং প্রত্যক্ষ কারণ (**Precipitating Causes**)। যে বর্তমান ঘটনার জন্য স্বাভাবিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং হিষ্টিরিয়া দেখা দেয় সেগুলিকেই প্রত্যক্ষ কারণ বলা হয়। প্রত্যক্ষ কারণ নানা রকমের হতে পারে। যথা—

প্রথমত, যে সব ঘটনা বা পরিস্থিতি ব্যক্তির অহংসত্তার অবদমিত ও সুপ্ত প্রবণতাগুলিকে সক্রিয় করে তোলে সেগুলি তার মধ্যে হিষ্টিরিয়া সৃষ্টি করতে পারে। রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এই অবদমিত প্রবণতাটি হল প্রত্যাখ্যাত

ভালবাসা কিংবা আত্ম-অনুকম্পা। দুশ্চিন্তামূলক হিষ্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এটি হল শৈশবকালীন দ্বন্দ্ব।

দ্বিতীয়ত, যে সব ঘটনা বা পরিস্থিতি ব্যক্তির অধিসত্তাকে দুর্বল করে তোলে বা তার সংগঠনটিকে নষ্ট করে দেয় তাও হিষ্টিরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণরূপে কাজ করে থাকে। মনোব্যাধির রোগীর ক্ষেত্রে অধিসত্তা হল অস্বাভাবিক ও অবাস্তব এবং ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবণতাগুলিকে দমন করাই তার কাজ। কিন্তু যখন অবদমিত প্রবণতাগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে কিংবা বাইরের প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপ অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তখন এই অতিরঞ্জিত সংগঠনটি ভেঙ্গে পড়ে। এই জন্যই এ্যাডলার বলেছেন যে সমস্ত মনোব্যাধি ঘটার কারণই হল ব্যক্তির মিথ্যা আদর্শ। মনোব্যাধিগ্রস্তের ক্ষেত্রে তার অধিসত্তা একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বা অবাস্তব আদর্শের অধিকারী হয় এবং বাইরের পরিবেশের প্রতিকূল চাপের জন্যই হোক বা তার আদর্শের অতিরঞ্জিত অবাস্তব প্রকৃতির জন্যই হোক ব্যক্তি যখনই তার সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে না, তখনই তার সেই অধিসত্তা ভেঙ্গে পড়ে এবং তার মধ্যে মনোব্যাধি দেখা দেয়।

হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসা (Treatment of Hysteria)

হিষ্টিরিয়ার রোগীকে প্রথমেই খুব ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। তার অতীত জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে সংগ্রহ করে সেগুলিকে সংগ্রথিত করে তার পূর্ণ ইতিহাসটি রচনা করতে হবে। যদি রোগ গুরুতর আকার ধারণ করে তাহলে অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। হিষ্টিরিয়া রোগীর প্রকৃত বাধা বা অসুবিধা কোথায় তা যাতে সে ঠিকমত জানতে পারে এবং ব্যাধিটির প্রকৃত স্বরূপ যাতে সে যথাযথ নির্ধারণ করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হবে। যে সমস্যাটি তার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কারণরূপে কাজ করছে সেই সমস্যাটি যাতে সে নিজে সমাধান করতে পারে তার জন্য তাকে পরামর্শ ও নির্দেশ দিতে হবে। হিষ্টিরিয়া রোগীর আত্মবিশ্বাস যাতে সুদৃঢ় হয়ে ওঠে তার জন্য তার মধ্যে ভরসা, উৎসাহ ও মনোবল সৃষ্টি করতে হবে। হিষ্টিরিয়া রোগীদের চিকিৎসা করার পথে একটি প্রধান বিঘ্ন হল যে রোগী নিজে তার লক্ষণগুলি দূর করতে বা ব্যাধি সারাতে মোটেই উদ্‌গ্রীব হয় না। হিষ্টিরিয়া রোগ নিয়ে গবেষণায় অগ্রগামীদের মধ্যে বিখ্যাত ফরাসী চিকিৎসক জ্যানে (Janet) 'উদাসীন মহিলা' নামক একটি বইতে হিষ্টিরিয়া রোগের এই লক্ষণটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে হিষ্টিরিয়া রোগী তার

লক্ষণগুলি সম্পর্কে সচেতন নয়। ফলে সেগুলি সারাবার জন্য সে মোটেই ব্যস্ত নয়। যেমন. রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়াতে রোগীর একটি হাত পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেলে সে বিনা দ্বিধায় বলে যে হাতটা কেটে ফেলা হোক। এক কথায় হিষ্টিরিয়া রোগী তার রোগ সারাবার মত কোনরূপ প্রেরণাই অনুভব করে না। বরং তার রোগ যাতে বজায় থাকে সেইটাই তার চেষ্টা হয়। এর কারণ অতি স্পষ্ট। যেগুলিকে আমরা রোগের লক্ষণ বলে মনে করি প্রকৃত পক্ষে হিষ্টিরিয়া রোগী তার অন্তর্নিহিত কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধানের পন্থা রূপে ঐ লক্ষণগুলি বেছে নেয়। ঐ লক্ষণগুলি প্রকাশের মধ্যে দিয়েই আংশিক ভাবে হলেও তার অতৃপ্ত চাহিদাটি তৃপ্ত হয় এবং তার রুদ্ধ প্রক্ষোভটি মুক্তিলাভ করে। অতএব তার কাছে ঐ লক্ষণগুলি দূর করার কোন প্রয়োজন বা মূল্য থাকে না। হিষ্টিরিয়া রোগীর এই উদাসীনতা এবং অসহযোগিতার জন্যই বহু ক্ষেত্রে রোগ সারানো কঠিন হয়ে পড়ে।

হিষ্টিরিয়া রোগের চিকিৎসার একটি বহু প্রচলিত পন্থা হল অনুভাবন (Suggestion)। স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনুভাবনীয়তার মাত্রা বেশী থাকে। ঐ রোগীদের কাছে সামাজিক সমর্থন ও স্বীকৃতির মূল্য খুব বেশী হওয়ার জন্য যদি কর্তৃত্বের সংগে তাদের কিছু বলা হয় তা হলে তৎক্ষণাৎ তারা সেটা বিশ্বাস করে। অবশ্য অনুভাবন প্রক্রিয়াটিই মনশ্চিকিৎসকেরা নানাভাবে প্রয়োগ করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসক রোগীকে এমন সব পিল বা ট্যাবলেট খেতে দেন যেগুলির ঔষধ হিসাবে কোন মূল্য নেই। কিন্তু গম্ভীরভাবে তিনি তাকে আশ্বাস দেন যে সেগুলি খেলে তার অসুখ সেরে যাবে। দেখা গেছে এ ধরনের চিকিৎসাতেও অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু অনুভাবনের মাধ্যমে কেবলমাত্র বাহ্যিক লক্ষণগুলিকেই দূর করা যায়, ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসাই করা যায় না।

হিষ্টিরিয়া রোগের আর একটি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেটি হল রোগীর কাছে তার রোগের লক্ষণগুলিকে অতৃপ্তিকর করে তোলা। যেমন, চিকিৎসক রোগীকে খুব তিক্ত আস্বাদযুক্ত কোন ঔষধ বা বেদনাদায়ক কোন ইনজেকশান দিয়ে জানালেন যে যতদিন না তার লক্ষণগুলি চলে যাচ্ছে ততদিন এই চিকিৎসা চলতে থাকবে এবং দিন দিন পদ্ধতিটি আরও কষ্টকর হয়ে উঠবে। এই ধরনের ভীতিকর বা কষ্টকর চিকিৎসা কিছুদিন চলার পর দেখা গেছে যে হিষ্টিরিয়া রোগীর লক্ষণগুলি হঠাৎ অন্তর্হিত হয়েছে।

এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করায় ফল পাওয়া গেলেও পদ্ধতিটি মোটেই মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। কেননা এই পদ্ধতিতে রোগীর মনের মধ্যে প্রায় একটি নতুন অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হয় এবং পূর্বের অন্তর্দ্বন্দ্বটিকে ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখলেও পরে অন্তর্দ্বন্দ্বটি তার পুরাতন স্থান অধিকার করে।

হিষ্টিরিয়ার প্রকৃষ্ট চিকিৎসা হল তার অন্তর্নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্বটিকে খুঁজে বার করা এবং সেটির সমাধানের ব্যবস্থা করা। কেবলমাত্র লক্ষণগুলি দূর করলেই প্রকৃতপক্ষে হিষ্টিরিয়ার নিরাময় হয় না। যে সব পদ্ধতিতে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণগুলিকেই কেবলমাত্র দূর করা বা দাবিয়ে রাখা হয় সে সব পদ্ধতি কখনই হিষ্টিরিয়ার স্থায়ী নিরাময় আনতে পারে না। এই জন্য হিষ্টিরিয়ার পূর্ণ নিরাময় আনতে দীর্ঘ সময়, সতর্কতা ও যত্নের প্রয়োজন। যে অবদমিত কামনা বা অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য ব্যক্তির মধ্যে সঙ্গতিবিধানে অসামর্থ্য বা অসুবিধা দেখা দিয়েছে সেই মানসিক পরিস্থিতির সঙ্গে যাতে ব্যক্তি ঠিকমত খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের জন্য নতুন আচরণ ও অভ্যাসের ধারা গড়ে তুলতে পারে তারই আয়োজন করা হিষ্টিরিয়া চিকিৎসার মৌলিক পদ্ধতি। এর জন্য রোগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে এমন একটি পারস্পরিক বিশ্বাস ও প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে যাতে রোগী বিনা দ্বিধা ও ভয়ে তার মনের মধ্যে নিহিত তথ্যরাশি চিকিৎসকের কাছে উন্মুক্ত করে দিতে পারে।

২। সাইকাসথেনিয়া (Psychasthenia)

কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ-সম্পন্ন মনোব্যাধিকে এক কথায় সাইকাসথেনিয়া নাম দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষণগুলির মধ্যে প্রধান হল—১। মনোবিকারমূলক ভয় বা ফোবিয়া (**Phobia**), ২। অবাস্তব অথচ দৃঢ়বদ্ধ ধারণা (**Obsession**). ৩। বাধ্যবাধকতার অনুভূতি (**Compulsion**) এবং ৪। সংশয় (**Doubt**)। এই ধরনের রোগে যে সব ব্যক্তি ভোগে তারা যখন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ে তখন তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও প্রক্ষোভমূলক অভিব্যক্তি দেখা দেয়। যেমন যে ব্যক্তি মনোবিকারমূলক ভয়ে পীড়িত সে যখন ভীতিকর পরিস্থিতিতে পড়ে তখন সে চিৎকার করে, কাঁপে, মূর্চ্ছা যায়, তার গা দিয়ে ঘাম ঝরে ইত্যাদি। আবার যে ব্যক্তি কোন অবাস্তব দৃঢ়বদ্ধ ধারণায় (**Obsession** ভোগে তার মধ্যে তখন দেখা দেয় প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা, অস্থিরতা, নিদ্রাহীনতা, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি। আবার যদি কারও মধ্যে এর সঙ্গে বাধ্যবাধকতার ভাবও (**Compulsion**) থাকে তাহলে এই লক্ষণগুলি অত্যন্ত তীব্র মাত্রায় প্রকাশ পায়।

মনোবিকারমূলক ভয় নানা রকমের হতে পারে যেমন, উচ্চস্থানের ভয় (**Acrophobia**), খোলা জায়গার ভয় (**Agoraphobia**), বদ্ধ জায়গার ভয় (**Claustrophobia**), রক্তের ভয় (**Hematophobia**), নির্জন স্থানের ভয় (**Monophobia**), অন্ধকারের ভয় (**Nictophobia**), ভীড়ের ভয় (**Ochlophobia**), জীবন্ত কবরস্থ হবার ভয় (**Taphophobia**) ইত্যাদি। সাধারণভাবে এ ধরনের ভয় অল্পমাত্রায় অনেক স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যেই থাকে, কিন্তু যখন এই ভয়গুলি অস্বাভাবিক ও ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অদম্য প্রকৃতির হয়ে ওঠে তখনই সেগুলি মনোব্যাধির রূপ ধারণ করে।

অবসেসান বা অবাস্তব ধারণার ক্ষেত্রেও ব্যক্তি বোঝে যে ধারণাটি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন কিন্তু তবু সেটিকে সে তার মন থেকে দূর করতে পারে না। সাধারণত এই ধারণাটি তার কাছে অপ্রীতিকর অনুভূতি সৃষ্টি করে থাকে এবং তার কারণটিও তার জানা থাকে না। মনোবিকারমূলক ভীতি, বাধ্যবাধকতার মনোভাব, দৃঢ়বদ্ধ ভুল ধারণা প্রভৃতি লক্ষণগুলি পরিবেশ থেকেই জন্মে থাকে। ব্যক্তির জীবনে এমন অনেক পরিস্থিতি এসে হাজির হয় যার সঙ্গে সে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না এবং তার ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় প্রক্ষোভের আতিশয্য। এই প্রক্ষোভের আতিশয্য ক্রমশ স্নায়ুমূলক ও প্রক্ষোভধর্মী উত্তেজনায় পরিণত হয়। শৈশবকালে এই উত্তেজনাকে প্রশমিত করার মত কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি বা সাহায্য ব্যক্তি পায় না এবং তার ফলে কতকগুলি অবাঞ্ছিত মানসিক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে স্থায়ীভাবে সৃষ্ট হয়ে যায়। আমরা প্রায়ই ছেলেমেয়েদের ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব ইত্যাদির গল্প শুনিয়ে থাকি এবং এই সব গল্পের সাহায্যে তাদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করে থাকি। কিন্তু আমরা তখন বুঝতে পারি না যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ভূতপ্রেতগুলি তাদের বয়স্ক জীবনে একদিন সত্যকারের বাস্তব ভূতপ্রেত হয়ে দেখা দেবে এবং তাদের সেই শিশু মনের সামান্য ভয় বহুগুণ হয়ে তাদের পরিণত মনে বাসা বাঁধবে। এই ভাবেই তাদের মনে নানা রকমের ফোবিয়া বা মনোবিকারমূলক ভয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

দৃঢ়বদ্ধ ধারণা এবং বাধ্যবাধকতার ভাব একই উপায়ে শিশুর মধ্যে সৃষ্ট হয়ে থাকে। কোন একটি বিশেষ আচরণ অতি সাধারণ ও সহজ ভাবেই শিশু হয়ত শৈশবে সম্পন্ন করতে সুরু করল এবং পিতা-মাতা বা অন্যান্য পরিজনের সমর্থনে সেটি ক্রমশ তার মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠল। কালক্রমে দেখা গেল যে সেই সহজ স্বাভাবিক ছোট আচরণটি শিশুর মধ্যে একটি গভীর দৃঢ়বদ্ধ কামনার

রূপ ধারণ করেছে। সাধারণত কোন বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতি, কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক, পিতামাতার অভ্যাস, বাড়ীর রীতিনীতি, পারিবারিক ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি থেকেই শিশুর মধ্যে বাধ্যবাধকতার অনুভূতি এবং অবাস্তব দৃঢ়বদ্ধ ধারণা সৃষ্ট হয়ে থাকে।

সাইকাসথেনিয়ার চিকিৎসার প্রথম সোপান হল যে এটি ঠিক কোন্ প্রকৃতির সেটি প্রথমে নির্ণয় করতে হবে। ব্যক্তির অস্বাভাবিক লক্ষণটি মনোবিকার-মূলক ভীতি, না দৃঢ়বদ্ধ ভুল ধারণা, না বাধ্যবাধকতার ভাব সেটিই প্রথমে সুনিশ্চিত ভাবে জানা প্রয়োজন। এর পরের সোপানে ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিতে হবে কি কারণে ঐ বিশেষ মনোবিকারমূলক লক্ষণটি তার মধ্যে দেখা দিয়েছে এবং যে পরিস্থিতি বা সমস্যাটির জন্য তার মধ্যে ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিয়েছে সেই পরিস্থিতি বা সমস্যাটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনার মত ক্ষমতা তার আছে। বিশেষ করে যে সব উদ্দীপক থেকে তার মধ্যে এই অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যটি দেখা দেয় সেই উদ্দীপকগুলি থেকে যাতে সে দূরে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করাও চিকিৎসার একটি প্রধান অঙ্গ। এইভাবে ব্যক্তির মধ্যে কিছু পরিমাণে সাহস ও ভরসা জাগিয়ে তুলতে হবে এবং তার ফলে তার ব্যাধির নিরাময়ও সহজ হয়ে আসবে।

বাধ্যবাধকতার অনুভূতির বৈশিষ্ট্য হল যে ব্যক্তি কোন একটি বিশেষ কাজ করার জন্য একটি অদম্য ইচ্ছা অনুভব করে। যদি এই কাজটি সে করতে পারে তাহলে তার মধ্যে অপ্রীতিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এই অনুভূতি নানা প্রকারের হতে পারে যেমন, ১। চুরি করার প্রবণতা (**Kleptomania**), ২। আগুন লাগাবার প্রবণতা (**Pyromania**), ৩। উত্তেজনা-কর পানীয় ব্যবহারের প্রবণতা (**Dipsomania**), ৪। কোন বিশেষ ধারণার প্রতীকরূপী কোন কাজ করার প্রবণতা (**Ritualistic act**) ইত্যাদি। এই ধরনের বাধ্যবাধকতার অনুভূতি সাধারণত কোনও শৈশবকালীন আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা থেকে জন্মায়। ব্যক্তি তার সেই শৈশবের অবদমিত ইচ্ছাটিকে এই বিশেষ কাজটি সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে তৃপ্তি দেবার চেষ্টা করে।

৩। নিউরাসথেনিয়া (Neurasthenia)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত আমরা নানারকম চাপ অনুভব করে চলেছি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির চাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে আধুনিক মানুষকে বাঁচতে হয়। এই চাপ যারা ঠিকমত সহ্য

করে পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করে চলতে পারে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু নানা কারণে অনেকেই এই বহুমুখী মানসিক চাপ সহ্য করতে পারে না এবং ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের তীব্র স্নায়ুমূলক দুর্বলতা দেখা দেয়। এরই নাম নিউরাসথেনিয়া। এই স্নায়ুমূলক দুর্বলতার সঙ্গে অপরিহার্যভাবে থাকে তীব্র ও ছেদহীন এক ক্লান্তির অনুভূতি।

নিউরাসথেনিয়ার ক্লান্তির অনুভূতিটি ব্যক্তির মধ্যে সব সময়েই বর্তমান থাকে। ব্যক্তি সব সময়েই নিজেকে অবসাদগ্রস্ত ও নিস্তেজ বলে মনে করে। সেই সঙ্গে হীনমন্যতার ভাব এবং ব্যর্থতার ভয়ও সর্বদাই তার মনকে পীড়াগ্রস্ত করে তোলে। তাছাড়া এ রোগে কতকগুলি শারীরিক লক্ষণও দেখা দেয়। যেমন রোগী তার সমস্ত শরীরে চলমান বেদনা ও ব্যথা অনুভব করে। বিশেষ করে তার কোমরে ও পিঠে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। মাথাধরা এই রোগের একটি সাধারণ লক্ষণ। প্রক্ষোভমূলক অবসন্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অন্তর্বৃত্ততা (Introversion), মনোযোগের অভাব. মানসিক চাঞ্চল্য প্রভৃতি এ রোগের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ রোগে যাঁরা ভোগেন তাঁরা সব সময়েই নিজেদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যথা সম্বন্ধে অভিযোগ করে থাকেন। এই অসুখ অসুখ বাতিককে হাইপোকনড্রিয়া (Hypochondria) বলা হয়।

নিউরাসথেনিয়ার কারণ হল মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব। কোনও প্রক্ষোভ অবদমিত হয়ে অচেতনে অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ গ্রহণ করে এবং নানা রকমের মানসিক লক্ষণের মাধ্যমে তা আত্মপ্রকাশ করে। অতিরিক্ত পরিশ্রম থেকেই যে এ রোগ জন্মায় তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম কাজ করার দুশ্চিন্তা থেকেই এই রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। অনেক দিন ধরে দুশ্চিন্তা. অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ব্যর্থতার জন্য যে প্রক্ষোভমূলক চাপ ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে নিউরাসথেনিয়া তাই থেকে জন্মায়। শারীরিক ক্লান্তি অনেক সময় প্রত্যক্ষ কারণরূপে কাজ করলেও প্রকৃতপক্ষে কোন অপ্রীতিকর কাজ বা দারিদ্র্য এড়াবার প্রচেষ্টাই এই মানসিক ক্লান্তির রূপ গ্রহণ করে থাকে।

নিউরাসথেনিয়ার চিকিৎসার পদ্ধতি হল ব্যক্তির মধ্যে নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্বটির স্বরূপ খুঁজে বার করা এবং ব্যক্তি যাতে সেটির সুষ্ঠু সমাধান করে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এই রোগের চিকিৎসার একটি বড় অঙ্গ হল রোগীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং কেন সে সঙ্গতিসাধনে অক্ষম হচ্ছে তার প্রকৃত কারণটি নির্ণয় করতে তাকে সাহায্য করা।

৪। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থা (Anxiety State)

সময় সময় দেখা যায় যে ব্যক্তির মনকে এক তীব্র দুশ্চিন্তা ও অনির্দিষ্ট ভয় সর্বদা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে তার এই দুশ্চিন্তা বা ভয়ের পেছনে বাস্তব কিংবা কাল্পনিক কোন রকম কারণই নেই। সব রকম মনোব্যাধির ক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক ভয় একটি সাধারণ লক্ষণ, কিন্তু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থাতেই এই ভয়ের অনুভূতি সব চেয়ে তীব্র হয়ে থাকে।

এই মনোব্যাধিতে যে ব্যক্তি ভোগে তার মধ্যে সামান্য কারণে যুক্তিহীন ভয় দেখা দেয়। সময় সময় মৃত্যুর ভীতি বা পাগল হয়ে যাবার ভয়ও ব্যক্তির মনকে পীড়িত করে তোলে। এই ভয়কে ফোবিয়া নাম দেওয়া যায় না, তার কারণ হল যে এই ভয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়ে থাকে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজে থেকে কোন সিদ্ধান্ত করতে সাহস করে না। সে সব সময়েই অসহায় এবং অপরের উপর নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে অপরের উপর নির্ভরশীলতার জন্য মনে মনে নিজের উপর রাগও হয়। নিজের অসহায়তা ও নির্ভরশীলতার জন্য তার এই রাগ দিন দিন বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সে অপরের প্রতি আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে। মনে মনে রাগ অনুভব করলেও ব্যক্তি সেই রাগ বাইরে প্রকাশ করতে ভয় পায়। একদিকে তার আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার প্রচেষ্টা অপর দিকে তার অন্যের উপর সত্যকারের নির্ভর-শীলতা এ দু'য়ে মিলে তাকে কাপুরুষ করে তোলে। একটা অবসন্নতা এবং বিরক্তির ভাব সব সময়েই তার মনকে বিক্ষুব্ধ করে রাখে।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থার প্রধান কারণ হল যে ব্যক্তি তার ব্যর্থতা এবং অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সব সময়েই ভীত হয়ে থাকে। ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তির প্রকৃত যৌনবৃত্তি এবং যৌনবাসনার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাই থেকেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এই মনোব্যাধিটির চিকিৎসা করতে হলে ব্যক্তির দুশ্চিন্তাগ্রস্ততার প্রকৃত কারণটি খুঁজে বার করা দরকার এবং যাতে সে সুষ্ঠুতর সঙ্গতিবিধানে সমর্থ হয় তার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলী

1. What is mental disorder? How many types of mental disorders are there? Give a short description of each.

Ans. (পৃঃ ২৩৭—পৃঃ ২৫৫)

2. Distinguish between psychosis and neurosis. Name and describe the major forms of psychosis and neurosis.

   Ans. (পৃ: ২২৮—পৃ: ২৫৫)

3. What is neurosis ? Describe different types of neurosis.

   Ans. (পৃ: ২৪২—পৃ: ২৫৫)

4. Give a short description of each :—

   Paranoia, Manic-depressive, Schizophrenia, Hysteria, Psychasthenia. Neurasthenia and Anxiety State.

বাইশ

মানসিক অসুস্থতার কারণ ও চিকিৎসা

(Causes and Treatment of Mental Disorders)

মানসিক অসুস্থতাকে আমরা দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছি। মনোবিকার (Psychosis) এবং মনোব্যাধি (Neurosis)। এর মধ্যে মনোবিকারের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে কোন না কোন প্রকৃতির মস্তিষ্কগত ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতাই এই ব্যাধিগুলি সৃষ্টি করে থাকে। যেগুলি অঙ্গগত মনোবিকার (Organic Psychosis) সেগুলির অঙ্গগত ত্রুটি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু যেগুলি আচরণগত মনোবিকার (Functional Psychosis) বলে পরিচিত সেগুলির পেছনে যদিও কোন সুনির্দিষ্ট অঙ্গগত ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা পাওয়া যায় না তবু মনশ্চিকিৎসকেরা মনে করেন যে সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা না গেলেও মস্তিষ্কের সংগঠনগত কোনরূপ দোষ বা অসম্পূর্ণতা অবশ্যই এই ধরনের আচরণমূলক মনোবিকারের পেছনে আছে।

এই জন্যই মনোবিকার সম্পূর্ণ নিরাময় করার মত কোনও সন্তোষজনক পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয় নি এবং অনেক মনোবিকার এখনও অনারোগ্য ব্যাধি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। মনোবিকারের যে সব চিকিৎসা প্রচলিত আছে তার মধ্যে ইনসুলিন ইনজেকসান প্রয়োগ একটি। এই প্রণালীতে রোগীর দেহে অতিরিক্ত মাত্রায় ইনসুলিন প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। ইনসুলিনের বৈশিষ্ট্য হল যে এই বস্তুটি শরীরের মধ্যে উত্তেজনাকর অবস্থার সৃষ্টি করে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় ইনসুলিন রক্তে প্রবেশ করলে ব্যক্তির সর্ব শরীরে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তার ফলে তার মস্তিষ্কেও একটা তীব্র আলোড়ন ঘটে এবং তা থেকে বহুক্ষেত্রে মস্তিষ্কের অস্বাভাবিকতা কিছুটা দূর হয়ে যায়। এই প্রণালী একেবারেই বিজ্ঞানসিদ্ধ নয় এবং এর ফলও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয় না। আধুনিককালে মনোবিকার চিকিৎসার নানা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি প্রচলিত পদ্ধতির নাম শক থেরাপি (Shock Therapy)। এই পদ্ধতিতে রোগীর মস্তিষ্কে খুব অল্প মাত্রায় বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয় এবং সেই শকের ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। প্রথম প্রথম খুব অল্পসময়ের জন্যই শকটি দেওয়া হয়, কিন্তু পরে শকের স্থায়িত্ব ধীরে ধীরে বাড়ান হয়। এইভাবে কিছুদিন নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় শক দেওয়ার ফলে অনেক মনোবিকারের ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যেতে

দেখা গেছে। তবে এই চিকিৎসা পদ্ধতিও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসিদ্ধ নয় এবং বহু ক্ষেত্রে কিছু দিন পরেই মনোবিকারের পুনরায় আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেছে।

মনোবিকার চিকিৎসার সব চেয়ে আধুনিক পদ্ধতিটি হল মস্তিষ্কের অস্ত্র চিকিৎসা (Lobotomy)। এই পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের কিছুটা অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়। মস্তিষ্কের যে অংশটি দুষ্ট বলে চিকিৎসক মনে করেন সেই জায়গাটুকু অপারেশন করে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের এ ধরনের অপারেশন থেকে ভাল ফলই পাওয়া যায়। এই চিকিৎসা পদ্ধতিটি এখনও নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় আছে। কিন্তু আধুনিক মনোবিকারের চিকিৎসকগণ এই পদ্ধতির মধ্যে বিরাট ভবিষ্যতের সূচনা দেখতে পান। আমেরিকায় সম্প্রতি মস্তিষ্কের অস্ত্র-চিকিৎসা নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষণ সুরু হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে।

মনোব্যাধির কারণ ও চিকিৎসা

(Causes and Treatment of Neurosis)

মনোব্যাধি বা নিউরসিসের কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। এর পেছনে কোন মস্তিষ্কগত ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নেই। ব্যক্তির কোনও রূপ মানসিক অসঙ্গতি বা বিক্ষোভ থেকে মনোব্যাধির সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেইজন্য মনোব্যাধির সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব বলেই মনশ্চিকিৎসকেরা বিশ্বাস করেন।

ব্যক্তির চারপাশের বস্তুজগতের দাবী বা চাহিদা মেটাতে অসামর্থ্য এবং তা থেকে জাত অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকেই মনোব্যাধির কারণ বলা চলে। কিন্তু বস্তুজগতের এই দাবী বা চাহিদা বলতে স্থূল দাবী বা চাহিদাগুলিকে বোঝায় না। এই দাবী বা চাহিদাগুলি প্রধানত ব্যক্তির মন থেকে তৈরী অর্থাৎ পুরোপুরি মানসধর্মী। সেই জন্য এর মূল কারণ নিহিত থাকে ব্যক্তির অচেতন স্তরে এবং সেই অলক্ষ্য অজ্ঞাত স্তরে না পৌঁছতে পারলে ঐ মনোব্যাধিটির প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন, আমাদের চারপাশে যে সব সঙ্কটজনক পরিস্থিতি বা ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় সেগুলির ভয় যতটা না আমাদের বিক্ষুব্ধ করে তার চেয়ে বেশী বিক্ষুব্ধ করে সেই সব পরিস্থিতি এবং অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অন্তর্নিহিত কমপ্লেক্স বা প্রক্ষোভগুলি। যেমন, রোগ, বোমা পড়া, যুদ্ধ ইত্যাদিকে আমরা ভয় করি না। কিন্তু ঐ সব পরিস্থিতিতে যে আমরা নিজেদের কাপুরুষ প্রতিপন্ন করে তুলতে পারি তারই ভয় আমাদের মনকে বেশী করে পীড়িত করে তোলে।

এক কথায় বিপদের সত্যকারের উদ্দীপক বাইরে থেকে আসে না, আসে ভেতর থেকে। যেমন, ভয়ে যে ব্যক্তি হিষ্টিরিয়ায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে তার ভয়ের কারণ এমন নয় যা থেকে সে পালাতে পারে না, বরং সে পালাতে চায় না বলেই তার মনে ভয় সৃষ্টি হয়েছে। অবসেসানে ভুগছে যে ব্যক্তি এমন নয় যে তাকে সমাজের দাবী বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছে বা তা থেকে তার পরিত্রাণ নেই। বরং সে নিজে থেকেই সমাজের দাবী মেনে নিয়েছে। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে সে ঠিকমত সঙ্গতিবিধান করতে পারছে না বলেই তার মধ্যে মনোব্যধি দেখা দিয়েছে। এক কথায় মনোব্যাধিতে যে সঙ্কট বা সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে তা পূর্ণভাবে ব্যক্তির নিজস্ব মনোগত।

মানুষকে দু'ধরনের সঙ্গতিবিধান করে পৃথিবীতে বাঁচতে হয়। এক শরীরের দিক দিয়ে। আর এক, মনের দিক দিয়ে। বস্তু জগতের উত্তাপ, আলো, জল, জীবাণু ইত্যাদির সঙ্গে সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধান করে তাকে তার দৈহিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হয়। যদি সে তা না পারে তাহলে তার দৈহিক ব্যাধি দেখা দেয়। তেমনই যে সব পারিবেশিক শক্তি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলির সঙ্গে ঠিকমত সঙ্গতিসাধন করতে না পারলে তার মধ্যে মানসিক ব্যাধি দেখা দেবে। অতএব মনোব্যাধির কারণ হল মানসিক জগতের সঙ্গে ব্যক্তির ভুল বা অসম্পূর্ণ সঙ্গতিবিধান। ব্যক্তির এই সঙ্গতিবিধানের ক্রটি বা অভাব নানা অস্বাভাবিক আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। ছোটখাট ভুল, নানা রকম স্বপ্ন, অদ্ভুত আচরণ ইত্যাদি ব্যক্তির এই মানসিক অপসঙ্গতিকে বাইরে ব্যক্ত করে দেয়। তবে যখন এই অপসঙ্গতি অত্যন্ত তীব্র এবং গভীর হয়ে ওঠে তখনই তা মনোব্যাধির পর্যায়ে পড়ে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

মনোব্যাধি মাত্রেরই দুটি কারণ আছে, প্রত্যক্ষ (Precipitating) ও পরোক্ষ (Predisposing)। আঘাতাত্মক মানসিক বিপর্যয়রূপ মানসিক অসঙ্গতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কারণই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন, মোটর দুর্ঘটনা, বোমা বিস্ফোরণ, প্রিয়জনের মৃত্যু, ব্যবসায়ে ব্যর্থতা প্রভৃতি থেকে জাত আঘাতাত্মক মনোব্যাধির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কারণকেই প্রধানত দায়ী বলে মনে করা যেতে পারে এবং যদি সেই প্রত্যক্ষ কারণটি দূর করা বা তার প্রভাবকে লাঘব করা যায় তাহলে মনোব্যাধিটি সেরে যায়। যুদ্ধের সময় বহু সৈনিক উত্তেজনাকর অভিজ্ঞতার জন্য প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পায় এবং তার ফলে তার মধ্যে মনোব্যাধির সৃষ্টি হয়। দেখা গেছে যে ঐ সব যুদ্ধজাত মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কারণই সবচেয়ে

প্রবল এবং এগুলির দূরীকরণের উপরই ব্যাধিটির নিরাময় নির্ভর করে। তবু এগুলির ক্ষেত্রেও পরোক্ষ কারণের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কেননা একই ধরনের আঘাতের ক্ষেত্রে একজনকে ভেঙে পড়তে দেখা যায়, অথচ আর একজনকে দেখা যায় সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকতে। একটি মেয়ে তার প্রেমিক কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে দেখা গেল যে সে এতই হতাশ হয়ে পড়েছে যে সে আত্মহত্যা করতে চলেছে। অথচ অপর একটি মেয়ে একই ভাবে প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে স্বাভাবিক ও সাধারণ জীবন যাপন করছে। হঠাৎ কোন সুস্থ ও সবল মানুষকে দেখা গেল যে সে তার আত্মচেতনা হারিয়ে এবং তার আগের জীবনের সব কথা ভুলে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিংবা আর একজন গির্জার দেওয়ালে ভার্জিন মেরী ও শিশু যীশুর ছবি দেখে অন্ধ হয়ে গেল। এসব ক্ষেত্রে নিশ্চয় আমরা প্রত্যক্ষ কারণকে বড় বলতে পারি না। কেননা এখানে ব্যাধিটির প্রকৃতি ও গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রত্যক্ষ কারণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অতএব এ সব ক্ষেত্রে পরোক্ষ কারণেরই প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী।

মনোব্যাধি বা নিউরসিসের পরোক্ষ কারণকে এক কথায় মনোব্যাধিমূলক সংগঠন (Neurotic Constitution) বলা যেতে পারে। মনোব্যাধিমূলক সংগঠনকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, মনোব্যাধিমূলক মনঃপ্রকৃতি (Neurotic Temperament) এবং মনোব্যাধিমূলক প্রবণতা (Neurotic Disposition)। মনোব্যাধিমূলক মনঃপ্রকৃতিটি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা খুবই সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ এবং সহজেই বিক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। অনেক শিল্পী ও কবি মনঃপ্রকৃতির দিক দিয়ে খুবই অনুভূতিপ্রবণ হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা যে সকলেই নিউরটিক হবেন তার কোন অর্থ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্যকারের মনোব্যাধিসম্পন্ন মনঃপ্রকৃতি নিয়ে জন্মেছে সে কোন রকম মানসিক আঘাত পেলেই মনোব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যাদের মনঃপ্রকৃতিতে এই ধরনের কোনও দুর্বলতা থাকে না, তারা অল্পবিস্তর মানসিক আঘাত পেলেও তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন হয় না।

আবার অনেক ক্ষেত্রে মনোব্যাধিমূলক মনঃপ্রকৃতি না থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ মনোব্যাধিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এর কারণ হল যে তাদের মধ্যে কোন কারণে মনোব্যাধিমূলক প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে যায়। মনোব্যাধিমূলক প্রবণতা কোন শারীরিক কারণের উপর নির্ভর করে না। এটি পুরোপুরি মানসধর্মী। শৈশবের কোন অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা থেকে শিশুর মনে কোন মনোবিকারমূলক প্রবণতা বা

কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তার ফলে তার মধ্যে মনোব্যাধি সৃষ্টি হবার উপযোগী একটি মনোভাব তৈরী হয়ে যায় এবং যখনই পরবর্তী জীবনে তাকে কোনও আঘাতাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তখনই শৈশবের সেই মনোবিকারমূলক প্রবণতা বা কমপ্লেক্স জেগে ওঠে এবং তার মধ্যে মনোব্যাধির সৃষ্টি করে। শৈশবের সেই অভিজ্ঞতাগুলি তার মনের অচেতন স্তরে অবদমিত হয়ে বিস্মৃতির গর্ভে চলে যায় বটে, কিন্তু যখনই পরবর্তী জীবনে সে কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখনই তার সেই অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতাগুলি আবার জেগে ওঠে এবং তার বর্তমানের সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাকে কঠিন ও জটিল করে তোলে।

একটি বিষয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা প্রায়ই এক মত যে নিউরসিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল তার পরোক্ষ কারণটি এবং এই পরোক্ষ কারণ নিহিত থাকে ব্যক্তির অতি শৈশবকালীন কোন প্রতিকূল আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতার মধ্যে। প্রায়ই বিশ্লেষণের মধ্যে দেখা যায় যে মনোব্যাধিগ্রস্ত রোগীর মন অতীতে কোন বিশেষ ব্যাপারে বা অভিজ্ঞতায় সংবদ্ধ থাকে। একে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় সংবন্ধন (fixation)[১] বলা হয়। সকল মনোব্যাধির ক্ষেত্রে সংবন্ধন থাকবেই। যখনই মনোব্যাধি দেখা দেয় তখনই ব্যক্তির অহংসত্তা সেই সংবন্ধনের দিনগুলিতে ফিরে যায় এবং শৈশবকালীন অস্বাভাবিক আচরণ ও মিথ্যা কল্পনার মধ্যে দিয়ে নিজের অবদমিত কামনার তৃপ্তি খোঁজে। ব্যক্তি তার সেই শৈশবকালীন সংবন্ধনের ক্ষেত্র থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে কিন্তু সে জানে না কেমন করে তা থেকে সে মুক্তি পাবে। ফলে সে তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ থেকে পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সে যেন তার ব্যাধির দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত হয়ে একটি দ্বীপের মত বাস্তব জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে বাস করে।

ফ্রয়েডের মতবাদ (Theory of Freud)

মনোব্যাধি বা নিউরসিসের কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মতবাদটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ পরীক্ষণ প্রসূত, সুচিন্তিত এবং অপূর্ব প্রতিভা-সমুজ্জ্বল তাঁর দেওয়া মানসিক ব্যাধির এই ব্যাখ্যাটি যেমন বিপ্লবধর্মী, তেমনই বহু বিতর্কের সৃষ্টিকারী।

তাঁর মতে মনোব্যাধি প্রকৃতপক্ষে রোগীর যৌনজীবনের কোন অন্তর্নিহিত গোপন কামনা থেকে উদ্ভূত। সেই কামনার পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টাই মনোব্যাধির লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। যে সব যৌন ইচ্ছা সে বাস্তবে পূর্ণ করতে পারে না

১। পৃঃ ৭৫

সেই ইচ্ছাগুলিরই বিকল্প আচরণরূপে এই লক্ষণগুলি দেখা দেয়। সেই জন্য মনোব্যাধি মাত্রেই হল যৌনধর্মী এবং কোন অসামাজিক গোপন ইচ্ছার পরিতৃপ্তির জন্য সমাজসম্মত প্রচেষ্টাবিশেষ।

ফ্রয়েডের ব্যাখ্যায় মনোব্যাধির লক্ষণগুলির উদ্দেশ্য হয় কোন যৌনকামনার পরিতৃপ্তির প্রয়াস কিংবা কোন যৌনকামনার বিরুদ্ধে ব্যক্তির প্রতিরোধের প্রচেষ্টা। হিষ্টিরিয়াতে এই যৌনকামনার পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টাই প্রবল, কিন্তু অবসেশানের ক্ষেত্রে অবদমিত কামনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রয়াসই প্রধান।

ফ্রয়েড নিউরসিসের সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ কারণের ভূমিকাকেও স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর মতে শৈশবকালীন লিবিডোর সংবন্ধনই মনোব্যাধির প্রধান কারণ। শৈশবকালে লিবিডোর অগ্রগতির সময় কোন কারণবশত ব্যক্তির লিবিডো কোন বিশেষ যৌন-আসক্তির স্থলে সংবদ্ধ হয়ে থাকে। ব্যক্তির পরিণত বয়সে যখন কোন বিশেষ ঘটনা বা অভিজ্ঞতার জন্য লিবিডোর সম্মুখগতি বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন লিবিডো তার সেই অতীতের সংবন্ধনের ক্ষেত্রে আবার ফিরে আসে। একে বলা হয় লিবিডোর প্রত্যাবর্তন (Regression)[১]। ফ্রয়েডের মতে প্রত্যক্ষ কারণ যতই প্রবল হোক্ না কেন, শৈশবকালীন লিবিডোর আসক্তি যদি পরিণত জীবনের লিবিডোকে পেছন থেকে আকর্ষণ না করে তাহলে মনোব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে না। এক কথায় ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন হল মনোব্যাধির পরোক্ষ কারণ এবং যে আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতার জন্য লিবিডো সেই শৈশবকালীন সংবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করে সেটি হল মনোব্যাধির প্রত্যক্ষ কারণ।

এই যদি মনোব্যাধির কারণ হয় তাহলে প্রত্যাবর্তিত লিবিডোকে তার শৈশবকালীন সংবন্ধন-স্থল থেকে মুক্ত করাই হল মনোব্যাধি নিরাময়ের একমাত্র উপায়। আর লিবিডোকে বিস্মৃত অতীতের সেই সংবন্ধন-স্থল থেকে মুক্ত করার একমাত্র পন্থা হল অচেতনের বিশ্লেষণ। ব্যক্তির অচেতনের অন্ধকার গহ্বরে নিহিত যে শৈশব আসক্তির স্থলটিতে লিবিডো সংবদ্ধ হয়ে আছে সেই শৈশব-আসক্তির স্বরূপটিকে যদি অচেতন থেকে তুলে ব্যক্তির সচেতনে আনা যায় তাহলেই লিবিডোর সংবন্ধনের ছেদ ঘটে এবং ব্যক্তির লিবিডো তার স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় পথে অগ্রসর হতে পারে অর্থাৎ এক কথায় তার মনোব্যাধির নিরাময় হয়। অচেতন বিশ্লেষণের পদ্ধতিরূপে ফ্রয়েড তাঁর প্রসিদ্ধ মুক্ত

১। পৃঃ ৭৩

অনুষঙ্গ (Free Association) পদ্ধতিটির উদ্ভাবন করেন এবং বর্তমানে এই পদ্ধতিটি মনশ্চিকিৎসার ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইউঙের মতবাদ (Theory of Jung)

ফ্রয়েডের প্রাক্তন সহকর্মী ইউঙ মনোব্যাধির কারণ নির্ণয়ে ফ্রয়েডের সঙ্গে একমত হন নি এবং একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে শৈশবকালীন সংবন্ধন মনোব্যাধি সৃষ্টির অপরিহার্য কারণ নয়। মনোব্যাধি সৃষ্টির প্রকৃত কারণ হল কোন বর্তমান সমস্যার সমাধানে বা কোন বর্তমান পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানে ব্যক্তির অসামর্থ্য। এই অসামর্থ্য যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন ব্যক্তির লিবিডো তার শৈশবকালীন জীবনযাত্রা ও আচরণধারাতে প্রত্যাবর্তন করে এবং তার ফলে ব্যক্তির মধ্যে মনোব্যাধি দেখা দেয়। ইউঙের মতে মনোব্যাধি যে সব সময় অবদমিত যৌনকামনা থেকে জন্মায় তা নয়। যখন ব্যক্তির বর্তমান জীবনযাত্রায় সহনাতীত কোন আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা বা কোন একান্ত জটিল সমস্যার চাপে তার স্বাভাবিক সঙ্গতিবিধান নষ্ট হয়ে যায় তখনই তার শৈশবকালীন আচরণধারা তার মধ্যে পুনরায় দেখা দেয়। এই শৈশবকালীন সঙ্গতিবিধানের প্রয়াসগুলি বর্তমান জীবনের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল হওয়ায় সেগুলি তার কোন কাজেই লাগে না এবং তার বর্তমান সঙ্গতিবিধান আরও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অতএব ইউঙের মতে নিউরসিসের চিকিৎসায় অচেতনের বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নেই। যে প্রত্যক্ষ কারণ থেকে ব্যক্তির নিউরসিস দেখা দিয়েছে সেই প্রত্যক্ষ কারণটি দূর করাই হল নিউরসিস নিরাময়ের একমাত্র উপায়। 'তার পথ থেকে জীবনের বাধাটি দূর করে দাও দেখবে তার ব্যাধি সেরে গেছে' —এই হল ইউঙের কথা। সেই জন্য ইউঙের নিউরসিস চিকিৎসার পদ্ধতির মূলনীতি হল ব্যক্তির বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি পরীক্ষা করা এবং যে প্রত্যক্ষ কারণ থেকে তার মধ্যে নিউরসিস দেখা দিয়েছে সে কারণটি দূর করা।

এ্যাডলারের মতবাদ (Theory of Adler)

ফ্রয়েডের আর একজন প্রাক্তন সহকর্মী প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী এ্যাডলার নিউরসিসের কারণের তৃতীয় সংব্যাখ্যান দিয়েছেন।

এ্যাডলারও ইউঙের মত অচেতনের অবদমিত কামনাকে নিউরসিসের কারণ বলে বর্ণনা করেন নি। এমন কি তিনি লিবিডোর প্রত্যাবর্তনকেও—

যা ইউঙও মেনে নিয়েছেন—মনোব্যাধির কারণ বলে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে নিউরসিসের কারণ নিহিত থাকে ব্যক্তির হীনম্মন্যতার অনুভূতির মধ্যে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কোনও না কোনও প্রকারের হীনতার বোধ আছে। এই হীনতার বোধকে পরিপূরণ করার জন্য ব্যক্তি তার মধ্যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অবাস্তব একটি লক্ষ্য সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু নিজের প্রকৃত সামর্থ্যের অভাবের জন্য এই লক্ষ্যে পৌঁছান তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে তার এই স্থিরীকৃত লক্ষ্য এবং তার প্রকৃত সামর্থ্য এ দু'য়ের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান দেখা দেয়। এতে তার মানসিক সাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং তার মধ্যে মনোব্যাধির সৃষ্টি হয়। এ্যাডলারের মতে মনোব্যাধির মূল কারণ হল ব্যক্তির জীবনযাত্রার ধারার (Style of life) মধ্যে গুরুতর অসঙ্গতির সৃষ্টি। এই জীবন-যাত্রার ধারা যদি তার সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণই থাকে না। কিন্তু যদি কোনও কারণে এই জীবন-যাত্রার ধারা তার সামর্থ্যের চেয়ে উন্নত হয়ে ওঠে তাহলে তার মধ্যে ব্যর্থতা দেখা দেয় এবং মনোব্যাধির সৃষ্টি হয়। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে মনোব্যাধির সংব্যাখ্যানে এ্যাডলার অচেতন, লিবিডোর সংবন্ধন, প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ফ্রয়েডীয় ধারণাগুলিকে একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এ্যাডলারের মতে মনোব্যাধির চিকিৎসায় ব্যক্তিকে তার অনুসৃত জীবনযাত্রার ধারার মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে সেটি দেখিয়ে দিতে হবে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তার জীবনের লক্ষ্য তার প্রকৃত সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার এবং যাতে সে তার সামর্থ্যানুগ ও বাস্তবধর্মী একটি লক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1 **What are the causes of neurosis ? How can neurosis be cured ?**

Ans. (পৃঃ ২৫৮—পৃঃ ২৬৪)

2. **Describe theories of neurosis given by Freud, Jung and Adler. What are their methods of treating neurosis ?**

Ans. (পৃঃ ২৬১—পৃঃ ২৬৪)

3. **Discuss the role of unconscious, fixation and regression in the creation of neurosis.**

তেইশ

শিশু পরিচালনা ও শিশু পরিচালনাগার

(Child Guidance & Child Guidance Clinic)

বর্তমান শতককে শিশু জাগরণের শতক বলা হয়। পঞ্চাশ বছর আগেও শিশুর চাহিদা, সমস্যা, মানসিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতির উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হত না। কিন্তু অগণিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হল শৈশবকাল। ফ্রয়েড এবং তাঁর বিভিন্ন অনুগামীদের ব্যাপক পরীক্ষণ থেকেই জানা গেছে যে শৈশবে যে সব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও পরবর্তী জীবনে সেগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। এইজন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এবং তাই থেকেই সৃষ্টি হয়েছে শিশু পরিচালনার (Child Guidance) নবতম ধারণাটি।

শিশু পরিচালনার স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা

পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে ছেদহীন সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নবজাত শিশু ধীরে ধীরে পরিণত দেহ-মন-সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এই সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়াটি যদি সুষ্ঠু ও সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয় তাহলে শিশুর মধ্যে কোনরূপ অপসঙ্গতি দেখা দেয় না এবং সে স্বাভাবিক ও সহজ মানুষরূপে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু অপর পক্ষে যদি শিশু তার পরিবেশের বহুমুখী শক্তির সঙ্গে সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ না হয় তাহলে তার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয় এবং তার সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশ গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। অপসঙ্গতি-সম্পন্ন শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না এবং সে প্রতিপদে প্রক্ষোভমূলক বাধা অনুভব করে। ক্রমশ তার মধ্যে নানা অসামাজিক ও অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয় এবং তার ফলে সে সমাজের আর সকলের নিন্দা, বিদ্রূপ ও অবহেলার পাত্র হয়ে ওঠে। গুরুতর ক্ষেত্রে শিশু সমাজের বিচারে অতি নিন্দনীয় অপরাধে অপরাধী বলে পরিগণিত হয় এবং সমাজের শাস্তির দণ্ড তার প্রতি উত্তোলিত হয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে শিশুর এই অস্বাভাবিক বিকাশ ও অবাঞ্ছিত আচরণ বন্ধ করতে হলে তাকে প্রথম থেকেই সুপথে পরিচালিত করা

প্রয়োজন। শিশুর প্রাথমিক সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টার সময় যদি তাকে বিচক্ষণতা ও সহানুভূতির সঙ্গে পরিচালিত করা যায় তাহলে সে প্রায় নির্ভুল পথে চলতে পারে এবং সম্ভাব্য অপসঙ্গতি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে বাঁচতে পারে। বাড়ী, স্কুল, খেলার মাঠ, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবেশে শিশু যখন তার সাধ্যমত সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করে তখন তাকে ব্যক্তিগত সাহায্য দিয়ে সুষ্ঠু ও সার্থক সঙ্গতিবিধানে সমর্থ করা যেতে পারে।

শিশু পরিচালনা কথাটি এই অর্থে যথেষ্ট ব্যাপকধর্মী। শিশুর সমগ্র জীবন-যাত্রাকে অর্থাৎ তার শিক্ষামূলক, প্রক্ষোভমূলক, সামাজিক প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলিকে স্বাস্থ্যময় পথে পরিচালিত করার বিস্তৃত কর্মসূচীটিই শিশুপরিচালনার ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থে শিশুর বর্তমান কর্মধারা, ভবিষ্যৎ অনুসরণীয় কর্মসূচী, তার পঠনীয় বিষয়, তার ভবিষ্যৎ বৃত্তি প্রভৃতি শিশুর বিকাশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক-গুলিকেই সুপথে পরিচালিত করাকে বুঝিয়ে থাকে।

কিন্তু যখন আমরা শিশুপরিচালনাগারের উল্লেখ করি তখন আমরা শিশু পরিচালনা কথাটি কিছুটা সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে থাকি। এই অর্থে কেবলমাত্র যে বিশেষধর্মী সমস্যাটি কোন শিশুর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ক্ষুণ্ন করে তুলেছে সেই সমস্যাটি সম্পর্কে শিং কোন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সুচিন্তিত পরিচালনাদানকেই বুঝিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রা কূল শক্তির চাপে যখন শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয় তখন নানা রকম সমস্যা:ূলক আচরণ তাকে সম্পন্ন করতে দেখা যায়। যেমন চুরি করা, মিথ্যাকথা বলা, ক্লাস থেকে পালান, অবাধ্যতা, শৃঙ্খলাহীনতা, আক্রমণ-ধর্মিতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের অবাঞ্ছিত আচরণ শিশুর সুষ্ঠু বিকাশকে বহু ক্ষেত্রে সঙ্কটময় করে তোলে। এইসব অপসঙ্গতিমূলক আচরণের পেছনে থাকে গভীর ও অচেতন মনে নিহিত কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অবদমিত কামনা। সাধারণ পিতামাতা ও শিক্ষকদের পক্ষে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অবদমিত কামনার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের সাহায্য ও সুপরিচালনা।

প্রচলিত অর্থে শিশুপরিচালনা বলতে এই ধরনের সমস্যামূলক শিশুদের মানসিক ব্যাধির কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসাকেই বুঝিয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞ মনশ্চিকিৎসক শিশুর সমস্যাটি পর্যবেক্ষণ করেন, তার কারণ নির্ণয় করেন এবং তার যথাযথ চিকিৎসার উপায় নির্ধারণ করে দেন। এক কথায় শিশু পরিচালনা বলতে

বিশেষজ্ঞদের দ্বারা শিশুর সমস্যার পর্যবেক্ষণ এবং তার নিরাময়ের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনকেই বোঝায়।

শিশু পরিচালনাগার (Child Guidance Clinic)

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আবির্ভাব খুব সাম্প্রতিক হলেও উন্নত দেশগুলিতে এর প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতি সকলেই উপলব্ধি করেছেন যে শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে তার মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখা সবার আগে প্রয়োজন। এর জন্য শিশুর মধ্যে যদি কোন রকম মানসিক বিকার বা অসুস্থতা দেখা দেয় তাহলে তাকে অবহেলা না করে অবিলম্বে তার কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করতে হবে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুর মানসিক অসুস্থতার স্বরূপ এতই জটিল ও গভীর প্রকৃতির হয়ে থাকে যে সাধারণ পিতামাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকদের পক্ষে সেগুলির চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। এর জন্য প্রয়োজন শিশুর সমস্যায় বিশেষজ্ঞদের কোনও সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান। এই প্রয়োজন থেকেই জন্মলাভ করেছে আধুনিক কালের শিশু পরিচালনাগার।

শিশু পরিচালনাগারের প্রাথমিক ইতিহাস

(Early History of Child Guidance Clinic)

শিশু পরিচালনাগার নামটি প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৯২২ সালে যখন আমেরিকার মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের জাতীয় সংসদটি (National Committee for Mental Hygiene) মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য প্রথম দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু করেন। কিন্তু ঐ নামটির সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহার না হলেও এই ধরনের সুগঠিত পরিচালনাগার অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন রূপে বর্তমান ছিল। বস্তুত শিশুদের সমস্যার সমাধান করার জন্য ১৮৯৬ সালে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইটনার উইটমার (Lightner Witmer) প্রথম মনোবিজ্ঞানমূলক চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এতেও আধুনিক শিশু পরিচালনাগারের মত মনোবিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও শিক্ষক তিনজনের প্রত্যেকে শিশুকে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করতেন। এ ছাড়াও জাজ বেকারের গাইডান্স সেণ্টার (Judge Baker's Guidance Centre) এবং কিশোর সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ইলিয়নয়েস ইনষ্টিটিউট (Illionois Institute for Juvenile Research) এ ব্যাপারে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলিও আধুনিক শিশু পরিচালনাগার স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেছিল। ওহিও ও ক্যালিফর্ণিয়ার

কিশোর সমস্যার গবেষণাগার, বোষ্টনের মনোবিকারের হাসপাতাল, হেনরী ফিপসের মনশ্চিকিৎসার আগার প্রভৃতি নানা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও যে আধুনিক শিশু পরিচালনাগারের বিকাশের পথ সুগম করে তুলেছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

শিশু পরিচালনাগারের সংগঠন

আজকাল শিশু পরিচালনাগার বলতে বিশেষ কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানকেই বোঝায়। এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিষ্ঠানটিতে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য কর্মীদের উপর নির্ভর করে থাকে। প্রত্যেক শিশু পরিচালনাগারে অন্তত তিন ধরনের বিশেষধর্মী কাজ করার মত বিশেষজ্ঞ থাকবেন। সেই তিন ধরনের বিশেষধর্মী কর্মক্ষেত্র হল—মনশ্চিকিৎসামূলক সামাজিক অনুসন্ধান (Psychiatric Social Work), মনোবিজ্ঞান (Psychology) এবং শিশু মনশ্চিকিৎসা (Child Psychiatry)। এই তিনটি কর্মক্ষেত্রে যে বিশেষজ্ঞরা কাজ করেন তাঁদের যথাক্রমে বলা হয় সামাজিক কর্মী (Social Worker), মনোবিজ্ঞানী (Psychologist) এবং মনশ্চিকিৎসক (Psychiatrist)। বস্তুত শিশু পরিচালনাগারের ক্রমবিকাশ এই তিন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। এই তিন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের মিলিত কর্মসূচীর মধ্যে দিয়েই আধুনিক শিশু পরিচালনাগারের পরিকল্পনাটি গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এই ধরনের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে শত শত পরিচালনাগার প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলিতে কাজ করে চলেছে।

এই তিন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের একজনও কম থাকলে প্রতিষ্ঠানটিকে শিশু পরিচালনাগার নাম দেওয়া যাবে না। একজন বা দু'জন বিশেষজ্ঞ নিয়েও অনেক চিকিৎসাগার আছে। সেগুলি নানা বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন মনোবৈজ্ঞানিক শিক্ষামূলক চিকিৎসাগার (Psycho-educational Clinic), পরিচালনা কেন্দ্র (Guidance Centre) ইত্যাদি। এগুলি পূর্ণাঙ্গ শিশু পরিচালনাগারের মত কার্যকর না হলেও শিশু সমস্যার সমাধানে এদের ভূমিকাও তুচ্ছ নয়।

উপরে বর্ণিত তিন ধরনের বিশেষজ্ঞ ছাড়াও আধুনিক শিশু পরিচালনাগারে আরও নানা প্রকারের বিশেষজ্ঞ দেখা যায়, যেমন শিশু-ব্যাধিতে বিশেষজ্ঞ; মনঃসমীক্ষক, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বিশেষজ্ঞ, অস্থি বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। বহু ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক পরিচালনায় বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও শিশু পরিচালনাগারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন।

শিশু পরিচালনাগার স্থাপনের নিয়মাবলী

(Rules for Establishing a Child Guidance Clinic)

শিশু পরিচালনাগার স্থাপন করতে হলে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সেগুলি হল এই—

প্রথমত, শিশু পরিচালনাগার স্থাপন করতে হলে শিশু পরিচালনা কাকে বলে এবং তার কি উদ্দেশ্য সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। আধুনিক কালে শিশু পরিচালনার অর্থ আগের চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে। যাঁরা পরিচালনাগারটি চালাবেন তাঁরা যেন আধুনিক কালের শিশু পরিচালনার ব্যাপকতর কার্যভার ও দায়িত্বের কথা মনে রাখেন।

দ্বিতীয়ত, শিশু পরিচালনাগার স্থাপন করার সময় যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে সেগুলি হল পরিচালনাগারটির অবস্থান ও সংগঠন। সাধারণত শিশু পরিচালনাগার নানা ধরনের সংগঠন-সম্পন্ন হতে দেখা গেছে। যেমন, পরিচালনাগারটি কোন সাধারণ হাসপাতাল বা মানসিক রোগের হাসপাতালের বহির্বিভাগরূপে থাকতে পারে। কিংবা স্থানীয় শিক্ষাবিভাগ বা স্বাস্থ্যবিভাগের অধীনস্থ বিদ্যালয় চিকিৎসা সংস্থার (School Medical Unit) শাখারূপে থাকতে পারে। আবার কখনও শিশু পবিচালনাগারটি কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষকশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সংগঠনরূপে থাকে। কিংবা এটি সম্পূর্ণ জনসাধারণের অর্থ-সাহায্যে পরিচালিত স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপেও থাকতে পারে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে শিশু পরিচালনাগার স্বতন্ত্র একটি অতি উন্নত ধরনের বিশেষধর্মী প্রতিষ্ঠান। বিশেষ জ্ঞানবর্জিত সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে এর নানা জটিলতা বোঝা শক্ত এবং তার ফলে পরিচালনাগারের বিভিন্ন সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলিও ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা প্রচুর থাকে। সেইজন্য যে ধরনের সংগঠনই হোক না কেন পরিচালকবর্গ যেন পরিচালনাগার চালানোর জটিলতা ও দায়িত্ব যথাযথ উপলব্ধি করেন।

কর্মী নির্বাচন (Selection of Personnel)

তৃতীয়ত, শিশুপরিচালনাগারে যে সব কর্মী থাকবেন তাঁদের নিযুক্ত করা হল পরবর্তী কাজ। শিশুপরিচালনাগারের জন্য তিন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ কর্মী থাকা অপরিহার্য। তাঁরা হলেন (ক) মনশ্চিকিৎসক সামাজিক কর্মী (Psychiatric Social Worker), (খ) মনোবিজ্ঞানী (Psychologist) এবং (গ) মনশ্চিকিৎসক (Psychiatrist)। এঁরা সকলেই নিজের নিজের বিষয়ে বিশেষজ্ঞানসম্পন্ন হবেন এবং তার জন্য এঁদের প্রত্যেককেই সুনির্দিষ্ট শিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

শিশু পরিচালনায় বিভিন্ন কর্মীদের সম্মিলিত কর্মসূচীই হল প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এখানে তিন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের মিলিত অবদানে শিশুর সমস্যাটির সমাধান করা হয়। তবু তত্ত্বের দিক দিয়ে এই তিন শ্রেণীর কর্মীর কাজের মধ্যে বিভাজন রেখা টানতে পারা যায়। যেমন, মনশ্চিকিৎসকের কাজ হল শিশুর নিজের সমস্যার সমাধান করা, সামাজিক কর্মীদের কাজ হল শিশুর পরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং তৃতীয় বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর কাজ হল শিশুর বুদ্ধি, অন্যান্য মানসিক সামর্থ্য, আগ্রহ প্রভৃতির স্বরূপ নির্ণয় করা। প্রথমে সামাজিক কর্মী শিশুর পরিবেশ অর্থাৎ তার পিতামাতা, সহপাঠী, শিক্ষক প্রভৃতির কাছ থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে মনশ্চিকিৎসকের সামনে সেগুলি উপস্থাপিত করেন। মনোবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানমূলক অভীক্ষার দ্বারা শিশুর মানসিক বৈশিষ্ট্য সামর্থ্য ও আগ্রহ পরিমাপ করে তাঁর পাওয়া তথ্যরাশি মনশ্চিকিৎসকের সামনে উপস্থাপিত করেন। এই সব বিভিন্ন তথ্যের দ্বারা সজ্জিত হয়ে মনশ্চিকিৎসক শিশুকে পরীক্ষা করেন এবং তার সমস্যাটির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করে তার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

বলা বাহুল্য এই কাজগুলি করতে হলে তিন ধরনের কর্মীকেই অভিজ্ঞ ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। যিনি মনশ্চিকিৎসক হবেন তিনি প্রথমে অবশ্যই চিকিৎসা বিদ্যায় স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন। তারপর তিনি মনশ্চিকিৎসায় বিশেষ শিক্ষণ গ্রহণ করবেন। তাঁর শিক্ষণসূচীর মধ্যে থাকবে সকল প্রকার মানসিক ব্যাধির প্রকৃতি ও চিকিৎসা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন এবং শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা গঠন। শিশুদের সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান এবং তাদের নানা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতাও তাঁর থাকা দরকার।

যিনি মনোবিজ্ঞানী হবেন তিনি অবশ্যই মনোবিজ্ঞানে স্নাতক হবেন এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকবে। তিনি বুদ্ধি পরিমাপের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং শিক্ষায় যে সব ছেলেমেয়ে পশ্চাদ্‌পদ তাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি তাঁর জানা থাকবে। সব শেষে শিশুদের আচার ব্যবহার ও চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকবেন এবং শিশুর বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকবে।

মনশ্চিকিৎসামূলক সামাজিক কর্মীর প্রধান কাজ হল শিশুর পরিবেশ নিয়ে। শিশু যেখানে জন্মেছে এবং বড় হয়েছে, যে স্কুলে সে পড়েছে সে সব স্থানে সামাজিক কর্মীকে যেতে হবে এবং যে সব সহপাঠী, প্রতিবেশীর সঙ্গে থেকে

শিশু বড় হয়েছে তাদের সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁকে শিশুর সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে হবে। এর জন্য সামাজিক কর্মীকে সমাজ সংগঠন ব্যবস্থার শিক্ষা নিতে হবে এবং সামাজিক ব্যবস্থার ব্যক্তিগত ও আইনগত উভয় দিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকৃতির সাধারণ সামাজিক কাজেও তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকবে। সব শেষে যেহেতু তাঁকে শিশুর বিভিন্ন সমস্যা নিয়েই প্রধানত কাজ করতে হবে সেহেতু মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানেও তাঁর গভীর জ্ঞান থাকবে।

আবাসগৃহ ও সাজ-সরঞ্জাম (Building and Equipment)

শিশু পরিচালনাগারের আবাসগৃহের নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ন নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে শিশু পরিচালনাগারটি বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসাগারের সঙ্গে একই বাড়ীতে অবস্থিত থাকে। এ সব ক্ষেত্রে যেমন সুবিধা আছে তেমনই অসুবিধাও আছে। চিকিৎসাগারের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকাতে চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য ও অন্যান্য সাহায্য প্রয়োজন হলেই পাওয়া যায়। তাছাড়া এমন অনেক শিশুসমস্যা আছে যেগুলির সমাধান করতে হলে পরিচালনা দানের সঙ্গে দৈহিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হয়। সে সব ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসাগারের সাহায্য অতি মূল্যবান। তেমনই আবার চিকিৎসাগারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে বিদ্যালয়ের শিশুদের মনে ভীতি এবং সংশয় জাগতে পারে। সাধারণত ছেলেমেয়েদের মনে চিকিৎসাগার বা হাসপাতাল সম্বন্ধে একটি ভীতিমূলক ধারণা থেকে থাকে। ফলে হাসপাতালের সঙ্গে যে সব পরিচালনাগার অবস্থিত থাকে সেগুলি সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। এর মধ্যে মানসিক হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিশু পরিচালনাগারেরই অসুবিধা সব চেয়ে বেশী। বিদ্যালয়ের একটি অংশে শিশু পরিচালনাগার অবস্থিত থাকার একটা বড় দোষ হল যে বিদ্যালয়ের গোলমাল হৈ চৈ পরিচালনাগারের সুষ্ঠু কর্ম সম্পাদনে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে থাকে।

আদর্শ শিশু পরিচালনাগারের জন্য প্রয়োজন অনেকগুলি কক্ষ-সম্পন্ন একটি স্বতন্ত্র বাড়ী। সঙ্গে যদি ছোট একটা বাগান থাকে তবে খুবই ভাল। ঘরের সংখ্যা যত বেশী থাকে ততই সুবিধা। এই ধরনের বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়েরা ঘোরাফেরা করতে পারে এবং খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে তাদের মনের সংশয় ও আড়ষ্টতা কেটে যায়। সংখ্যার দিক দিয়ে অন্তত পাঁচখানি ঘর থাকা একান্ত দরকার। যথা, সামাজিক কর্মী, মনশ্চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানী, এই তিনজনের

প্রত্যেকের জন্য একখানি করে তিনখানি ঘর। এর পর ছেলেমেয়েদের বসার একটি ঘর এবং তাদের খেলার জন্য অন্তত একটি ঘর।

প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম অবশ্য খুব বেশী লাগে না। তবে নীচের বস্তুগুলি পরিচালনাগার চালাবার জন্য একপ্রকার অপরিহার্য, যথা, (ক) সাধারণভাবে শারীরিক পরীক্ষা করার জন্য দরকারী যন্ত্রপাতি, (খ) বুদ্ধি পরিমাপের সাজসরঞ্জাম, (গ) প্রচুর পরিমাণে খেলাধূলার জিনিষ, (ঘ) শিশুর সমস্যাবলীর বিবরণ লেখার বিভিন্ন ফর্ম এবং (ঙ) আরামদায়ক ও মজবুত আসবাবপত্র।

বুদ্ধি পরিমাপের নানারকম অভীক্ষা আজকাল বেরিয়েছে। সাধারণত বিনে-স্কেলের আধুনিক সংস্করণটি, মেরিল-পামারের সম্পাদনী অভীক্ষা, ওয়েকসলার-বেলিভিউ টেষ্ট ইত্যাদি প্রখ্যাত অভীক্ষাগুলি সব পরিচালনাগারে রাখা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য ভারতে শিশু পরিচালনাগার খুলতে হলে আঞ্চলিক ভাষায় প্রস্তুত অভীক্ষা রাখতে হবে। এ ব্যাপারে ভারত খুবই অনগ্রসর। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বুদ্ধি পরিমাপের নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা বিশেষ তৈরী হয় নি।

খেলাধূলার জিনিষপত্রের পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে পরিচালনা-গারটিকে ভালভাবে সজ্জিত করতে হলে নীচের জিনিষপত্রগুলি রাখা উচিত। নানা রকম খেলনা, পুতুল, কাঠের ব্লক, প্লাষ্টিসাইন, বল, ক্যারাম, ব্যাগাটেলি ইত্যাদি। বাস্তব জীবনে ব্যবহৃত সাধারণ বস্তুগুলির অনুকরণে যে খেলনা তৈরী হয় সেগুলি অবশ্যই রাখতে হবে।

শিশু পরিচালনাগার চালাতে হলে নানা রকম নিদর্শ পত্র বা ফর্মের (form) ব্যবহার অপরিহার্য। সাধারণত সামাজিক কর্মীদের কাজ করার জন্য লাগে কেসহিষ্ট্রী ফর্ম। এই ফর্মে শিশুর অতীত জীবন ও অন্যান্য বিষয়ে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। মনোবিজ্ঞানীদের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করার জন্য আর এক ধরনের ফর্মের প্রয়োজন হয়। শিশুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শ্রেণী শিক্ষকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য তৃতীয় এক ধরনের ফর্ম পাঠান হয়ে থাকে। সব শেষে মনশ্চিকিৎসকের আবিষ্কৃত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করার জন্য আর একটি বিশেষ ফর্মের প্রয়োজন হতে পারে। উপরের ফর্মগুলি ছাড়াও প্রত্যেক পরিচালনাগারেই ডায়েরী শীট (Diary sheet) ব্যবহার করা হয়। এই শীটে প্রত্যেকটি কেস সম্পর্কে দৈনিক যে সব সাক্ষাৎকার হয়, চিঠিপত্র লেখা হয় এবং যাঁরা দেখা করতে আসেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয়। আসবাব পত্রের মধ্যে প্রত্যেক ঘরেই কম করে ছ'টি করে ইজিচেয়ার থাকবে।

শিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় ইজি চেয়ারে বসে কথাবার্তা বলাই ভাল। এছাড়া কয়েকটি সাধারণ ডেস্ক বা টেবিল এবং ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী নীচু চেয়ার থাকবে। ছোট ছোট কার্পেট বা সতরঞ্চি রাখতে হবে যাতে দরকার পড়লে ছেলেমেয়েরা সেগুলির উপর বসে খেলা করতে পারে। কাগজপত্র, অভীক্ষার সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি রাখার জন্য দু'একটি ষ্টিলের কেবিনেট দরকার।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে শিশুপরিচালনাগারে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করাই সব চেয়ে আগে দরকার। শিশুর মনে যদি বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা সৃষ্টি না করা যায় তাহলে তার সমস্যার সমাধান করা কখনই সম্ভব হবে না। এই জন্যই পরিচালনাগারের অভ্যন্তরীণ সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র, কর্মীদের আচার ব্যবহার এ সব মিলিয়ে এমন একটি পরিবেশ রচনা করতে হবে যাতে শিশুর কাছ থেকে সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যায়।

শিশু পরিচালনাগারের লক্ষ্য, কাজ ও উপযোগিতা
(Objectives, Functions and Utilities of Child Guidance Clinic)

শিশু পরিচালনাগারের কার্যকারিতা সম্বন্ধে আজ আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং বর্তমানে এগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। শিশু পরিচালনাগারগুলির লক্ষ্য, কাজ ও উপযোগিতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে শিশুদের মধ্যে যে সব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই জটিল মানসিক সংঘাত বা প্রক্ষোভমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে এবং সেগুলির স্বরূপ চেনা সাধারণভাবে প্রচলিত ব্যবস্থার দ্বারা সম্ভব হয় না। এর জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য। বস্তুত একমাত্র বিশেষজ্ঞরাই শিশুর সমস্যাটি পর্যবেক্ষণ করে তার প্রকৃত কারণটি খুঁজে বার করতে পারেন। একমাত্র শিশু পরিচালনাগারের সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশেই এই কাজটি সম্ভব হয়ে থাকে।

শিশুর সমস্যার কারণ নির্ণয় করাও যেমন জটিল কাজ, তেমনি জটিল হল তার চিকিৎসা পদ্ধতি। আন্তরিকতা, অভিজ্ঞতা এবং শিশু মনোবিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান থাকলেই শিশুমনের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব হয়। তাছাড়া

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে নানারকম যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন। একমাত্র সুসংগঠিত শিশু পরিচালনাগারগুলিতেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিশুর মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করার ব্যবস্থা থাকে।

৩। সুপরিচালনা (Guidance)

চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে আসে সুপরিচালনা। নিছক চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা মানসিক ব্যাধি বা প্রক্ষোভমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব কোনটিরই সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় শিশুর ভবিষ্যৎ আচরণের সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ। যদি শিশুর ভবিষ্যৎ আচরণকে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করা না যায় তবে শিশুর ব্যাধিটি কোন দিনই সম্পূর্ণভাবে সারে না। বরং প্রতিকূল পরিস্থিতির উদয় হলে সেই ব্যাধি আবার দেখা দেয়। শিশুর এই ভবিষ্যৎ আচরণের সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণকেই সুপরিচালনা নাম দেওয়া হয়েছে। আধুনিক শিশু পরিচালনাগারগুলির কার্যাবলীর মধ্যে এই সুপরিচালনার কাজটি নিঃসন্দেহে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৪। সম্মিলিত কার্যসূচী

শিশু পরিচালনাগারের যে কাজগুলির বর্ণনা করা হল তার সবগুলিই অতি-মাত্রায় বিশেষধর্মী এবং প্রত্যেকটি কাজের জন্যই স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। শিশু পরিচালনাগারের বৈশিষ্ট্যই হল এই বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করে তাঁদের একটি সংঘবদ্ধ দলে পরিণত করা। সেখানে শিশুর প্রতিটি সমস্যাকেই একটি সম্মিলিত কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে এই বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন এবং সেটির সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করেন। এই সম্মিলিত কার্যসূচীর জন্যই শিশু পরিচালনাগারের কার্যকারিতা এত বেশী নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে।

পিতামাতার পক্ষে শিশুর চিকিৎসার জন্য সব সময় অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া সম্ভব হয় না এবং সম্ভব হলেও বড় জোর তাঁরা একজনের পরামর্শ নিতে পারেন। কিন্তু শিশু পরিচালনাগার সৃষ্টি হওয়ার ফলে যে কোন পিতামাতার পক্ষে শিশুর সমস্যা বা ব্যাধির ক্ষেত্রে স্বল্পব্যয়ে একাধিক প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে এবং শিশুর জটিলতম সমস্যারও সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা করা তাঁদের আয়ত্তাধীন হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি শিশু পরিচালনাগারের কাজের মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

আধুনিক সমাজে কিশোরদের মধ্যে অপরাধপরায়ণতার (Delinquency) মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে। দেখা গেছে যে বাড়ী বা বিদ্যালয়ের অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির জন্য যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি হয়। আধুনিক শিশু পরিচালনাগারগুলির উপর এই ধরনের ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকারের কারণ খুঁজে বার করার দায়িত্ব এসে পড়েছে। যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি হয় তার মূলে প্রায়ই থাকে প্রক্ষোভমূলক অপসঙ্গতি, অতৃপ্ত চাহিদা এবং অবদমিত কামনা। এই কারণগুলির প্রকৃত স্বরূপ জানা এবং তাদের যথাযথ চিকিৎসা করার জন্য মানসিক ব্যাধিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য অপরিহার্য। এই ধরনের বিশেষজ্ঞদের পাওয়া যায় শিশু পরিচালনাগারে এবং সেইজন্যই আধুনিক শিশু পরিচালনাগারগুলির কর্মসূচীর মধ্যে অপরাধপরায়ণতার কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৭। বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা (Vocational Guidance)

অনেক আধুনিক শিশু পরিচালনাগারে বৃত্তিমূলক সুপরিচালনার (Vocational Guidance), কাজও করা হয়ে থাকে। শিশু ভবিষ্যতে কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করবে, তার সামর্থ্য ও আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোন্ বৃত্তি তাকে সব চেয়ে বেশী সাফল্য ও তৃপ্তি এনে দেবে ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে শিশুকে যথাযথ নির্দেশ দেওয়াই হল বৃত্তিমূলক সুপরিচালনার লক্ষ্য।

৮। অনগ্রসর শিশুদের চিকিৎসা (Treatment of Backward Children)

তাছাড়া যে সব ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় পশ্চাদ্‌পদ বা যাদের বিদ্যালয়ের কাজকর্মে কোন আগ্রহ দেখা যায় না তাদের সমস্যা নিয়ে অনেক শিশু পরিচালনাগারে গবেষণাও হয়ে থাকে। নানা কারণে শিশু তার স্কুলের পাঠ-প্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে না। তার জন্য তার মানসিক সামর্থ্যের ন্যূনতা, তার আগ্রহের অভাব, তার শারীরিক কোন ত্রুটি, তার দীর্ঘ প্রলম্বিত কোন রোগ, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষায়তনের প্রতিকূল আবহাওয়া প্রভৃতি নানা বিভিন্ন বিষয় দায়ী হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা শিশুকে পরীক্ষা করে তার অনগ্রসরতার প্রকৃত কারণটি নির্ণয় করতে পারেন এবং তার ত্রুটি সংশোধনের যথার্থ পন্থার নির্দেশ দিতে পারেন। এই সব নতুন কাজগুলির সংযোজনের ফলে আধুনিক শিশু পরিচালনাগারের কর্মসূচী অনেক ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

৯। নুতন তথ্যের উদ্ভাবন (Discovery of New Facts)

এছাড়া বর্তমান কালে শিশু পরিচালনাগারগুলি শিশুর নানা সমস্যা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যের আকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন শিশুর কোন বিশেষ সমস্যা দেখা দেয় তখন পরিচালনাগারের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ঐ সমস্যাটিকে তাঁদের নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার ও পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এর দ্বারা শারীরিক, মনোবিজ্ঞানমূলক, সামাজিক, শিক্ষামূলক, বৃত্তিমূলক, বিনোদনমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে সমস্যাটির বিচার করা হয় এবং তার ফলে সমস্যাটি সম্বন্ধে স্বভাবতই নানা নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। পরে যখন এই সব বিশেষজ্ঞ একসঙ্গে বসে এই তথ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর সমস্যাটি সমাধান করেন, তখন সেই সমাধানটি যে সব দিক দিয়ে কার্যকর ও নির্ভুল হয়ে ওঠে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বিশেষজ্ঞরা স্বতন্ত্রভাবে যদি সমস্যাটির পর্যবেক্ষণ করতেন তা হলেও যে তাঁরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করতেন এ কথা সত্য। কিন্তু পরিচালনাগারের সম্মিলিত আলোচনার পরিবেশে যত অধিক সংখ্যক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হয় তা কোন মতেই একক চিন্তা থেকে আসতে পারে না। তাছাড়া এই সম্মিলিত আলোচনার মধ্যে দিয়ে যে সব মতামত ও সিদ্ধান্ত বিশেষজ্ঞরা ব্যক্ত করে থাকেন সেগুলি শিশুর বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রায়ই নতুন পথের সন্ধান দিয়ে থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. What are the functicns of 'Child Guidance Clinic'? Show your acquaintance with the perscnnel of a child guidance clinic pointing out the programme of work designated for each.
   Ans. (পৃ. ২৬৫—পৃঃ ২৭৬)
2. What do you mean by 'Child Guidance'? Describe the minimum requirement for organising a 'Child Guidance Clinic'.
   Ans. (পৃঃ ২৬৫—পৃঃ ২৭৬)
3. Enumerate the personnel of a 'Child Guidance Clinic' and state the duties of each person?
   Ans. (পৃঃ ২৬৯—পৃঃ ২৭৬)
4. Discuss the aims and objectives of child guidance service.
   Ans. (পৃ ২৭৩ - পৃঃ ২৭৬)
5. Discuss the functions of psychologist in a child guidance clinic.
   Ans. (পৃ. ৩০৫—পৃঃ ৩১২)

চব্বিশ

মানসিক ব্যাধি ও অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা

(Diagnosis & Treatment of Mental Diseases & Maladjustment)

অপসঙ্গতি নিরাময়ের জন্য অপসঙ্গতির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা অপরিহার্য। অপসঙ্গতির বাহ্যিক অভিব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে থাকে। একই মানসিক সমস্যা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। তেমনই আবার একই অপসঙ্গতিমূলক আচরণের মূলে থাকতে পারে বিভিন্ন মানসিক কারণ। অতএব নিছক বাহ্যিক অভিব্যক্তি দেখেই অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যেমন, কোন ছেলের যদি মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস থাকে কিংবা কোন মেয়ে যদি ক্লাসে তার সংপাঠিনীদের সঙ্গে একেবারে মেলামেশা না করে, তাহলে তাদের মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিয়েছে বুঝতে হবে। কিন্তু তাদের এই অপসঙ্গতির কারণ তাদের এই বাহ্যিক আচরণ থেকে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা ছেলেটির চুরি করার প্রবণতার মূলে কিংবা মেয়েটির অতি-লাজুকতার মূলে আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা থেকে সুরু করে আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা প্রভৃতি বহু রকম মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তি থাকতে পারে। অতএব অপসঙ্গতির যথাযথ চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন তার স্বরূপ বা প্রকৃতিটি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা।

অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয় করার জন্য সাধারণত দুটি সোপানের উল্লেখ করা যায়। যথা—তথ্যসংগ্রহ ও সংব্যাখ্যান।

১। তথ্যসংগ্রহ ঃ সাক্ষাৎকার ও মুক্ত অনুষঙ্গ

অপসঙ্গতির স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে প্রথমে শিশুর সমস্যাটি সম্বন্ধে চিকিৎসককে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই তথ্য সংগ্রহের নানা পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হল সাক্ষাৎকার (Interview) পদ্ধতি। অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশুর সঙ্গে মনশ্চিকিৎসক প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপের মধ্যে দিয়ে তার সমস্যাটির কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। সমস্যাটি কি প্রকৃতির, কবে থেকে সুরু হয়েছে এবং তার সৃষ্টির প্রকৃত কারণ কি—এই মূল্যবান তথ্যগুলি মনশ্চিকিৎসক শিশুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে সংগ্রহ করেন। বলা বাহুল্য, এই সাক্ষাৎকার একবারে বা একদিনেই শেষ হয় না। বহুদিন ধরে ও বহু ধৈর্যপূর্ণ ঘণ্টা কাটানোর পর

এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি তিনি সংগ্রহ করতে পারেন। অপসঙ্গতির চিকিৎসায় এই সাক্ষাৎকারের স্থান সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর মনে যদি মনশ্চিকিৎসক যথেষ্ট বিশ্বাস সৃষ্টি করতে না পারেন তাহলে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-গুলি কখনই তিনি সংগ্রহ করতে পারেন না। ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস, সহানুভূতি ও বিচক্ষণতা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে কোন চিকিৎসকই তাঁর তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে পারেন না।

তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সাধারণ মনশ্চিকিৎসকেরা সাক্ষাৎকারের উপর নির্ভর করলেও মনঃসমীক্ষণ-গোষ্ঠিভুক্ত মনশ্চিকিৎসকেরা এই ধরনের সাক্ষাৎকারকে মোটেই কার্যকর বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতিটিই (Free Association) হল শিশুর কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের একমাত্র কার্যকর পন্থা। মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড এই মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতিটির উদ্ভাবক। তাঁর মতে শিশুর সমস্যা বা মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃত কারণ খুঁজে বার করতে হলে তার মনের গভীর তলদেশে অনুসন্ধান চালান অপরিহার্য। সাধারণ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিশুর সেই অজ্ঞাত মনের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং সেই জন্য মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোন পন্থা নেই। ফ্রয়েডের মুক্ত পদ্ধতিটির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ না থাকলেও এই পদ্ধতি শিশুদের ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে সর্বত্র প্রয়োগ করা যথেষ্ট অসুবিধা-জনক, সময়সাপেক্ষ ও শ্রমবহুল। সেইজন্য অনেক আধুনিক মনশ্চিকিৎসক সাধারণভাবে খোলাখুলি প্রত্যক্ষ আলোচনার উপর নির্ভর করে থাকেন।

২। সংব্যাখ্যান (Interpretation)

তথ্যসংগ্রহের পরবর্তী সোপান হল সংব্যাখ্যান। ব্যক্তির কাছ থেকে যে সব তথ্য মনশ্চিকিৎসক সংগ্রহ করলেন সেগুলির যথাযথ সংব্যাখ্যানের উপরই চিকিৎসার সাফল্য নির্ভর করে। সাধারণভাবে দেখা গেছে যে, শিশু এমন বহু অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশ করে থাকে যেগুলির সঙ্গে প্রকৃত সমস্যার কোন দিক দিয়েই সম্পর্ক নেই, উপরন্তু সেগুলি নানাভাবে প্রকৃত সমস্যাটিকে আবৃত করে রাখে। মনশ্চিকিৎসকের কাজ হল এই অজস্র তথ্যের মধ্যে থেকে প্রকৃত ও প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি খুঁজে বার করা এবং সেগুলির নির্ভুল সংব্যাখ্যান দেওয়া। মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতির মাধ্যমে স্তূপীকৃত তথ্য মনশ্চিকিৎসকের হাতে

এসে পৌঁছয় এবং সেগুলির মধ্যে থেকে শিশুর সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা চিন্তাগুলি তাঁকে খুঁজে বার করে নিতে হয়।

আধুনিক শিশু পরিচালনাগারগুলিতে শিশুর সম্বন্ধে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আরও দু'শ্রেণীর কর্মী থাকেন। এক, সামাজিক কর্মী (Social worker) এবং অপর, মনোবিজ্ঞানী। সামাজিক কর্মীদের কাজ হল শিশুর পরিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির কাছ থেকে তার পূর্ব ইতিহাস ও ঘটনাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করা। এগুলি শিশুর অপসঙ্গতির সংব্যাখ্যানে মনশ্চিকিৎসককে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীরা হলেন মনোবিজ্ঞানী। এঁদের কাজ হল বিভিন্ন আধুনিক পরিমাপমূলক অভীক্ষার সাহায্যে শিশুর বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক শক্তি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা। এই সব বিভিন্ন তথ্য একত্রিত করে মনশ্চিকিৎসক শিশুর অপসঙ্গতির সংব্যাখ্যান করে থাকেন।

সংব্যাখ্যানের কাজটিই অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এইখানেই মনশ্চিকিৎসকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি ও প্রতিভার পরিচয় মেলে। বস্তুত, সমস্যাটির যথাযথ সংব্যাখ্যান পেলে তার সমাধান আর দূরবর্তী থাকে না। প্রত্যেক মনশ্চিকিৎসকেরই এই সংব্যাখ্যানের নিজস্ব পদ্ধতি ও রীতি আছে। মনঃসমীক্ষণবাদী চিকিৎসকদের সংব্যাখ্যানের পদ্ধতি অনেক গভীর ও ব্যাপক। তাঁদের মতে সমস্ত মানসিক সমস্যার মূলেই আছে অচেতন মনের প্রভাব। মানুষের সচেতন মনে তাঁর জটিল সমস্যাগুলির কোনও প্রকৃত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই জন্যই তাঁরা কেবলমাত্র সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে তথ্য সংগ্রহে বিশ্বাসী নন। মনঃসমীক্ষকরা অপসঙ্গতির সমস্ত সংব্যাখ্যান অচেতন মনের আচরণের দ্বারাই দেবার চেষ্টা করে থাকেন এবং তাঁদের চিকিৎসার পদ্ধতিও অচেতন মনের দ্বন্দ্ব বা বৈষম্য দূরীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যে সব মনশ্চিকিৎসক মনঃসমীক্ষণ মতবাদী নন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অচেতন মনের অপরিসীম শক্তি ও প্রভাবের কথা স্বীকার করেন। যদিও তাঁরা মমঃসমীক্ষকদের মত সমস্ত মানসিক সমস্যার মূলেই একমাত্র অচেতনের প্রভাবের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না তবু তাঁরা মানসিক সমস্যার সৃষ্টিতে অচেতন মন যে প্রধানতম শক্তিরূপে কাজ করে সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করেন না। এই জন্য সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে যে সব তথ্য তাঁদের হাতে পৌঁছয় সেগুলির সাহায্যে তাঁরা ব্যক্তির অচেতনের কার্যকলাপ অনুমানের চেষ্টা করে থাকেন।

তাঁদের মতে সাধারণ ও সরাসরি আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে অচেতনের কার্যকলাপের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেই সব তথ্যকেই ভিত্তি করে সমস্যাটির যথাযথ সমাধান করা সম্ভবপর হয়।

চিকিৎসা (Therapy)

অপসঙ্গতির প্রকৃত স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় করার পর সেটির নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এইখানে বিভিন্ন মনশ্চিকিৎসক বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। শিশুর মানসিক ব্যাধির কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মনশ্চিকিৎসক বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন এবং তাঁদের সেই বিভিন্ন তত্ত্ব অনুযায়ী তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে। নীচে কয়েকটি প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির বর্ণনা করা হল।

ক। অচেতন উদ্‌ঘাটন

মানসিক অপসঙ্গতির যে চিকিৎসা পদ্ধতিটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেটি হল ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণভিত্তিক প · · ফ্রয়েডের পূর্বে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় সম্মোহন পদ্ধতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করা হত। মনোবিজ্ঞানীরা চিরকালই এ সিদ্ধান্ত করে এসেছেন যে ব্যক্তির মনের মধ্যে কোন গুপ্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব বা কোন অবদমিত অতৃপ্তি থেকেই মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু মনের গভীর তলদেশে নিহিত এই মানসিক দ্বন্দ্বের সন্ধান সোজাসুজি বা প্রকাশ্য-ভাবে পাওয়া যায় না। তার জন্য বিশেষ পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

অচেতনে অবদমিত শিশুর কোন চিন্তা, ধারণা বা অভিজ্ঞতা থেকেই তার অপসঙ্গতির সৃষ্টি হয়ে থাকে সেইজন্য মনঃসমীক্ষণবাদী চিকিৎসকরা এই কথা বিশ্বাস করেন যে শিশুর সেই অবদমি চিন্তা, ইচ্ছা বা অভিজ্ঞতাটি তার সামনে উদ্‌ঘাটিত করতে পারলেই তার মানসিক অপসঙ্গতি দূর হয়ে যাবে। তাঁদের মতে অপসঙ্গতির চিকিৎসার প্রধান অঙ্গই হল অচেতন থেকে অবদমিত দ্বন্দ্বটিকে খুঁজে বার করা। বস্তুত যখনই মনশ্চিকিৎসক শিশুর অচেতনের এই রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন তখনই তাঁর চিকিৎসার কাজও শেষ হয়ে যায়। মনশ্চিকিৎসক শিশুকে তার মনের সেই অবদমিত চিন্তা বা কামনাটির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দেন এবং যাতে সে ভবিষ্যতে আর অপসঙ্গতিমূলক আচরণ না করে সে সম্পর্কে উপযুক্ত পরামর্শ দেন। মনঃসমীক্ষণবাদীদের মতে এই পরামর্শদানই মানসিক অপসঙ্গতির চিকিৎসার প্রধানতম অঙ্গ।

খ। প্রবোধন (Persuasion)

যাঁরা মনঃসমীক্ষণবাদে বিশ্বাসী নন তাঁরা তথ্য আহরণের জন্য যেমন মুক্ত অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেন না তেমনই অচেতনের কার্যকলাপের দ্বারা সমস্ত মানসিক অপসঙ্গতির ব্যাখ্যাও দেন না। ফ্রয়েডের প্রাক্তন সহকর্মী ইয়ুঙ এবং এ্যাডলার ফ্রয়েডের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। অবশ্য এঁদের মধ্যে ইয়ুঙ ফ্রয়েডের মতই অচেতনের ভূমিকায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর অনুসৃত চিকিৎসার পদ্ধতিতে তিনি অচেতনের কার্যকলাপের অনুসন্ধানকেই সর্বপ্রধান স্থান দিয়েছেন। কিন্তু এ্যাডলার তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিতে অচেতনের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন এবং শিশুর নিজস্ব প্রত্যাশা ও বাস্তবের মধ্যে অসামঞ্জস্যকেই অপসঙ্গতির কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। এ্যাডলার শিশুর মানসিক অপসঙ্গতির চিকিৎসার সময় অচেতন উদ্‌ঘাটনের পদ্ধতি অনুসরণ করেন না। তিনি শিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সামনাসামনি আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে তার মনের দ্বন্দ্বটির প্রকৃত স্বরূপ জানবার চেষ্টা করেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে এ্যাডলারের ব্যাখ্যায় অপসঙ্গতির কারণ হল শিশুর মধ্যে হীনমন্যতার সৃষ্টি। বস্তুত শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি তখনই সৃষ্টি হয় যখনই তার নিজস্ব শক্তি সম্পর্কে ধারণা এবং তার বাস্তব সামর্থ্যের মধ্যে ব্যবধান বা বৈষম্য বিরাট হয়ে তার কাছে দেখা দেয়। ইয়ুঙ, এ্যাডলার এবং তাঁদের অনুগামীদের চিকিৎসা পদ্ধতিকে আমরা প্রবোধন (Persuasion) নাম দিতে পারি। বর্তমানে বহু আধুনিক মনশ্চিকিৎসক এই প্রবোধন পন্থায় শিশুর অপসঙ্গতির চিকিৎসা করে থাকেন।

সাম্প্রতিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকায় মনোবিকারের বহু চিকিৎসক দেখা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে বেশ বড় একটি দলই ফ্রয়েডীয় পন্থায় পুরোপুরি বিশ্বাসী নন। কিন্তু তাঁরা সকলেই ফ্রয়েডের অচেতন মনের তত্ত্বটির কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্জন করে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং অচেতন উদ্‌ঘাটনকে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার প্রধান একটি অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

গ। আচরণ নিয়ন্ত্রণ

বহু অপসঙ্গতির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রবোধন বা পরামর্শদানের দ্বারাই স্থায়ীভাবে ব্যাধির নিরাময় করা সম্ভব হয় না। নিরাময়কে স্থায়ী করতে হলে শিশুর আচরণকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করারও প্রয়োজন দেখা দেয়। অনেক সময় শিশু তার মানসিক ব্যাধির প্রকৃত কারণটি উপলব্ধি করতে পারলেও

বাঞ্ছিত বা উপযুক্ত আচরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে নিজে থেকে কোন সুপরিকল্পিত আচরণধারা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। এই সব ক্ষেত্রে চিকিৎসককে শিশুর আচরণ সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় এবং সে যাতে সুনির্দিষ্ট একটি আচরণধারা অনুসরণ করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা চিকিৎসককেই অবলম্বন করতে হয়। অবশ্য চিকিৎসকের একার পক্ষে শিশুর আচরণধারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তার জন্য শিশুর পিতামাতা, শিক্ষক এবং আর সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

মনে করা যাক কোন একটি শিশুর লেখাপড়ায় উৎকর্ষ প্রদর্শনের মত যথেষ্ট মানসিক শক্তি নেই। তার ফলে যে ব্যর্থতা সে বোধ করে তা থেকে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং সে অপসঙ্গতিমূলক আচরণের আশ্রয় নেয়। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যে আত্মপ্রতিষ্ঠা সে লাভ করতে পারল না সেই আত্মপ্রতিষ্ঠা সে আদায় করল হয় মিথ্যা গর্ব আস্ফালন করে বা নিজের নানা কল্পিত সাফল্যের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। চিকিৎসক তার এই অপসঙ্গতিমূলক আচরণের যথার্থ কারণটি যদি তার সামনে প্রকাশ করেন তাহলে তার অপসঙ্গতি কিছু পরিমাণে দূর হবে সন্দেহে নেই কিন্তু তার মানসিক দ্বন্দ্ব বা ব্যর্থতার বোধ তার দ্বারা লোপ পাবে না।। এর জন্য প্রয়োজন লেখাপড়া ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে সে যাতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পন্থার নির্দেশ দেওয়া। শিশুটির প্রকৃতিদত্ত শক্তি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে যে লেখাপড়া ছাড়া আর অন্য কোন্ ক্ষেত্রে তার দক্ষতা আছে এবং তাকে সেই পথে পরিচালিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দেখা যায় যে শিশুটির খেলাধূলায় পারদর্শিতা দেখাবার ক্ষমতা আছে বা অভিনয় বা অন্য কোন শিল্পে সহজাত নৈপুণ্য আছে তাহলে তাকে সেই পথে পরিচালিত করে আর সকলের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে তাকে সাহায্য করতে হবে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটির অপসঙ্গতি চলে যাবে। এইভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে তার অপসঙ্গতির প্রকৃত নিরাময় করা সম্ভব হবে।

খেলাভিত্তিক চিকিৎসা (Play Therapy)

ছোট শিশুর ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসার সাধারণ পদ্ধতিগুলি সব সময় প্রয়োগ করা যায় না। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেও তাদের মানসিক দ্বন্দ্বের যথার্থ স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। খুব ছোট ছেলেমেয়েরা ভাষার সাহায্যে তাদের

মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে না, আলাপ আলোচনা করা ত দূরের কথা। অথচ শিশুর মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব বা অপসঙ্গতি দেখা দেয় খুব অল্প বয়স থেকেই। সেজন্য খুব অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের মানসিক অপসঙ্গতি নিরাময়ের জন্য আধুনিক মনশ্চিকিৎসকগণ খেলাভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসক শিশুর খেলার মধ্যে দিয়ে মানসিক দ্বন্দ্বটির স্বরূপ নির্ধারণ করে থাকেন।

সকল মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন যে শিশুর ক্ষেত্রে খেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ আচরণ। তার মনোভাব, রুচি, আকাঙ্ক্ষা, আশা, চাহিদা সবই তার খেলার মধ্যে দিয়ে বাইরে রূপ গ্রহণ করে। মনশ্চিকিৎসকগণ অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশুকে নানা রকম খেলার সুযোগ দেন এবং তার সেই খেলার প্রকৃতি ও গতিধারা দেখে তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বটির স্বরূপ ধরতে পারেন এবং সেই মত চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেন।

সাধারণত খেলাভিত্তিক চিকিৎসায় অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশুকে বহু বিভিন্ন প্রকৃতির খেলার সামগ্রী দেওয়া হয়। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের পুতুল, বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি খেলনা, ছবি আঁকার সাজসরঞ্জাম, নানা রকমের জিনিস তৈরী করার উপযোগী মাটি বা বালি, কার্ডবোর্ড. কাঁচি, কাগজ প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে শিশুর সামনে রাখা হয় এবং সেগুলি নিয়ে তাকে যেমন খুশী খেলতে উৎসাহিত করা হয়।

খেলার মাধ্যমে মানসিক বিশ্লেষণ

খেলার মাধ্যমে শিশুর মানসিক বিশ্লেষণ প্রথম করেন ফ্রয়েড কন্যা আনা ফ্রয়েড। তাঁর সমকালীন আর একজন মহিলা মনশ্চিকিৎসকের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিনি হলেন মেলানি ক্লিন। এঁরা দুজনেই শিশুর খেলাকে মনঃসমীক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যম রূপে ব্যবহার করেছেন। আনা ফ্রয়েড এক জায়গায় লিখেছেন মনোব্যাধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা তাদের খেলার সময় অতি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কোন কোন মনোব্যাধিগ্রস্ত শিশুর ক্ষেত্রে সৃজনমূলক খেলার চেয়ে কল্পনামূলক খেলাই বেশী দেখা যায়। এ সব ক্ষেত্রে মা বাবারা প্রায়ই এই ধরনের কল্পনার আতিশয্যকে শিশুর ক্ষেত্রে একটি বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। কিন্তু অতিরিক্ত কল্পনামূলক খেলা শিশুর কোন না কোন মনোব্যাধিরই সূচনা করে থাকে এবং পরে দেখা যায় যে ঐ একই খেলা শিশু বার বার খেলে এবং তার অন্য সব কাজে ঐ খেলা বাধার সৃষ্টি করে। আনা ফ্রয়েডের এই পর্যবেক্ষণ

থেকে বোঝা যাচ্ছে যে শিশুর খেলা যে কেবলমাত্র তার মনোভাবেরই স্বরূপ ব্যক্ত করে তা নয়, তা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার একটি চিত্র পর্যবেক্ষকের কাছে তুলে ধরে।

খেলার মাধ্যমে বিশ্লেষণ পদ্ধতি আনা ফ্রয়েড এবং মেলানি ক্লিন প্রথম প্রবর্তন করেন। তাঁরা দেখলেন যে ভাষার অপরিণতির জন্য শিশু তার মনের ভাব মুক্ত অনুষঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে পারে না। এই জন্য অন্যান্য মনশ্চিকিৎসকেরা ছোট শিশুর ক্ষেত্রে মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতির প্রয়োগ অসম্ভব বলেই মনে করেন। কিন্তু আনা ফ্রয়েড, মেলানি ক্লিন ও তাঁদের অনুগামীরা খেলার মাধ্যমে শিশুর উপর মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতির প্রয়োগ করেন এবং তা থেকে অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করেন। এই খেলা-মাধ্যম বিশ্লেষণেতে শিশুকে একটি সমস্যামূলক খেলা দেওয়া হয়। শিশুর মধ্যে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতাজনিত যে প্রক্ষোভ অবরুদ্ধ হয়ে থাকে খেলার মধ্যে দিয়ে সেই অবরুদ্ধ প্রক্ষোভ মুক্তিলাভ করে এবং শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভমূলক সাম্য ফিরে আসে। যদি সম্পূর্ণ বাধাহীনভাবে শিশু তার পছন্দমত খেলার সামগ্রী নিয়ে তার খুশীমত খেলে যেতে পারে তাহলে সেই খেলার মধ্যে দিয়ে তার সমস্যার গোপন রূপটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অনেক সময় শিশুকে কোন সুপরিকল্পিত বিশেষ সমস্যামূলক খেলা দেওয়া হয়। মনশ্চিকিৎসক শিশুর সেই সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিটি দেখে তার মনোভাব ও অবদমিত ইচ্ছাটি জানতে পারেন। সময় সময় শিশুকে তিনি তার সমস্যাটির সমাধান করতে সাহায্যও করেন। আর যখন শিশু সেই সমস্যাটি সমাধান করতে সমর্থ হয় না। তখন মনশ্চিকিৎসক তার হয়ে সমস্যাটির সমাধান করে দেন। সমস্যাটির সমাধানের পর তিনি শিশুর সঙ্গে সেটি নিয়ে আলোচনা করেন এবং সে সম্পর্কে তার নিজস্ব মত ও ইচ্ছা জানতে চান।

নানারকম খেলার সামগ্রীতে ভরা চিকিৎসাগারের খেলাঘরটিতে শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বলা হয়, তুমি এগুলির মধ্যে যে কোন জিনিষ নিয়েই খেলতে পার। শিশু খেলা সুরু করে আর সেই মুহূর্ত থেকেই চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণের কাজও সুরু হয়ে যায়। প্রথমেই চিকিৎসক দেখেন যে তাঁর এই কথার উত্তরে শিশুর মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিশু উৎসাহের সঙ্গে খেলা সুরু করে, না শিশু খেলতে ইতস্তত বোধ করে। চিকিৎসক আরও পর্যবেক্ষণ করেন যে শিশুর খেলা উদ্দেশ্যহীন না উদ্দেশ্যসম্পন্ন, সৃজনমূলক না ধ্বংসমূলক। সবশেষে শিশুর খেলা থেকে চিকিৎসক নির্ণয় করার চেষ্টা করেন

যে শিশুর কোন অন্তর্নিহিত মানসিক দ্বন্দ্ব বা দুশ্চিন্তা তার খেলার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা। শিশুর খেলার মাঝে মাঝে চিকিৎসক ছোট ছোট উক্তি বা মন্তব্য করে শিশুকে তার মনোভাবটি আরও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করতে সাহায্য করেন। অনেক সময় চিকিৎসক নিজেও শিশুর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে খেলায় যোগ দেন।

বয়স্কদের চিকিৎসার সময় যেমন আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসক ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন তেমনি শিশুর খেলার মধ্যে দিয়েও শিশুর সম্পর্কে চিকিৎসক অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। শিশু অবশ্য বয়স্কদের ভাষায় কথা বলতে পারে না, কিন্তু তবু খেলার মধ্যে দিয়ে সে যা ব্যক্ত করে তা যেমনই প্রচুর, তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। শিশুব ভাষা হল প্রতীক বা চিহ্নের ভাষা। বিভিন্ন আচরণের মধ্যে দিয়ে শিশু তার বক্তব্যটি চিকিৎসকের সামনে তুলে ধরে এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকের পক্ষে সেই বক্তব্যের গূঢ়ার্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। নীচের একটি উদাহরণ থেকে খেলাভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

ডিক নামে পাঁচ বছরের একটি ছেলেকে চিকিৎসকের কাছে আনা হল। ছেলেটি সব সময় বিমর্ষ, গম্ভীর ও আত্মকেন্দ্রিক প্রকৃতির। প্রথম প্রথম সে চিকিৎসকের সঙ্গে একটিও কথা বলত না, লক্ষ্যহীনভাবে বালি নিয়ে খেলা করত কিংবা বক্সিং-র ব্যাগে এক নাগাড়ে ঘুসী মেরে যেত। পরের বার সে আঙ্গুল দিয়ে ছবি আঁকতে সুরু করল এবং কাগজেব উপর উজ্জ্বল রঙ দিয়ে বড় বড় দাগ টানতে লাগল। এইবার সে চিকিৎসকের সঙ্গে কিছু কিছু কথাবার্তা বলা সুরু করল কিন্তু তাও অত্যন্ত অল্প এবং সীমাবদ্ধ।

কিন্তু আরও কিছুক্ষণ পরে তার ভাবভঙ্গী বদলে গেল। এবার সে ভাল-ভাবেই মনশ্চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে সুরু করল। মনশ্চিকিৎসক তার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় যোগ দিলেন এবং তাকে তার নিজের খুশীমত খেলতে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

ডিক হঠাৎ একটি খেলাঘরের বাড়ীর কাছে গেল। সে তার ভেতরের পুতুলগুলি টেনে টেনে বার করতে লাগল, আর ভীষণ উত্তেজিতভাবে নিজের মনে মনে কি সব বলতে লাগল। তারপর এক সময় মার পোষাক পরা পুতুলটি টেনে বার করে খেলার বাড়ীর দেওয়ালে সজোরে ছুড়ে মেরে চিৎকার করে বলে উঠল, এইবার যাও। তার সমস্ত শরীর প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

চিকিৎসক ডিককে তাঁর কাছে সস্নেহে টেনে নিয়ে বললেন, সময় সময় মার উপর তোমার খুব রাগ হয় তাই না, ডিক। ডিক কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে চিকিৎসকের কোলে মুখ লুকোল।

উপরের দৃষ্টান্তটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে শিশুর মনের অবদমিত চিন্তাকে খেলার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত করাই হচ্ছে এই পদ্ধতিটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। শিশু যাতে বিনা দ্বিধায় তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং তার মনের দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ বা ক্রোধাত্মক চিন্তা চিকিৎসককে অকপটে জানাতে পারে তার জন্য তাকে উৎসাহিত করা হয়। এর জন্য যে বস্তুটি বিশেষ করে প্রয়োজন হয় সেটি হল শিশুর সঙ্গে চিকিৎসকের একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন। শিশু যদি চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে শেখে এবং তাঁকে সত্যকারের হিতৈষী বন্ধু বলে মনে করে তাহলে তার মনের অবদমিত চিন্তা ও প্রক্ষোভ তার কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে সে দ্বিধা করে না।

শিশুর মনের অবদমিত চিন্তা ও রুদ্ধ কামনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে তার অপসঙ্গতির চিকিৎসা করা চিকিৎসকের পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। খেলা-ভিত্তিক চিকিৎসার উপকারিতা দ্বিবিধ। প্রথমত, শিশুর খেলার মধ্যে দিয়ে তার অবদমিত প্রক্ষোভ ও আবেগ বাইরে অভিব্যক্ত করতে পারে বলে শিশুর মনের মধ্যে সমতা ও স্থৈর্য ফিরে আসে এবং তার অপসঙ্গতি অনেকখানি সেখানেই দূর হয়ে যায়। বস্তুত খেলাভিত্তিক চিকিৎসায় এই রুদ্ধ প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশই ব্যাধি নিরাময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান। দ্বিতীয়ত, অভিব্যক্ত মনোভাব ও প্রক্ষোভের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসক তার যথাযথ চিকিৎসারও আয়োজন করতে পারেন।

খেলাভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতিটি আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু পরীক্ষণের মাধ্যমে বর্তমানে ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে এর কার্য-কারিতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the methods of diagnosing and treating maladjustment in the children.

Ans. (পৃঃ ২৭৭—পৃঃ ২৮৬)

2. Describe the major characteristics of Play Therapy. What are its merits?

3. What method is followed in Play Therapy? How is the child's maladjustment analysed through play?

Ans. (পৃঃ ২৮২—পৃঃ ২৮৬)

পঁচিশ

অপসঙ্গতি প্রতিরোধের পন্থাবলী

(Precautions against Maladjustment)

অপসঙ্গতি হল শিশুর কোন মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তির ফল। চাহিদাটি অতৃপ্ত থাকার ফলে মনের মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তারই বহিঃপ্রকাশ হল অপসঙ্গতিমূলক আচরণ। অতএব ভীরুতা, আক্রমণধর্মিতা, ক্লাস পালান, মিথ্যাভাষণ, অপহরণ, যৌন-অপরাধ প্রভৃতি যে সব আচরণকে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বলে বর্ণনা করা হয়, সেগুলির কোনটিই প্রকৃতপক্ষে ব্যাধি নয়, সেগুলি হল ব্যাধির বাহ্যিক লক্ষণমাত্র। প্রকৃত ব্যাধি নিহিত থাকে মনের মধ্যে অতৃপ্ত চাহিদার রূপে। অতএব অপসঙ্গতির চিকিৎসা করতে গেলে ঐ সব লক্ষণগুলির কেবলমাত্র চিকিৎসা করলে চলবে না। অর্থাৎ শিশুর ভীরুতা ও আক্রমণধর্মিতাকে পরিবর্তিত করা কিংবা তার ক্লাস পালান, মিথ্যাভাষণ, অপহরণ, যৌন অপরাধের ইচ্ছা প্রভৃতিকে দমন করার চেষ্টা করলেই হবে না, তার মনের গভীর স্তরে নিহিত অতৃপ্ত কামনাকে তৃপ্ত করারও ব্যবস্থা করতে হবে। এক কথায় অপসঙ্গতির চিকিৎসা নিছক লক্ষণমূলক (symptomatic) হবে না' হবে উৎসমূলক। চিকিৎসা করতে হবে অপসঙ্গতির লক্ষণের নয়, অপসঙ্গতির উৎসের। শিশুর অপসঙ্গতির প্রতিরোধের জন্য পিতামাতা ও শিক্ষকদের কি করা উচিত সে সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হল।

১। সুষম খাদ্য

মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্যের অতি নিকট সম্পর্ক। শরীর যদি সুস্থ বা যথোচিত পুষ্ট না থাকে তাহলে প্রক্ষোভমূলক সাম্য বজায় থাকে না। অজীর্ণ, ক্ষুধার অভাব, খাদ্যে বিরাগ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে বিরক্তি ও অপ্রীতিকর মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে পরে জাগে অপসঙ্গতির প্রবণতা। সেজন্য সুষম খাদ্য হল মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখার সর্বপ্রথম উপকরণ। দেহের প্রয়োজনমত খাদ্যের ব্যবস্থা করলে শিশুদের শরীর সুস্থ ও সুপুষ্ট থাকবে এবং সহজে অপসঙ্গতি দেখা দেবে না।

২। ব্যায়াম

কেবল সুষম খাদ্য হলেই হবে না, শরীরের সুপুষ্টির জন্য প্রয়োজন ব্যায়াম। নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস থাকলে পরিপাচনে কোন ত্রুটি দেখা দেবে না এবং

স্বাস্থ্য সবল হয়ে উঠবে। তার ফলে শিশুদের প্রক্ষোভমূলক সাম্য অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং সহজে অপসঙ্গতি দেখা দেবে না। তাছাড়া ব্যায়ামের মধ্যে দিয়ে অপসঙ্গতিমূলক অস্থিরতা বা চঞ্চলতা উপশমিত হয়ে থাকে।

৩। বিশ্রাম

পর্যাপ্ত বিশ্রামও শিশুর মানসিক সমতা রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীরের যে সব ক্ষয় হয় সেগুলির পূরণের জন্য যেমন প্রয়োজন সুষম খাদ্যের, তেমনই প্রয়োজন বিশ্রামের। রাত্রে পর্যাপ্ত ঘুম ছাড়াও কাজের মধ্যে শিশু যাতে শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম পায় তার উপযুক্ত আয়োজন রাখতে হবে।

৪। ইন্দ্রিয়মূলক ত্রুটিহীনতা

কোন কোন ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানা কারণে ইন্দ্রিয়মূলক দোষ দেখা যায়। বিশেষ করে চোখের এবং কানের দোষ অনেকের মধ্যে থাকে এবং তার ফলে তারা ভাল করে দেখতে বা শুনতে পায় না। এই সব ছেলেমেয়েদের ক্লাসে বোর্ডের লেখা দেখতে বা শিক্ষকের পাঠ শুনতে প্রচুর অসুবিধা হয়। তার ফলে এদের মধ্যে একটি বিরক্তি ও ব্যর্থতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। এই থেকে শিশুর মধ্যে জন্ম নেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তা থেকে পরে গুরুতর অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে।

সেজন্য ছেলেমেয়েরা যাতে কোন রকম ইন্দ্রিয়ঘটিত অক্ষমতা থেকে না ভোগে, সেদিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া তাদের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উপযুক্ত চিকিৎসককে দিয়ে প্রতিটি ছেলেমেয়েকে পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে যে তাদের চোখ, কান বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার দোষ আছে কিনা এবং থাকলে সে দোষ যাতে দূর করা যায় তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ

স্কুলে বা বাড়ীতে সর্বত্রই ছেলেমেয়েরা যে পরিবেশে বাস করে সেটি যাতে স্বাস্থ্যকর হয় সেদিকে যতটা সম্ভব মনোযোগ দিতে হবে। বিশেষ করে শিশুর বিকাশমান দেহমনের জন্য পর্যাপ্ত আলো ও হাওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে দেখা দেয় প্রক্ষোভমূলক অসমতা এবং তা অপসঙ্গতির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে।

৬। জানার আগ্রহ ও কৌতূহলের তৃপ্তি

বিকাশমান শিশুর সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যে তার বাইরের জগতের বস্তুগুলি সে ভাল করে চিনতে এবং জানতে চায়। তার কৌতূহল একরকম অসীম বললেই চলে। নতুন কিছু দেখলেই সে নানারকম প্রশ্ন করে, হাত দিয়ে বস্তুটি নাড়াচাড়া করে, বস্তুটি কি তা জানতে চায়। শিশুর কৌতূহলের পরিতৃপ্তি হওয়া তার মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন তার প্রক্ষোভমূলক সুসঙ্গতির জন্য। তাছাড়া তার এই কৌতূহলকে গঠনমূলক পথে পরিচালিত করে তাকে বাঞ্ছিত আচরণ ও জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

৭। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান

প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধানের আর একটি উপায় হল শিশুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলামেশা ও ভাবের আদানপ্রদানের সুযোগ দেওয়া। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দলের সংযোগে এসে শিশুর জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হয়, মনের উদারতা বাড়ে, মানসিক সাম্য বজায় থাকে এবং ছোটখাট ঘটনা বা আঘাত তাদের মনকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না।

সামাজিক মেলামেশা অপসঙ্গতিকে দূরে রাখার একটি প্রশস্ত উপায়। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশুদের প্রাক্ষোভিক সাম্য বজায় রাখা প্রতিটি সুপরিচালিত বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অন্তর্গত হওয়া উচিত।

৮। নিরাপত্তাবোধের তৃপ্তি ও ভালবাসা

শিশুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাটি হল নিরাপত্তাবোধের তৃপ্তি। তার চারপাশে যাঁরা থাকেন তাঁরা যদি তাকে তার প্রাপ্য আদর ও আন্তরিকাতার সঙ্গে গ্রহণ করেন তাহলেই শিশু নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করে। আর যদি তাঁরা তাকে অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান করেন তা হলে তার মধ্যে জাগে নিরাপত্তাহীনতার বোধ। এর জন্য প্রয়োজন শিশুকে ভালবাসা, তাকে আপন করে নেওয়া এবং তাকে কখন মনে করতে না দেওয়া যে সে অবহেলিত বা পরিত্যক্ত। এ থেকেই শিশুর মধ্যে দেখা দেবে অতি-প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বোধ এবং তার ফলে ব্যক্তিসত্তা স্বাভাবিক পন্থায় সুষমভাবে গড়ে উঠবে। মনে রাখতে হবে যে নিরাপত্তাহীনতার অভাব শিশুর অপসঙ্গতি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারণ।

৯। স্বীকৃতিলাভ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা

শিশুর প্রক্ষোভমূলক সুসঙ্গতিবিধানের আর একটি বড় উপকরণ হল অপরের কাছ থেকে স্বীকৃতিলাভ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা। সে যে সমাজের আর দশজনের মত একজন এবং অন্যান্য সকলের মত তারও স্থান যে স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এটা শিশু যদি বুঝতে পারে তাহলে সহজে তার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয় না। আর যদি শিশু কোন না কোন দিক দিয়ে নিজের মূল্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তাহলে তার মধ্যে হীনমন্যতার বোধ জেগে ওঠে। এর জন্য প্রয়োজন শিশু যাতে অপরের কাছ থেকে তার কাজের স্বীকৃতিলাভ করে এবং যাতে সমাজের আর দশজন তাকে স্বীকার করে নেয়। অথচ সকল ছেলেই লেখাপড়ায় ভাল হতে পারে না। সেইজন্যই স্কুলের পাঠক্রমে লেখাপড়া ছাড়াও খেলাধূলা, অঙ্কন, সঙ্গীত, অভিনয়, বিভিন্ন শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েরও পর্যাপ্ত আয়োজন রাখতে হবে যাতে শিশু তার নিজস্ব প্রকৃতিদত্ত শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রটি খুঁজে পায় এবং তার অহংসত্তাকে কোন না কোন দিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

১০। অন্যান্য মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তি

এ ছাড়া শিশুদের অন্যান্য মৌলিক চাহিদাগুলিও যাতে পূর্ণতৃপ্তি লাভ করে তার আয়োজন করাই অপসঙ্গতি নিবারণের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা।

যে সব মৌলিক চাহিদার তৃপ্তি শিশুর প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক জীবনের পরিপুষ্টির জন্য অপরিহার্য সেগুলি যাতে ব্যাহত না হয় তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে সর্বাগ্রে। আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, প্রশংসা ও সমর্থনের চাহিদা, স্নেহ-ভালবাসার চাহিদা ছাড়াও স্বাধীনতা ও দায়িত্বপালনের চাহিদা, সামাজিক পরিচিতির চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা, নূতনত্বের চাহিদা, সঙ্গের চাহিদা প্রভৃতি শিশুর প্রাথমিক ও মৌলিক চাহিদাগুলি যাতে অবশ্যই তৃপ্তিলাভের সুযোগ পায় স্কুলে এবং বাড়ীতে—সর্বত্র সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এগুলির যথাযথ পরিতৃপ্তির উপর নির্ভর করছে শিশুর প্রাক্ষোভিক সমতা রক্ষা ও অপসঙ্গতির নিরাময়।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the measures that shuould be adopted to guard against maladjustment in the children.

Ans. (পৃ: ২৮৭—পৃ: ৩১০)

2. What is maladjustment ? What measures should the teachers and parents adopt to prevent its occurrence in the child ?

Ans. (পৃ: ১৫৫—পৃ: ১৫৯ + পৃ: ২৮৭—পৃ: ২৯০)

ছাব্বিশ

যৌথ মনশ্চিকিৎসা (Group Therapy)

দৈহিক চিকিৎসার মত মানসিক চিকিৎসাতেও সাধাবণত রোগীকে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। এই একক চিকিৎসার প্রথায় ব্যক্তির রোগের বিভিন্ন লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ কবা হয় এবং সেই লক্ষণগুলি অনুযায়ী চিকিৎসাব ব্যবস্থা কবা হয়। আধুনিক কালে মানসিক রোগের চিকিৎসার এমন কতবগুলি পদ্ধতি আবিষ্কার কবা হয়েছে যাতে একাধিক রোগীকে একসঙ্গে চিকিৎসা কবা হয়ে থাকে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে কয়েকজন মনশ্চিকিৎসক মানসিক রোগেব চিকিৎসার যৌথ পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তন করেন। কিন্তু গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে এবং তাব পরবর্তীকালেই যৌথ মনশ্চিকিৎসাব পদ্ধতিগুলির ব্যবহাব সুরু হয়।

যৌথ মনশ্চিকিৎসার মৌলিক নীতি

মানুষ যদিও এককভাবে জন্মায় এবং বেঁচে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন একটি সত্তা নয়। সঙ্গকামিতা, গোষ্ঠীবিশ্বস্ততা. যৌথজীবনের প্রতি আসক্তি ইত্যাদি মনোভাবগুলি একপ্রকার মানবমনের সহজাত বৈশিষ্ট্য বললেই চলে। ব্যক্তি যে গোষ্ঠী বা দলে বাস করে ব্যক্তির উপর তার প্রভাব এক প্রকার অপবিমেয়। যদি কোন কাবণে ব্যক্তি গোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে না চলতে পারে তাহলে তার মানসিক শান্তি ও নিবাপত্তাবোধ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। আর যদি ব্যক্তিকে তাব সমাজ বা গোষ্ঠী সমাদরে গ্রহণ করে নেয় তাহলে তাব মানসিক শক্তি, আত্মনির্ভবতা প্রভৃতি গুণগুলি বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। এইজন্যই ব্যক্তিমাত্রেই চায় যে সে যে দলে বাস করে সেই দলের বীতিনীতি, মান, প্রত্যাশা, লক্ষ্য প্রভৃতির সঙ্গে যাতে সে সুষ্ঠুভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পাবে। 'পৃথিবীতে কোন মানুষই একটি দ্বীপ নয়'—মানুষের সামাজিক দিকটা সম্পর্কে এই প্রসিদ্ধ উক্তিটিকে ভিত্তি করেই যৌথ মনশ্চিকিৎসার মৌলিক পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাঁরা এই যৌথ মনশ্চিকিৎসা পদ্ধতিব অনুসরণ করে থাকেন তাঁরা দলের সদস্যদের মধ্যে এমন একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার মনোভাব সৃষ্টি কবেন যার ফলে প্রত্যেকের সম্মানবোধ, আত্মসচেতনতা, আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকে। মানসিক রোগের একটা বড় লক্ষণ হল যে রোগী প্রথমেই তার আত্মবিশ্বাস ও

মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং নিজেকে দুর্বল ও অক্ষম মনে করে। যৌথ মনশ্চিকিৎসায় প্রথমেই ব্যক্তির মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস ও মানসিক কর্মদক্ষতা ফিরিয়ে আনা হয় বলে রোগের নিরাময় হতে দেরী হয় না।

গত ২০/২৫ বৎসরের গবেষণায় যৌথ মনশ্চিকিৎসার উন্নতি হয়েছে। সকল রকম মানসিক ব্যাধি, প্রক্ষোভমূলক বিপর্যয়, মনোব্যধি (Neurosis), মনোবিকার (Psychosis), সঙ্গতিবিধানের অসুবিধা, এমন কি গুরুতর অপরাধপরায়ণতার ক্ষেত্রেও যৌথ চিকিৎসা পদ্ধতিটি বিশেষ ফলপ্রদ হতে দেখা গেছে। ছোট ছেলেমেয়েদের থেকে সুরু করে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যৌথ পদ্ধতির বিশেষ কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে।

যৌথ মনশ্চিকিৎসার শ্রেণীবিভাগ

যৌথ মনশ্চিকিৎসায় রোগীকে একটি বিশেষভাবে সংগঠিত দলের মধ্যে রেখে চিকিৎসা করা হয়। কখনও রোগীর পরিচিত, কখনও অপরিচিত ব্যক্তিদের নিয়ে এই দলটি তৈরী করা হয়। দলের আকার এবং সদস্য নির্বাচনের দিক দিয়ে যৌথমনশ্চিকিৎসা পদ্ধতির কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ হতে পারে। যেমন পরিচালনামূলক যৌথ মনশ্চিকিৎসা (Directive Group Therapy), মুক্ত-প্রতিক্রিয়া বা সাক্ষাৎকারমূলক যৌথ মনশ্চিকিৎসা (Free Interaction or Interview Group Therapy), পরিবারভিত্তিক মনশ্চিকিৎসা (Family Psychotherapy) মনশ্চিকিৎসামূলক দল (Therapeutic Community)।

১। পরিচালনামূলক যৌথ মনশ্চিকিৎসা
(Directive Group Therapy)

যৌথ মনশ্চিকিৎসায় যখন চিকিৎসক দলের কার্যাবলী পূর্ণভাবে সংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করেন, তখন সেই চিকিৎসা পদ্ধতিকে পরিচালনামূলক যৌথ মনশ্চিকিৎসা বলা হয়। দলটির গঠন থেকে সুরু করে দলের কর্মসূচী, কার্যের প্রকৃতি নির্ধারণ প্রভৃতি সবই চিকিৎসকের পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে।

অতিরিক্ত মদ্যাসক্তির ফলে মানসিক অবনতি ঘটেছে এমন ব্যক্তিদের যৌথ পদ্ধতির মাধ্যমে খুব সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসা করা যায়। যারা অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তাদের নিয়ে একটি বিশেষ ধরনের দল গঠন

করা হয় এবং এই সব ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে মদ্যপানের কুফল এবং মদ্যপান ত্যাগের সুফল সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকে। তার ফলে তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং প্রক্ষোভমূলক সমর্থন গড়ে ওঠে এবং অনেকেরই মদ্যাসক্তি শেষ পর্যন্ত দূর হয়ে যায়। দেখা গেছে যে এই ধরনের মদ্যপায়ীদের দলগত চিকিৎসায় প্রায় দলের তিন-চতুর্থাংশ ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য-ভাবে উপকৃত হয়ে থাকে।

ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আর এক ধরনের মনশ্চিকিৎসামূলক দলের প্রচলন আছে। এগুলিকে মনশ্চিকিৎসামূলক সামাজিক সংস্থা (Therapeutic Social Club) বলা হয়। এই সংস্থাগুলি হল প্রকৃতপক্ষে যে সব মানসিক রোগী সবে রোগমুক্ত হয়ে উঠেছে তাদের বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত করার উপযোগী এক ধরনের মেলামেশার জায়গা বা ক্লাব বিশেষ। এই সংস্থাগুলি অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের পরিকল্পনা অনুযায়ী ও তাঁদের সতর্ক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং রোগীরা যাতে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করে সামাজিক আচাব ব্যবহার সম্বন্ধে নতুন করে শিক্ষা লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়।

সাইকোড্রামা (Psychodrama)

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জে এল মরেনো নামে একজন মনশ্চিকিৎসক সাইকোড্রামা নামে এক অভিনব যৌথ চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন।

এই পদ্ধতিতে মানসিক ব্যাধির রোগী নিজের রচিত নাটকের মধ্যে দিয়ে তার সমস্যাকে প্রকাশ করে থাকে। মরেনো একবার তাঁর বোগীদের নাটক রচনা করা এবং স্বতঃপ্রসূতভাবে অভিনয় করার সুযোগ দেন। তাতে তিনি দেখলেন যে নাটক রচনা বা অভিনয় করার সময় রোগী তার নিজের ব্যক্তিগত জগৎ, তার নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা, তাব নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব, কামনা এবং স্বপ্ন সবই তার নাটকে প্রতিফলিত করে। এই থেকে মরেনো সাইকোড্রামার পদ্ধতিটি আবিষ্কার করলেন। সাইকোড্রামা হল ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার একটি সহজ এবং শিল্পীসুলভ অভিব্যক্তি যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি যে সামাজিক সংগঠনটিতে অবস্থিত সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। এই সব নাটকে রোগীর সঙ্গে মনশ্চিকিৎসক নিজে এবং অন্যান্য রোগীরাও অভিনেতা এবং দর্শক উভয় ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। মনশ্চিকিৎসক প্রায়ই নাটকের পরিচালকরূপে কাজ

করে থাকেন। রোগীর যে সমস্যাটি নাটকের বিষয়বস্তু রূপে অভিনীত হবে মনশ্চিকিৎসকই সেই সমস্যাটি ঠিক করে দেন এবং কারা কারা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবে, কি ধরনের সংলাপ থাকবে ইত্যাদি ব্যাপারগুলিও মনশ্চিকিৎসক নির্ধারিত করেন। প্রত্যেক নাট্যাংশের পর মনশ্চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে একটি আলোচনা সভা বসে এবং তাতে সকল দর্শকই অংশ গ্রহণ করে থাকেন। সাইকোড্রামায় ব্যবহৃত দুটি বিশেষ ধরনের কৌশলের উল্লেখ করা যায়। অনেক সময় রোগীর সামনেই আর একজন ব্যক্তি রোগীর ভূমিকা অভিনয় করে। আবার কখনও রোগী নিজে তার পরিবারের একজন বিশেষ সদস্যের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং অপর এক ব্যক্তি রোগীর ভূমিকা অভিনয় করে।

২। মুক্ত-প্রতিক্রিয়া বা সাক্ষাৎকারমূলক যৌথ মনশ্চিকিৎসা

এই বিশেষ যৌথ মনশ্চিকিৎসার পদ্ধতিটিই ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের মৌলিক তত্ত্ব থেকেই প্রসূত, যদিও এটি বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তিত ও ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। ইংলণ্ডের ফাউক্স (Foulkes), আমেরিকার স্লাভসন (Slavson), স্কিলডারড (Schilderd), ওয়েণ্ডার (Wender) প্রভৃতি মনশ্চিকিৎসকগণ মুক্ত প্রতিক্রিয়ামূলক যৌথ চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন।

এই পদ্ধতিতে কয়েকজন রোগীকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয় এবং আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, মনোভাব-প্রকাশ প্রভৃতি সব দিক দিয়ে প্রত্যেককেই পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সেখানে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যাতে তারা তাদের অনুভূতি, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, স্বপ্ন, শৈশব চিন্তা, অবাস্তব কল্পনা প্রভৃতি বিনা দ্বিধায় অপরের কাছে প্রকাশ করতে পারে। এইভাবে তাদের অবরুদ্ধ প্রক্ষোভ ক্রমশ মুক্তি পাবার ফলে তাদের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব অনেক পরিমাণ কমে যায়। এবং তারা আত্মনির্ভরতা ও বিশ্বাস ফিরে পায়। বলা বাহুল্য ফ্রয়েডের মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association) এবং বিরেচনের (Catharsis) মৌলিক নীতির উপরই এই মুক্ত প্রতিক্রিয়ার পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত।

এই পদ্ধতিতে অনেক সময় রোগীদের মধ্যে আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করা হয়। সেই সভায় রোগীরা পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে। সভায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব প্রধানত দলের সদস্যদের

উপর ন্যস্ত থাকে। মনশ্চিকিৎসক সভায় উপস্থিত থাকেন বটে তবে তাঁর প্রধান কাজই হয় দলের সদস্যদের সভা পরিচালনার কাজে সাহায্য করা।

৩। পরিবারভিত্তিক মনশ্চিকিৎসা

অনেক ক্ষেত্রে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার নিজের পরিবারের মধ্যে রেখেই চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই মনোব্যাধি পরিবারের মধ্যে কোনরূপ অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া বা অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং রোগীকে তার নিজের পরিবারের মধ্যে রেখে পর্যবেক্ষণ করলে মনোব্যাধির যথার্থ কারণ নির্ণয় সহজ হয়ে ওঠে। পবিবারের মধ্যে থাকার সময় রোগীকে পর্যবেক্ষণ কবে মনশ্চিকিৎসক যে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া বা অভিজ্ঞতার জন্য ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে তা নির্ণয় করতে পারেন এবং পরিবারের সদস্যদের সে বিষয়ে সতর্ক করে দিতে পাবেন এবং প্রয়োজনমত তাঁদেরও যথাযথ পরিচালনা করতে পারেন।

পরিবাব একটি স্বাভাবিক সমাজসংগঠন। এই ধরনের সংগঠনে রোগীর প্রতিক্রিযাও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তবে সমগ্র পরিবারটিকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ সব সময় পাওয়া যায় না। সেইজন্য এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর হলেও এটিকে প্রায়ই পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

৫। মনশ্চিকিৎসামূলক দল (Therapeutic Community)

মানসিক রোগের হাসপাতালে সময় সময় মানসিক ব্যাধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে বেশ বড় একটা দল গঠন করা হয়। এই দলটিকে মনশ্চিকিৎসামূলক দল বলা হয়। এই ধরনের দলে কেবলমাত্র যে রোগীরাই থাকে তাই নয়, হাস-পাতালের কর্মীরাও এই দলেব অন্তর্ভূক্ত হন। এ সব দলের সদস্যদের মেলা-মেশার জন্য নানা ধরনের সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এবং সেই সব সম্মেলনে রোগীরা অবাধে নিজেদের মতামত ও মনোভাব প্রকাশ করেন। হাসপাতালের চিকিৎসার কর্মসূচীতে এই দলগুলি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে এবং বহুক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নেয়। এই ধরনের দলগত চিকিৎসার ফলে বোগীদের মধ্যে থেকে নির্জনতার মনোভাব চলে যায়, তাদের মধ্যে মনোবলের সৃষ্টি হয় এবং তারা অপরের সঙ্গে সুষ্ঠু ও সঙ্গতিসম্পন্ন আচরণ সম্পন্ন করতে শিখতে পারে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে যৌথ পদ্ধতি শিশু মনশ্চিকিৎসার রাজ্যে এক অসম্পূর্ণ নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছে। এই পদ্ধতিটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এটিকে এত বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ আকারে পরিকল্পনা করা যায় যে সকল রকম মানসিক ব্যাধি এবং আচরণগত বৈষম্যের ক্ষেত্রেই এটি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। এই কারণে আধুনিক মনশ্চিকিৎসকদের শিক্ষণসূচীতে যৌথ চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কতকগুলি বিশেষ মনোব্যাধির ক্ষেত্রে যৌথ পদ্ধতি ব্যক্তিগত পদ্ধতির চেয়ে অধিকতর কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে কেবলমাত্র যৌথ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে কোন মানসিক ব্যাধির সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভবপর হতে পারে না। ব্যক্তিগত চিকিৎসা পদ্ধতির সম্পূরক রূপেই যৌথ পদ্ধতিকে সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. What is Group Therapy? What are its procedures and utilities?

Ans. (পৃঃ ২৯১—পৃঃ ২৯৬)

2. Discuss the merits of Group Therapy. How many forms of Group Therapy are in use?

Ans. (পৃঃ ২৯১—পৃঃ ২৯৬)

3. Write notes on :—Psychodrama, Directive Group Therapy, Free Interaction or Interview Group Therapy, Family Therapy.

সাতাশ

বিদ্যালয় ও মানসিক স্বাস্থ্য (School & Mental Health)

আধুনিক কালে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব আগের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে গেছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার নীতি গ্রহণ করার ফলে অধিকাংশ শিশুই ছ'বৎসর বয়স থেকে স্কুলে যাওয়া সুরু করে। সহরাঞ্চলে যেখানে নার্সারি, কিণ্ডারগার্টেন প্রভৃতি শিশু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন আছে সেখানে তিন বৎসর বয়স থেকে শিশুরা বিদ্যালয়ে যায়।আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুকে পিতামাতার সঙ্গ ত্যাগ করে বৎসরের বেশ কয়েক মাস বিদ্যালয় পরিবেশে কাটাতে হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে শিশুর জীবনের প্রথম বৎসরগুলির বেশ বড় একটি অংশ বিদ্যালয়েতেই কেটে থাকে। অথচ এই সময়টাই শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনের দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই তার প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলি অসংগঠিত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে সুসংহত ও সংগঠিত হয়ে ওঠে। বহিঃপৃথিবীর সংস্পর্শে এসে এক দিকে যেমন তার জ্ঞানের পরিধি বাড়তে থাকে তেমনই তার প্রাক্ষোভিক জগৎটিও ধীরে ধীরে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে।

বাল্যকালের শেষে যখন সে যৌবনে পা দেয় তখন তার মধ্যে নানা প্রকার নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। এই চাহিদাগুলির তৃপ্তির উপরই তার প্রক্ষোভমূলক জগতের সংগঠন ও সংহতি নির্ভর করে। যদি কোন বিশেষ চাহিদা কোন কারণে ব্যাহত হয় বা অতৃপ্ত থেকে যায় তাহলে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছিতও নয়। কিন্তু শিশু যদি তার সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের কোনরূপ সমাধান করতে না পারে বা অন্তর্দ্বন্দ্বটি অতি তীব্র হয়ে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তাহলে তার প্রক্ষোভমূলক জগতে অসংগতি বা বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। একেই মনোবিজ্ঞানের ভাষায় প্রক্ষোভমূলক সমন্বয়নের অভাব বলা হয়। শিশুর মনে যখন এ ধরনের প্রক্ষোভমূলক সমন্বয়নের অভাব বা অসংগতি দেখা দেয় তখনই তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয় পরিবেশে শিশুর মধ্যে যে সব চাহিদার সৃষ্টি হয় সেগুলি যাতে যথাযথ তৃপ্তি লাভ করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রথমেই সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

এই চাহিদাগুলির মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যথা ভালবাসার চাহিদা, পরিচিতি লাভের চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা এবং সক্রিয়তার চাহিদা। এই মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদাগুলি ছোট বড় সব ছেলেমেয়ের মধ্যেই সমানভাবে দেখা যায়। শিশু যখন একটু বড় হয় তখন তার মধ্যে আরও কয়েকটি নতুন চাহিদা দেখা দেয়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্বাধীনতার চাহিদা (need for freedom), দায়িত্ব পালনের চাহিদা (need for sharing responsibility), সৃজনশীলতার চাহিদা (need for creativity), সঙ্গী বা সঙ্গিনীর চাহিদা (need for mate) এবং জীবনদর্শনের চাহিদা (need for a philosophy of life)।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে কেবলমাত্র শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু করে তুললেই বা শিক্ষাদানের আয়োজনকে সন্তোষজনক করলেই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব শেষ হয় না। শিশুর এই সব চাহিদাগুলি যাতে তৃপ্ত হবার সুযোগ পায় তারও উপযুক্ত আয়োজন করতে হবে। দেখা গেছে নানা কারণে শিশুর এই সব চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায়। ইতিপূর্বে আমরা এই ধরনের কয়েকটি কারণের আলোচনা করেছি। সেগুলি হল, ১। অনুপযোগী পাঠক্রম ২। মনোবিজ্ঞান-বিরোধী শিক্ষণ পদ্ধতি ৩। নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা ৪। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অভাব ৫। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ৬। অবাঞ্ছিত সঙ্গ বা দলের প্রভাব ইত্যাদি। (পৃঃ ৪৫—পৃঃ ৪৬ দ্রষ্টব্য)

অনুপযোগী পাঠক্রম

বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত পাঠক্রমটি শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি এবং আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচনা করা হয় নি এবং তার ফলে তার পক্ষে সেটি সন্তোষজনকভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। এর দ্বারা একদিকে যেমন তার শিক্ষার অগ্রগতি যথেষ্ট ব্যাহত হয় তেমনই বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করতে না পারার জন্য তার মধ্যে একটি মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সে নিজেকে অক্ষম, অযোগ্য এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে হেয় বলে মনে করে। বিশেষ করে যে সব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে বিশেষ কড়াকড়ি থাকে বা যে সব বাড়ীতে পিতামাতারাই লেখাপড়া নিয়ে কড়া শাসন করেন সে সব ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে এবং কালক্রমে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। আধুনিক শিক্ষাবিদদের সকলেই এই কারণে শিক্ষার্থীদের

আগ্রহ ও শক্তির বিভিন্নতা অনুযায়ী পাঠক্রম রচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

মনোবিজ্ঞান-বিরোধী শিক্ষণ পদ্ধতি

অনুপযোগী পাঠক্রম যেমন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তেমনই অবৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতির জন্যও শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে। সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে বর্তমানে প্রচুর ত্রুটি আবিষ্কৃত হয়েছে। যেসব বিদ্যালয়ে এই সকল ত্রুটি সংশোধন করা হয় না এবং পুরাতন ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতির উপরই নির্ভর করা হয়ে থাকে সে সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষার্থী শিক্ষকের বক্তব্য হয় বুঝতে পারে না কিংবা দৈনন্দিন পাঠ যথাযথ অনুসরণ করতে পারে না। ফলে তার মধ্যে ব্যর্থতার অনুভূতি দেখা দেয়। এই ব্যর্থতা থেকে কখনও কখনও তার মধ্যে দেখা দেয় আক্রমণধর্মী মনোভাব আবার কখনও বা অতিরিক্ত পলায়নধর্মী আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা। এ দুটি মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ কালক্রমে আরও গুরুতর অপরাধ-প্রবণতায় পর্যবসিত হতে পারে।

শিক্ষক বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যর্থতার প্রকৃত কারণটি জানতে না পেরে তাদের আচরণের ভুল ব্যাখ্যা করেন এবং গতানুগতিক পথে তাদের সংশোধনের চেষ্টা করেন। তার ফল ভাল ত হয়ই না, বরং শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যহীনতাকে তীব্রতর করে তোলে।

নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা

যে সব বিদ্যালয়ে কঠোর নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা প্রচলিত আছে সে সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। যে সময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে সে সময়টি তাদের দেহে মনে বিকাশ লাভের সময়। এই সময় তাদের পরিবেশটি হবে মুক্ত, বাধাহীন এবং সম্পূর্ণ পীড়নবর্জিত। কিন্তু যে সব বিদ্যালয় এখনও প্রাচীন শৃঙ্খলার আদর্শে বিশ্বাসী সে সব বিদ্যালয়ে নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলাকে সার্থক শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে মনে করা হয় এবং সেই সব বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সময় ও পদ্ধতি নির্বাচন থেকে সুরু করে খেলাধূলা, অবসরযাপন, সাধারণ চলাফেরা, কথা বলা প্রভৃতি শিক্ষার্থীর সকল প্রকার আচরণই কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

এই কঠোর নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা বহুক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে। বিশেষ করে যে সব ছেলেমেয়ে বেশীমাত্রায় সংবেদনশীল বা যারা বিশেষ ধরনের স্বকীয়তা বা সৃজনশীলতা নিয়ে জন্মে থাকে তাদের স্বাভাবিক বিকাশপ্রক্রিয়া এই ধরনের নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার জন্য বিশেষভাবে খর্ব হয়ে যায়। তার ফলে তাদের মানসিক বিকাশ অস্বাস্থ্যকর ও অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে বিদ্যালয় পরিবেশের এই ধরনের কৃত্রিম শৃঙ্খলা অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্যামূলক আচরণ এবং চরম ক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি করে থাকে। কোনও কোনও শিক্ষার্থী এই ধরনের নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অবাধ্য, নীতিহীন, শৃঙ্খলাভঙ্গকারী ইত্যাদি নামে অভিযুক্ত হয়। এই সব ছেলেমেয়ের শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে না তাদেরও মানসিক স্বাস্থ্য বেশ ক্ষুন্ন হয় এবং অনিশ্চয়তা, সংশয়, ভয় এবং নিরাপত্তার অভাববোধ তাদের ব্যক্তিসত্তাকে বিশেষভাবে পঙ্গু করে তোলে।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অভাব

পুঁথিগত বিদ্যাদানের যে পরিকল্পনাটি সাধারণ গতানুগতিক বিদ্যালয়ে অনুসরণ করা হয় সেটি যে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ শিক্ষাদানে অক্ষম একথা আজ সকলেই স্বীকার করে থাকেন। শিশুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ ও সুষম বিকাশের জন্য সম্পূরক হিসাবে সুপরিকল্পিত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা রাখা অপরিহার্য। যে সব বিদ্যালয়ে এই ধরনের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর পর্যাপ্ত আয়োজন নেই সেই সব বিদ্যালয়ে শিশুদের মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির সুসংহত বিকাশ সম্ভব হয় না। বিশেষ করে যৌবনাগমের প্রাক্কালে শিশুর মনের মধ্যে যে ব্যাপক প্রক্ষোভমূলক পরিবর্তন দেখা দেয় সেগুলির সুষ্ঠু অভিব্যক্তি উপযুক্ত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অভাবে গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। সাধারণ শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যে সব শিক্ষার্থী নিজেদের মূল্য প্রমাণিত করতে সমর্থ হয় না তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি বড় মাধ্যম হল এই সব সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী। ফলে যেখানে পর্যাপ্ত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অভাব সেখানে বহু শিক্ষার্থীর এই অতি প্রয়োজনীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় এবং কালক্রমে তার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অভাবে সক্রিয়তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা, সৃজনশীলতার প্রচেষ্টা, দায়িত্ব বহনের চাহিদা প্রভৃতি চাহিদাগুলি তৃপ্তি লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে সুপরিকল্পিতভাবে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অনুশীলনের কোনও আয়োজন নেই বললেই চলে। অতি স্বল্পসংখ্যক বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীদের খেলাধূলা, নাট্যাভিনয়, প্রদর্শনী প্রভৃতির পর্যাপ্ত আয়োজন আছে। বাকী বিদ্যালয়গুলিতে অর্থাভাবে এসবের কোনও ব্যবস্থাই হয় না। এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী চাহিদাগুলি অতৃপ্ত থেকে যায় এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে ওঠে।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ

অনুপযোগী গৃহ, স্থানাভাব, অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও চিকিৎসার অভাব প্রভৃতি কারণের জন্যও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক অপসঙ্গতি দেখা দেয়। দেহের স্বাস্থ্যের সঙ্গে মনের স্বাস্থ্যের যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। অতএব যদি বিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাস্থ্যের অনুকূল না হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে।

অবাঞ্ছিত সঙ্গ

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশের বিদ্যালয় পরিবেশটি বৃহত্তর সমাজের নানা ধরনের ভাবধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে উঠেছে। এর জন্য যেমন কিছু ভাল ফল হয়েছে তেমনই মন্দ ফলও হয়েছে। বৃহত্তর সমাজের প্রত্যক্ষ সংযোগে আসার ফলে শিক্ষার্থীরা যেমন অনেক বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়ে উঠেছে, তেমনই অনেক অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দলের সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের মধ্যে প্রতিকূল মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে। পরিণতমনা ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই মানসিকতা তাদের বিভ্রান্ত, উদাসীন এবং অনেক ক্ষেত্রে বিপথগামী করে তোলে। তার ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সমতা নষ্ট হয়ে যায়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যালয় পরিবেশে একাধিক কারণে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। অতএব শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব যথেষ্ট। যাতে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য বিদ্যালয়

কর্তৃপক্ষের কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। এই ব্যবস্থাগুলিকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা, প্রতিরোধমূলক (Preventive) এবং নিরাময়মূলক (Curative)।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার যে কারণগুলি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি দূর করাই হল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য এই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী এবং একবার মানসিক স্বাস্থ্য কোন কারণে ক্ষুণ্ণ হলে তার ফল শিক্ষার্থীর জীবনে সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে।

শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিদ্যালয় পরিবেশে যে সব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সেগুলির বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

১। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ

আমরা দেখেছি যে শিক্ষাদানের পদ্ধতি যদি বিজ্ঞানভিত্তিক না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে। এই জন্য শিক্ষাদানের পদ্ধতিটি যাতে আধুনিক প্রগতিশীল ও হয় সে বিষয়ে যত্ন নেওয়া বিশেষ কর্তব্য। শিক্ষা পদ্ধতির উপর সাম্প্রতিক কালে বহু মূল্যবান গবেষণা হয়েছে এবং কি ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন তা বিশেষজ্ঞরা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ যে তর্কবিদ্যা-নির্ভর পদ্ধতিটি (Logical Method) এতদিন শিক্ষায়তনে অনুসৃত হয়ে এসেছে এবং যেটিকে এতদিন পণ্ডিত ব্যক্তিরা নির্ভুল শিক্ষা পদ্ধতি বলে বর্ণনা করে এসেছেন আজ গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে সেই তর্কবিদ্যামূলক পদ্ধতি অপেক্ষা মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি (Psychological Method) অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটিই একমাত্র প্রযোজ্য, তর্কবিদ্যা-নির্ভর পদ্ধতিটি সেখানে মোটেই উপযোগী নয়। তেমনই পাঠ্য বিষয়বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে পড়ানোর রীতিটি হল একটি বহু প্রচলিত সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি। এটিকে বিশ্লেষক পদ্ধতি (Analytic Method) বলা হয়। কিন্তু আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে আগে সংশ্লেষক পদ্ধতি (Synthetic Method) অনুসরণ না করে প্রথমেই বিশ্লেষক পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে শিক্ষার্থীর যথাযথ শিক্ষাগ্রহণের পথে বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেজন্য

আধুনিক কালে শিক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লেষক-বিশ্লেষকের সম্মিলিত পদ্ধতি অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন। এছাড়াও শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তত্ত্ব সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পাওয়া গেছে।

শিক্ষাপদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশী। ইংরাজী, গণিত প্রভৃতি কতকগুলি পাঠ্যবিষয়ের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। ভারতীয় বিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজী যে পদ্ধতিতে শেখান হয়ে থাকে তা নিতান্তই ত্রুটিপূর্ণ। একটি ভারতীয় শিশু যেমন তার মাতৃভাষা বাড়ীর স্বাভাবিক পরিবেশে শেখে ইংরাজী ভাষা সেভাবে শেখার সুযোগ সে পায় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষক তাকে সম্পূর্ণ কৃত্রিম পরিবেশে স্বতন্ত্রভাবে এই ভাষাটি শেখান। দেখা গেছে, যে পদ্ধতি তাঁরা সাধারণত অবলম্বন করে থাকেন তাতে শিশুর শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। তার ফলে সে যেমন এই ভাষাটি ভালভাবে শিখতে পারে না তেমনি তার এই অক্ষমতার জন্যে তার মধ্যে প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতিও দেখা দেয়। গণিত শিক্ষাদানের বেলাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে গণিত শিক্ষার যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে তা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। ফলে শিক্ষার্থী এই বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করতে পারে না এবং তার ব্যর্থতাবোধ তার মনের মধ্যে প্রচুর বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ভারতীয় বিদ্যালয়-গুলিতে দেখা গেছে যে এই দুটি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা প্রায় বেশ অনগ্রসর থেকে যায়। তার মুখ্য কারণই হল ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির অনুসরণ। অতএব শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার একটি প্রধান পন্থা হল বিদ্যালয়ে আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রবর্তন।

২। উপযোগী পাঠক্রমের প্রবর্তন

শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য আর একটি অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা হল উপযোগী পাঠক্রমের প্রবর্তন। পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে তুলতে হলে যে সব বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে সেগুলির মধ্যে শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক পরিণতি, সামর্থ্য ও আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কারণে প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকে। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচুর মানসিক ও

প্রক্ষোভমূলক পরিবর্তন দেখা যায়। বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যৌবনাগম ঘটে এবং তখন তাদের জন্য পরিবর্তনশীল পাঠক্রমের প্রয়োজন।

এইসব মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে মনে রেখে পাঠক্রমটি তৈরী করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা এবং সমাজগত চাহিদা—পাঠক্রম পরিকল্পনার মাধ্যমে এ-দুয়ের মধ্যে বিশেষভাবে সমন্বয় আনতে হবে। দেখতে হবে শিশুদের ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি এবং সমাজগত চাহিদাগুলি, দুই-ই যেন পাঠক্রমের মধ্যে দিয়ে তৃপ্তিলাভ করে। বস্তুত উপযোগী পাঠক্রমের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হবে এইটিই।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম নিয়ে বহু বৎসর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত কোনও সুনির্ধারিত ও সন্তোষ-জনক পাঠক্রমের পরিকল্পনা গঠিত হয় নি। বরং সম্প্রতি যে নতুন পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে তাতে শিক্ষার্থীর বহুমুখী চাহিদাগুলি তৃপ্তিলাভ করবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একথা মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সন্তোষজনক পাঠক্রম সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

৩। পর্যাপ্ত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজন

শিক্ষার্থীর নিরুদ্ধ প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের একটি বড় মাধ্যম হল সহপাঠ-ক্রমিক কার্যাবলী। সাধারণ গতানুগতিক পাঠক্রমের ক্ষেত্রে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা তাদের প্রক্ষোভ অবদমিত করতে বাধ্য হয়। যেমন, সকল শিক্ষার্থীই লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখিয়ে শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি বা পরিচিতি লাভ করতে পারে না। কিন্তু যদি বিদ্যালয়ে তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের উপযোগী সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজন থাকে তাহলে সেই সব কার্যাবলীর মাধ্যমে তারা আর সকলের কাছে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং সেইভাবে তাদের অবরুদ্ধ বা অতৃপ্ত প্রক্ষোভের তৃপ্তি দান করতে পারে। এই কারণে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকারের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজন করা একান্ত প্রয়োজন। এই সব কার্যাবলী শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভমূলক সুসমন্বয়নে বিশেষ সাহায্য করে থাকে।

৪। সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি

বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে যদি সত্যকারের সমাজধর্মী করে তোলা যায় তাহলে শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভমূলক সুসমন্বয়ন সহজেই সংঘটিত হয়। যে সব

ছেলেমেয়ে নিঃসঙ্গ পরিবেশে মানুষ হয় তাদের প্রক্ষোভের বিকাশ সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যসম্মত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে ভারসাম্যের অভাব দেখা যায়। কিন্তু বিদ্যালয়ে যদি প্রকৃত সামাজিক পরিবেশ থাকে তাহলে তাদের প্রক্ষোভের এই অসম বিকাশ ঘটতে পারে না এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের প্রক্ষোভের সংগঠন সুষ্ঠু ও সুষম হয়ে ওঠে। এইজন্য বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক মেলামেশা, ভ্রমণ, বিতর্ক, সম্মেলন প্রভৃতির আয়োজন করতে হয় যাতে শিক্ষার্থীরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে বিনা বাধায় নিজেদের বিভিন্ন প্রাক্ষোভিক অনুভূতিকে অভিব্যক্ত করতে পারে।

৫। ব্যক্তিগত মনোযোগ দান

বিদ্যালয়ে যেমন সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার, তেমনই আবার ব্যক্তি মানুষ রূপে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব চাহিদাগুলি যাতে মেটে তার ব্যবস্থাও করা দরকার। সামাজিক মেলামেশার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক সত্তার চাহিদা পূর্ণ হলেও একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি রূপে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব চাহিদা সেখানে তৃপ্তি লাভ করে না। তার জন্য আরও বিশেষ ধরনের আয়োজন ও পরিবেশের প্রয়োজন। এ প্রয়োজন ঠিকমত না মিটলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তা যান্ত্রিক ও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

এই প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর্দর্শ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে ভাল করে জানাটা বিশেষ দরকার। যে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে ভাল করে জানেন না, শিক্ষার্থীর চাহিদা, মানসিকতা, চিন্তার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির সঙ্গে যে শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই সে শিক্ষক কখনই শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সুবিচার করতে পারেন না। তাঁর শিক্ষাদান কখনই শিক্ষার্থীর চিন্তা এবং আচরণের ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় না। অতএব শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে হবে এবং তাদের প্রত্যেককে তিনি ভাল করে জানবেন। যদি কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে কোনও কারণে প্রক্ষোভমূলক বৈকল্য বা অসঙ্গতি দেখা দেবার সম্ভাবনা ঘটে তাহলে শিক্ষক আগে থেকেই তার জন্য যথাযথ প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠনে সাহায্য করতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ককে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ করে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন

অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে হবে, তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব চাহিদা আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং যখনই প্রয়োজন হবে সহৃদয়তা ও সহানুভূতির সঙ্গে তাদের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাবলী (Curative Measures)

শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কি ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে সে সব ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার অর্থ হল প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি দেখা দেওয়া এবং তা প্রকাশ পায় নানা প্রকার আচরণ সমস্যার রূপে। পড়াশোনা ঠিকমত না করা, ক্লাস পালানো, শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হওয়া, নিয়ম-কানুন না মানা, মিথ্যাকথা বলা, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এ সব ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে প্রয়োজন বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা ও বিশেষ প্রকৃতির চিকিৎসা পদ্ধতি। সহজ প্রকৃতির ও স্বল্পমাত্রার আচরণ বৈষম্যের চিকিৎসা করা সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষধর্মী জ্ঞান ও শিক্ষা ছাড়া এই ধরনের মানসিক অসঙ্গতির নিরাময় করা সম্ভব নয়। এর জন্য সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হল শিশু পরিচালনা-গারের (Child Guidance Centre) সাহায্য নেওয়া। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে শিশুদের মানসিক অসঙ্গতির কারণ বিশ্লেষণ করে সেটির নিরাময়ের আয়োজন করা হয়। এতে উচ্চশিক্ষিত মনোবিজ্ঞানী ও মনশ্চিকিৎসক থাকেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের ভাল করে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে তাদের যথাযথ চিকিৎসার আয়োজন করেন। আমাদের দেশে অবশ্য এই ধরনের শিশু পরিচালনাগারের অস্তিত্ব একপ্রকার নেই বললেই চলে। এটি অবশ্যই দুঃখের কথা। যে দেশের বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা কয়েক কোটির উপর সে দেশে ছেলেমেয়েদের মানসিক সমস্যার সমাধানে সাহায্য করার জন্য কোনও বিশেষ সংস্থা বা ব্যক্তির ব্যবস্থা থাকা যে একান্ত প্রয়োজন একথা বলা বাহুল্য।

বিদেশের প্রগতিশীল দেশগুলিতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ই কোন না কোন শিশু পরিচালনাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে এবং কোনও শিক্ষার্থীর মধ্যে কোনও রূপ

মানসিক বিকলতা বা প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি দেখা দিলে ঐ শিশু পরিচালনাগারে তাকে পাঠান হয়ে থাকে। সেখানকার বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুযায়ী শিক্ষার্থীটির মানসিক বিকারের নিরাময়ের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও পিতামাতা প্রয়োজনীয় যথাযথ প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন।

আমাদের দেশে পূর্ণাঙ্গ শিশু পরিচালনাগারের অভাবে সব বিদ্যালয়েই মনশ্চিকিৎসক (Psychiatrist) বা সুমন্ত্রকের (Counsellor) সাহায্য নেওয়ার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য। সঙ্গতিসম্পন্ন বিদ্যালয়গুলি এই ধরনের কোনও বিশেষজ্ঞকে বিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করতে পারে। আর যে সব বিদ্যালয়ের সে সঙ্গতি নেই সেগুলি যৌথভাবে কোনও বিশেষজ্ঞের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে পারে এবং প্রয়োজন হলে সেই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঐ বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাতে পারে। বলা বাহুল্য আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির আর্থিক সঙ্গতি এতই দুর্বল যে এ ব্যাপারে সরকারের অগ্রণী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সরকারী শিক্ষা বিভাগ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জন্য এক জন করে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবেন এবং ঐ অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি তাদের শিক্ষার্থীদের সমস্যার ব্যাপাবে ঐ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা সত্ত্বেও শিশুপরিচালনাগাবের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটে না। এমন অনেক জটিল ক্ষেত্র আছে যেখানে পূর্ণাঙ্গ শিশু পরিচালনাগারেব সাহায্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সেই কারণে সমগ্র রাজ্যে কয়েকটি শিশু পরিচালনাগার স্থাপনের দায়িত্ব সরকারকে অবশ্যই নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যটিকে কয়েকটি বড় বড় অঞ্চলে বিভক্ত করে নিলেও কম কবে অন্তত চাব পাঁচটি শিশু পরিচালনাগার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য অবিলম্বে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

মানসিক বিকার একবার দেখা দিলে তার চিকিৎসার জন্য বিশেষধর্মী মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আমরা জানি যে সকল প্রকার মানসিক অসঙ্গতির মূলেই আছে কোনও না কোনও গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার অতৃপ্তি। এই চাহিদাটির পরিষ্কার রূপ বাইরে থেকে বোঝা যায় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নিজেরও অজানা থাকে। সেই জন্য সাধারণ ভাবে যাঁরা বিশেষজ্ঞ নন তাঁদের দ্বারা এই সব মনোবিকারের চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না।

এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে অচেতন মনে সাধারণত এই সব কারণ

নিহিত থাকে সেই অচেতন মন থেকে অতৃপ্তির কারণগুলি অনুসন্ধান করে বার করতে হয়। এর জন্য বিশেষজ্ঞদের নানা পদ্ধতির অনুসরণ করতে হয়। ক্ষেত্র অনুযায়ী বিশেষজ্ঞরা সাধারণ আলাপ-আলোচনা থেকে সুরু করে মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতি (**Free Association Method**) পর্যন্ত অবলম্বন করে থাকেন।[১]

প্রশ্ন

1. What do you mean by mental health ? Indicate the responsibility of the school in preserving the mental health of its children.

Ans. (পৃঃ ৭ – পৃঃ ৮) + (পৃঃ ২৯৭—পৃঃ ৩০৮)

১। পৃঃ ১৭০ দ্রষ্টব্য

আঠাশ

শিশু পরিচালনাগারের কর্মীদের কার্যাবলী

একটি শিশু পরিচালনাগারে তিন শ্রেণীর কর্মীর সহায়তা অপরিহার্য, মনোবিজ্ঞানী, সামাজিক কর্মী ও মনশ্চিকিৎসক। এদের প্রত্যেকের কাজই বিশেষধর্মী এবং তিনজনের মিলিত ও সুসংহত কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারাই শিশুর পরিচালনার কাজটি নির্বাহ হয়ে থাকে। নীচে এই তিন শ্রেণীর কর্মীর কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল।

(ক) মনোবিজ্ঞানীর কার্যাবলী

প্রথম যখন শিশুকে পরিচালনাগারে আনা হয় তখন তার সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করার দরকার হয়। এই কাজের প্রথম সোপান হল শিশুর একটি সর্বাঙ্গীণ মনশ্চিকিৎসামূলক পরীক্ষা ও পরিমাপ করা। এই প্রয়োজনীয় কাজটির ভার নেন মনোবিজ্ঞানী।

প্রথমেই তিনি শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ করেন। তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে শিশুটি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, না বুদ্ধির দিক দিয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের থেকে ভিন্ন অর্থাৎ শিশুটি স্বল্পবুদ্ধি কিংবা উন্নতবুদ্ধি। শিশুর এই বুদ্ধির পরিমাপ তার সমস্যা নির্ণয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধির মাত্রার উপর অনেক সমস্যার প্রকৃতি নির্ভর করে। স্বল্পবুদ্ধি শিশুদের ক্ষেত্রে যেমন কতকগুলি বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়, তেমনই আবার উন্নতবুদ্ধিদের ক্ষেত্রে অন্য কতকগুলি বিশেষ ধরনের সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। সেইজন্য শিশুর সমস্যার প্রকৃতি নির্ণয়ন ও নিরাময় করার আগেই তার বুদ্ধির পরিমাপ করা বিশেষ প্রয়োজন।

বুদ্ধির পরিমাপের জন্য নানা রকমের অভীক্ষার ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রসিদ্ধ বিনে-সাইমন স্কেলটি বর্তমানে নিম্নতম দু'বৎসর বয়স থেকে সুরু করে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা যায়। এছাড়া ওয়েক্সলার বেলেভিউ অভীক্ষাটিও এজন্য যথেষ্ট উপযোগী। শেষোক্ত অভীক্ষাটি ছোট ছেলেমেয়েদের উপর প্রয়োগের উপযোগী একটি বিশেষ সংস্করণও আছে।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ভাষামূলক অভীক্ষা প্রয়োগ করায় অনেক অসুবিধা থাকে। একটু পরিণতবয়স্ক ছেলেমেয়ে না হলে ভাষামূলক অভীক্ষার প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায় না। তাছাড়া ভারতের ক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় ভাষায় এই দুটি অভীক্ষার নির্ভরযোগ্য সংস্করণও পাওয়া যায় না। সেইজন্য ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সম্পাদনী অভীক্ষা

প্রয়োগ করার প্রথা প্রচলিত হয়েছে। এগুলি ভাষাবর্জিত হওয়ার জন্য সব দেশের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা সম্ভব। এই ধরনের বহুল প্রচলিত ভাষাবর্জিত অভীক্ষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম হল—নানা ধরনের ফর্মবোর্ড, কোহ্‌'র ব্লক ডিজাইন, আলেকজাণ্ডারের পাশ-এ্যালংগ, পোর্টিয়াসের গোলকধাঁধাঁ, হিলির পাজ্‌ল ইত্যাদি। গুডএনাফের 'মানুষ আঁকার' অভীক্ষাটিও ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এছাড়া পিণ্টনার প্যাটারসনের সম্পাদনী অভীক্ষা, র‍্যাভেনের প্রগ্রেসিভ ম্যাট্রিসেস টেষ্টও ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বুদ্ধি পরিমাপের পর মনোবিজ্ঞানীর কাজ হল শিশুর ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করা। এই কাজটির উপর শিশুর সমস্যার নির্ণয় ও চিকিৎসার প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে। ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের অর্থ হল শিশুর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে কোন্ কোন্ সংলক্ষণগুলি শক্তিশালী ও কোন্ কোন্ সংলক্ষণগুলি দুর্বল তা নির্ণয় করা। শিশুর ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির প্রকৃতি ও মাত্রার সঙ্গে শিশুর সমস্যার প্রকৃতি ও মাত্রা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বস্তুত শিশুর সমস্যামাত্রকেই আমরা শিশুর ব্যক্তিসত্তার সমস্যা বলে বর্ণনা করতে পারি। অধিকাংশ শিশু সমস্যাই তার ব্যক্তিসত্তার অসম সংগঠন থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেইজন্য শিশুর সমস্যার স্বরূপ যথাযথ নির্ণয় করতে হলে তার ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির প্রকৃতি ও মাত্রা পরীক্ষা করে দেখা অপরিহার্য। ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ পরিমাপের জন্য নানা ধরনের অভীক্ষা আজকাল তৈরী হয়েছে যে সব অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীকে প্রদত্ত প্রশ্নাবলীর লিখিত উত্তর দিতে হয়, সেগুলি ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবু কয়েকটি ছোট ছোলমেয়েদের জন্য বিশেষভাবে গঠিত ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবলী পাওয়া যায়। তার মধ্যে ইপাট পার্সোনালিটি ইন্‌ভেণ্টারিটির নাম করা যায়। এই কারণেই শিশুর ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের জন্য মনোবিজ্ঞানীরা সাধারণত প্রতিফলন অভীক্ষারই (Projective Test) ব্যাপক ব্যবহার করে থাকেন। এগুলিতে লেখার কাজ নেই বা থাকলেও অল্প। এগুলির সাহায্যেই মনোবিজ্ঞানী শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। এই ধরনের অভীক্ষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রর্সা ইঙ্কব্লট টেষ্ট, শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা, কাহিনী সংবোধন অভীক্ষা (TAT) ইত্যাদি। শেষোক্ত অভীক্ষাটির একটি বিশেষ শিশু সংস্করণ (CAT) পাওয়া যায়। এছাড়া শিশুদের ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের জন্য রোজেন-

উইগ পিকচার-ফ্রাষ্ট্রেসন ষ্টাডি (Rosenweig Picture-Frustration Study), বাক্য সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা, টয় টেষ্ট (Toy Test), ওয়ার্ল্ড টেষ্ট (World Test) প্রভৃতির ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। শিশুদের মধ্যে মনোব্যাধিমূলক প্রবণতা আছে কিনা তা পরিমাপের জন্যও অভীক্ষা পাওয়া যায়।

ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের পর শিশুর আগ্রহ ও মনোভাব পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়। শিশুর সমস্যার সঙ্গে এই দুটি বস্তুর বিশেষ সম্পর্ক আছে। কোন্ ধরনের কাজ বা বস্তুর প্রতি শিশুর আগ্রহ আছে তা জানা গেলে শিশুর সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় করা সহজ হয়ে ওঠে। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি ও ভাবধারার প্রতি শিশুর কি ধরনের মনোভাব তা জানার জন্য মনোবিজ্ঞানীকে তার মনোভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার দরকার হয়। এই মনোভাবের সংগঠনের উপর শিশুর সমস্যার প্রকৃতি ও মাত্রা অনেকখানি নির্ভরশীল।

আগ্রহ ও মনোভাব, এ দুটি বস্তু পরিমাপের জন্যও নানা ধরনের আধুনিক অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব অভীক্ষারও আবাব বিশেষ ধরনের শিশু-সংস্করণ পাওয়া যায়। মনোবিজ্ঞানী সেই সব অভীক্ষার সাহায্যে শিশুর আগ্রহ ও মনোভাবের পরিমাপ করে থাকেন।

শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে কোন্ ধরনের সঙ্গতিবিধান করতে সক্ষম হয়েছে তা পরিমাপ করারও অভীক্ষা পাওয়া যায়। বেলে'র সঙ্গতিবিধান অভীক্ষার শিশু-সংস্করণটির সাহায্যে শিশু তার পরিবেশের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে কতটা সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পেরেছে মনোবিজ্ঞানী তার পরিমাপ করতে পারেন।

অনেক সময় শিশুর দক্ষতার পরিমাপ করারও দরকার পড়ে। শিশুর অনেক সমস্যাই তার শিক্ষা-ঘটিত অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। শিশুর স্বভাবগত দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে শিশুর পাঠ বিষয় নির্ধারিত করলে তার মধ্যে সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে তার প্রকৃতিগত দক্ষতার স্বরূপ জানার দরকার হয়। এই জন্য মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন দক্ষতার অভীক্ষার প্রয়োগ করে শিশুর দক্ষতার স্বরূপ নির্ণয় করে থাকেন।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞানী শিশুর বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যগুলির স্বরূপ ও মাত্রা নির্ণয় করে তাঁর বিবরণী তৈরী করেন। এই মনোবৈজ্ঞানিক বিবরণীকে ভিত্তি করে মনশ্চিকিৎসক শিশুর সমস্যা ও ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয় করেন এবং তার সমাধান ও চিকিৎসার প্রণালী স্থির করে থাকেন।

এই বিবরণী তৈরী করেই মনোবিজ্ঞানীর কাজ শেষ হয় না। শিশুর সমস্যার পরীক্ষা ও চিকিৎসা চলাকালীনও মনোবিজ্ঞানীর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। মনশ্চিকিৎসক যখন শিশুকে পরীক্ষা করেন এবং তার সমস্যা বা ব্যাধির লক্ষণগুলি দূর করার চেষ্টা করেন তখনও মনোবিজ্ঞানীর যথেষ্ট সাহায্যের প্রয়োজন হয়। শিশুকে পরীক্ষা করার সময় তার মধ্যে নতুন আচরণবৈশিষ্ট্য বা নতুন লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। সে সময় মনোবিজ্ঞানীকে শিশুর সেই নতুন আচরণবৈশিষ্ট্য বা নতুন লক্ষণের ব্যাখ্যা দিতে হয়। সাধারণত যে সব শিশুদের মধ্যে আচরণসমস্যা দেখা দেয় তাদের মধ্যে একটা প্রতিরোধ প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে থাকে অর্থাৎ সাধারণ প্রচলিত অভীক্ষাবলীর সাহায্যে সব সময়ে তাদের ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রকৃত পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। এই সব ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রণালীর একটা প্রধান সোপান হল শিশুর এই প্রতিরোধ-প্রবণতা দূর করা এবং এ ব্যাপারে মনশ্চিকিৎসক ও মনোবৈজ্ঞানিককে যৌথভাবে কাজ করতে হয়।

(খ) সামাজিক কর্মীর কার্যাবলী

শিশু পরিচালনাগারের সামাজিক কর্মীর কাজ হল শিশুর নিজস্ব সামাজিক পরিবেশে শিশুর সম্পর্ক, স্থান ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করা। শিশুর সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে কেবলমাত্র শিশুর অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যাবলীর পরিমাপ করলেই চলবে না, সেই সঙ্গে বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার কি ধরনের সম্পর্ক বর্তমান তা জানাও দরকার। এটি একটি সুপ্রমাণিত সত্য যে অধিকাংশ শিশুসমস্যারই সৃষ্টি হয় পরিবেশের সঙ্গে শিশুর সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের অক্ষমতা থেকে। শিশুর গৃহপরিবেশে ভাইবোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং বিদ্যালয় পরিবেশে তার সহ-শিক্ষার্থী, শিক্ষক প্রভৃতিদের সঙ্গে শিশুর সঙ্গতিবিধানের কোন না কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বা আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা থেকেই শিশুর মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব শিশু তার জীবনযাত্রার পথে যে সব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সঙ্গে আদান-প্রদান করে এসেছে তাদের সকলের সম্পর্কেই শিশুর প্রতিক্রিয়ার একটি সুস্পষ্ট বিবরণী মনশ্চিকিৎসকের জানা দরকার। আর এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সংগ্রহ করার দায়িত্ব হল সামাজিক কর্মীর।

সামাজিক কর্মী প্রধানত শিশুর গৃহপরিবেশ ও বিদ্যালয় পরিবেশের সঙ্গে

প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি প্রথমে শিশুর পিতামাতা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাদের কাছ থেকে শিশুর সম্বন্ধে প্রাপ্তব্য সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করেন। সামাজিক কর্মী শিশুর শারীরিক, মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক বিকাশের প্রকৃতি ও গতিপথ সম্বন্ধে বিশদ্ তথ্যাদি তাঁর বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেন। শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়ার পথে কোনরূপ অস্বাভাবিক বা দুর্ঘটনামূলক কিছু ঘটেছে কিনা, সে কোনরূপ আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল কিনা, তার পিতামাতা তার প্রতি কি ধরনের আচরণ করেন, তার মৌলিক চাহিদাগুলি কতদূর তৃপ্ত হয়েছে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সামাজিক কর্মী শিশুর পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনার মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। সামাজিক কর্মী শিশুর গৃহপরিবেশের প্রকৃতি সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করেন এবং শিশুর গৃহের চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশ সম্বন্ধেও বিশদ্ বিবরণ সংগ্রহ করেন।

গৃহ পরিবেশের পর আসে বিদ্যালয় পরিবেশ। সামাজিক কর্মী শিশুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রধানশিক্ষক ও সহশিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং শিশুর আচরণ, চরিত্রবৈশিষ্ট্য, অভ্যাস, মনোভাব, আগ্রহ প্রভৃতি সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। তিনি শিশুর সমস্যা সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত সংগ্রহ করেন।

বিদ্যালয় পরিবেশের পর শিশু বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে প্রবেশ করে। শিশু যত বড় হয় ততই গৃহ ও বিদ্যালয়ের বাইরের বহির্বিশ্বের পরিবেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই পরিবেশও ধীরে ধীরে শিশুর ব্যক্তিসত্তার উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করে এবং অনেক ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে সমস্যার সৃষ্টির কারণ হয়েও দাঁড়ায়। অতএব শিশুর বহির্জগতের যাদের সঙ্গেই তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সামাজিক কর্মীকে তাদের সকলের সঙ্গেই যোগাযোগ স্থাপন করতে হয় এবং শিশুর উপর তাদের কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হতে হয়। এক কথায় শিশুর অতীত জীবনের বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে একটি সুসম্পূর্ণ জীবন ইতিহাস গঠন করাই হল সামাজিক কর্মীর কাজ। এই কাজের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত বলে অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক সামাজিক কর্মীর সহায়তার প্রয়োজন হয়।

সামাজিক কর্মী শিশুর সম্বন্ধে যে সব তথ্যাদি সংগ্রহ করেন সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেওয়া হল। যথা—

(১) পরিবারের সদস্য, তাদের পরিচয় ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা (২) পরিবারের শিক্ষার মান, আদর্শ ও মর্যাদা (৩) শিশুর স্বাস্থ্যঘটিত তথ্যাদি (৪) তার যৌন বিকাশের বিবরণ (৫) তার প্রক্ষোভগত বিকাশ (৬) তার সামাজিক ও আচরণমূলক বিকাশ এবং (৭) বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক ইত্যাদি।

(গ) মনশ্চিকিৎসকের কার্যাবলী

শিশু পরিচালনাগারের প্রধান তিন শ্রেণীর কর্মীর প্রত্যেকেরই কাজ যথেষ্ট মূল্যবান হলেও তুলনামূলক ভাবে মনশ্চিকিৎসকেরই কাজটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলা চলে। তার প্রধান কারণ হল যে শিশুর সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যানের সর্বশেষ সমন্বয় সাধন করে সেই সমস্যাটির সমাধানের পন্থা নির্ণয় করার দায়িত্ব থাকে মনশ্চিকিৎসকের উপরই। শিশুর বুদ্ধি, ব্যক্তিসত্তা, আচরণধারা, মানসিক শক্তি, দক্ষতা, আগ্রহ প্রভৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত যে সব তথ্য মনোবিজ্ঞানী আহরণ করেন এবং শিশুর সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কিত যে সব তথ্য সামাজিক কর্মী সংগ্রহ করে আনেন সে সবগুলিকে বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যান করে মনশ্চিকিৎসক শিশুর সমস্যার প্রকৃত কারণ ও উপযুক্ত চিকিৎসাপ্রণালী নির্ধারণ করেন। এই কাজের জন্য মনশ্চিকিৎসকের যথেষ্ট বিশেষধর্মী শিক্ষা থাকা দরকার। মনোবিজ্ঞানী ও সামাজিক কর্মীর সংগৃহীত তথ্যাবলীকে ভিত্তি করে মনশ্চিকিৎসক শিশুকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁর বিশেষধর্মী শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিশুর সমস্যার প্রকৃত কারণটি খুঁজে বার করেন। মনশ্চিকিৎসক এই উদ্দেশ্যে শিশুকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করেন। মনশ্চিকিৎসক তাকে নানা রকম প্রশ্ন করেন এবং তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তার মনোভাব জানার চেষ্টা করেন। প্রয়োজন হলে শিশুর চারপাশে একটি সুপরিকল্পিত পরিবেশের সৃষ্টি করে তিনি শিশুর প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন।

মনশ্চিকিৎসকের কাজকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম, শিশুর সমস্যার স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় এবং দ্বিতীয়, সেই সমস্যার সমাধান করা বা নিরাময়ের পন্থা নির্ধারণ করা। এই প্রথম কাজটি মনশ্চিকিৎসক নানাভাবে সম্পন্ন করে থাকেন। মনশ্চিকিৎসক কোন্ পন্থায় শিশুর সমস্যার স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় করবেন তা নির্ভর করে শিশুর বয়স এবং তার সমস্যার প্রকৃতির উপর। শিশু যদি বড় হয় এবং মনশ্চিকিৎসকের প্রশ্নের উত্তর দিতে

সক্ষম হয় তাহলে মনশ্চিকিৎসক প্রত্যক্ষ প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে তার সমস্যার স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। আরও বড় হলে তার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে তার সমস্যাটি কি এবং কেনই বা সৃষ্টি হয়েছে তা জানার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিশু যদি অল্প বয়সের হয় তাহলে এ পন্থায় তার সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তখন সাধারণত মনশ্চিকিৎসক খেলাভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতিতে মনশ্চিকিৎসক খেলায় ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় শিশুর খেলার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে তার সমস্যার স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় করেন। তাছাড়া আজকাল নানা ধরনের আধুনিক অভীক্ষার সাহায্যে শিশুর সমস্যার স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

সমস্যার স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় করার পরের সোপান হল তার নিরাময়ের পন্থার নির্ধারণ করা। যে সব মনশ্চিকিৎসক ফ্রয়েডীয় অচেতন-তত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁদের মতে শিশুর মনের অভ্যন্তরে নিহিত অচেতন থেকে শিশুর সমস্যার কারণটি বাইরে টেনে বার কবে আনতে পাবলেই শিশুর সমস্যা দূর হয়ে যায় এবং সেইটাই হবে তার সমস্যা সমাধান করার প্রকৃত পন্থা। আর যাঁরা অচেতন-তত্ত্বে এতটা বিশ্বাসী নন বা আংশিক বিশ্বাসী তাঁরা শিশুর সমস্যার চিকিৎসার জন্য নানা পন্থার উদ্ভাবন করেছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিশুর সমস্যার কারণটিকে অপসারিত করা, যে পরিবেশ থেকে শিশুর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিবেশের পরিবর্তন করা, বিভিন্ন ধরনের যৌথ ও সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টায় তাকে ব্যাপৃত রেখে তার হীনমন্যতার অনুভূতি দূর করা, তার প্রক্ষোভমূলক সমন্বয়ন যাতে আরও সুসংহতভাবে সম্পন্ন হয় তা দেখা ইত্যাদি। এই বিভিন্ন পন্থাগুলি শিশুর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যে যথেষ্ট কার্যকর তা বিভিন্ন মনশ্চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা থেকে সুপ্রমাণিত হয়েছে। একথা সকল মনশ্চিকিৎসকই স্বীকার করেন যে শিশুর অধিকাংশ সমস্যাই তার এক বা একাধিক মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তি থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেই জন্য মনশ্চিকিৎসক চিকিৎসার যে রীতিই অনুসরণ করুন না কেন তাঁর মূল লক্ষ্যই হল যে শিশুর অতৃপ্ত চাহিদার তৃপ্তি সাধন করা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য। মনশ্চিকিৎসক যেমন মনের ব্যাধির চিকিৎসায় দক্ষ হবেন, তেমনই আবার শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসার আধুনিক পন্থার সঙ্গেও পরিচিত থাকবেন। সেইজন্য মনশ্চিকিৎসককে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করা হতে হয়। এর কারণ হল যে শিশুর মানসিক সমস্যা

নির্ণয়ের সময়ে তার শারীরিক সুস্থতা সম্বন্ধেও তাঁকে সুনিশ্চিত হতে হবে। দেহ ও মনের সুস্থতা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অনেক মানসিক ব্যাধির উৎস শারীরিক অসুস্থতা হতে পারে, আবার তেমনই অনেক মানসিক ব্যাধি থেকে শারীরিক ব্যাধি দেখা দিতে পারে। অতএব শিশুর মানসিক সমস্যার সমাধান করার পূর্বে মনশ্চিকিৎসক শিশুর সর্বাঙ্গীণ শারীরিক পরীক্ষা করবেন এবং তার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশদ ও নির্ভুল জ্ঞান আহরণ করবেন। তবেই তাঁর পক্ষে শিশুর মানসিক সমস্যার সাফল্যজনক চিকিৎসা করা সম্ভব হবে।

আধুনিক মনশ্চিকিৎসক শিশু পরিচালনাগারে যে সব বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকেন তার মধ্যে কতকগুলির নীচে উল্লেখ করা হল। যথা—

(১) সাক্ষাৎকার (২) মুক্ত অনুসঙ্গ পদ্ধতি (৩) খেলাভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি (৪) অনুভাবন (৫) স্বপ্ন বিশ্লেষণ (৬) প্রত্যক্ষ লঘুকরণ বিশ্লেষণ (Direct Reductive Analysis) (৭) যৌথ চিকিৎসা (৮) কর্মমূলক চিকিৎসা (Occupational Therapy) (৯) সামাজিক চিকিৎসা (Socio-Therapy) ইত্যাদি।

এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন

1. Describe in details the tasks that are performed by the psychologist, the psychiatrist and the social worker of a modern Child Guidance Clinic.

Ans. (পৃঃ ৩০৯—পৃঃ ৩১৬)

ঊনত্রিশ

সঙ্গতিবিধানের স্বরূপ (Nature of Adjustment)

প্রাণী ও অ-প্রাণীর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি সর্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল প্রাণী আচরণ সম্পন্ন করে, কিন্তু অ-প্রাণীর মধ্যে কোনও আচরণ দেখা যায় না। বৃষ্টি পড়া, আগুন জ্বলা, বাতাসের সঞ্চালন প্রভৃতি কাজগুলি অ-প্রাণীর ক্ষেত্রে সংঘটিত হলেও এগুলিকে আচরণ বলা চলে না। কেননা, ঐ কাজগুলি বৃষ্টি, আগুন, বাতাস প্রভৃতি অ-প্রাণী বস্তুগুলি স্বেচ্ছায় সম্পন্ন করে না। নিছক নানাবিধ পারিবেশিক শক্তির সমষ্টিগত প্রভাবে এই ঘটনাগুলি ঘটে থাকে।

কিন্তু প্রাণীমাত্রেই কোন না কোন রকম আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। এককোষী জীবাণু থেকে সুরু করে বহুকোষী জটিল শরীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলীসম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য।

এই আচরণ সম্পন্ন করার পেছনে যে সব কারণ আছে সেগুলিকে এক কথায় সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা বলা চলে। অর্থাৎ প্রাণী তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করার প্রচেষ্টা বা খাপ খাইয়ে নেবার জন্য আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। অবশ্য সঙ্গতিবিধান করা বা খাপ খাইয়ে নেওয়ার পেছনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। সেটি হল প্রাণীর নিজের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করার বা এক কথায় বাঁচার ইচ্ছা। অ-প্রাণীর মধ্যে বাঁচার কোনও ইচ্ছা নেই। এইজন্য পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবারও কোন প্রয়োজন তার নেই। আর তার ফলে তাকে কোন রকম আচরণই সম্পন্ন করতে হয় না।

সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজন দেখা দেয় কেন? প্রাণীমাত্রকেই কোন না কোন ধরনের পরিবেশে বাস করতে হয়। যে কোন পরিবেশকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সেটি কতকগুলি শক্তির সমষ্টিমাত্র। গাছপালা, বাড়ী-ঘর, আলো, বাতাস, শব্দ, পশু পাখী, নানা ধরনের মানুষ প্রভৃতি পরিবেশের সকল বস্তুগুলিই ব্যক্তির উপর কোন না কোন প্রকারের প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই শক্তিগুলি বিভিন্নধর্মী, বৈচিত্র্যময় ও ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থের দিক দিয়ে নানা প্রকৃতির হয়ে থাকে। কোন শক্তি ব্যক্তির প্রতি অনুকূল, কোনটি আবার প্রতিকূল হয়ে থাকে। আবার কোন কোন শক্তি ব্যক্তির স্বার্থের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন প্রকৃতিরও হতে পারে।

শক্তিগুলির এই প্রকৃতিগত বিভিন্নতার জন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেগুলির সঙ্গে মানিয়ে চলা বা সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যদি কোন শক্তির সঙ্গে

ব্যক্তি যথাযথ সঙ্গতিবিধান করতে না পারে তাহলে তার সুষ্ঠু জীবনধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দেয়। গুরুতর ক্ষেত্রে তার জীবনও বিপন্ন হতে পারে। এই সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজনকে আমরা ব্যক্তির চাহিদা বলে বর্ণনা করে থাকি।

কতকগুলি চাহিদা নিছক শারীরিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন পানীয় জলের চাহিদা, বাতাসের চাহিদা, খাদ্যের চাহিদা, নিদ্রা বা বিশ্রামের চাহিদা ইত্যাদি। এই চাহিদাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যক্তির জীবন ধারণ এগুলির যথাযথ তৃপ্তির উপর নির্ভর করে।

বলা বাহুল্য মানুষের জীবনে শারীরিক সঙ্গতিবিধান অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, আগুন, শীত, গ্রীষ্ম, বন্যপশুর আক্রমণ ইত্যাদি থেকে নিজেকে রক্ষা করা ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমানের উন্নত সমাজজীবনে এগুলি নিয়ন্ত্রিত করার নানা উন্নত পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে এবং তার ফলে এগুলির সমস্যা সভ্য মানুষের কাছে খুব একটা গুরুতর প্রকৃতির নয়।

কিন্তু বর্তমান সমাজবদ্ধ ও উন্নত মানুষের ক্ষেত্রে নিছক শারীরিক অস্তিত্ব রক্ষার চেয়ে সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল প্রকৃতির হয়ে উঠেছে। যে সব সামাজিক শক্তিগুলির মধ্যে ব্যক্তিকে বাস করতে হয় সেগুলি নানা বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়ার ফলে সেগুলির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান কবতে ব্যক্তিকে নানারকম প্রচেষ্টা করে যেতে হয়। সামাজিক পরিবেশ বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় ব্যক্তি যে সব দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করে সেইগুলিকে। ব্যক্তির নিকটতম সামাজিক পরিবেশ হল তার পরিবার—নিজের স্ত্রী-পুত্র, নিকট আত্মীয় ইত্যাদি নিয়ে যে গোষ্ঠী সেটি। তার পরবর্তী বাইরের সামাজিক পরিবেশ হল তার প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের গোষ্ঠী—যাদের সঙ্গে তাকে বহু সময়ই নানারকম আদানপ্রদান করতে হয়। এছাড়াও আছে বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ, তার নিজের দেশবাসী এবং স্বদেশের বাইরেরও বিভিন্ন দেশবিদেশের অধিবাসী যাদের সঙ্গে তাকে সাক্ষাৎভাবে কোনও আচরণ করতে না হলেও পরোক্ষভাবে নানা ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি আদানপ্রদানে তাকে কমবেশী অংশীদার হতে হয়। মানুষের সভ্যতা যখন এত বেশী উন্নত ও জটিল হয়ে ওঠেনি তখন নিজস্ব পরিবার ও প্রতিবেশী গোষ্ঠীর মধ্যেই ব্যক্তির পরিবেশ সীমাবদ্ধ থাকত। তার বৃহত্তর পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রে ছিলই না, বা থাকলেও সীমিত মাত্রার ও স্বল্প পরিধির ছিল। কিন্তু সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি

এবং যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থার অকল্পনীয় উন্নয়নের ফলে আজ শিক্ষিত মানুষ মাত্রেরই জীবনে বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

এই সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। খাপ খাইয়ে চলা কথাটির অর্থ হল যে ঐ পরিবেশ থেকে জাত যে সব শক্তি সেগুলির সঙ্গে যথাযথ আচরণ করা যাতে সেই শক্তিগুলি ব্যক্তির কোনরূপ অস্বস্তি, অসুবিধা বা বিপদের কারণ হয়ে উঠতে না পারে এবং তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে তাকে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তির উপর স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের ভার থেকে থাকে তাহলে তার সন্তোষজনক আয়োজন করতে পারাটাই হল তার ক্ষেত্রে সার্থক সঙ্গতিবিধানের দৃষ্টান্ত। যদি ব্যক্তি সে কাজ করতে অসমর্থ হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সে তার পরিবারের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারল না। কিংবা প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবরা কোন ব্যক্তির কাছ থেকে যে ধরনের সহযোগিতা, দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি আশা করে সে সব যদি ব্যক্তি দেখাতে না পারে তাহলে সে তার প্রতিবেশী ও বন্ধু মহলে প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান থেকে বঞ্চিত হয় এবং সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হয়। অতএব এক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে সুষ্ঠু ও সার্থক সঙ্গতিবিধান হল ঐ সামাজিক পরিবেশ থেকে তার উপর যে সব দাবী বা প্রত্যাশা করা হয় সেগুলি সন্তোষজনক ভাবে মেটানো। এইভাবে বৃহত্তর সমাজেরও নানা রকম দাবী ব্যক্তির উপর আরোপ করা হয় এবং সেগুলি যথাযথ মেটানো ব্যক্তির ক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের জন্য অবশ্য প্রয়োজন।

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে যদি ব্যক্তির এই সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়াটির বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে কয়েকটি সোপান বা পর্যায় আছে। সেগুলি হল :—

প্রথমত, ব্যক্তি তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য বিশেষ কোন পথে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয়ত, কোন কারণে তার সেই আচরণ কোন বাধায় প্রতিহত হয়। তৃতীয়ত, তখন সে সেই বাধা অতিক্রম করার জন্য নানা নতুন নতুন আচরণের উদ্ভাবন করে তার সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করে। চতুর্থত, এইভাবে নতুন নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে করতে হঠাৎ একটি বিশেষ আচরণের দ্বারা সে সেই বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং পঞ্চমত, তারপর সে তার সেই উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে আবার অগ্রসর হয় এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছয়।

এত হল সফল সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে সোপানের বর্ণনা। কিন্তু যেক্ষেত্রে ব্যক্তি সফল সঙ্গতিবিধান করতে পারে না সেক্ষেত্রে চতুর্থ ও পঞ্চম সোপানের পরিবর্তে একটি সোপানই থাকে। সেটি হল সে বাধা অতিক্রম করতে পারে না এবং তার আচরণ বা অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়।

এখানে সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়াটি হল মূলত ঐ বাধাটিকে অতিক্রম করে তার পূর্বের আচরণে ফিরে আসা। যদি সে ঐ বাধাটি অতিক্রম করতে না পারে তাহলে সে সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হয় না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়ার মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকবে। প্রথমত, বিশেষ কোন আচরণ করা বা বিশেষ কোন লক্ষ্যে পৌঁছনর চাহিদা বা প্রেষণা। দ্বিতীয়ত, সেই আচরণ সম্পাদনের বা লক্ষ্যে পৌঁছনর পথে বাধার সৃষ্টি অর্থাৎ তার সেই প্রেষণা বা চাহিদার অতৃপ্তি। তৃতীয়ত, সেই বাধাটিকে দূর করার জন্য নানা বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণ সম্পাদন এবং সেই বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণ সম্পাদনের দ্বারা সমস্যাটির সমাধান করা অর্থাৎ তার সেই বাধাপ্রাপ্ত প্রেষণার তৃপ্তিদান। এই শেষ ধাপে অর্থাৎ তার সমস্যাটির সমাধান বা বাধাটির অপসারণে পৌঁছতে পারলেই ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যে ব্যক্তি তার সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয় তা নয়। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তি সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ হয়েছে বলতে হবে।

যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ হয় সে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি কি করে? সাধারণত সে আবার চেষ্টা করে এবং পূর্বের প্রচেষ্টা বা আচরণের পরিবর্তে সে নতুন প্রচেষ্টা বা আচরণ সম্পন্ন করে দেখে যে সে তার বাধাটি দূর করতে পারে কিনা। যদি সে তা পারে তাহলে সে সঙ্গতিবিধানে সমর্থ হল। দ্বিতীয়বার প্রচেষ্টায় সে সফল না হতেও পারে এবং তাকে একাধিক বার প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। প্রেষণার তীব্রতা, ব্যক্তির ধৈর্য, দৃঢ়সংকল্প, বুদ্ধি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ব্যক্তি কতবার প্রচেষ্টা করে সফল হবে।

সামাজিক সঙ্গতিবিধান প্রকৃতির দিক দিয়ে বহু বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে। সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তিকেই এই সামাজিক সঙ্গতিবিধান করতে হয়। মূলত সমাজে স্বীকৃত ও অনুমোদিত সদস্যরূপে বাস করতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সামাজিক সঙ্গতিবিধান অপরিহার্য। মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে সমাজের অধিকাংশ লোকই সাফল্যের সঙ্গেই এই সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হয়। কিন্তু আবার অনেকের পক্ষেই সফল সামাজিক সঙ্গতিবিধান করা

সম্ভব হয় না। তার ফলে একদিকে যেমন সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দূষিত হয়ে ওঠে, তেমনই তারা নিজেরাও হীনমন্যতা, ভয়, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত অনুভূতি থেকে কষ্ট পায়। কোন ব্যক্তির নিজের গোষ্ঠীর অন্তর্গত অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে যদি সম্পর্ক সন্তোষজনক না হয় তাহলে তার পক্ষে তৃপ্তিকর জীবনযাপন করাই দুরূহ হয়ে ওঠে। সামাজিক সঙ্গতিবিধান যদি সন্তোষজনক না হয় তাহলে সমাজের স্বীকৃতি ও সহায়তা থেকে সে বঞ্চিত হয় এবং তার সুষ্ঠ জীবনযাপন প্রক্রিয়াই ব্যাহত হয়ে ওঠে। আজকের সভ্য সমাজজীবনে কি ধরনের সঙ্গতিবিধানের সমস্যা বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা দেয় তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যখন বছরের গোড়ায় শিক্ষাবর্ষের সুরু হয় তখন নানা পরিবার, পরিবেশ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে ছেলেমেয়েরা সেই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। সহপাঠী, শিক্ষক, পাঠ্যবিষয়, স্কুলের নিয়মকানুন প্রভৃতি তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন এবং তখন এই নতুন শক্তিসমষ্টির সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করা তাদের সফল বিদ্যালয় জীবনের জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তাদের কাছে সঙ্গতিবিধানমূলক সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য তারা নানা বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণ করে চলে এবং এই বিভিন্ন আচরণের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের সঙ্গতিবিধানের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে।

বন্ধুবান্ধব মহলেও শিক্ষার্থীর মধ্যে এই রকম সঙ্গতিবিধানের সমস্যা দেখা দিতে পারে। নতুন সহপাঠীদের পরিবেশে পড়ে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই নিজেদের মানিয়ে নেয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে যে স্কুলে ভর্তি হয়ে শিশুটি তার সহপাঠীদের সঙ্গে ঠিকমত মেলামেশা করতে পারছে না। সাধারণত যে সব ছেলেমেয়ে পিতামাতার একমাত্র সন্তান হয় বা বাড়ীতে তার বয়সী ছেলেমেয়ের অভাব থাকে তারা বাইরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় অভ্যস্ত থাকে না। পিতামাতার খুব বেশী আদরে মানুষ হওয়ার ফলে তারা প্রায়ই অন্তর্বৃত ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে এবং বন্ধুদের সঙ্গে যথাযথ সামাজিক আচরণগুলি সম্পন্ন করতে শেখে না। ফলে তাদের মধ্যে সঙ্গতিমূলক সমস্যা দেখা দেয়। এই রকম একটি মেয়ে তার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে প্রত্যাশিত আচরণ সম্পন্ন করতে পারল না। তার বন্ধুবান্ধব যে ধরনের আচরণ, কর্তব্য, দায়িত্ব তার কাছে থেকে প্রত্যাশা করে সেগুলি সে সম্পন্ন করতে অসমর্থ হল এবং তার ফলে

মেয়েটি তার বন্ধুবান্ধবদের মহলে সফল সঙ্গতিবিধান করতে পারল না। এই সমস্যা আরও তীব্র হয়ে উঠল যখন ঐ মেয়েটি বাধ্য হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশাই বন্ধ করে দিল।

বড়দের ক্ষেত্রেও এই ধরনের সঙ্গতিবিধানের সমস্যাও প্রচুর দেখা যায়। চাকরির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছা বা পছন্দের বিরুদ্ধে কোনও বিশেষ একটি চাকরি নিতে হল। কিন্তু যেহেতু চাকরিটা তাকে জোর করে নিতে হয়েছে সেহেতু সে সেটি মনোযোগ দিয়ে করল না এবং কিছুদিনের মধ্যেই কর্মক্ষেত্রে অনুপযোগী অক্ষম বলে তার দুর্নাম রটে গেল। ফলে ঐ ব্যক্তির মধ্যে সঙ্গতিমূলক সমস্যা দেখা দিল। অথচ তার ঐ চাকরি ভালভাবে করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল এবং আর্থিক দিক দিয়েও তার চাকরিটা বিশেষ দরকার ছিল। কিন্তু নিছক সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্যের জন্য সে কাজের অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হল এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত তার চাকরিটা চলেও গেল।

এ ধরনের নানা কারণের জন্য কোনও নতুন বা অপরিচিত পরিবেশে বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে যখন ব্যক্তি অসমর্থ হয় তখন সে সঙ্গতিবিধান-মূলক সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সময়ে সে নানা বিভিন্ন ধরনের আচরণ করে সেই শক্তিগুলির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করার চেষ্টা করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন না কোন আচরণের দ্বারা সে ঐ শক্তির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয় এবং পরে তার ঐ সমস্যাটিও আর থাকে না। যেমন, উপরের উদাহরণে প্রথম ক্ষেত্রে ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল ফল করতে না পেরে খেলাধূলা, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি অন্য কোনও ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা দেখিয়ে স্কুলের শিক্ষক ও বন্ধুমহলে তার বাঞ্ছিত প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা আদায় করে নিল।

কিংবা সে নানা ধরনের অস্বাভাবিক পন্থার আশ্রয় নিল। যেমন নিজের অলীক দুঃসাহসিক কার্যকলাপের বর্ণনা করে কিংবা দুর্বল সহপাঠীদের মারধর করে, কিংবা বোকারাই লেখাপড়া করে, এই কথা বলে বেড়িয়ে বা নিজের লেখাপড়ায় অক্ষমতার জন্য স্কুলের শিক্ষকদের অকর্মণ্যতা বা পক্ষপাতিত্বের দোষে অভিযুক্ত করে স্কুলের নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজের সঙ্গতিবিধান করার চেষ্টা করল। এই ধরনের আচরণগুলি অতি অবশ্যই অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছিত। কিন্তু এগুলিই ঐ বিশেষ ছেলেটিকে তার স্কুলের পরিবেশে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করল এবং তার মনে তৃপ্তি আনল।

কিংবা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মেয়েটি যখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে

পারল না তখন কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে তার ভাল লাগে না এবং সে একা একা থাকতে ভালবাসে ইত্যাদি বলে বেড়াতে লাগল। অনেক সময় নিজেকে উচ্চস্তরের মানুষ এবং অন্যান্য মেয়েদের নিম্নস্তরের বলে বর্ণনা করতেও লাগল। এইভাবে সে তার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করল এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে তার প্রাপ্য সম্মান আদায় করল।

তেমনই, চাকরির ক্ষেত্রে ভদ্রলোকটি ঐ চাকরিটি নিকৃষ্ট ধরনের এবং তার মত লোকের পক্ষে উপযোগী নয় একথা বলে তার অক্ষমতাকে ঢাকার চেষ্টা করল। এবং যখন তার চাকরি চলে গেল তখন সে বলল যে সে ইচ্ছা করেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এইভাবে সে তার পরিবার ও অন্যান্য সকলের কাছে নিজের মর্যাদা ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখল। অর্থাৎ সে এইভাবে সঙ্গতিবিধান করল।

উপরে বর্ণিত সঙ্গতিবিধানের উদাহরণগুলি সবই অস্বাভাবিক প্রকৃতির এবং যদিও এই ধরনের সঙ্গতি বিধানের ঐ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করতে পেরেছিল এবং তাদের বিশেষ বিশেষ সমস্যামূলক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সাহায্য করেছিল তবু সেগুলি কিন্তু স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত প্রকৃতির নয়। সেগুলি তার মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা সাময়িক মীমাংসা করতে পারলেও তার অন্তর্দ্বন্দ্বের স্থায়ী কোন সমাধান দিতে পারে নি। তাছাড়া এই ধরনের অস্বাভাবিক সঙ্গতিবিধানের দ্বারা সঙ্গতিবিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয় না। উদাহরণস্বরূপ, যে ছেলেটি স্কুলে লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখাতে পারল না এবং তার জন্য সে খেলাধূলায় পারদর্শিতা দেখিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা আদায় করল, সেক্ষেত্রে তার সঙ্গতিবিধান তার কাছে তৃপ্তিকর হল বটে, কিন্তু স্কুলে যোগদানের যে মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ লেখাপড়া শেখা সেইটিই এখানে সিদ্ধ হল না। তেমনই যে মেয়েটির বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার ইচ্ছা থাকলেও তার অনুপযোগী মানসিক সংগঠনের জন্য তা সে পারল না এবং বন্ধুদের নিম্নস্তরের বলে মনে করে নিজে আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করা সুরু করল সে মেয়েটি যদিও তার সঙ্গতিবিধানের সমস্যার একটা সমাধান করল তবু ঐ সমাধান কৃত্রিম প্রকৃতির এবং কখনই তাকে স্থায়ী তৃপ্তি দিতে পারল না। তেমনই যে ব্যক্তিটি তার চাকরিতে মন দিয়ে কাজ করতে পারল না সে যদিও কাজটি তার যোগ্য নয় ইত্যাদি বলে তার অক্ষমতার একটা যুক্তি খাড়া করল এবং ঐভাবে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করল তবু এটা যে তার কাছে কাম্য সঙ্গতিবিধান হল না সেটা বলা বাহুল্য। কাজটি তার পছন্দমত না হলেও সে

যদি কাজটিকে ভাল মনে গ্রহণ করত এবং তাতে নিজের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করত তাহলেই তার পক্ষে সঙ্গতিবিধান বাঞ্ছিত প্রকৃতির হত।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে সঙ্গতিবিধান দু'প্রকারের হতে পারে। বাঞ্ছিত পন্থায়, আবার অবাঞ্ছিত পন্থায়। যেমন বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা আসে লেখাপড়া শিখতে। অতএব যখন কোন ছেলে যথাযথ লেখাপড়া করে বিদ্যালয় পরিবেশে সঙ্গতিবিধান করতে পারে, তখন তাকে বাঞ্ছিত সঙ্গতিবিধান বলা চলে। কিন্তু লেখাপড়া ছাড়া অন্য কোনও পন্থায় যদি সে বিদ্যালয় পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় তাহলে সেটা হবে অবাঞ্ছিত পন্থায় সঙ্গতিবিধান। অবাঞ্ছিত সঙ্গতি-বিধান আবার দু'শ্রেণীর হতে পারে, নির্দোষ প্রকৃতির এবং বিকৃত প্রকৃতির। যখন খেলাধুলা, বিতর্ক, সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি সমাজ-অনুমোদিত আচরণের মাধ্যমে ছেলেটি সঙ্গতিবিধান করে সেটা তখন হবে নির্দোষ প্রকৃতির, কিন্তু অবাঞ্ছিত সঙ্গতিবিধান। আর যদি মিথ্যা বড়াই করা, ছোট ছেলেমেয়েদের মারধর করা, অপরাধ অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি বিকৃত পন্থার মাধ্যমে ছেলেটি সঙ্গতিবিধান করে তাহলে সেটা হবে বিকৃত অবাঞ্ছিত সঙ্গতিবিধান। এই বিকৃত অবাঞ্ছিত সঙ্গতিবিধান যদি নিয়ন্ত্রিত মাত্রার মধ্যে থাকে তাহলে ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য খুব তীব্র হয় না এবং পরে সে তার বিকৃত পন্থা ত্যাগ করে অন্য কোন স্বাভাবিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যখন এই বিকৃতির মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে ওঠে তখন ব্যক্তির মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে এবং তার ফলে তার মানসিক স্বাস্থ্য বেশ ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠতে পারে।

জীবনে সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা

সার্থক ও তৃপ্তিকর জীবনযাপনের প্রথম ও প্রধান উপকরণ হল সঙ্গতিবিধান। পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পারলে ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক উভয়ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রতিবন্ধক দেখা দিতে পারে। রোদ, জল, ঝড়, শীত, গরম প্রভৃতি পরিবেশের প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান না করতে পারলে ব্যক্তির পক্ষে শারীরিক অস্তিত্ব সংরক্ষণই বিপদাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আজকের সভ্য মানুষের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ফলে প্রায় অধিকাংশ প্রাকৃতিক শক্তিই তার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে উঠেছে। সেজন্য বর্তমানে এই পর্যায়ের সঙ্গতিবিধান খুব বড় একটা সমস্যা নয়। যদি গুরুতর প্রকৃতির কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা পরিবর্তন ঘটে তাহলে অবশ্য সেক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে এই প্রাকৃতিক সঙ্গতিবিধানও কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে প্রায়ই সমস্যা দেখা দেয়। আমাদের বর্তমান সমাজকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এটি নানা বিভিন্ন প্রকৃতির শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে একটি অতি জটিল রূপ ধারণ করেছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির শক্তির প্রভাবে ব্যক্তিকে প্রতিনিয়তই বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেগুলি সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করতে না পারলে তাকে নানা ধরনের অসুবিধা, দুর্নাম, অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, এমন কি সামাজিক শাস্তিও ভোগ করতে হয়।

সামাজিক স্তরে ব্যক্তিকে যেমন তার নিজের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে হয় তেমনই আবার বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী এমন কি বৃহত্তর সমাজের নানা প্রকৃতির ব্যক্তির সঙ্গে তাকে সামাজিক আচরণ সম্পন্ন করতে হয়। সব সমাজেই পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, বৃহত্তর সমাজের মানুষ সকলের সঙ্গে আচরণ করার একটি সুনির্দিষ্ট মান আছে এবং সেই মান অনুযায়ী আচরণ করাটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে সঙ্গতিবিধানের জন্য অপরিহার্য। পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী প্রভৃতির প্রতি কর্তব্যপালন, তাদের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদান, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কাজের সুষ্ঠু সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি তার সামাজিক সঙ্গতিবিধান সম্পন্ন করে।

তেমনই অর্থনৈতিক সঙ্গতিবিধান এবং বৃত্তিমূলক নিরাপত্তা ব্যক্তির সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক সমাজজীবনের জন্য একপ্রকার অপরিহার্য।

আজকের সমাজে প্রত্যেক মানুষকেই তার নিজের ও নিজের পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের দায়িত্ব অতি অবশ্যই পালন করতে হয়। এর জন্য তাকে কোনও বিশেষ পেশা বা বৃত্তি অনুসরণ করতে হয়। বর্তমানে প্রত্যেক সমাজেই এই বৃত্তিমূলক পরিবেশটি বিশেষ জটিল হয়ে উঠেছে এবং বৃত্তির ক্ষেত্রে সঙ্গতি-বিধান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দুরূহ কাজে পরিণত হয়েছে। উপযুক্ত বৃত্তি পাওয়া এবং সন্তোষজনকভাবে সেই বৃত্তি অনুসরণ করা প্রত্যেক ব্যক্তির বৃত্তিমূলক সঙ্গতিবিধানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সোপান।

বস্তুত বর্তমান সমাজে মানমর্যাদা, সুখসুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসিতা সবই ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর নির্ভর করে। সেদিক দিয়ে অর্থনৈতিক সঙ্গতিবিধানের গুরুত্ব অপরিসীম। তেমনই সাংস্কৃতিক স্তরেও সঙ্গতিবিধান ব্যক্তির সুষ্ঠু ও তৃপ্তিকর সমাজজীবনের জন্য অপরিহার্য। আজকের যে কোন সমাজই সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান আহরণের দিক দিয়ে অনেক

এগিয়ে গিয়েছে। তার ফলে সর্বত্রই শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ অনেক সমৃদ্ধ ও উন্নত। এই উন্নত শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি-বিধান করতে না পারলে ব্যক্তির পক্ষে সমাজে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাস করা সম্ভব নয়।

সবশেষে আসে রাজনৈতিক পরিবেশ। আজকের জগতে সব রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নানা আদর্শসম্পন্ন রাজনৈতিক মতবাদগুলির প্রভাবে রাজনীতি আজ সর্বস্তরের মানুষের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে এবং তার সব রকমের আচরণ ধারাকেই নিয়ন্ত্রিত করছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই বিভিন্নধর্মী রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলাটা বর্তমানে অতিগুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সবই আজ রাজনীতির সঙ্গে অতি নিবিড়ভাবে জড়িত। যে ব্যক্তি রাজনৈতিক শক্তিগুলির সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হয় না তার জীবনযাত্রার সব দিকগুলিই নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে ব্যক্তি যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করা যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজনীয় তাই নয় তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য বললেই যথার্থ বলা হয়। পরিবেশের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ অবশ্য গুরুত্বের দিক দিয়ে সর্বপ্রথমে উল্লেখ্য। কেননা, ব্যক্তি যদি তার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পারে তাহলে তার শারীরিক অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে ওঠে। দেখা গেছে যে বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়া প্রাণী বাঁচতে পারে না। অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, অতিমাত্রায় আঘাত, অতিরিক্ত ভার বা চাপ, অতিমাত্রায় বৃষ্টি প্রভৃতি ঘটনাগুলি শারীরিক অস্তিত্বকে বিপদাপন্ন করে তোলে। অতএব প্রাকৃতিক পরিবেশে সঙ্গতিবিধান শারীরিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই অপরিহার্য।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে মানুষের উদ্ভাবনীশক্তি, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রসার এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা মানুষের এই সমস্যাকে বহুলাংশে সহজ করে তুলেছে এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করা যেহেতু মানবসভ্যতার অগ্রগতির একটি অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ সেহেতু এই সঙ্গতিবিধানের কাজটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তির একার উপর আর ন্যস্ত নয়। মানবজাতি যৌথভাবেই প্রাকৃতিক সঙ্গতিবিধানের সমস্যাটি

সমাধান করার দায়িত্ব নিয়েছে। তবু যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে একক ভাবে কোন শারীরিক সঙ্গতিবিধানের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে ক্ষেত্রে যাতে সেই সমস্যার সে সন্তোষজনক সমাধান করতে পারে সেটা দেখা তার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে সঙ্গতিবিধানের গুরুত্ব নিয়ে কোন মতান্তর থাকতে পারে না। সমাজে নিজের যথাযথ মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিজের পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী সকলের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ তার কাছে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। নিজের পরিবারের লোকজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির কাছে যদি ব্যক্তি তার ঈপ্সিত সম্মান ও মর্যাদা না পায় তাহলে সেটি তার কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠবে। এ সব ক্ষেত্রে বোধহীন ও অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরা ছাড়া যে কোন স্বাভাবিক মানুষই অল্প বিস্তর মানসিক বিপর্যয়ের পাত্র হয়ে ওঠে। যে সব ব্যক্তি সাধারণের চেয়ে অধিকমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ তাদের মধ্যে এ ধরনের পরিস্থিতিতে তীব্র মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং গুরুতর ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মানসিক বিফলতা দেখা দেয়। স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রেও সামাজিক নিন্দা, দুর্নাম যা মর্যাদাহানি বিশেষ মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করে এবং সহজ ও সুস্থ সমাজজীবনের বিরাট অন্তরায় হয়ে ওঠে।

যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের অক্ষমতা সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যায় সে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি সামাজিক শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হয়। তখন ব্যক্তির মধ্যে গুরুতর মানসিক অপসঙ্গতি দেখা দেয় এবং সেই ব্যক্তিকে সমাজে থেকেও সমাজ থেকে বিতাড়িত জীবন যাপন করতে হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা মানবজীবনের সঙ্গতিবিধানের প্রধান প্রধান উপযোগিতাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারি। যথা—

প্রথমত, সঙ্গতিবিধান প্রাণীর বাধাপ্রাপ্ত বা অসমাপ্ত কাজ বা আচরণের পুনরনুষ্ঠান সম্ভব করে এবং তাকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সমর্থ করে। সঙ্গতিবিধানের অভাবে প্রাণী যে কাজ বা আচরণ করছিল তা বন্ধ হয়ে যায় এবং সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সমর্থ হয় না। প্রাণী যে মুহূর্তে সঙ্গতিবিধানে সমর্থ হয় সেই মুহূর্তেই তার সেই বাধাপ্রাপ্ত কাজ আবার চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণী তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি নতুন চাকরি নিয়ে বিদেশে গেছে। সেখানের অধিবাসীদের

আচার-ব্যবহার তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হল এবং সে সেই রকম আচরণ করতে না পারার জন্য সেখানকার লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারল না এবং তার ফলে তার অভীষ্ট যে চাকরি সেটাই সে ভালভাবে করতে পারল না। কিন্তু কিছুদিন পরে মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করে ব্যক্তিটি সেখানকার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার শিখে নিল এবং শীঘ্রই তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে সমর্থ হল। তার ফলে ভালভাবে চাকরী করাও তার পক্ষে আর অসুবিধা হল না। অর্থাৎ সে সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছল।

দ্বিতীয়ত, যতক্ষণ ব্যক্তি সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ না হচ্ছে ততক্ষণ ব্যক্তির মধ্যে একটি অস্বস্তিকর উত্তেজনা (tension) দেখা দেয়। যে মুহূর্তে ব্যক্তি সঙ্গতিবিধানে সফল হয় সেই মুহূর্তেই তার সেই অস্বস্তিকর অনুভূতি চলে যায় এবং তার শারীরিক-মানসিক সাম্যাবস্থা ফিরে আসে। উপরের উদাহরণে ব্যক্তিটি যতদিন না বিদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে পারছিল ততদিন সে একটি দুশ্চিন্তা ও ব্যর্থতার বোধে ভুগছিল। যে মুহূর্তে সে বিদেশীদের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারল সেই মুহূর্তে তার সেই দুশ্চিন্তা ও ব্যর্থতার বোধ চলে গেল।

তৃতীয়ত, সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজন দেখা তখনই দেয় যখনই ব্যক্তির কোনও বিশেষ প্রেষণা বা চাহিদা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই প্রেষণা বা চাহিদা যদি শক্তিশালী ও ব্যক্তির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে সঙ্গতিবিধানের অভাব ব্যক্তির মধ্যে ব্যর্থতার বোধ সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে নানারকম মানসিক সমস্যার জন্ম দেয়। গুরুতর ক্ষেত্রে তার মানসিক স্বাস্থ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে উঠতে পারে। অতএব সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের ফলে ব্যক্তির এই প্রক্ষোভমূলক সমস্যা দূর হয়ে যায় এবং তার মানসিক স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে।

চতুর্থত, সঙ্গতিবিধান মাত্রেরই উদ্দেশ্য হল কোন একটি বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছন। এই লক্ষ্যটি ব্যক্তির কোন বিশেষ চাহিদা তৃপ্ত করে এবং সে দিক দিয়ে কোন না কোন ভাবে ঐটি ব্যক্তির পক্ষে হিতকর বা তার স্বার্থের পরিপোষক। কোন প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করা বা কোন সামাজিক সমস্যার সমাধান করা বা কোন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকৃতির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই সঙ্গতিবিধানের মূল লক্ষ্য। সেদিক সুষ্ঠু সঙ্গতি-বিধান সব সময়েই ব্যক্তির কোন মঙ্গলসাধন করে থাকে বা তার কোনও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

সবশেষে, সঙ্গতিবিধান ব্যক্তিকে মানসিক তৃপ্তি দান করে এবং তার উন্নততর ও সমৃদ্ধতর জীবন যাপনে তাকে সমর্থ করে।

নিছক শারীরিক ও সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই যে সঙ্গতিবিধান প্রয়োজন তা নয়। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সঙ্গতিবিধানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশের সঙ্গে উন্নত সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়ারই নাম অগ্রগতি। ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। প্রাকৃতিক শক্তিগুলির সঙ্গে প্রাচীন মানুষ যেভাবে সঙ্গতিবিধান করত তার তুলনায় আধুনিক মানুষ আজ অনেক বেশী উন্নত প্রকৃতির সঙ্গতিবিধান করতে পারে। যেমন, শীত, গ্রীষ্ম, দূরত্ব প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়া পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত। তেমনই সামাজিক স্তরেও মানুষের সঙ্গতি-বিধানের প্রচেষ্টা অনেক বেশী উন্নত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন অনিশ্চিত যাযাবর জীবনের পরিবর্তে মানুষ আজ সুসংহত পরস্পরের উপর নির্ভরশীল সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করতে শিখেছে। এটি হল উন্নত সামাজিক সঙ্গতিবিধানের উদাহরণ। তেমনই শিক্ষা সংস্কৃতি, বৃত্তি-অর্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও মানুষের সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়া পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত হয়ে উঠেছে; বস্তুত সঙ্গতিবিধানের এই উন্নয়নই মানব সভ্যতার অগ্রগতির মাপকাঠি।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the nature of adjustment. Why is adjustment so important in human life?

2. What is adjustment? Discuss the utility of adjustment in our daily life.

ত্রিশ

ব্যর্থতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব—অপসঙ্গতির কারণ (Frustration & Conflict : : Causes of Maladjustment)

আমরা ইতিপূর্বে অপসঙ্গতির কারণাবলী নিয়ে আলোচনা করেছি।[১] সেখানে আমরা অপসঙ্গতির প্রধানত চারটি কারণের উল্লেখ করেছি। যথা:—আক্রমণধর্মিতা, নিরাপত্তার অভাব, অপরাধবোধ এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব।

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা এই কারণগুলি সম্বন্ধে আরও একটু বিশদ আলোচনা করব।

সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যখন কোন মানুষের মধ্যে চাহিদা জাগে। চাহিদা মানে কোন কিছুর অভাববোধ। ক্ষুধার সময় খাদ্যের অভাববোধ হল খাদ্যের চাহিদা। আর সেই চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যক্তিকে যে আচরণ সম্পন্ন করতে হয় সেটিই হল সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা। যে আচরণের দ্বারা ব্যক্তির চাহিদাটি সন্তোষজনকভাবে মেটে সেই আচরণকে সঙ্গতিবিধান বলা হয়। যেমন যদি ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তার আচরণের দ্বারা খাদ্য পেতে পারে তাহলে সে সঙ্গতিবিধান করতে পেয়েছে বুঝতে হবে। আর যদি তার আচরণ সত্ত্বেও সে খাদ্য পেতে সমর্থ না হয় তাহলে বুঝতে হবে সে সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হয় নি এবং তার চাহিদা বাধাপ্রাপ্ত (thwarted) হয়েছে। চাহিদার এই বাধাপ্রাপ্তি যেমন একটি স্বাভাবিক ঘটনা তেমনই অনেক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও বটে।

প্রত্যেক মানুষেরও বহু চাহিদা প্রতিনিয়তই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। বাধাপ্রাপ্তি ঘটলে ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয় আচরণের বিভিন্নতা। অর্থাৎ ব্যক্তি তখন সেই চাহিদাটির পরিতৃপ্তির জন্য নানা বিচ্ছিন্ন ধরনের আচরণ সম্পন্ন করতে সুরু করে। প্রায়ই এই বিভিন্ন আচরণের ফলে তার সেই চাহিদার একটা সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিতৃপ্তি ঘটে এবং চাহিদাজনিত যে উদ্বেগ বা উত্তেজনা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় তার নিরসন ঘটে। অর্থাৎ ব্যক্তি তার সহজ ও স্বাভাবিক শারীরিক মানসিক সাম্যাবস্থায় ফিরে আসে এবং তার মধ্যে আর কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকে না। কিন্তু যদি বারবার বিভিন্ন প্রকৃতির প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও ব্যক্তির সেই চাহিদার তৃপ্তি না ঘটে তাহলে তার চাহিদার বাধাপ্রাপ্তি স্থায়ী প্রকৃতির হয়ে ওঠে। তখন তার চাহিদাজনিত উদ্বেগ বা উত্তেজনার নিরসন ঘটে না এবং

১। পৃঃ ১৫৯—পৃঃ ১৬৪

সে একটা উত্তেজিত ও অস্থির অবস্থার মধ্যে থেকে যায়। একেই আমরা ব্যর্থতার (frustration) ক্ষেত্র বলে বর্ণনা করতে পারি। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই ব্যর্থতার কারণটি হয় কোন বিশেষ একটি পরিস্থিতি বা কোনও ব্যক্তির এমন কোন কাজ যা ব্যক্তিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে দেয় না। যেমন কোনও ছেলে স্কুলের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সিনেমায় যেতে চায়। কিন্তু বেরোবার সময় হঠাৎ তার ছোট ভাই পড়ে যাওয়ার জন্য এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যার জন্য তার যাওয়া হল না। কিংবা তার বাবা তাকে সিনেমায় যেতে দিলেন না। ঐ আকস্মিক বাহ্যিক পরিস্থিতির জন্য কিংবা তার বাবার আচরণের জন্য ছেলেটির সিনেমায় যাওয়া হল না। এটি একটি ব্যর্থতার উদাহরণ।

ব্যর্থতা ও প্রেষণার তীব্রতা

ব্যর্থতার প্রকৃতি ও মাত্রা ব্যক্তির প্রেষণা বা চাহিদার তীব্রতার উপর নির্ভর করে। ব্যর্থতা দেখা দিলে ব্যক্তি যে আবার বর্ধিত উৎসাহে চেষ্টা করে এটা সর্বজনীন ব্যাপার। সাধারণত যে বস্তু মানুষ পায় না বা বহু কষ্ট করে পায় তার প্রতি তার আকর্ষণ বেশী দেখা যায় এবং সেটি পাবার জন্য সে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করে। নদীর এপার বিশ্বাস করে যে যত সুখ সব ওপারে। বহু পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ব্যর্থতা প্রেষণা বা চাহিদার তীব্রতা বাড়ায়। তবে অবশ্য এই নীতি তখনই সত্য হয় যখন প্রেষণা বা চাহিদাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতির এবং মোটামুটিভাবে শক্তিশালী হয়। যেমন ক্ষুধার বা নিরাপত্তার চাহিদা। এই ধরনের চাহিদার ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্তি ঘটলে ব্যক্তি বর্ধিত উৎসাহ ও উদ্যমের সঙ্গে সেই চাহিদাটি পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করে।

নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ইঁদুরদের মধ্যে ব্যর্থতার সৃষ্টি করে মনোবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে ব্যর্থতার ফলে ইঁদুরদের মধ্যে প্রেষণা তীব্র হয়ে ওঠে এবং তাদের প্রচেষ্টায় তীব্রতা বেড়ে যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও তার কাজে বাধার সৃষ্টি করলে দেখা যায় যে তার প্রচেষ্টা আগের চেয়ে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, যে খেলনাটা তার হাতের কাছে সেটির চেয়ে যে খেলনাটি তার আয়ত্তের বাইরে সেটির প্রতিই সে বেশী আকৃষ্ট হচ্ছে। এই প্রকৃতির নানা পরীক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে স্বল্পমাত্রায় ব্যর্থতাবোধ প্রাণীর প্রেষণা ও প্রচেষ্টাকে তীব্রতর করে তোলে। মানুষের আচরণ যদিও তার পরিবেশের শক্তির দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয় তবু যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি

বোঝে যে কোন কষ্টসাধ্য লক্ষ্যে পৌছতে পারলে দশজনের প্রশংসা পাওয়া যাবে এবং সেই লক্ষ্যে পৌছনর জন্য তাকে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে সে ক্ষেত্রে ব্যক্তি সানন্দে কষ্ট সহ্য করতে রাজী হয় এবং লক্ষ্যে পৌছনর চেষ্টা করে। বস্তুত বহু সামাজিক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা দেখা দিলে ব্যক্তি তার প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত ত হয় না বরং নিজের মর্যাদা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বর্ধিত উদ্যমে প্রচেষ্টা করে যায়। তবে যাদের মধ্যে এই আত্মসম্মান লাভের প্রেষণা দুর্বল বা বাধা অত্যন্ত গুরুতর প্রকৃতির তাদের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী ত করেই না, বরং দুর্বলই করে তোলে।

বিদ্যালয়ে দেখা গেছে যে, যে সব ছেলেমেয়ে উচ্চাভিলাষসম্পন্ন তারা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার বা করণীয় কার্যাবলীর মধ্যে যেগুলি দুরূহ বা কষ্টসাধ্য সেগুলি বেছে নেয়। তারা জানে যে এগুলি করতে পারলে তারা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সহপাঠীদের কাছে বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে।

ব্যর্থতা ও আক্রমণধর্মিতা

ব্যর্থতা যেমন প্রেষণাকে শক্তিশালী করে তোলে তেমনই আবার বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে আক্রমণধর্মিতারও সৃষ্টি করে।

যে ছেলে মার মনোযোগ পেতে অভ্যস্ত সে যদি কোনও কারণে বারবার মার দ্বারা অবহেলিত হয় তাহলে সে আক্রমণমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে সুরু করে। সে হয়ত চেঁচামেচি সুরু করল কিংবা জিনিষপত্র ছুঁড়তে লাগল বা ছবি এঁকে দেয়াল নোংরা করল ইত্যাদি। যে মেয়েটিকে তার বন্ধুরা বিশেষ আমল দিল না সেই মেয়েটি ঐ বন্ধুদের পোষাক, চেহারা, আচরণ প্রভৃতির সমালোচনা করতে সুরু করল। ব্যক্তির ব্যর্থতার উৎস বা কারণ স্বরূপ যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ এই আক্রমণধর্মী আচরণ তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি উদ্দিষ্ট হতে পারে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আসল উৎস বা কারণ থেকে সরে এসে কোন নির্দিষ্ট এবং দুর্বল ক্ষেত্রের প্রতি উদ্দিষ্ট হতে পারে। যেমন, অফিসে ভুল কাজ করার ফলে কর্তৃপক্ষের কাছে ভর্ৎসিত হয়ে কোন ব্যক্তি বাড়ী ফিরে সামান্য অপরাধের জন্য নিজের ছোট ছেলেমেয়েদের মারধর করল।

অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার বোধ থেকে আক্রমণধর্মিতার সৃষ্টির কিছু উদাহরণ দেওয়া যায়। সমাজের সংখ্যালঘু-গোষ্ঠীর উপর সংখ্যাগুরু-গোষ্ঠীর আক্রমণ ও অত্যাচারের ব্যাখ্যা রূপে অনেক মনোবিজ্ঞানী এই ঘটনার উল্লেখ করে থাকেন। সংখ্যাগুরুদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার বোধ

সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে সামরিক মনোভাবসম্পন্ন জাতিগুলি নিজেদের ব্যর্থতার জন্য কোন ছোট জাতি বা দেশকে শত্রু বলে অভিহিত করে এবং আক্রমণ করে।

নানা পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থতা থেকে আক্রমণধর্মিতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে ব্যর্থতার সব ক্ষেত্রেই আক্রমণধর্মিতা প্রকাশ পায় না। বস্তুত ব্যর্থতার নানা প্রকার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আক্রমণধর্মিতা একটি। এমন অনেক ক্ষেত্র দেখা গেছে যেখানে ব্যর্থতা ব্যক্তিকে দুর্বল ও ভীরু করে তোলে।

ব্যর্থতা ও প্রত্যাবর্তন

অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ব্যক্তির আচরণের মধ্যে অসংহতি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এবং কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ও কার্যকারিতার দিক দিয়ে তার কাজের মানাবনতি ঘটায়।

তার ফলে ইতিপূর্বে তার কাজের মধ্যে যে উৎকর্ষ দেখা দিয়েছিল ব্যর্থতার বোধ দেখা দেওয়ার ফলে তার অবনতি ঘটে। আচরণের এই মানাবনতিকে আমরা প্রত্যাবর্তন (Regression) বলতে পারি। ছোট ছেলেমেয়েদের উপর পরীক্ষণ করে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে যদি ব্যর্থতার বোধ সৃষ্টি করা যায় তাহলে তাদের আচরণের মান উল্লেখযোগ্য ভাবে নেমে যায় এবং প্রকৃতির দিক দিয়ে পূর্ব শৈশবের স্তরে প্রত্যাবর্তন করে। বড়দের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে যদি কোন কাজের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ব্যর্থতার সৃষ্টি হয় তাহলে তাদের কাজ শিশুজনোচিত হয়ে পড়ে এবং অনেক বেশী যুক্তিহীন এবং পরিবেশের অনুপযোগী হয়ে ওঠে।

সঙ্গতিবিধান ও শিখন

সঙ্গতিবিধান বলতে আমরা প্রাণীর সেই আচরণ ধারাকে বুঝি যার দ্বারা প্রাণী তার পরিবেশের শক্তিসমষ্টির সঙ্গে যথাযথ মানিয়ে নিতে পারে এবং তার অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছয়। সঙ্গতিবিধানের জন্য প্রাণীকে এই কারণে কয়েকটি বিশেষ সোপানের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এরই একটি সোপানে প্রাণী তার বাধাপ্রাপ্ত আচরণকে মুক্ত করার জন্য নানা বিভিন্ন ধরনের আচরণ অনুষ্ঠান করে এবং শেষ পর্যন্ত এই বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণের মধ্যে থেকে একটি বিশেষ আচরণকে নির্বাচন করে নেয় এবং তার দ্বারা সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হয়।

প্রাণী এইভাবে ব্যর্থ ও অসফল আচরণগুলি সম্পন্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত যে সফল ও সার্থক আচরণটি সম্পন্ন করে তাকেই আমরা শিখন নাম দিয়ে থাকি।

থর্নডাইকের একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণে একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে খাঁচার বাইরে তার অভীষ্ট খাবার রাখা হয়েছিল। খাঁচার দরজাটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে বিশেষ একটি হাতলে চাপ দিলে দরজাটি খুলে যায়। বিড়ালটি খাবারে পৌঁছতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নানাভাবে খাঁচা থেকে বেরোবার চেষ্টা করে এবং বেশ কয়েকবার অন্ধ ও অর্থহীন চেষ্টা করার পর অবশেষে সে ঐ হাতলটিতে চাপ দিয়ে খাঁচা খুলে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এইভাবে কিছুদিন খাঁচায় বন্ধ থাকা অবস্থায় বারবার অন্ধ চেষ্টা করার পর এমন একদিন এল যেদিন বেড়ালটি আর অন্ধ বা অর্থহীন প্রচেষ্টা করল না। খাঁচায় বন্ধ করা মাত্রই হাতলে চাপ দিয়ে বেরিয়ে এল। অর্থাৎ বেড়ালটি বন্ধ খাঁচা থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে শিখল।

দেখা যাচ্ছে যে বেড়ালটিকে তার পরিবেশের শক্তিগুলির সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিবিধান করার জন্য নতুন আচরণ শিখতে হল। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিখন প্রক্রিয়া অপরিহার্যভাবে জড়িত এবং শিখন, তা সে স্বল্পই হোক বা অধিকই হোক, সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে অবশ্যই থাকবে।

ইতিপূর্বে যে ব্যক্তিটি চাকরির জন্য বিদেশে গিয়েছিল অথচ সেই দেশের অধিবাসীদের আচার ব্যবহার তার জানা ছিল না বলে সে ভালভাবে চাকরিই করতে পারছিল না, সে তখনই সার্থকভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারল যখন সে দেশের অধিবাসীদের আচরণ শিখল। অর্থাৎ তার সঙ্গতিবিধান তখনই সন্তোষজনক হল যখন তার উপযুক্ত শিখন ঘটল। এইভাবে দেখা যাবে যে সমস্ত সফল সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে শিখন একটি অপরিহার্য সোপান।

বস্তুত বিশ্লেষণ করলে আ ও দেখা যাবে যে শিখন প্রক্রিয়ার উদ্ভবই হয়েছে সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। প্রাণীকে যদি তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না হত এবং কোন বাধার সম্মুখীন না হয়ে যদি তার চাহিদার তৃপ্তি করতে পারত তাহলে শিখনের কোন প্রয়োজন হত না। প্রয়োজনবোধই হল উদ্ভাবনের প্রসূতি, এই ইংরাজী প্রবাদটিতে এই সত্যটাই বলা হয়েছে।

শিখনের ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন হল যে শিখন প্রক্রিয়াটি সম্ভব হয় কেন?

সঙ্গতিবিধানের জন্য শিখনের প্রয়োজন আছে একথা স্বীকার করা হলেও প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন প্রাণীর আচরণ ক্রমশ অসফল স্তর থেকে সফল স্তরে উন্নীত হয় এবং শেষে প্রাণী ঐ সন্তোষজনক আচরণটি কি ভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়?

এর একটি উত্তর হল যে প্রাণীর স্মৃতি বা মনে রাখার ক্ষমতা আছে বলেই তার শিখন সম্ভব হয়। অর্থাৎ প্রাণী বর্তমানে যে আচরণটি সম্পন্ন করে অভীষ্ট লাভে সমর্থ হল সেটি সে মনে রাখে এবং পরবর্তী কালে ঐ পরিস্থিতিতে সে অন্য কোন আচরণ না করে ঐ সফল আচরণটি সম্পন্ন করে। পরিবেশের চাহিদা মেটানোর জন্য সে পরে তার ঐ আচরণেরও আবার উন্নয়ন ঘটায় এবং এইভাবে তার আচরণ ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলে।

স্মৃতি বা মনে রাখা শিখনের একটা মুখ্য কারণ হলেও সব ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের দ্বারা শিখনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। আরও কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

শিখন সংঘটিত হবার একটি শক্তিশালী কারণ রূপে আমরা থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রটির উল্লেখ করতে পারি। এই সূত্রটির অর্থ হল যে শিখনের শেষে প্রাণী তৃপ্তি লাভ করে সে শিখন নিজে নিজেই তার মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায় এবং তার মধ্যে স্থায়ী আচরণধারা রূপে থেকে যায়। অপর পক্ষে যে শিখনের ফল প্রাণীর কাছে অতৃপ্তিকর সে শিখন নিজে নিজেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিড়ালটির ক্ষেত্রে যে আচরণের দ্বারা সে খাঁচা খুলে তার খাদ্যে গিয়ে পৌঁছল সেই আচরণটি তার মধ্যে স্থায়ী ভাবে থেকে গেল, কিন্তু যে সব আচরণের দ্বারা সে দরজা খুলতে পারে নি এবং তার অভীষ্ট খাদ্যলাভে সমর্থ হয় নি সেই আচরণগুলি সে স্বাভাবিকভাবেই ভুলে গেল। থর্নডাইকের এই সূত্রটির দ্বারা কেন প্রাণী শেখে এবং কেনই বা সেই শিখন তার মধ্যে থেকে যায় তার একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়ার কয়েকটি প্রকারভেদ

সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়াটির আমরা কয়েকটি শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ করতে পারি। যথা—

প্রথম, রিফ্লেক্সমূলক সঙ্গতিবিধান। অধিকাংশ শরীরতত্ত্বমূলক সঙ্গতিবিধান রিফ্লেক্সের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন, অতিরিক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হলে আমরা হাই তুলি, অর্থাৎ হাঁ করে বাইরের থেকে অতিরিক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করি। এই রকম হাঁচা, কাসা, ঢেকুর তোলা, চোখে কিছু ঢোকবার উপক্রম হলে চোখ বন্ধ করা ইত্যাদি হল রিফ্লেক্সমূলক সঙ্গতিবিধান। একটি বিষয় দ্রষ্টব্য যে

এই ধরনের সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে আমাদের কোনও শিখনের প্রয়োজন হয় না। রিফ্লেক্স হল প্রকৃতিদত্ত সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়া বিশেষ। অনেক ক্ষেত্রে রিফ্লেক্স সচেতন প্রকৃতির হয়, আবার অচেতন প্রকৃতিরও হয়। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই রিফ্লেক্স ইচ্ছাবর্জিত হয়ে থাকে অর্থাৎ তার ব্যবহারে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইচ্ছার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয়, প্রবৃত্তিমূলক সঙ্গতিবিধান। রিফ্লেক্সের মত প্রবৃত্তিও প্রকৃতিদত্ত সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়া বিশেষ। ভয়ের কোন বস্তু সামনে দেখলে সেই বস্তু থেকে পালান এই ধরনের প্রবৃত্তিমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত। রেগে গেলে আক্রমণ করা, একা থাকলে সঙ্গ খোঁজা, নতুন বস্তু জানা বা দেখার জন্য কৌতূহলী হওয়া ইত্যাদি হল প্রবৃত্তিমূলক সঙ্গতিবিধানের উদাহরণ।

তৃতীয়, অনুবর্তনমূলক সঙ্গতিবিধান। অনেক সঙ্গতিবিধান প্রাণী অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখে থাকে। প্যাভলভ তাঁর প্রসিদ্ধ পরীক্ষণে দেখিয়েছেন যে খাবার সময় কুকুরের যে লালাক্ষরণ হয় খাবার সময় যদি কয়েকদিন পর পর ঘণ্টা বাজানো হয় তাহলে কিছুদিন পরে সেই লালাক্ষরণ প্রক্রিয়াটি খাবার না দিলেও কেবল ঘণ্টা বাজানোর উত্তরেও সম্পন্ন হতে পারে। অর্থাৎ যে খাদ্যরূপ উদ্দীপকের উত্তরে লালাক্ষরণ রূপ প্রক্রিয়াটি ঘটে থাকে, বিশেষ পরিস্থিতিতে ঘণ্টা বাজানো রূপ উদ্দীপকের উত্তরে সেই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে পারে। এইভাবে এক উদ্দীপক থেকে আর একটি উদ্দীপকে কোনও বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চালনকে অনুবর্তন বলা হয়।[১]

প্রাণীর জীবনে এই ধরনের অনুবর্তনের দৃষ্টান্ত অসংখ্য পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বিদ্যালয়ে যিনি গণিত পড়ান তিনি হয়ত এমন পদ্ধতির অনুসরণ করেন যা শিক্ষার্থী বুঝতে পারে না। ফলে দেখা গেল যে ঐ গণিতের শিক্ষককে শিক্ষার্থী ভয় করতে স্নরু করল কিংবা গণিত শাস্ত্রটির উপরই তার বিরাগের সৃষ্টি হল। তা থেকে হয়ত কালক্রমে সমগ্র বিদ্যালয়ের উপরই তার বিরূপ মনোভাব জাগল যার ফলে বিদ্যালয়ে যাওয়াটাই তার কাছে অপ্রীতিকর হয়ে উঠল। এই রকম বহু অনুবর্তনমূলক সঙ্গতিবিধান, বিশেষ করে প্রক্ষোভমূলক আচরণের ক্ষেত্রে, আমাদের মধ্যে দেখা যায়।

চতুর্থ, অচেতন সঙ্গতিবিধান। প্রাণী অনেক সময় এমন আচরণ করে যার কারণ সে জানে না। প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ একটি পরিস্থিতি বা

১। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান পৃঃ ১২২ (২য় খণ্ড)

ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করার জন্য সে ঐ আচরণটি সম্পন্ন করেছে, কিন্তু সেটি সে সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই করেছে। যেমন, এক ব্যক্তি প্রচণ্ড দুর্ভাবনায় ভুগছে। সে বিনা কারণে কোন নির্দোষ ব্যক্তির সঙ্গে চেঁচামেচি করার পর দেখা গেল যে তার সে দুর্ভাবনা সাময়িকভাবে চলে গেছে। অর্থাৎ সে তার ঐ দুর্ভাবনাগ্রস্ত মানসিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য চেঁচামেচি করেছে। কিন্তু সেটা তার কাছে জানা নেই। একেই আমরা অচেতন সঙ্গতিবিধান বলে বর্ণনা কবতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ফ্রয়েড এই ধরনের বহু অচেতন সঙ্গতিবিধানের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চমত, প্রতীকমূলক সঙ্গতিবিধান। প্রাণী যে সব সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণ অঙ্গসঞ্চালন বা শারীরিক আচবণের মাধ্যমে সম্পন্ন করে সেগুলিকে আমরা মূর্ত এবং প্রতীকবর্জিত সঙ্গতিবিধান বলতে পারি।

কিন্তু প্রাণী বহু সঙ্গতিবিধান সম্পন্ন করে শব্দ বা কথার দ্বাবা। বস্তুত আমাদের সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়ায় ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কথা বলা হল উচ্চারিত ভাষা এবং অনুচ্চারিত ভাষা হল চিন্তা করা, এ দুটি প্রক্রিয়াই আমাদেব সঙ্গতিবিধানে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কথা বলা ও চিন্তা করা—এ দুইই হল প্রতীকমূলক আচরণ। প্রতিরূপ (image), সামান্য ধারণা (concept), ভাষা, সংখ্যা—এ সবই হল প্রতীক এবং আমার চিন্তা করা, কথা বলা, কল্পনা করা প্রভৃতি কাজ এই সব প্রতীকের সাহায্যে সম্পন্ন করে থাকি।

সঙ্গতিবিধানেব ক্ষেত্রে শিশু থেকে সুরু করে বয়স্ক ব্যক্তিরা ব্যাপকভাবে ভাষার আশ্রয় নিয়ে থাকে। সামাজিক পরিবেশে সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে কথাবার্তা, আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু উন্নত সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে চিন্তার ভূমিকাই সর্বপ্রধান। চিন্তারই মাধ্যমে আমরা জটিল সমস্যার সমাধান করে থাকি এবং জটিল পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হই। চিন্তা প্রক্রিয়া যত সমৃদ্ধ হবে সঙ্গতিবিধানও তত উন্নত ও কার্যকর হয়ে উঠবে। সভ্যতার অগ্রগতি মানেই হল উন্নততর সঙ্গতিবিধান এবং উন্নত চিন্তাই সেই উন্নততর সঙ্গতিবিধানে মানুষকে সক্ষম করে।

সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়ার গুণগত প্রকারভেদ

—সমন্বয়ধর্মী, অসমন্বয়ধর্মী ও অ-সঙ্গতিবিধানমূলক

গুণ বা উৎকর্ষের দিক দিয়ে আমরা সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টাকে দু'ভাগে ভাগ

করতে পারি, যথা—সমন্বয়ধর্মী (integrative) এবং অ-সমন্বয়ধর্মী (non-integrative)। এছাড়াও এক প্রকৃতির আচরণ আছে যেগুলিকে আমরা অ-সঙ্গতিবিধানমূলক (non-adaptive) বলে বর্ণনা করতে পারি।

যে সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণের দ্বারা ব্যক্তির চাহিদার তৃপ্তি হয় এবং তার মধ্যে চাহিদাজনিত যে শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার উপশম ঘটে তাকেই আমরা সমন্বয়ধর্মী সঙ্গতিবিধান বলতে পারি। সঙ্গতিবিধান যদি সমন্বয়ধর্মী হয় তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার সংগঠন সুষ্ঠু ও সুষম হয় এবং তার জীবনযাপন সন্তোষজনক ও অগ্রগতিমূলক হয়ে ওঠে। ব্যক্তির আচরণের এই সমন্বয়ধর্মিতা আবার নানা মাত্রার হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টা আংশিক সমন্বয়ধর্মী হতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তির চাহিদার পূর্ণ তৃপ্তি না ঘটলেও চাহিদার আংশিক তৃপ্তির ফলে ব্যক্তির উত্তেজনার উপশম ঘটতে পারে এবং ব্যক্তি সাময়িকভাবে সুস্থ জীবনযাপনে সমর্থ হয়।

যে সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টা ব্যক্তির চাহিদা মেটাতে পারে না এবং তার শারীরিক উত্তেজনার উপশম ঘটায় না তাকে আমরা অসমন্বয়ধর্মী সঙ্গতিবিধান বলতে পারি। এক্ষেত্রে প্রচেষ্টাটি ব্যক্তির চাহিদা মেটাতে না পারলেও পরিবেশের শক্তিসমষ্টির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে ব্যক্তিকে সমর্থ করে এবং আচরণটি সে কারণে সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টার পর্যায়ে পড়ে যদিও তা বাঞ্ছিত ও সুষ্ঠু পন্থা নয়।

ব্যক্তি যখন পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিবিধান করতে সক্ষম হয় না এবং এমন আচরণ করে যা তার উত্তেজনাকে তীব্রতর করে তোলে তখন সে আচরণকে অ-সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণ বলে। এ সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রায়ই তার মানসিক সাম্য হারিয়ে ফেলে এবং তার মধ্যে বিকলতা দেখা দেয়।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the role of frustration in creating maladjustment in the individual.

Ans. (পৃঃ ৩৩০—পৃঃ ৩৩৩)

2. Describe the relation between frustration and aggression and between frustration and regression.

Ans. (পৃঃ ৩৩২—পৃঃ ৩৩৩)

3. Discuss the relation between adjustment and learning.

Ans. (পৃঃ ৩৩৩—পৃঃ ৩৩৫)

4. Write notes on :—

Integrative, Non-integrative & Non-adaptive Adjustment.

Ans. (পৃঃ ৩৩৭—পৃঃ ৩৩৮)

একত্রিশ

সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণের বিভিন্নতা

সঙ্গতিবিধান মানুষের জীবনে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। এর দ্বারা ব্যক্তি তার চাহিদার তৃপ্তি সাধন করে, তার শারীরিক অস্থিরতা ও মানসিক উত্তেজনার প্রশমন ঘটায় এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় এসে উপনীত হয়। মোটামুটি ভাবে যে প্রক্রিয়ার দ্বারাই ব্যক্তি তার কোনও চাহিদা মেটাতে এবং তার সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয় তাকেই সঙ্গতি-বিধানমূলক প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে।

স্পষ্টতই সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণের এই ব্যাপকতার জন্য এটি নানা বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। সব ক্ষেত্রেই যে সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণটি প্রত্যক্ষভাবে এবং সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ভাবে ব্যক্তির সমস্যার সমাধান করতে পারে তা নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই পরিপূরক এবং আংশিক সন্তোষজনক প্রচেষ্টা রূপে সেটি প্রকাশ পেতে পারে। যে ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল ফল করে স্কুলে তার প্রতিষ্ঠা লাভ করল সে প্রত্যক্ষভাবে এবং সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ভাবে তার চাহিদার তৃপ্তি লাভ করল। কিন্তু যে ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল ফল করতে না পেরে খেলাধূলায় বা অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখিয়ে স্কুলে তার প্রতিষ্ঠা আদায় করল সে ক্ষেত্রে তার সঙ্গতিবিধান হল পরিপূরক আচরণ বিশেষ এবং আংশিক সন্তোষজনক। আবার যে ছেলেটি চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, মারধর করা ইত্যাদি বিকৃত পন্থার আশ্রয় নিয়ে স্কুলে তার প্রতিষ্ঠা আদায় করল সে ক্ষেত্রেও তার সঙ্গতিবিধান হল পরিপূরক আচরণ কিন্তু প্রকৃতিতে বিকৃত এবং একান্তভাবেই আংশিক সন্তোষজনক।

এই তিন ক্ষেত্রেই সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণ বিভিন্ন হলেও সব কটি আচরণই ব্যক্তিকে সঙ্গতিবিধানে সাহায্য করেছে এবং তার চাহিদার তৃপ্ত করে তার মানসিক উত্তেজনার প্রশমন করেছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আচরণ বিকৃত হলেও সেটি সঙ্গতিবিধানমূলক ও চাহিদার তৃপ্তিদায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই বিভিন্ন আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে শেফার এবং শোবেন তাঁদের পুস্তকে সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।[1] তারা এই শ্রেণীবিভাগটি করেছেন আচরণের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা বা পার্থক্য অনুযায়ী। যথা—

১। প্রতিরক্ষামূলক সঙ্গতিবিধান (Adjustment by Defence)

২। পলায়নমূলক সঙ্গতিবিধান (Adjustment by Escape)

---

1. The Psychology of Adjustment :: Shaffer and Shoben

৩। ভীতিমূলক ও অবদমনমূলক সঙ্গতিবিধান
(Adjustment involving Fear and Repression)

৪। অসুস্থতামূলক সঙ্গতিবিধান (Adjustment by Ailments)

৫। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থা (Anxiety States)

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণ সমন্বয়ধর্মী আবার অ-সমন্বয়ধর্মী হতে পারে।[১] উপরে যে বিভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গতিবিধান-মূলক আচরণের উল্লেখ করা হল সেগুলি বিভিন্ন মাত্রায় সমন্বয়ধর্মী হয়ে থাকে। অর্থাৎ সেগুলির ব্যক্তির চাহিদার তৃপ্তি দান ও উত্তেজনার উপশম করার ক্ষমতা বিভিন্ন মাত্রায় হতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টা অ-সমন্বয়ধর্মী হয়েও ওঠে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে ব্যক্তির সকল প্রচেষ্টাই তার চাহিদার তৃপ্তিসাধন ও উত্তেজনার উপশম ঘটানোর জন্য সৃষ্ট। তবে কতটা সেগুলি তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে সেটা নির্ভর করে ব্যক্তির বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞতা এবং সমস্যার প্রকৃতি ও দুরূহতার উপর।

উপরে যে বিভিন্ন ধরনের সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণগুলির উল্লেখ করা হল সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

১। প্রতিরক্ষামূলক সঙ্গতিবিধান

প্রতিরক্ষামূলক আচরণ নানা বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আচরণ পরিপূরক (Compensatory Behaviour) আচরণের রূপ নেয়।

পরিপূরক আচরণ

অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাভাবিক বা বাঞ্ছিত পথে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে ব্যর্থ হয়ে তার পরিবর্তে কোনও বিকল্প বা পরিপূরক আচরণ সম্পন্ন করে তার চাহিদা তৃপ্ত করে। এই বিকল্প আচরণের দ্বারা তার পূর্বের অভীষ্টলাভে সে পূর্ণভাবে সমর্থ না হলেও আংশিকভাবে সে তার সেই অভীষ্ট লাভ করতে পারে কিংবা ঐ অভীষ্টের পরিবর্তে একটি বিকল্প অভীষ্ট স্থাপন করে সেইটি সে লাভ করে। যেমন, যে ছেলেটি স্কুলের লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখাতে না পেরে এবং শিক্ষক সহপাঠীদের কাছে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদাটি পরিতৃপ্ত করার জন্য নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা বাহাদুরির গল্প বলে বেড়াতে লাগল কিংবা তার চেয়ে বয়সে ছোট বা দুর্বল ছেলেমেয়েদের মারধর সুরু করল, কিংবা তার বন্ধুবান্ধবদের ছোটখাট জিনিষপত্র চুরি করা আরম্ভ করল সে ছেলেটি প্রকৃতপক্ষে পরিপূরক আচরণের সাহায্যে তার চাহিদার তৃপ্তি করছে।

১। পৃঃ ৩৩৭

এই প্রতিরক্ষামূলক আচরণগুলি সাধারণত আক্রমণধর্মী এবং বেশ কল্পনাধর্মী হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে প্রথমে সাময়িক ভাবে ব্যক্তির মধ্যে ব্যর্থতার বোধ জাগে। পরে সেই ব্যর্থতার বোধ থেকে ব্যক্তির মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগে এবং সৃষ্টি হয় শারীরিক অস্থিরতা। এ দুটি থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে একটি বিকল্প অভীষ্ট স্থাপন করে এবং পরিপূরক আচরণের দ্বারা সে বিকল্প লক্ষ্যটিতে গিয়ে পৌঁছয়। উপরে উল্লিখিত ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল ফল না দেখাতে পেরে খেলাধূলায় পারদর্শিতা দেখায়, ছোট ছেলেদের মারধর করা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, প্রভৃতি পরিপূরক নানা ধরনের আচরণের সাহায্যে তার বিকল্প অভীষ্ট লাভ করে।

প্রতিরক্ষামূলক আচরণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ব্যক্তির মধ্যে প্রায়ই একটা হীনমন্যতার অনুভূতি তৈরী হয়। যেহেতু সে স্বাভাবিক পন্থায় অনুমোদিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারল না, সেহেতু তার মধ্যে নিজের সম্বন্ধে একটি হীনমন্যতার বোধ জাগে এবং সে বিভিন্ন ধরনের আচরণের দ্বারা নিজের সম্বন্ধে ঐ হীনমন্যতার বোধকে দূর করার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত এই হীনমন্যতার বোধের সঙ্গে তার মধ্যে একটা দুশ্চিন্তার অনুভূতিও তৈরী হয়। যেহেতু সে আর সকলের মত অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না, সেহেতু তার মধ্যে সমাজের নিন্দা, শাস্তি, সমালোচনা ইত্যাদি নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা তার মনকে ব্যাপৃত করে রাখে। তখন কোনও প্রতিরক্ষামূলক আচরণের আশ্রয় নিয়ে সে দুশ্চিন্তাটি দূব করার চেষ্টা করে। এই ধরনের প্রতিরক্ষামূলক আচরণ আবার নানা রূপ নিতে পারে। যেমন :—

প্রতিক্রিয়া সংগঠন

প্রতিরক্ষামূলক আচরণের একটি বিশেষ প্রকার হল প্রতিক্রিয়া সংগঠন কখনও কখনও কোন অবদমিত ইচ্ছাকে অস্বীকার করার জন্য ব্যক্তি সেই ইচ্ছার বিপরীত মনোভাবটি প্রকাশ করে বা প্রত্যাশিত আচরণের বিপরীত আচরণটি সম্পন্ন করে। এই কৌশলটিকে প্রতিক্রিয়া সংগঠন (Reaction Formation) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কারও প্রতি ঘৃণা বা রাগ রূপান্তরিত হয়ে তার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ বা ভালবাসার রূপ নিতে পারে। ঈডিপাস কমপ্লেক্স বা কাস্ট্রেসন কমপ্লেক্স থেকে জাত পিতার প্রতি বিদ্বেষ প্রতিক্রিয়া সংগঠনের ফলে পিতার জন্য অতিরিক্ত উদ্বেগে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

অপব্যাখ্যান

যখন আচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা কারণের পরিবর্তে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বা সমাজ-অনুমোদিত কোন উদ্দেশ্য বা কারণ উপস্থাপিত করা হয় তখন সেই

আচরণটিকে অপব্যাখ্যান (Rationalisation) বলা যেতে পারে। এই ধরনের কৌশলের দ্বারা ব্যক্তির অহংসত্তা তার আচরণটির সত্যকার উদ্দেশ্য বা কারণটি প্রকাশ করার অবাঞ্ছিত কাজ থেকে রেহাই পায়। অবশ্য প্রকৃত কারণটা গোপন রেখে অন্য একটি কারণ উপস্থাপিত করার এই কাজটি সম্পূর্ণ অচেতন-ভাবেই ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যে কারিগর তার নিজের অকর্মণ্যতার জন্য তার যন্ত্রপাতির দোষ দেয় বা যে নর্তকী তার নৃত্যকলার অজ্ঞতার দায়িত্ব উঠোনের উপর চাপায়, সেই কারিগর বা নর্তকী নিজের আত্মরক্ষার জন্য অপব্যাখ্যানেরই আশ্রয় নিচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টায় আমরা এই ধরনের বহু অপব্যাখ্যানের সাহায্য নিয়ে থাকি।

প্রতিক্ষেপণ

প্রতিক্ষেপণ (Projection) অপব্যাখ্যানের একটি বিশেষ প্রকার মাত্র। এই কৌশলটিতে ব্যক্তি তার অহংসত্তার অতৃপ্ত কামনাটি বাইরের জগতের উপর প্রতিক্ষিপ্ত করে। যেমন, কোন স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অচেতনে নিহিত ঘৃণাটি প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীর মনে এই ধারণার সৃষ্টি করতে পারে যে তার প্রতিই তার স্বামীর আসক্তি নেই বা স্বামীই তাকে ঘৃণা করে।

উন্নীতকরণ

পরিপূরক আচরণের মাধ্যমে সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে উন্নীতকরণই (Sublimation) সর্বোৎকৃষ্ট। এই কৌশলের দ্বারা ব্যক্তির পক্ষে অচেতনে অবদমিত অতৃপ্ত কামনার আংশিক তৃপ্তি দেওয়া সম্ভব হয়। এই প্রক্রিয়াটিতে ব্যক্তি কোন কামনাকে তার নিম্নশ্রেণীর লক্ষ্য থেকে সরিয়ে এনে কোন উন্নত শ্রেণীর লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক সমাজে যৌন মিলনের ইচ্ছা উন্নীত হয়ে ক্লাব, পার্টি, সহনৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে নরনারীর মধ্যে অবাধ মেলামেশায় পরিণত হয়েছে, আক্রমণাত্মক কামনা বক্সিং, কুস্তি ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার রূপ নিয়েছে।

প্রতিক্রিয়া সংগঠন, অপব্যাখ্যান, প্রতিক্ষেপণ ও উন্নীতকরণ প্রভৃতি সঙ্গতি-বিধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি তার চাহিদার তৃপ্তি লাভ করে এবং সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধান করতে সক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়াগুলি মোটামুটিভাবে সমন্বয়ধর্মী এবং ব্যক্তির উত্তেজনার প্রশমন করে থাকে।

১। পলায়নমূলক সঙ্গতিবিধান

বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে যথাযথ সঙ্গতিবিধান

করতে না পেরে ব্যক্তি সেই পরিবেশ থেকে পলায়ন করছে। যখনই ব্যক্তি বোঝে যে তার সম্মুখস্থ বাধা তার পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব নয় বা যে সমস্যার সে সম্মুখীন হয়েছে তার সমাধান করা তার আয়ত্তের মধ্যে নয় তখন সে সেই পরিস্থিতি থেকে সরে দাঁড়ায়। যদিও এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সে তার বাধা অতিক্রম করতে পারে না বা তার সমস্যার সমাধান করতেও সমর্থ হয় না, তবুও এই ভাবেই সে পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে নেয় এবং নিজের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বেরও সমাধান করে। সেদিক দিয়ে আমরা পলায়নধর্মী আচরণকে সমন্বয়ধর্মী সঙ্গতিবিধান বলে বর্ণনা করতে পারি।

পলায়নধর্মী সঙ্গতিবিধান যে সব সময় অসন্তোষজনক হয় তা নয়। যদি সত্য সত্যই পরিবেশ এমন হয় যে যেখানে ব্যক্তির নিরাপত্তা ব্যাহত হচ্ছে তাহলে পলায়নধর্মী আচরণ যথেষ্টই যুক্তিযুক্ত আচরণ। কিন্তু যেখানে পরিবেশ সমস্যামূলক হলেও ব্যক্তিব পক্ষে সে সমস্যাব সম্মুখীন হওয়া সম্ভব এবং তার মঙ্গলেব জন্য তাব তা করা উচিতও, সেখানে পলায়নধর্মী আচরণ কোন প্রকারেই যথাযথ সঙ্গতিবিধান হতে পারে না। তাছাড়া বারবার পলায়নধর্মী আচরণ করতে করতে ব্যক্তি তার প্রেরণা, উদ্যম, প্রচেষ্টা সব হারিয়ে ফেলে এবং সকল রকম সামাজিক পরিবেশেই সে পলায়নধর্মী আচরণের আশ্রয় নেয়। তখন সঙ্গতিবিধান হয়ে দাঁড়ায় অ-সমন্বয়ধর্মী এবং ব্যক্তির সুস্থ ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পরিপন্থী। যেখানে ব্যক্তির পলায়নধর্মী আচরণ মাত্রা ছাড়িয়ে যায় সেখানে গভীর মনোবৈজ্ঞানিক বিকর্ততা দেখা দেবারও সম্ভাবনা থাকে।

কয়েকটি প্রধান পলায়নধর্মী সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টাব নীচে উল্লেখ করা হল। যথা—

(ক) প্রত্যাহরণ (Withdrawal) (খ) স্কিৎসোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) (গ) নেতিবাচকতা (Negativism) (ঘ) দিবাস্বপ্ন ও অবাস্তব কল্পনা (Daydreaming and Fantasy) (ঙ) প্রত্যাবৃত্তি (Regression)।

(ক) প্রত্যাহরণ

নিজেকে অপরের কাছ থেকে প্রত্যাহৃত করে নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা এক ধরনের সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টা। যখন ব্যক্তির কোনও শক্তিশালী চাহিদা বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন সে নানা বিভিন্ন ধরনের আচরণ করে তার সেই চাহিদাটি তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। অনেক সময় দেখা যায় যে তার কাম্য পন্থায় চাহিদাটির তৃপ্ত করতে না পেরে সে বিচ্ছিন্নতা বা নিঃসঙ্গতা রূপ আচরণের আশ্রয় নেয়।

এর দ্বারা তার চাহিদা প্রত্যক্ষভাবে তৃপ্ত না হলেও তার উত্তেজনার প্রশমন ঘটে এবং সে তার মানসিক সাম্য ফিরে পায়। লাজুকতাও প্রত্যাহরণের আর একটি অতিসাধারণ দৃষ্টান্ত।

বিচ্ছিন্নতা বা নিঃসঙ্গতা

চাহিদার তৃপ্তি করতে না পারলে এই ধরনের নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রচেষ্টা অন্যান্য সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টার চেয়ে অনেক দিক দিয়ে ব্যক্তির কাছে কাম্য। তার প্রথম কারণ হল যে এই পন্থাটি খুব সহজেই এবং কোন রকম আয়াস না করেই গ্রহণ করা যায় এবং তার মানসিক উত্তেজনা ও অস্থিরতার অবসান ঘটায়। দ্বিতীয়, যেহেতু যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতা (Isolation) ও নিঃসঙ্গতার (Seclusiveness) আশ্রয় নেয় সে ব্যক্তি সমাজ বা গোষ্ঠীর আর কারও কাছে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না সেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার আচরণ কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না এবং তাকে কারও সমালোচনা বা নিন্দার সম্মুখীন হতে হয় না। তার ফলে তার এই সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা কোন রকম বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

লাজুকতা

এই বিচ্ছিন্নতা বা নিঃসঙ্গতার একটি রূপ হল লাজুকতা (Shyness or Timidity)। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঠিক অনুরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন তাদের কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রেষণা প্রতিহত হয় তখন তারা তাদের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকে এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়। তার ফলে তারা বন্ধুবান্ধব মহলে লাজুক বলে পরিচিত হয় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পিতামাতা, শিক্ষকশিক্ষিকাদের কাছে প্রশংসার পাত্র বা পাত্রী হয়ে ওঠে। তার এই আচরণ যে গুরুতর প্রকৃতির অপসঙ্গতির লক্ষণ এটা সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারে না। এই ধরনের আচরণ যে ব্যক্তির উত্তেজনা দূর করে এবং সেদিক দিয়ে সমন্বয়ধর্মী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(খ) স্কিৎসোফ্রেনিয়া

এই আত্মপলায়নের প্রচেষ্টা যখন খুব তীব্র মাত্রার হয়ে ওঠে তখন তা মানসিক ব্যাধির আকার নেয় এবং ব্যক্তি তার ব্যক্তিসত্তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এটা এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে যখন সে আর বাস্তবের সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ রাখারই চেষ্টা করে না। তখন সে বাস্তব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি সত্তাসম্পন্ন মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অবস্থাকে অটিজম (autism) বলে।

বড়দের ক্ষেত্রে চরম অবস্থায় এটি স্কিৎসোফ্রেনিয়া নামক (Schizophrenia) মানসিক বিকৃতির আকার ধারণ করে।

প্রত্যাহরণের একটি চরম ক্ষেত্রের নাম হল স্কিৎসোফ্রেনিয়া এটি সম্পূর্ণরূপে অ-সমন্বয়ধর্মী আচরণ এবং ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার সুষম সংগঠনের ভীষণ রকম পরিপন্থী।

বাস্তব থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়াই হল এর প্রধান লক্ষণ। তার সঙ্গে জড়িত থাকে সাধারণ দৈনন্দিন কাজকর্মের প্রতি তীব্র অনীহা, অপরের সঙ্গে স্বাভাবিক আদানপ্রদানের অক্ষমতা, পরিস্থিতির সম্পূর্ণ অনুপযোগী প্রক্ষোভ-মূলক অভিব্যক্তি এবং বাস্তবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন অদ্ভুত কথাবার্তা, আচরণ ও ভাবভঙ্গী। প্রকৃতপক্ষে এগুলি নিঃসঙ্গতা বা প্রত্যাহারমূলক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি যে ধরনের আচরণ করে থাকে সেগুলিরই বহুগুণ অতিরঞ্জিত রূপমাত্র।

স্কিৎসোফ্রেনিয়ার কারণ সম্বন্ধে এখনও মনোবিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ নন। তবে সকলেব মতেই এর একটা শরীরতত্ত্বমূলক কারণ আছে অর্থাৎ মস্তিষ্কের কোনও অজ্ঞাত ত্রুটি থেকে এর জন্ম। তবে সেই সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক কারণও এব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধানে অসমর্থ হয়ে ব্যক্তি যখন প্রত্যাহারমূলক আচরণের আশ্রয় নেয় তখনই স্কিৎসোফ্রেনিয়া তীব্র মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করে। আবার একথাও সত্য যে যারা স্কিৎসোফ্রেনিয়ার প্রবণতা নিয়ে জন্মায় তারা সঙ্গতিবিধানমূলক সমস্যার সম্মুখীন হলে অন্য কোনও রকম প্রচেষ্টার সাহায্য না নিয়ে প্রথমেই প্রত্যাহারমূলক প্রচেষ্টার আশ্রয় নেয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে স্কিৎসোফ্রেনিয়ার শরীরতত্ত্বমূলক কারণটি পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে এবং স্কিৎসোফ্রেনিয়ার সব লক্ষণগুলি পূর্ণভাবে তাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এক কথায় স্কিৎসোফ্রেনিয়ায় শরীরতত্ত্বমূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক কারণগুলি পরস্পরের পরিপূরক ও পরিপোষক।

স্কিৎসোফ্রেনিয়াকে মনোবিজ্ঞানীরা চার ভাগে ভাগ করে থাকেন। যথা—
১। সরল প্রকৃতির (Simple)—এটি সাধারণত বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার রূপে অভিব্যক্ত হয়। ২। হেবেফ্রেনিক (Hebephrenic)—এই শ্রেণীর স্কিৎসো-ফ্রেনিয়ায় প্রক্ষোভমূলক বিভ্রান্তি ও অর্থহীন আচরণের ঘটনা বেশী দেখা যায়। ৩। ক্যাটাটনিক (Catatonic)—এই শ্রেণীতে ব্যক্তির মধ্যে একই ধরনের এবং যান্ত্রিক প্রকৃতির আচরণ দেখা যায় এবং ৪। প্যারানয়েড (Paranoid) —এই ধরনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে কিছু কিছু বিভ্রান্তিমূলক পরিপূরক আচরণ

দেখা দেয়, যেমন অপরের দ্বারা পীড়িত হবার বিভ্রান্তি এবং তা থেকে জাত নানা অস্বাভাবিক আচরণ।

(গ) নেতিবাচকতা

প্রত্যাহারমূলক আচরণ সব সময়েই নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির হয় না। অনেক সময় তা প্রতিরক্ষামূলক আচরণের মতই আক্রমণধর্মী আচরণের রূপ নেয়। যখন ব্যক্তির প্রত্যাহারমূলক আচরণ একগুঁয়েমি, জেদ, কোন কাজ করতে সক্রিয় অসম্মতি, পরস্পরবিরোধী আচরণ এবং বহির্জগতের দাবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইত্যাদি রূপ গ্রহণ করে তখন তাকে নেতিবাচকতা (Negativism) বলা হয়! এই ধরনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানমূলক প্রচেষ্টা আংশিক নিঃসঙ্গতাধর্মী, আবার আংশিক আক্রমণধর্মী।

ব্যক্তির নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টায় বাধার সৃষ্টি করলে তার মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব দেখা দেয়। ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিশেষ করে যৌবনপ্রাপ্তির সময় যখন তারা তাদের পছন্দমত কাজ করার পথে বাধা পায় তখন তারা নেতিবাচক সঙ্গতিবিধানের পন্থা গ্রহণ করে। তখন তারা একগুঁয়ে ও জেদী হয়ে ওঠে, কোন কিছু করতে বললে সরাসরি অসম্মতি প্রকাশ করে, সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধিতা করে এবং তার পক্ষে যে সব কাজ করণীয় সেগুলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রায়ই তার মধ্যে একটা ক্রুদ্ধ মনোভাব দেখা যায় এবং সকল প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত তত্ত্ব ও রীতিনীতি মেনে নিতে সে অস্বীকার করে। এই ধরনের সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টা মূলত পলায়নধর্মী বাস্তব সমস্যা বা বাধাকে এড়িয়ে যাবারই প্রচেষ্টা বিশেষ। তবে তা প্রকাশ পায় সক্রিয় প্রতিরোধে ও আক্রমণধর্মী আচরণের রূপে।

এ সব ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব সতর্কতার সঙ্গে আচরণ করতে হয়। কোন কিছু তাদের জোর করে বললে তারা অসম্মত হয় এবং তার ফলে তখন পিতামাতারা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষে এসে যান। এক্ষেত্রে যদি পিতামাতা তাদের অবদমন করার চেষ্টা করেন তাহলে পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে ওঠে এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গতিবিধানের সমস্যা আরও তীব্র হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বিচক্ষণ উপায় হল মধ্য পন্থা গ্রহণ করা। এই সময় ছেলেমেয়েদের স্বাধীন কাজে যতটা সম্ভব বাধা না দেওয়া এবং সেই সঙ্গে পরিবারের বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পন্ন কাজে তাদের অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। তার

ফলে তাদের নেতিবাচক মনোভাব ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে এবং তারা স্বাভাবিক সঙ্গতিবিধানের পথে ফিরে আসবে।

(ঘ) দিবাস্বপ্ন বা অবাস্তব কল্পনা

প্রত্যাহারমূলক সঙ্গতিবিধানের আর একটি অতি প্রচলিত পন্থা হল দিবাস্বপ্ন বা অবাস্তব কল্পনার (Day-dreaming or Fantasy) আশ্রয় গ্রহণ করা। দিবাস্বপ্ন বা অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় নিতে কোন পরিশ্রম বা আয়াসের প্রয়োজন হয় না বলে এবং যখনই ব্যক্তির ইচ্ছা তখনই সে এই পন্থা গ্রহণ করতে পারে বলেই দিবাস্বপ্ন বা অবাস্তব কল্পনা খুব একটা প্রচলিত ও বহুল ব্যবহৃত সঙ্গতি-বিধানমূলক আচরণ।

সকল ব্যক্তিই জীবনে অল্পবিস্তর দিবাস্বপ্ন দেখে থাকে এবং এটি যে সবক্ষেত্রেই অপসঙ্গতির দৃষ্টান্ত তা নয়। বহু সুসঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিই দিবাস্বপ্ন দেখে থাকেন। তবে সকলেই এ নিয়ে বাইরে আলোচনা করেন না বা কাউকে নিজের দিবাস্বপ্ন সম্বন্ধে কিছু বলেন না। নিজের দিবাস্বপ্নকে তাঁরা অনেকটা নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার রূপে গোপন রেখে থাকেন।

কিন্তু যখন ব্যক্তি স্বাভাবিক পন্থায় সঙ্গতিবিধান করতে না পেরে দিবাস্বপ্নের সাহায্যে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করে এবং তার মানসিক উত্তেজনার উপশম ঘটায় তখন সেই সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টা অবশ্যই সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রকৃতির নয়। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার কর্মোদ্যম, প্রচেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে এবং যখনই কোনও চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টায় বাধার সম্মুখীন হয় তখনই সে দিবাস্বপ্নের সাহায্যে তার সমস্যার সমাধান করে এবং তার মানসিক উত্তেজনার উপশম ঘটায়।

শৈশবে শিশুদের দৈনন্দিন খেলার মধ্যে অবাস্তব কল্পনার প্রভাব দেখা যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে সে প্রকাশ্যে কথা বলে তার কল্পনাকে প্রকাশ করে। আর একটু বড় হলে সে অবশ্য কোন্ কল্পনাটি বাস্তব আর কোন্‌টি অবাস্তব তা বুঝতে শেখে।

ছেলেমেয়েদের দিবাস্বপ্ন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্ম-অভিব্যক্তির সূচক। যে যত বড় হয় তত তার কল্পনার আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্ম-অভিব্যক্তির প্রচেষ্টাগুলি বাস্তবে কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় তার এই প্রচেষ্টাগুলি বাস্তবে যতটা সফল হয় না, ততটা সে দিবাস্বপ্নের সাহায্যে পূরণ করে নেয়। এই কারণে যার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও

আত্মঅভিব্যক্তির চাহিদা বাস্তবে যত কম পূরণ হয়, তার দিবাস্বপ্নের মাত্রাও তত বেশী। বড়দের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা যে পরিমাণ বাস্তবে অপূর্ণ থাকে সে পরিমাণ তারা দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে পূরণ করে নিয়ে নিজেদের ব্যর্থতার বোধ দূর করে।

(ঙ) প্রত্যাবর্তন

প্রত্যাবর্তন (Regression) কথাটির অর্থ হল পূর্বের বা অতীতের আচরণে ফিরে যাওয়া। বর্তমান ক্ষেত্রে যখন ব্যক্তির কোনও আচরণ তার সমস্যার সমাধান করতে বা বাধা অতিক্রম করতে পারলো না, তখন অতীতে ঐ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যক্তি যে আচরণ করত সেই আচরণ পুনরায় করাকে আমরা ব্যাপক অর্থে প্রত্যাবর্তন বলতে পারি। যেহেতু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং অভিজ্ঞতার ক্রমবৃদ্ধির ফলে মানুষের আচরণ ক্রমশ উন্নততর হয়ে উঠছে, সেহেতু পূর্বের বা অতীতের আচরণ বর্তমান আচরণের চেয়ে নিকৃষ্ট ও কম কার্যকর। কিন্তু বর্তমানের আচরণ উন্নত প্রকৃতির হলেও সেটি কোনও কারণে যখন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং কার্যকর হয় না তখন ব্যক্তি তার মানবিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য অতীতের ঐ অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির আচরণে ফিরে যায়। ফলে তার সঙ্গতিবিধান কখনই সন্তোষজনক হয় না। কিন্তু সে সময়ের মত ঐ আচরণই তার সমস্যার সমাধান করে দেয় এবং তার মানসিক উত্তেজনারও প্রশমন ঘটায়। অর্থাৎ সঙ্গতিবিধানের এই আচরণটি সাময়িকভাবে এবং আংশিক সমন্বয়ধর্মী।

সাধারণত প্রত্যাবর্তনমূলক আচরণ অপরিণত, শিশুসুলভ ও বাস্তবের অনুপযোগী হয়ে থাকে। একটি ছোট ছেলে নিজে নিজেই তার জামাকাপড় পরতে পারে। কিন্তু তার একটি ভাই জন্মানর পর দেখা গেল যে সে নিজে থেকে তার জামাকাপড় পরতে পারছে না তাকে জামা কাপড় পরিয়ে দিতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তার ভাইটি জন্মাবার ফলে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পারার জন্য তার আচরণ অতি-শৈশবের স্তরে প্রত্যাবর্তন করেছে। বড় ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায় যে তারা যদি বাড়ী ছেড়ে হস্টেলে গিয়ে থাকে তখন তাদের মধ্যে বাড়ী ফেরার জন্য এক ধরনের অসুস্থতা (homesickness) দেখা যায়। বস্তুত এটি নতুন পরিবেশে সঙ্গতি-বিধানে অসামর্থ্য থেকে জাত প্রত্যাবর্তনমূলক প্রচেষ্টামাত্র।

কোনও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হলে কথা আটকে যাওয়া বা তোৎলামি

করা, ছোটছেলের মত কেঁদে ফেলা, হাত পা ছোঁড়া ইত্যাদি প্রত্যাবর্তনমূলক আচরণগুলি অনেক বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যেও দেখা যায়।

৩। ভীতিমূলক ও অবদমনমূলক সঙ্গতিবিধান

ভীত হওয়া বা ভয় পাওয়া প্রাণীমাত্রেরই একটি অতি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। বস্তুত আত্মরক্ষার একটি অপরিহার্য উপকরণ হল ভয় পাওয়া। প্রাণী তার চেয়ে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণী বা বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে যদি ভয় না পেত তাহলে তার পক্ষে আত্মরক্ষার উপযোগী আচরণ করার (যেমন, আক্রমণ করা বা পালান) কোনও কারণ থাকত না এবং তার ফলে তার পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হত না। ডোডো নামক হাঁস জাতীয় এক ধরনের প্রাচীন প্রাণীর অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে আজ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার একটি কারণ ছিল সে তার শরীরের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রকৃতিদত্ত কোনও অস্ত্র ছিল না। তা সত্ত্বেও সে বিপদ থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারত। কিন্তু তাও সে পারে নি। তার কারণ হল তার মধ্যে ভয়ের কোন অনুভূতি ছিল না। সেদিক দিয়ে ভয়কে আমরা আত্মসংরক্ষণের একটি স্বাভাবিক উপকরণ বলেই বর্ণনা করব।

ফোবিয়া ও যুক্তিহীন ভীতি

ভয়ের সত্যকারের কারণ বা উৎসকে ভয় করাই হল ভয়ের স্বাভাবিক প্রকাশ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ব্যক্তি এমন কিছুকে ভয় করছে যেটি সত্যকারের ভয়ের কোন কারণ নয়, অর্থাৎ তা থেকে ব্যক্তির কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই। একেই আমরা অস্বাভাবিক ভয় বা যুক্তিহীন ভয় বলব। এই ভাবে ভয়ের আশ্রয় নেওয়াও প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা। এই ধরনের যুক্তিহীন ভয়কে ফোবিয়া (Phobia) বলা হয়। যুক্তিহীন ভয় বা ফোবিয়া বহু বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। যে সব ফোবিয়ার কথা সাধারণত শোনা যায় সেগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হল। যথা—

ক্ষুদ্র ও বদ্ধ স্থানের ভয় (Claustrophobia), উচ্চস্থানের ভয় (Acrophobia), উন্মুক্তস্থানের ভয় (Agoraphobia), জলের ভয় (Aquaphobia), রাত্রি বা অন্ধকারের ভয় (Nychophobia), আগুনের ভয় (Pyrophobia), জন্তুজানোয়ারের ভয় (Zoophobia) ইত্যাদি।

এছাড়া অনেককে নানা অত্যন্ত সাধারণ ও বিচিত্র বস্তুকেও ভয় করতে দেখা গেছে। যেমন, একটি মেয়ের মধ্যে চোখের সম্বন্ধে ফোবিয়া তৈরী হয়ে ছিল। সে

কারও চোখের দিকে তাকাতে পারত না। আর একটি মেয়ের কল থেকে জল পড়ার শব্দ শুনলে ভীষণ ভয় করত, ইত্যাদি।

ফোবিয়ার উদ্ভবের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ফোবিয়ার মুখ্য কারণ হল অবদমন (Repression)।[১] ব্যক্তির জীবনে অতি শৈশবে কোনও ভীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। যেহেতু ঘটনাটি তার কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর ছিল সেজন্য সেটি সে তার অচেতনে অবদমিত করে এবং বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যায়। কিন্তু যে বস্তুটিকে কেন্দ্র করে শৈশবে তার মধ্যে ভয় সৃষ্টি হয়েছিল সে বস্তুটি সম্বন্ধে একটা তীব্র ভয় তার মধ্যে থেকে যায়। এই থেকে পরিণত জীবনে তার মধ্যে ঐ বস্তুটি সম্বন্ধে একটা ফোবিয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে তার ভয়ের কারণটি জানে না এবং তাকে প্রশ্ন করলে সে ঐ বস্তুটিকে কেন ভয় করে তা বলতে পারে না তার কারণ হল অবদমনের ফলে ঘটনাটি তার সচেতন মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ পুরো ঘটনাটিই সে একেবারে ভুলে গেছে।

এখন যদি কোন মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তার অচেতন থেকে ঐ ঘটনাটি তার চেতন মনে তুলে আনা যায় তাহলে সেই শৈশবের পুরো ঘটনাটি তার মনে পড়ে যায় এবং বহুক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার ফলে তার মধ্যে থেকে ঐ ফোবিয়াটিও দূর হয়ে গেছে।

ফোবিয়া বা যুক্তিহীন ভীতি এক ধরনের সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা। শৈশবে যে পরিস্থিতি বা ঘটনাটি ব্যক্তির মনে ভয়ের সৃষ্টি করেছিল সেটির সঙ্গে সঙ্গতি-বিধান করার জন্যই সে এক দিকে তার অভিজ্ঞতাকে অচেতনে অবদমিত করে, আবার অপর দিকে ভয়ের উৎস বা কারণটি সম্বন্ধে সে তার মনের মধ্যে একটি ভয়ের ভাব সৃষ্টি করে। তার ফলে সে ঐ বস্তুটিকে এড়িয়ে যায় বা তা থেকে দূরে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই ভীতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক ধরনের সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাবিশেষ। যেহেতু কেবল এড়িয়ে গিয়েই বা দূরে থেকেই ব্যক্তি ঐ ভীতিকর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারে সেজন্য এই প্রক্রিয়াটি মোটামুটি ভাবে ব্যক্তির কাছে সন্তোষজনক এবং তার মানসিক উত্তেজনার প্রশমকও। তাছাড়া যেহেতু মাত্র বিশেষ একটি ঘটনা বা বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির মনে এই ফোবিয়ার সৃষ্টি হয় এবং অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে তার অনুভূতি স্বাভাবিক প্রকৃতিরই থাকে সেহেতু ব্যক্তির অন্যান্য আচরণের মধ্যে কোনরূপ জটিলতা দেখা দেয় না এবং তার ফলে ব্যক্তি সন্তোষজনক ভাবেই তার জীবন কাটাতে পারে। সেইজন্য

১। পৃঃ ১৩৮

ফোবিয়া একদিক দিয়ে সমন্বয়ধর্মী সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণ করে এবং ব্যক্তির মানসিক উত্তেজনার উপশম করে তাকে স্বাভাবিক আচরণ করতে সক্ষম করে।

অনেক সময় দেখা গেছে যে, যে বস্তুটি সম্বন্ধে ব্যক্তির মনে ফোবিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুটি তার ভীতির প্রকৃত কারণ নয়। সেক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তুটির পরিবর্তে অন্য একটি বস্তু প্রতীক রূপে ব্যক্তির মনে ভয়ের কারণ রূপে কাজ করে। এই ধরনের ফোবিয়াকে আমরা বিচ্যুত (Displaced Phobia) ফোবিয়া বলতে পারি। সাধারণত এই ধরনের ফোবিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির একটা গভীর দুশ্চিন্তার অনুভূতি থাকে এবং তাই থেকেই ঐ ধরনের ফোবিয়া তার মধ্যে সৃষ্টি হয়। বিচ্যুত ফোবিয়ার একটা উদাহরণ ফ্রয়েড দিয়েছেন। হানস নামে একটি ছেলে ঘোড়াকে ভীষণ ভয় করত। অথচ ঘোড়া নিয়ে তার জীবনে এমন কিছু ঘটে নি যার জন্য ঘোড়া তার কাছে ভীতির কারণ হতে পারে। প্রকৃত-পক্ষে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে হানসের ভয় তার বাবাকে নিয়ে। সে বাবার জায়গায় ঘোড়াকে প্রতীকরূপে খাড়া করেছিল। বাবার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা থেকে হানসের মনে ভয় জেগেছিল এবং তার সেই দুশ্চিন্তাজাত ভয়ই বাবা থেকে ঘোড়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। কতকগুলি ঘটনার জন্য বাবার সঙ্গে ঘোড়ার ধারণাটি অবশ্য শিশু হানসের মনে সংযুক্ত হয়ে গেছল এবং সেই কারণে বাবার সম্বন্ধে ভয়টা ঘোড়ার প্রতি ভয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রথম শ্রেণীর ফোবিয়ার ক্ষেত্রে অবদমন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভয়ের কারণটি প্রত্যক্ষভাবে অনুবর্তিত হয়ে যায় এবং যদিও ব্যক্তি ভয়ের ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভুলে যায় তবু তার মধ্যে ঐ বিশেষ বস্তুটির প্রতি একটি যুক্তিহীন ভয় থেকে যায়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে কোন একটা ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে তার মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হয় এবং পরে সমস্ত ব্যাপারটি সে ভুলে গেলেও তার ভয়ের প্রত্যক্ষ কারণের স্থানে ঐ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন অবান্তর বস্তুতে তার ভয় অনুবর্তিত বা সংযুক্ত হয়ে যায়। তার দুশ্চিন্তা ও ভয়ের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে তার মধ্যে তখন ভয় থাকে না। ভয় তখন সৃষ্টি হয় অন্য কোনও একটি সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য ও অবান্তর বস্তুকে ঘিরে।

অবদমন ও অবদমনমূলক সঙ্গতিবিধান

ফোবিয়ার সৃষ্টিতে অবদমনের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি একটি অচেতন মানসিক প্রক্রিয়া। চেতন মনের কোন অভিজ্ঞতা, ধারণা, কথা, অনুভূতি

প্রভৃতি ব্যক্তি তার অচেতনে অবদমিত করে এবং তার ফলে তার সচেতন মন থেকে সেটি সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয়ে যায়। অর্থাৎ সেটি সে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। এই অবদমন করার পেছনে থাকে ঐ বিশেষ অভিজ্ঞতা, ধারণা ইত্যাদি সম্বন্ধে ব্যক্তির একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর অনুভূতি এবং অবদমন কাজটিও সে করে সম্পূর্ণ অচেতন পন্থায় যার জন্য পরে ঐ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তার কোন কিছুই মনে থাকে না।

মানুষের জীবনে বহু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। কিন্তু তার সবগুলিই তার অচেতনে অবদমিত হয় না। কোন্ বিশেষ অভিজ্ঞতাটি ব্যক্তি তার অচেতনে অবদমিত করবে সেটি নির্ভর করে ব্যক্তির অপ্রীতিকর অনুভূতির মাত্রার উপর এবং তার স্বরূপও নির্ধারণ করে ব্যক্তির অচেতন অহংসত্তাটি। সেইজন্য ব্যক্তি কোন কিছু সচেতনভাবে অবদমিত করতে পারে না বা ভুলে যেতেও পারে না। এই জন্যই দেখা যায় কোনও কোনও ঘটনা ব্যক্তি সম্পূর্ণ ভুলে যায় আবার কোন কোন ঘটনা যথেষ্ট অপ্রীতিকর হলেও ব্যক্তি তা ভোলে না। এই ঘটনাকে আমরা নির্বাচনমূলক বিস্মৃতি বলতে পারি। ফ্রয়েড তাঁর প্রসিদ্ধ 'সাইকো-প্যাথোলজি অফ এভরি-ডে লাইফ' নামক গ্রন্থে এই ধরনের বিস্মৃতির বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন।

অবদমনও এক ধরনের সঙ্গতিমূলক পন্থা। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি অপ্রীতিকর ও বেদনাদায়ক স্মৃতি ও চিন্তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সমর্থ হয়। কোনও সমস্যা যদি ব্যক্তির মধ্যে গভীর দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে অথচ তার ক্ষমতার দ্বারা সে সেটির সমাধান করতে পারে না তাহলে সেটিকে অচেতনে অবদমিত করে ভুলে যেতে পারলে ব্যক্তির সমস্যার সমাধান হয় না বটে তবু তার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা সাময়িক মীমাংসা হয় এবং তার মনের উত্তেজনাও দূর হয়। এই কারণে অবদমন হল এক ধরনের সহজলভ্য সঙ্গতিবিধানের পন্থা বিশেষ।

কিন্তু অবদমনের দোষ প্রচুর। প্রথমত, অপ্রীতিকর ও বেদনাদায়ক চিন্তাটিকে অচেতনে অবদমিত রাখার জন্য ব্যক্তিকে বেশ কিছুটা মানসিক শক্তি সর্বদা ব্যয় করতে হয়। তার ফলে ব্যক্তির স্বাভাবিক মানসিক শক্তির পরিমাণ হ্রাস পায়। তাছাড়া অবদমন একটা সাময়িক সমাধান মাত্র, সমস্যাটির প্রকৃত সমাধান তার দ্বারা হয় না। ফলে চিরকালই তার অচেতনে সমস্যাটি অমীমাংসিত অবস্থায় থেকে যায় এবং বহুক্ষেত্রে তার সচেতন মনের আচরণকে বিকৃত করে

তোলে। সেদিক দিয়ে অবদমন সঙ্গতিমূলক প্রক্রিয়ারূপে নেতিবাচক এবং সংগঠনবিরোধী। এক কথায় অবদমন একটি অসমন্বয়ধর্মী সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা বিশেষ এবং ব্যক্তির সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তাগঠনের পরিপন্থী।

যে শিশুর শৈশবে এই ধরনের বেদনাদায়ক ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে এবং তার ফলে তাকে সেটি তার অচেতনে অবদমিত করতে হয় সে শিশুর পরবর্তী জীবনে ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু ও সুষম সংগঠন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

আবিষ্টতা

অবদমনমূলক সঙ্গতিবিধানের আর একটি প্রকার হল আবিষ্টতা (Obsession)। আবিষ্টতা হল এমন একটি চিন্তা বা ইচ্ছা যা ব্যক্তি মিথ্যা ও অর্থহীন বলে জানে অথচ তা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। যেমন, এক ব্যক্তির প্রায়ই মনে হয় যে সে বুঝি একটা ছুরি নিয়ে তার স্ত্রীর গলা কেটে ফেলবে। অথচ তার স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই ভাল। এক্ষেত্রে তার চিন্তা ও ইচ্ছাটা মিথ্যা জেনেও তা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে এর কারণ হল যে ব্যক্তিটির প্রতি কাজে তার স্ত্রী হস্তক্ষেপ করে থাকে এবং তার ফলে স্ত্রীর প্রতি ব্যক্তিটির মধ্যে একটি তীব্র বৈরিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তি তার স্ত্রীকে প্রকৃতই ভালবাসে সেহেতু সে তার ঐ বৈরীভাবটিকে সচেতন মনে স্বীকার করে না এবং সেটিকে তার অচেতনে অবদমিত করে রেখেছে। এই অস্বীকৃত ও অচেতনে অবদমিত বৈরীভাবটি তার মনে তার স্ত্রীকে হত্যা করার একটা আবিষ্টতামূলক চিন্তার সৃষ্টি করেছে।

বলা বাহুল্য আবিষ্টতাও এক ধরনের সঙ্গতিবিধানের প্রয়াস। এর মূলেও আছে পলায়নপন্থিতা এবং অবদমন প্রক্রিয়া। স্ত্রীর প্রতি তার বৈরী মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য সে পলায়নমূলক পন্থার আশ্রয় নিয়েছে এবং তার অচেতনে ঐ মনোভাবকে অবদমিত করেছে। তার এই অস্বাভাবিক পন্থায় সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টা থেকেই তার ঐ আবিষ্টতামূলক চিন্তাটি সৃষ্টি হয়েছে।

বাধ্যতাবোধ

বাধ্যতাবোধের (Compulsion) ক্ষেত্রে ব্যক্তি এমন একটি কাজ করার প্রবণতা অনুভব করে যে কাজটিকে সে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বা অর্থহীন বলে জানে। বাধ্যতাবোধের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ঐ কাজটি করার জন্য একটা দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনা অনুভব করে এবং যতক্ষণ না সে ঐ কাজটি করছে ততক্ষণ তার

সেই উত্তেজনা দূর হচ্ছে না। উপরে বর্ণিত আবিষ্টতা ও বাধ্যতাবোধ মূলত সমধর্মী। প্রথমটি হল চিন্তার ক্ষেত্রে, আর দ্বিতীয়টি সক্রিয় আচরণের রূপে প্রকাশ পায়। অনেক সময় বাধ্যতাবোধের সঙ্গে ফোবিয়াও যুক্ত থাকে এবং ঐ বিশেষ আচরণটি সম্পন্ন করলে তার ভয়ও চলে যায়।

অনেকের মধ্যে বারবার হাত ধোওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এটি একটি বাধ্যতামূলক আচরণের দৃষ্টান্ত। ব্যক্তিটি সব সময় হাত ধোওয়ার একটি উগ্র ইচ্ছা অনুভব করে এবং যতক্ষণ না সে হাত ধুচ্ছে ততক্ষণ তার সেই উত্তেজনাও প্রশমিত হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে কোন অন্যায় কাজ করার ফলে ব্যক্তির মনে যে অপরাধবোধের সৃষ্টি হয় তাই থেকে বারবার হাত ধোওয়ার এই বাধ্যতামূলক আচরণটি জন্ম নেয়। যেহেতু হাত দিয়েই মানুষ সব কাজ করে থাকে সেহেতু হাত ধোওয়াটা অপরাধমূলক কাজ থেকে নিজেকে দোষমুক্ত করার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বাধ্যতাবোধমূলক আচরণও এক ধরনের সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা। যে অপ্রীতিকর বা বেদনাদায়ক কাজের জন্য ব্যক্তি অপরাধবোধ করে বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় সে কাজটি ভোলার জন্য সে প্রতীকরূপে একটি সামান্য ও আপাতনির্দোষ কাজ সম্পন্ন করে। ঐ প্রতীকমূলক কাজ করার ফলে তার অপরাধবোধ এবং দুশ্চিন্তা তৎক্ষণাৎ চলে যায় এবং তার মানসিক সাম্য ফিরে আসে। কিন্তু পরে ঐ অপরাধবোধ বা দুশ্চিন্তা তার মধ্যে আবার দেখা দেয় এবং তার জন্য তাকে বার বার ঐ একই আচরণ সম্পন্ন করতে হয়।

অতিরিক্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বারবার ঘরদোর পরিষ্কার করা, জিনিষপত্র অতি নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রাখা ইত্যাদি কাজগুলির পিছনে অনেক সময় এইরকম বাধ্যতাবোধ থাকে। বাংলাভাষায় যাকে আমরা বাতিক বলি, অনেক ক্ষেত্রে তার কারণ অনুসন্ধান করলে এই শ্রেণীর বাধ্যতাবোধমূলক আচরণ-প্রবণতা দেখা যাবে।

৪। অসুস্থতামূলক সঙ্গতিবিধান

অসুস্থতা বা ব্যাধি কোনও মানুষই চায় না এবং স্বেচ্ছায় কেউ অসুস্থ হয় একথা বললে বিশ্বাস করা কঠিন হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি দুরূহ সমস্যায় পড়লে বা কোন কঠিন বাধার সম্মুখীন হলে নিজের মধ্যে নিজে থেকেই অসুস্থতার সৃষ্টি করে এবং সেই ভাবে তার সমস্যা বা বাধার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করার চেষ্টা করে।

অনেক সময় দেখা গেছে যে কোন ব্যক্তি কাজে ফাঁকি দেবার জন্য বা কোন ছেলে স্কুলে যেতে অনিচ্ছুক হলে অসুস্থ হবার ভান করে। সেগুলি একধরনের সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণ কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি সত্যকারের অসুস্থ হয় না। অসুস্থতার ভান করে মাত্র। কিন্তু আমরা যে ক্ষেত্রগুলি আলোচনা করছি সে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি সত্যকারেরই অসুস্থ হয় এবং তার মধ্যে ঐ ব্যাধির লক্ষণগুলি প্রকৃতই দেখা দেয়।

এই ধরনের অসুস্থতামূলক সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রগুলি নিউরসিস বা সাইকো-নিউরসিস (Neurosis or Psychoneurosis)[১] নামে পরিচিত। সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে গুরুতর ব্যর্থতা বা অসামর্থ্য দেখা দিলে নিউরসিস বা সাইকোনিউরসিসের সৃষ্টি হয় এবং এই সময় নানা বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতার মাধ্যমে ব্যক্তি সঙ্গতি-বিধানের চেষ্টা করে। প্রসঙ্গক্রমে নিউরসিস বা সাইকোনিউরোসিস সাইকো-সিস (Psychosis) থেকে পৃথক। সাইকোসিস গুরুতর প্রকৃতির মানসিক অসুস্থতা এবং উন্মত্ততার পর্যায়ভুক্ত। এই পুস্তকে নিউরসিসের বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'মনোব্যাধি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

নিউরসিস বা মনোব্যাধিকে সাধারণত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন—হিষ্টিরিয়া, সাইকাস্থেনিয়া, নিউরাস্থেনিয়া, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থা ইত্যাদি।

[এগুলির বিশদ বিবরণের জন্য পৃঃ ২৪৩-পৃঃ ২৫৫ দ্রষ্টব্য]

৫। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থা (Anxiety States)

ইতিপূর্বে যে কয়টি সঙ্গতিমূলক আচরণের বর্ণনা করা হল সেগুলি বহুক্ষেত্রে সন্তোষজনক না হলেও মোটামুটিভাবে ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ করে এবং তার মানসিক উত্তেজনা ও অস্থিরতাও দূর করে। সেইজন্য অনেকক্ষেত্রে এগুলি সন্তোষজনক ও কাম্য সঙ্গতিবিধানের পর্যায়ে না পড়লেও এগুলিকে সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণ বলে বর্ণনা করা যায়।

এই অর্থে কিন্তু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থাকে সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণ বলা চলে না। বরং এটিকে সঙ্গতিবিধানের অভাবসূচক আচরণ বা অ-সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণ বলাই ঠিক।

ব্যক্তি যখন তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না তখন তার মধ্যে যে আচরণ দেখা দেয় তাকেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থা বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে

১। পৃঃ ২৪২

তার সমস্তার সমাধান ত হয়ই না এবং তার শারীরিক-মানসিক উত্তেজনারও কোনও উপশম ঘটে না। তখন তার সেই অবস্থা একটি গভীর সর্বব্যাপী দুশ্চিন্তার রূপ নেয় এবং ব্যক্তি সর্বদা দুর্ভাবনা, চিন্তা, ভয় ও সন্দেহের মধ্যে বাস করে। তার ফল নানা রকমের হতে পারে। ঘটনাটি অতি তীব্র মাত্রায় ঘটলে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক বিকলতা দেখা দিতে পারে এবং সে মানসিক ভারসাম্য হারাতে পারে। সাধারণ ক্ষেত্রে তার আচরণ অপসঙ্গতিপূর্ণ হয় ও পরিবেশের উপযোগী হয় না। তার ব্যক্তিসত্তারও বিকাশ সুষম হয় না এবং প্রক্ষোভমূলক সমন্বয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেখানে পিতামাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক স্বাস্থ্যসম্মত নয় সেখানেই শিশুর মধ্যে এই ধরনের দুশ্চিন্তামূলক অবস্থা দেখা দেয় এবং পরবর্তী জীবনে সে তার জীবনের সমস্যাগুলির সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে পারে না। অতিরিক্ত শাসনপ্রিয় পিতামাতার ক্ষেত্রে শিশু এই ধরনের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থার পাত্র হয়ে ওঠে। যে সব পরিবারে বহু ছেলেমেয়ে থাকে বা অন্য কোন কারণে পিতামাতা সন্তানের প্রতি যথোচিত যত্ন নেন না সে সব ক্ষেত্রেও শিশুর মধ্যে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয় এবং তার মধ্যে অ-সঙ্গতিবিধানধর্মী আচরণ দেখা দেয়।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থা নানা প্রকারের দেখা যায়। ব্যক্তি হয়ত নিজের অলীক অসুস্থতা সম্বন্ধে ভীষণভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ওঠে এবং নিজের রোগ সম্বন্ধে অভিযোগ করা, আলোচনা করা, ডাক্তার দেখান ইত্যাদি এত মাত্রাতিরিক্তভাবে করে যে তার আচরণ বাতিকের পর্যায়ে গিয়ে পৌছয়। একে হাইপোকণ্ড্রিয়া (Hypochondria) বা রোগের বাতিক বলা হয়।

শারীরিকী ভবন (Somatisation)

অনেক ক্ষেত্রে মানসিক দুশ্চিন্তা সত্যকারের শারীরিক অভিব্যক্তির রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মাথা ধরা, হজমের গোলমাল হওয়া প্রভৃতি অনেক রোগ দুশ্চিন্তা থেকেও সৃষ্টি হয়ে থাকে। একে শারীরিকীভবন (Somatisation) বলা চলে। অর্থাৎ মানসিক দুশ্চিন্তা রূপান্তরিত হয়ে শারীরিক ব্যাধিতে পরিণত হয়। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা, হজম না হওয়া, হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া, শরীরে কোন শক্তি নেই বলে মনে হওয়া, কোন অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়া প্রভৃতি নানা সত্যকারের শারীরিক অসুস্থতা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থা থেকে সৃষ্টি হতে পারে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে পেপটিক আলসার বা আন্ত্রিক ক্ষত নামক ব্যাধিটি অনেকক্ষেত্রে এই ধরনের মানসিক দুশ্চিন্তার শারীরিকীভবনের ফলে দেখা দেয়।

প্রশ্নাবলী

1. Name the different varieties of adjustment processes adopted by the individual in different situations.

Ans. (পৃ: ৩২৬—পৃ: ৩৫৬)

2, What is Somatisation ? Give some examples.

Ans. (পৃ: ৩৫৬)

3. Describe with illustrations the following modes of adjustment and explain under what conditions they are resorted to by the individual.

(a) Complementary Behaviour, (b) Reaction Formation. (c) Rationalisation, (d) Projection, (e) Phobia, (f) Day-dreaming and Fantasy, (g) Obsession, (h) Compulsion, (i) Repression, (j) Regression, (k) Hypochondria, (l) Anxiety States.

বত্রিশ

ব্যক্তিসত্তার সঙ্গতিবিধানে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ভূমিকা
(Role of Mental Hygiene in the Adjustment of the Individual)

ব্যক্তির সুষ্ঠু জীবনযাপন, জীবনে সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভ, পারিবারিক সম্প্রীতি, বন্ধু-প্রতিবেশী মহলে প্রাপ্য মর্যাদালাভ, বৃত্তিতে সাফল্য এবং সবশেষে আত্মতৃপ্তি—এ সবই নির্ভর করে পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু ও সার্থক সঙ্গতিবিধানের উপর। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে পারে না এবং তার ফলে সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় না। এই পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী ফল রূপে তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গতিবিধান ব্যাহত হয় এবং তার প্রক্ষোভমূলক সমন্বয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক কথায় তার মানসিক স্বাস্থ্যই সামগ্রিকভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলতে বোঝায় সেই সব নিয়মকানুন ও সর্তাবলী যেগুলি অনুসরণ করলে ব্যক্তি তার মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। অতএব ব্যক্তি যাতে তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে পারে তার জন্য কয়েকটি সূত্র বা বিধানের উল্লেখ করা যায়। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে এ ব্যাপারে কোনও নির্ভুল ও সুনিশ্চিত সূত্র বা তত্ত্ব দেওয়া যায় না। তবে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এমন কতকগুলি পন্থা ও বিধিনিষেধের নির্দেশ দিতে পারে যেগুলি অনুসরণ করলে সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যক্তি সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হবে বলে আশা করা যায়। যথা—

১। শারীরিক সুস্থতা

ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে কেবলমাত্র মানসিক প্রচেষ্টার দ্বারা নয়, তার শারীরিক প্রয়াসও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ব্যক্তি তার দেহ ও মন বা সম্পূর্ণ অস্তিত্ব দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে। অতএব ব্যক্তির আচরণটি যেমন পরিবেশের উপযোগী হবে সেইরকম তার শারীরিক প্রক্রিয়াগুলিও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। এক কথায় সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্য একটি অপরিহার্য উপকরণ।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা অন্যান্য দিক দিয়ে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও বাস্তবক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শারীরিক ব্যথাবোধ, এণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ডের রস নিঃসরণ, কোনও অঙ্গহানি বা শারীরিক

প্রতিবন্ধতা প্রভৃতি কারণের জন্য ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষভাবে ব্যাহত হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া সাময়িক শারীরিক অসুস্থতার জন্য ব্যক্তির মেজাজ খারাপ থাকতে পারে বা তার প্রেষণা পূর্ণভাবে কার্যকর না হতে পারে এবং তার ফলেও তার সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অতএব ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের জন্য শারীরিক অসুস্থতা যে একটি অপরিহার্য সর্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।[1]

২। আত্ম বিশ্লেষণ

দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ জটিল সমস্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্ত হল আত্মবিশ্লেষণ (Self analysis)। যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, আচরণবৈশিষ্ট্য ও সেই সঙ্গে নিজের শক্তিসামর্থ্যকে বিশ্লেষণ করে সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে অবহিত হয় তার পক্ষে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করা বেশ সহজ হয় এবং তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গতি-বিধানও সুষম ও সুষ্ঠু হয়ে ওঠে।

এই আত্মবিশ্লেষণকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমত, ব্যক্তি তার জীবনে কোন্ কোন্ চাহিদা ও প্রয়োজনগুলি মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বলে গ্রহণ করেছে ব্যক্তির তা ভাল করে জানা দরকার। সে জীবনযাত্রার যে ধারাটি গ্রহণ করেছে সেটিকে বাস্তবায়িত করতে কোন্ কোন্ চাহিদা তাকে পূর্ণ করতে হবে এই তথ্যটুকু নিজেকে বিশ্লেষণ করে তাকে জানতে হবে। দ্বিতীয়ত, সেই সঙ্গে তাকে তার নিজের শক্তিসামর্থ্যেরও প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হবে। তাকে জানতে হবে যে, যে সব চাহিদাকে সে তার জীবনের লক্ষ্য বলে ধরে নিয়েছে সেগুলি পূর্ণ করার মত সামর্থ্য তার আছে কিনা। তৃতীয়ত, তাকে তার শক্তি ও সামর্থ্যের সঙ্গে তার চাহিদা ও লক্ষ্যগুলির একটা সুষম সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে।

আত্মবিশ্লেষণের এই তিনটি পর্যায় বা সোপান প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যদি তার চাহিদাগুলি তার সামর্থ্যের আয়ত্তের বহির্ভূত হয় তাহলে সেই চাহিদাগুলি পূরণ করা তার পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে উচিত হবে তার চাহিদাগুলির সংশোধন ও পরিবর্তন করা এবং তার সামর্থ্যের উপযোগী হয় এমন চাহিদাগুলি তার লক্ষ্য-রূপে গ্রহণ করা। এক কথায় ব্যক্তির চাহিদা ও সামর্থ্যের মধ্যে যদি বড় একটি ব্যবধান থাকে আর যদি ব্যক্তি তার চাহিদাকে পরিবর্তিত করে তার সামর্থ্য ও

চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে না পারে তাহলে তার পক্ষে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গতিবিধান কখনই সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক হবে না।

অ্যাড্‌লার (Adler) তার মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ব্যক্তির জীবন-ধারা (life style) এবং তার নিজের চাহিদা ও লক্ষ্যের মধ্যে সঙ্গতিবিধান করাকে সুষ্ঠু ব্যক্তি-সত্তা গঠন এবং মানসিক সাম্য অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান বলে বর্ণনা করেছেন।

আত্মবিশ্লেষণ থেকে আসে নিজেকে মেনে নেওয়া (Self-acceptance)। যখন ব্যক্তি নিজের সামর্থ্য এবং সেই সঙ্গে নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে তখনই নিজেকে তার প্রকৃত স্বরূপে মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়। নিজেকে মেনে নেওয়ার অর্থ হল যে ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে কোনও ভুল বা অতিরঞ্জিত ধারণা থাকবে না এবং নিজের সাফল্যের আয়ত্তাতীত কোনও ভুল লক্ষ্যও সে স্থাপন করবে না। ফলে তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গতিসাধন সুষম ও সন্তোষজনক হয়ে উঠবে।

৩। বাস্তবকে মেনে নেওয়া

নিজেকে মেনে নেওয়ার পরবর্তী অপরিহার্য স্তরটি হল বাস্তবকে মেনে নেওয়া। বাস্তব বলতে ব্যক্তির চারপাশের বস্তু, ব্যক্তি ও ঘটনার সামগ্রিক সমাবেশকে বোঝায়। ব্যক্তি তার পরিবারের বিভিন্ন সদস্য অর্থাৎ তার মা, বাবা, ভাইবোন প্রভৃতিদের এবং যে পরিবেশে সে বাস করে সেই পরিবেশের অন্যান্য ব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিদের ভাল করে পর্যবেক্ষণ করবে, জানবে এবং তাদের মেনে নেবে। তার মা, বাবা, ভাই, বোন আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি যে প্রকৃতির মানুষ এবং তার সঙ্গে তাদের যে শ্রেণীর সম্পর্ক—এগুলি যদি ব্যক্তি ভাল ভাবে বোঝে তাহলে তাদের নিকট থেকে তার কোন অবাস্তব প্রত্যাশা থাকবে না এবং তার ফলে তারা কোন দিন তার আশাভঙ্গ বা বেদনার কারণ হয়ে উঠবে না। যে ছেলের পিতামাতার আর্থিক সঙ্গতি সীমাবদ্ধ সে ছেলে যদি তার পিতামাতার এই সীমাবদ্ধতাটুকু বোঝে তাহলে তাঁদের কাছ থেকে তার কোন অসম্ভব প্রকৃতির আর্থিক প্রত্যাশা থাকবে না এবং তাকে ভবিষ্যতে সেই কারণে কোনও আশাভঙ্গ জনিত আঘাতও পেতে হবে না।

ব্যক্তিকে তার প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদেরও ভাল করে জানতে হবে। তারা কি প্রকৃতির, তার চাহিদাগুলির তৃপ্তির জন্য তারা কতটুকু তার জন্য করতে পারে এবং তাদের চাহিদার সঙ্গে তার নিজের চাহিদার কোন সংঘাত ঘটবে কিনা

—ইত্যাদি তথ্যগুলি জানা থাকলে ব্যক্তির পক্ষে তার প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান অনেক বেশী সহজ ও সন্তোষজনক হবে।

৪। অন্তরঙ্গ ও আস্থাভাজন ব্যক্তি

সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করা এবং প্রক্ষোভমূলক সাম্য বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই এমন কেউ অন্তরঙ্গ ও আস্থাভাজন ব্যক্তি থাকবে যার কাছে সে তার মনের সব কথা খুলে বলতে পারবে। মনের দ্বিধা, সন্দেহ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, সমস্যা সবই বহুল পরিমাণে লাঘব হয়ে যায় যদি সে সম্বন্ধে ব্যক্তি কোন কিছু গোপন না করে কাউকে সব কথা খুলে বলতে পারে। এ নয় যে সে তার সেই বন্ধুর কাছ থেকে তার সমস্যার কোন সমাধান পাবে। কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করে সব কথা বলতে পারলে ব্যক্তির মনের ভার অনেকখানি লাঘব হয় এবং তার নিজের সমস্যার সমাধান সে নিজেই খুঁজে বার করতে পারে।

বস্তুত 'মন খুলে কথা বলা' প্রক্রিয়াটিই মানসিক উত্তেজনা প্রশমন করে এবং ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করে। তার কারণ হল যে ব্যক্তিকে এই সভ্য সামাজিক পরিবেশে সব সময়েই তার অচেতন মনের উপর একটি বাধা বা প্রতিরোধ চাপিয়ে রাখতে হয় এবং সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয় যাতে তার এই প্রতিরোধ এড়িয়ে তার মনের অব্যক্ত ও গোপন ইচ্ছা, চিন্তা ও ধারণাগুলি বাইরে প্রকাশিত হয়ে না পড়ে। ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশ দিন দিন যত বেশী জটিল হয়ে উঠছে ততই ব্যক্তিকে তার এই অচেতন প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হচ্ছে। অচেতনের উপর এই প্রতিরোধ স্থাপন করার জন্য ব্যক্তিকে বেশ কিছুটা মানসিক শক্তির প্রয়োগ করতে হয় এবং তার ফলে তার স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়। সেইজন্য এমন যদি কেউ থাকে যার কাছে ব্যক্তি তার মনের কথা খুলে বলতে পারে এবং কিছুক্ষণের জন্যও তার মনের এই বাধাটা তুলে নিতে পারে তাহলে সাময়িকভাবেও মানসিক শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়াস থেকে সে রেহাই পায় এবং সেই সময়ের জন্য তার মানসিক আড়ষ্টতা ও উত্তেজনার প্রশমন ঘটে। মনোবিজ্ঞানে এই প্রক্রিয়াকে বিরেচন (Catharsis) নাম দেওয়া হয়েছে।

এর ফলে ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক সমন্বয়ন উন্নতস্তরের হয় এবং তার পক্ষে সঙ্গতিবিধান সহজ ও সুষ্ঠু হয়ে ওঠে।

৫। সক্রিয়তার অভ্যাস

সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তার সঙ্গতিবিধানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্ত হল সক্রিয়তার

অভ্যাস গঠন করা। দৈনন্দিন জীবনে সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধান করতে হলে ব্যক্তিকে সক্রিয়ভাবে তার পারিবেশিক শক্তিগুলির সম্মুখীন হতে হবে। নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চেষ্ট থাকলে কখনই সঙ্গতিবিধান সন্তোষজনক হবে না। অনেক ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুলের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সফল সঙ্গতিবিধানের আচরণটি ব্যক্তিকে আবিষ্কার করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তির যদি সক্রিয় প্রচেষ্টার অভ্যাস না থাকে তাহলে তার সমস্যাটি সহজ হলেও সেটি সমাধান করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। অতএব ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু ও কার্যকর সঙ্গতিবিধানের জন্য ব্যক্তির পক্ষে সক্রিয়তার অভ্যাস আহরণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

৬। সামাজিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ

গোষ্ঠীর আর সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা ব্যক্তিসত্তার সঙ্গতিবিধানের আর একটি কার্যকর পন্থা। সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করলে ব্যক্তি তার নিজের চাহিদাটা ভুলে যেতে পারে এবং তার সমস্যা বা অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা অনেক কমে যায়। তাছাড়া সমাজের বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করলে ব্যক্তির সঙ্কীর্ণ মনোভাব দূর হয়ে যায় এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের তাদের প্রকৃত স্বরূপে মেনে নেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে।

৭। সংগঠনমূলক ও তৃপ্তিকর কাজ

ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হল তৃপ্তিকর ও সংগঠনমূলক কাজ করা। ব্যক্তি যে সব কাজ করে সেগুলি যদি তাকে সত্যকারের তৃপ্তি দান করতে পারে তাহলে তার ব্যক্তিসত্তার সংগঠন স্বাভাবিকভাবেই সুসমন্বিত ও সুসংহত হয়ে ওঠে। এর একটি পন্থা হল এমন সব কাজ নির্বাচন করা যেগুলি প্রকৃতিতে সংগঠনমূলক এবং যেগুলির দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ কোন সামাজিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এই ধরনের কাজের দ্বারা ব্যক্তির নিজের নানা গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাও তৃপ্ত হয় এবং তার তার ফলে তার মধ্যে সাফল্যের তৃপ্তিবোধ আসে। অবশ্য তৃপ্তিকর কাজের জন্য দরকার ব্যক্তির কাজ নির্বাচনের স্বাধীনতা। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিবেশ এমনই প্রতিকূল প্রকৃতির হতে পারে যেখানে ব্যক্তির পক্ষে তার তৃপ্তিকর কাজ নির্বাচন করার স্বাধীনতা যথেষ্ট সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। এই ধরনের পরিবেশেও ব্যক্তিকে যথাসম্ভব নিজের পক্ষে তৃপ্তিকর কাজ নির্বাচন করার চেষ্টা করতে হয়।

৮। সৃজনমূলক কাজ

তৃপ্তিকর কাজগুলির মধ্যে সৃজনমূলক কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান সমাজে বিশেষধর্মী কাজ এতই দিন দিন বেড়ে উঠছে যে ব্যক্তিকে এমন অনেক কাজ করতে হয় যেগুলি যান্ত্রিক প্রকৃতির এবং অভিনবত্বহীন। এই ধরনের কাজগুলি ব্যক্তির পক্ষে প্রায় ক্ষেত্রেই তৃপ্তিকর হয়ে ওঠে না। সেইজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজের গণ্ডীর বাইরে কোন কিছু একটা সৃজনধর্মী কাজ বেছে নিতে হবে যেটি তার মানসিক চাপ দূর করবে এবং তার তৃপ্তিদান করবে। সাহিত্যসৃষ্টি, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, বাজনা বাজানো, মূর্তি তৈরী করা ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃজনধর্মী কাজ আছে যেগুলি ব্যক্তি তার পছন্দ ও সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পন্ন করতে পারে। এই ধরনের সৃজনমূলক কাজ করা ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের পরম সহায়ক।

৯। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অনুসরণ

ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে সন্তোষজনক ভাবে সমাধান করার একটি অতি কার্যকর পন্থা হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সেই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার ফলে সমস্যাটির দুরূহতা সম্বন্ধে কোনরূপ অতিরঞ্জিত বা বিকৃত ধারণা ব্যক্তির মধ্যে তৈরী হবে না এবং তার পক্ষে সেটির সমাধানের জন্য সবচেয়ে কার্যকর পন্থাটি গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

সমস্যাটির সমাধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিই সবচেয়ে কার্যকর। গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য যে পন্থার অবলম্বন করেন ব্যক্তিও সেই একই পন্থায় তার জীবনঘটিত সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করবে। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি প্রথমে সমস্যাটি খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করবে এবং সেটির প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি নির্ভুল ধারণা গঠন করবে। দ্বিতীয় সোপানে সে ঐ সমস্যাটি সম্বন্ধে যত বেশী সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তথ্যগুলির মধ্যে যেগুলি প্রাসঙ্গিক সেগুলি নির্বাচন করবে। তৃতীয় সোপানে সে ঐ তথ্যগুলিকে ভিত্তি করে সমস্যাটির সমাধানের একটি বিশেষ পন্থাকে প্রকল্প (Hypothesis) রূপে গ্রহণ করবে। সবশেষে ব্যক্তি ঐ প্রকল্পটি তার সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োগ করবে।

সমস্যা সমাধানের এই বিজ্ঞানসম্মত পন্থাটি সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং সেই সঙ্গে সবচেয়ে কার্যকর। এর দ্বারা দ্রুত ও স্বল্পতম আয়াসে সে তার সমস্যাটির সমাধান করতে সক্ষম হবে। যে ব্যক্তি তার জীবন সমস্যাগুলি এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাধানের চেষ্টা করে তার পক্ষে সহজে সাফল্যলাভ করা সম্ভব হয়

এবং তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানও অনেক বেশী সহজসাধ্য হয়ে ওঠে এবং তার মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

১০। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ

অবশেষে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। প্রথমত, মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যক্তিকে তার আচরণের প্রকৃতি ভালভাবে বুঝতে সমর্থ করে। দ্বিতীয়ত, কোন্ ধরনের আচরণগুলি সমন্বয়ধর্মী আর কোন্‌গুলি সমন্বয় বিরোধী এই তথ্যটি ব্যক্তি মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে জানতে পারে। তৃতীয়ত, এই জ্ঞান থাকলে ব্যক্তি অ-সমন্বয়ধর্মী আচরণ থেকে বিরত থাকতে পারে এবং যে ধরনের আচরণ তাকে সুষ্ঠু সঙ্গতি বিধানে সমর্থ করবে সে ধরনের আচরণ সে সম্পন্ন করতে পারে।

অবশ্য এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে মনোবিজ্ঞানে অগভীর জ্ঞান অর্জন করে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলে তা ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকরই হতে পারে। সেইজন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান যেন গভীর ও নির্ভুল প্রকৃতির হয় সে সম্বন্ধে ব্যক্তিকে সচেতন হতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1 Discuss the various codes of Mental Hygiene that lead to the satisfactory adjustment of the individual.

Ans পৃঃ ৩৫৮—পৃঃ ৩৬৪

2. Describe the role of Mental Hygiene in promoting harmonious personality adjustment of the individual.

Ans. (পৃঃ ৩৫৮—পৃঃ ৩৬৪)

তেত্রিশ

বিদ্যালয়ে অপসঙ্গতির কারণাবলী ও প্রতিরোধের পন্থা

(Causes of Maladjustment in School Situation and Remedial Measures)

ইতিপূর্বে আমরা সাধারণভাবে অপসঙ্গতির কারণগুলি আলোচনা করেছি। এই পরিচ্ছেদে আমরা বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে যে বিশেষ কারণগুলি শিক্ষার্থীর মধ্যে অপসঙ্গতির সৃষ্টি করে সেগুলির আলোচনা করব।

সাধারণত বেশ ছোট বয়সেই শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যোগ দেয়। তার ফলে নতুন পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধান করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক পরিণতি তাদের অনেক সময়ই থাকে না। কিন্তু যেহেতু বহু পরীক্ষণ থেকেই দেখা গেছে যে বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে এবং নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালাভের প্রতি তার মধ্যে প্রকৃতিজাত প্রবণতা থাকে সেজন্য অধিকাংশ শিশুর পক্ষেই বিদ্যালয় পরিস্থিতিটি অপরিচিত হলেও সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে অসুবিধা হয় না এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ ভালভাবেই সে খাপ খাইয়ে নেয়।

কিন্তু একথা সত্য হলেও আমরা প্রায়ই এমন অনেক ক্ষেত্রের সন্ধান পাই যেগুলিতে দেখা যায় শিশুর পক্ষে সঙ্গতিবিধান করা সম্ভব হচ্ছে না এবং সে একটি অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশু হয়ে উঠছে। এর ফলে তার যে কেবলমাত্র শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয় তাই নয়, তার ব্যক্তিসত্তার সমস্ত সংগঠনটিই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে শিশুর অপসঙ্গতি ঘটার কারণগুলিকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত, শিক্ষার্থীঘটিত কারণাবলী, দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ঘটিত কারণাবলী।

শিক্ষার্থীঘটিত কারণাবলী (Causes relating to the Child)

অনেক ক্ষেত্রে শিশুর লালন পালনের ত্রুটি বা তার পরিবারঘটিত অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য থেকে শিশুর মানসিক সংগঠনের মধ্যে কোনও গুরুতর ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। তার ফলে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুশ্চিন্তা, মানসিক দুর্বলতা, ভয় প্রভৃতি নানা অসঙ্গতির সৃষ্টি হয় এবং শিশুর বিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর তার পক্ষে ঐ নতুন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করা সম্ভব হয় না। যেমন ইতিপূর্বে যে মেয়েটি বাড়ীতে একা একা নিঃসঙ্গভাবে মানুষ হবার ফলে যখন সে বিদ্যালয়ে যোগ দিল তখন দেখা গেল সে তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা

করতে পারছে না এবং কালক্রমে সে একটি অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশু হয়ে দাঁড়ায়। মা-বাবার একমাত্র সন্তান, পরিত্যক্ত ও শৈশবে ভালবাসা থেকে বঞ্চিত ছেলেমেয়ে বা অতিরিক্ত আদরে মানুষ হওয়া ছেলেমেয়ে প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে শিশুটির মানসিক সংগঠন স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরী হয় না এবং তার ফলে যখন সে স্কুলে যোগ দেয় তখন সে তার নতুন পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না। এ সময়ে যদি সে যথাযথ সুপরিচালনা না পায় তাহলে তার বিদ্যালয় জীবন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তার সংগঠন এবং ভবিষ্যৎ জীবনধারাও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

শিশুর যে নিজস্ব ব্যক্তিগত কারণগুলির উল্লেখ করা হল সেগুলি অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে দেখা দেয় বলা যায়। কিন্তু আমাদের মত দেশে যেখানে অধিকাংশ পিতামাতারই আধুনিক মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে জ্ঞান নিতান্তই স্বল্প সেখানে এই ধরনের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট সংখ্যাতেই দেখা যায়।

বিদ্যালয়ঘটিত কারণাবলী (Causes relating to the School)

স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও স্কুলের পরিস্থিতিতে অপসঙ্গতির কারণ-গুলিকে আমরা বিদ্যালয়ঘটিত কারণাবলী বলে বর্ণনা করতে পারি। এই ধরনের কারণগুলি হল :—

১। অনুপযোগী পাঠক্রম

২। মনোবিজ্ঞান-বিরোধী শিক্ষণ পদ্ধতি

৩। নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা

৪। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অভাব

৫। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ

৬। অবাঞ্ছিত সঙ্গ

উপরিউক্ত কারণগুলি 'বিদ্যালয় ও মানসিক স্বাস্থ্য' শীর্ষক পরিচ্ছেদে (পৃঃ ২৯৮—পৃঃ ৩০১) বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হয়েছে।

অপসঙ্গতি রোধের পন্থা

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অপসঙ্গতিরোধের জন্য দু'শ্রেণীর পন্থা গ্রহণীয়। প্রতিরোধমূলক (Preventive) এবং নিরাময়মূলক বা প্রতিকারমূলক (Curative)।

এই দু'প্রকার পন্থারই বিশদ্ আলোচনা 'বিদ্যালয় ও মানসিক স্বাস্থ্য' শীর্ষক পরিচ্ছেদে (পৃঃ ৩০২—পৃঃ ৩০৮) পাওয়া যাবে।

চৌত্রিশ

সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের লক্ষণাবলী

(Criteria of Good Adjustment)

ব্যক্তির সামনে কোন সমস্যা বা বাধার সৃষ্টি হলে ব্যক্তি তার সঙ্গে সঙ্গতি-বিধানের চেষ্টা করে এবং কোনও না কোনও প্রকারের সঙ্গতিবিধান করে; কিন্তু সব সঙ্গতিবিধানই সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ সঙ্গতিবিধান করে সমস্যাটি এড়িয়ে যায়। বলা বাহুল্য এই ধরনের সঙ্গতিবিধান স্থায়ী ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল নয় এবং তার সমস্যারও প্রকৃত সমাধান ঘটে না। সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান বলতে কি বোঝায় তার কয়েকটি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের আমরা উল্লেখ করতে পারি। যথা—

১। বাধাপ্রাপ্ত আচরণের পুনরনুষ্ঠান

বাধাপ্রাপ্ত আচরণের পুনরনুষ্ঠানকে আমরা সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ বলে বর্ণনা করতে পারি। প্রাণী যখন কোনও সমস্যা বা বাধার সম্মুখীন হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হয় না তখন সে যে আচরণ করছিল তার সেই আচরণ বন্ধ হয়ে যায়। ব্যক্তি যখন আবার সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হয় তখন সেই বাধা দূরীভূত হয় এবং সে আবার তার সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া আচরণ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়, অবশ্য সেটির প্রয়োজনমত পরিবর্তন সাধন করে। অতএব এদিক দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত আচরণের পুনরনুষ্ঠানকে সঙ্গতিবিধানের প্রথম লক্ষণ বলা চলে। কিন্তু যে কোনও আচরণই প্রাণীর সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের সূচক নয়। কেননা প্রাণীর সঙ্গতিবিধান বন্ধ হলে সে কোন না কোন প্রকারের আচরণ অনুষ্ঠান করবেই। কিন্তু যে কেবলমাত্র সেই আচরণকেই সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান বলা হবে যেটি প্রাণীকে তার চাহিদার তৃপ্তি দেবে এবং তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ করবে। আর যে আচরণ প্রাণীকে তা করতে সমর্থ করবে না সে আচরণকে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান বলে গণ্য করা হবে না।

২। সমস্যার সমাধান ও চাহিদার তৃপ্তি

ব্যক্তির সমস্ত সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টারই লক্ষ্য হল তার সমস্যার সমাধান এবং চাহিদার তৃপ্তি। যতক্ষণ সমস্যার সমাধান এবং চাহিদার তৃপ্তি না ঘটছে ততক্ষণ তার সঙ্গতিবিধানকে আমরা কখনই সুষ্ঠু বলে বর্ণনা করতে পারি না।

৩। উত্তেজনার অবসান

সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে ব্যক্তির শরীর ও মনের উত্তেজনার অবসান ঘটা। ব্যক্তির মধ্যে কোন চাহিদা জাগলে এবং

সেই চাহিদার তৃপ্তি না ঘটলে, অর্থাৎ তার সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের অভাব দেখা দিলে তার মধ্যে শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনা (tension) ও অস্থিরতা দেখা দেয়। সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধান ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তার সেই উত্তেজনা ও অস্থিরতাও দূর হয়ে যায়।

৪। ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়সাধক

সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণটি হল যে এটি ব্যক্তিসত্তার সমন্বয় সাধন করে। যে সব সংরক্ষণের সংগঠনে ব্যক্তিসত্তা গঠিত হয় সেই সংলক্ষণগুলির সুষ্ঠু সমন্বয়নই ব্যক্তিসত্তার সুষম ও বাঞ্ছিত বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য। ব্যক্তির চাহিদার তৃপ্তি ও বিভিন্ন প্রক্ষোভের সুষম সমন্বয়ই ব্যক্তিসত্তার বাঞ্ছিত বিকাশ ঘটাতে পারে। যে সঙ্গতিবিধানমূলক আচরণ ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে সুসংগতি সাধন করে তার বিভিন্ন প্রক্ষোভের মধ্যে সমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তাকেই আমরা সুষ্ঠু সংগতিবিধান বলতে পারি। অর্থাৎ এক কথায় সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান অতি অবশ্যই সমন্বয়ধর্মী হবে। (পৃঃ ৩৩৭—পৃঃ ৩৩৮ দ্রষ্টব্য)

যে ক্ষেত্রে ব্যক্তির চাহিদা তৃপ্ত হয় না বা আংশিক তৃপ্ত হয় সে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি সঙ্গতিবিধানের জন্য অবাঞ্ছিত পন্থার আশ্রয় নেয় এবং তার সেই সঙ্গতি-বিধানমূলক আচরণকে আমরা সমন্বয়হীন সঙ্গতিবিধান বলে বর্ণনা করতে পারি। যেহেতু এই ধরনের সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির চাহিদার পূর্ণ ও স্বাভাবিক তৃপ্তি হয় না এবং তার শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনার অবসান ঘটে না সেহেতু এই সঙ্গতিবিধানকে সুষ্ঠু ও কাম্য বলে বর্ণনা করা যায় না।

৫। প্রক্ষোভমূলক সমতা ও মানসিক তৃপ্তি

সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তির শারীরিক-মানসিক উত্তেজনার উপশম ঘটে, তেমনই তার প্রক্ষোভমূলক সমতা ফিরে আসে এবং ব্যক্তি এক-ধরনের মানসিক তৃপ্তি অনুভব করে। এই তথ্য থেকেই থর্নডাইকের শিখনের ফললাভের সূত্রটি গঠিত হয়েছে।

৬। অগ্রগতির সূচক

সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান ব্যক্তির চাহিদার তৃপ্তি আনে এবং সেই সঙ্গে তাকে সমাজে উন্নততর জীবনযাপনে সক্ষম করে। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাবলীর বিকাশসাধনে সুষ্ঠু সংগতিবিধান সহায়তা করে এবং তার সৃজনীশক্তিকে অভিব্যক্ত হবার সুযোগ দেয়। এক কথায় সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির একটি অপরিহার্য উপকরণ।

চৌত্রিশ

মাদক ও তার প্রভাব

মাদকাসক্তি বর্তমান সমাজ জীবনের এক অতি জটিল সমস্যা। এটি শুধু কোন একটি দেশ বা জাতির সমস্যা নয় আন্তর্জাতিক সমস্যা রূপে এটি আজ মানব সমাজে চিহ্নিত। দেশ ও জাতির স্বার্থে এবং ভাবী নাগরিকদের জীবন রক্ষায় ভারতের মানব সম্পদ মন্ত্রক ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মাদকাসক্তিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রূপে বর্ণনা করেছেন। মাদক ও তার কুপ্রভাবের সমস্যাটি বুঝতে হলে মাদক কাকে বলে এবং মাদকাসক্তির অর্থ ও বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে হবে।

মাদকের অর্থ : মাদক কাকে বলে ?

সাধারণত মাদকদ্রব্য এমন একটি পদার্থ যা গ্রহণ করলে ব্যক্তির দেহ ও মনের উপর নানারূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং কিছুদিন ঐ পদার্থ ব্যবহার করার পর ব্যবহারকারী মাদকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে ঐ পদার্থটির প্রতি তার গভীর আসক্তি জন্মায়। সিগারেট, ভাঙ, গাঁজা ও খৈনী বা দোক্তা থেকে শুরু করে মদ ও বিভিন্ন ধরনের ওষুধ যেমন মরফিন, হিরোইন ও ঘুমের বড়ির প্রতি মানুষ আসক্ত হয়। বস্তুত মাদক বা ড্রাগ একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ যেটি গ্রহণ করলে কিছুদিনের মধ্যেই পদার্থটির প্রতি গ্রাহকের তীব্র আসক্তির সৃষ্টি হয় এবং আসক্ত ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মানসিক বিকার দেখা দেয়।

ড্রাগ ব্যবসায়ীদের নিকট ড্রাগ বলতে একপ্রকার ওষুধ বোঝায়। শারীরিক ব্যাধি নিরাময় ও রোগ উপশমের জন্য চিকিৎসক এই সকল ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেন। কিন্তু যখন এটি চিকিৎসার উদ্দেশ্য ছাড়া নেশার জন্য ব্যবহার করা হয় তখন তাকে মাদক বলা হয়।

মাদক দ্রব্য একটি ওষুধ জাতীয় বস্তু হওয়ার ফলে এটি সাধারণভাবে খাদ্য রূপে গ্রহণ করা উচিত নয়। এটি গ্রহণ করলে দেহের ও মনের মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন ঘটে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়াও এটি তখন শুধু মানসিক উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অতএব মাদক একটি পদার্থ যা ব্যক্তির দেহে ও মনে নানারূপ উত্তেজনাকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তার ফলে নানা উপসর্গ দেখা দেয় এবং মানুষের

আচরণও বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। মন ও দেহ দুদিক দিয়েই তার মধ্যে এইসব পরিবর্তন দেখা যায়। মাদক ক্রমাগত গ্রহণ করলে ব্যক্তি ধীরে ধীরে ঐ বস্তুটির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অবশ্য সব মাদকের আসক্তির স্থায়িত্ব সমান হয় না। এমন কি গ্রহীতার মনে তা কখনো কখনো প্রভাব নাও ফেলতে পারে।

মাদক নানাভাবে শরীরের মধ্যে গ্রহণ করা হয়। যেমন—খাদ্য হিসাবে, ঘ্রাণের মাধ্যমে, সিগারেটের মাধ্যমে। ইন্‌জেক্‌সনের দ্বারাও মাদক ব্যক্তির দেহে সঞ্চালিত হয়।

মাদক আসক্তির স্বরূপ

মাদকে আসক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি মাদক গ্রহণ করে মাদক গ্রহণের কারণে তার মধ্যে তিনটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, যেমন নির্ভরশীলতা, সহনশীলতা এবং প্রত্যাহরণ প্রতিক্রিয়া। বেশ কিছুদিন ধরে মাদক গ্রহণ করলে ব্যক্তির মধ্যে মাদকটির প্রতি নির্ভরশীলতা (**dependence**) গড়ে ওঠে। এটি দেহ ও মন উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। মাদক গ্রহণকারী যেমন দিনের যে সময় মাদক গ্রহণ করে থাকে সেই সময় সেটি গ্রহণ না করলে সে নানারকম দৈহিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তেমনই মনের দিক দিয়েও ব্যক্তি মাদকটি গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সে পুনরায় মাদকটি গ্রহণ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত মাদক ছাড়া সে অন্য কোন কিছু চিন্তা করতে পারে না। তখন তার একমাত্র চিন্তা মাদককে ঘিরে থাকে। একমাত্র মাদক গ্রহণ করার পরই তার এই দেহ ও মনের অস্বস্তি দূর হয়। এই গভীর নির্ভরশীলতা মানুষকে ধীরে ধীরে মাদকের দাস করে তোলে। ব্যক্তি তখন যে কোন ভাবে মাদক সংগ্রহ করতে ও সেটি গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে।

দ্বিতীয় লক্ষণ সহনশীলতার (**tolerance**) অর্থ হল যে, যে পরিমাণ মাদক ব্যক্তি গ্রহণ করে, দীর্ঘদিন সেই একই পরিমাণে তার সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব হয় না। দেখা যায় যে মদ, হিরোইন, ঘুমের ওষুধ প্রভৃতি কিছু কিছু ধরনের মাদকের ক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রথমে মাদকটি যে পরিমাণে গ্রহণ করে কিছুদিন পর সেই পরিমাণে আর তার আসক্তির সৃষ্টি হয় না, তাকে পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হয়। মাদকটি প্রথমে তার দেহে ও মনে যে ভাবে ক্রিয়া করত এবং মাদকতা বা নেশা সৃষ্টি করত অল্প কিছুদিন পরেই সেই পরিমাণে আর তা সৃষ্টি হয় না।

তখন তাকে মাদকের পরিমাণ বাধ্যতামূলক ভাবে বৃদ্ধি করতে হয়। অর্থাৎ দেহ প্রথমে যে ভাবে যে পরিমাণ মাদকে প্রভাবিত হত পরবর্তীকালে সেই পরিমাণ মাদকে আর তা প্রভাবিত হয় না। একেই দেহের সহনশীলতা (**tolerance**) বলা হয়। এই ভাবে মাদকাসক্ত ব্যক্তি কখনই একই পরিমাণ মাদকে দীর্ঘদিন আসক্ত হয়ে থাকতে পারে না, তাকে প্রতিদিন তার পরিমাণ বৃদ্ধি করে যেতে হয়। এই ভাবে বৃদ্ধি করতে করতে একসময় পরিমাণ এতই বেড়ে যায় যে সেটি সংগ্রহ করা এবং গ্রহণ করা ব্যক্তির সাধ্যের এবং তার শারীরিক সহ্য ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। অথচ তার মাদকের উপর নির্ভরশীলতা তাকে ওই বর্ধিত পরিমাণ মাদক সংগ্রহ করতে বাধ্য করে। এর ফলেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে অসামাজিক, অস্বাভাবিক ও অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। তখন মাদক ছাড়া তার জীবনে আর কিছুরই মূল্য থাকে না। স্বাস্থ্য, চাকুরী, পরিবার, সমাজ, বন্ধু সবই তার কাছে নগণ্য হয়ে যায় এবং সবকিছুই সে মাদকের জন্য বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে।

তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি মাদকাসক্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে তা হল কতকগুলি লক্ষণ যা মাদক গ্রহণ বন্ধ করলে ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। দেখা গেছে যে কিছুদিন মাদক ব্যবহার করলে শরীরের নিজস্ব শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া অস্বাভাবিক হয়ে যায় এবং মাদক গ্রহণ বন্ধ করলে শরীরে নানা কষ্ট ও উপসর্গ দেখা দেয়। একেই প্রত্যাহরণ প্রতিক্রিয়া বা বিরতি লক্ষণ (**withdrawal symptoms)** বলা হয়। দেখা গেছে প্রতিদিন যে সময় ব্যক্তি মাদক ব্যবহার করতে অভ্যস্ত থাকে সেই সময়টি অতিক্রান্ত হলে তার দেহে ও মনে একধরনের অস্বস্তি শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে এই অস্বস্তি নানারকম দৈহিক প্রতিক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। যেমন, প্রচণ্ড পেটের যন্ত্রণা, বমি ভাব, জ্বর, দেহে ব্যথা, মাথা ধরা, চোখ নাক দিয়ে ক্রমাগত জল গড়া, কাঁপুনি, চামড়ার লোমকূপগুলি ফুলে ওঠা প্রভৃতি। যদি এই সময় তাকে মাদক ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তাহলে এই ধরনের লক্ষণগুলির দ্রুত উপশম হয়ে যায়। কিন্তু মাদক না পেলে এই সব শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলি বন্ধ করতে ওষুধ খেতে হয়। যদিও বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই উপসর্গগুলি বিভিন্ন পরিমাণে দেখা যায় এবং চিকিৎসার সময়ও ভিন্ন ভিন্ন হয় সাধারণত এক সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে মাদকাসক্তি ব্যক্তির জীবনে যেমন শারীরিক ও মানসিক নানা ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি করে তেমনি এটি তার স্বাভাবিক জীবন

যাত্রা বিপর্যস্ত করে দেয়। তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং কর্ম-জীবন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে ধীরে ধীরে সমাজের অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মাদক ও তার প্রতি আসক্তিই তার জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। যতই তার মাদকাসক্তি বাড়তে থাকে ও সে মাদকের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ততই সে অন্যদের থেকে দূরে চলে যায় এবং তারাও তার অসামাজিকতার জন্য তাকে পরিত্যাগ করে। ফলে সে তখন আরও বেশী করে তার একমাত্র সঙ্গী ঐ মাদকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এটি একটি দুষ্ট চক্রের মত কাজ করতে থাকে এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে আরও গভীরতার সমস্যা ও বিপর্যয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়।

মাদকাসক্তির সমস্যাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। অনেকে এটিকে এক ধরনের নৈতিক অবনতির ফল বলেন এবং একমাত্র আধ্যাত্মিক পথেই এর সমাধান সম্ভব বলে মনে করেন। তবে চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটিকে এক ধরনের অসুস্থতা বলা হয় যেটি চিকিৎসার সাহায্যে দূর করা যায়। মাদকাসক্তি এই মত অনুযায়ী একটি ব্যাধি। তবে বর্তমানে এটিকে ব্যক্তি-সত্তার এক ধরনের অস্বাভাবিকতাও বলা হয়। কারণ অনেক সময় একই পরিস্থিতিতে একজনকে মাদকের প্রতি আসক্ত হতে দেখা গেলেও আর একজন মাদক বা অন্য কোন রকম আসক্তি ছাড়াই জীবনের সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে। দেখা গেছে ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণের মধ্যে যদি কোন ধরনের অস্বাভাবিকতা থাকে তবে বিভিন্ন আচরণমূলক সমস্যা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিতে পারে। এই ধরনের একটি সমস্যা মাদকাসক্তির সমস্যা। তাই মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকে এটিকে এক ধরনের সঙ্গতিবিধানের ত্রুটিজনিত আচরণমূলক সমস্যা বলা যায়।

তবে বর্তমানে মাদকাসক্ত ব্যক্তির আচরণ সমাজ ও পরিবারকে বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলেছে এবং মাদকাসক্তি দেশের অর্থনৈতিক ও আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। সেই কারণে আজ মাদকাসক্তিকে অনেকেই আর্থ-সামাজিক সমস্যা বলে বর্ণনা করেন।

মাদকের প্রকারভেদ

প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্যের প্রচলন ছিল। ভারতে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের যুগে সুরার ব্যবহারের

প্রচুর উল্লেখ আছে। আর্য মুনিঋষিগণ সোমরস পান করতেন। প্রাচীনকালে দ্রাক্ষারসও একপ্রকার মাদক হিসাবে ব্যবহৃত হত। আধুনিক যুগে খেজুর রস, আঙুরের রস প্রভৃতি থেকে মদ তৈরী হয়। আজকাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নানা রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে মাদক তৈরী হতে দেখা যাচ্ছে যেমন, কোকেন, হিরোইন, মদ এবং বিভিন্ন ধরনের ঘুম ও ব্যথা নিরোধক ওষুধ।

বিভিন্ন মাদকদ্রব্য

বর্তমানে যে সকল বিভিন্ন ধরনের মাদকের ব্যবহার দেখা যায় সেগুলি হল :—

১। **ক্যানাবিস** (**Cannabis**)—এটি এক ধরনের গাছ যেটিকে মারিজুয়ানা (**Marijuana**) বা গাঁজাও বলা হয়। এই গাছটি বছরে একবার হয়, যার ফুল আর পাতা কেটে সিগারেটের মধ্যে দিয়ে বা অন্য কোন ভাবে সেবন করা হয়। এই গাছটির বিভিন্ন অংশ থেকে যে নানা ধরনের মাদক তৈরী হয় সেগুলি হল হাসিস, ভাঙ, গাঁজা, চরস ইত্যাদি। যদিও এর আসক্তি খুব তীব্র হয় না, তবে বেশী ব্যবহার করলে এটি ব্যক্তির মধ্যে অলীক-বীক্ষণ (**hallucination**) সৃষ্টি করে।

২। **কোকেন** (**Cocaine**) - কোকোয়া গাছের পাতা বহুদিন ধরেই মানুষ উত্তেজনা-বর্ধক পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। আজ তা থেকেই তৈরী হয়েছে অন্যতম তীব্র একটি মাদক, কোকেন। এটি প্রধানত নিঃশ্বাসের সাহায্যে গ্রহণ করা হয় বা ইন্‌জেকসানের মাধ্যমে রক্তে প্রবেশ করানো হয়। মাত্র কয়েক মিলিগ্রাম কোকেন নাকের সাহায্যে ঘ্রাণের মাধ্যমে গ্রহণ করলে তীব্র নেশার সৃষ্টি হয়। ইন্‌জেকসানের সাহায্যে রক্তে প্রবেশ করলে এটি হৃদ্‌স্পন্দন বৃদ্ধি করে এবং রক্তচাপও বাড়িয়ে দেয়। একটানা কোকেনের ব্যবহার ব্যক্তির ইন্দ্রিয় অনুভূতিগুলিকে বিকৃত করে দেয় এবং দৃষ্টিমূলক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। কোকেন দেহে ও মনে একধরনের উন্মাদনা ও বিভ্রান্তিকর অনুভূতি তৈরী করে।

৩। **আফিম** (**Opium**)—পপি নামক গাছের বীজ থেকে নিঃসৃত একধরনের আঠা থেকে আফিম তৈরী হয়। এটিকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে পরিশ্রুত করে মরফিন ও হিরোইন পাওয়া যায়। মরফিন প্রধানত ব্যথা উপশম ও ঘুমের

জন্য ব্যবহার করা হয়। অতীতে আফিম জলে গুলে খাওয়ার প্রথা ছিল এবং ভারত ও চীনে এটা দিয়ে ধূমপানও করা হত। মরফিন থেকে হিরোইন তৈরী হয় এবং প্রথমে এটা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে এটি একটি মারাত্মক মাদকে পরিণত হয়েছে। বিশুদ্ধ হিরোইন সাদা পদার্থ এবং এর স্বাদ তিক্ত। কিন্তু যে হিরোইন এখন মাদকাসক্তদের মধ্যে ব্যবহার করা হয় সেটি পুরোপুরি বিশুদ্ধ নয় এবং নানা ধরনের ভেজাল মেশানোর ফলে এটির রঙও সাদা নয়, এটির রঙ খয়েরি। এই কারণে এই ধরনের হিরোইনকে ব্রাউন স্যুগার (**Brown Sugar**) বলা হয়। মরফিন ও হিরোইন-এর প্রভাব ও ব্যবহার পদ্ধতি মোটামুটি প্রায় এক। তবে হিরোইনের আসক্ত করার ক্ষমতা বেশী থাকার ফলে এটি দুটির মধ্যে বেশী বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। হিরোইন অনেক সময় ইন্‌জেকসানের মাধ্যমে রক্তের মধ্যে সরাসরি গ্রহণ করা হয়। একবার ব্যক্তি হিরোইনে আসক্ত হয়ে পড়লে আর কোন কিছুতেই তার আসক্তির তৃপ্তি আসে না। দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে এর সহনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিমাণে বৃদ্ধি না করলে ব্যক্তি পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে না। তবে গ্রহণ ক্ষমতার চেয়ে বেশী যদি হিরোইন গ্রহণ করা হয় তবে ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

৪। **প্রশামক** (Depressants)—এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল সেই সমস্ত ওষুধ যেগুলি স্নায়ুর মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস করে, ঘুম সৃষ্টি করে বা মোহাচ্ছন্নতা তৈরী করে। এর মধ্যে ঘুমের বড়ি, **(sedative)** বারবিটুরেট **(barbiturate)** এবং প্রশামক **(tranquiliser)** আছে। এই ওষুধগুলি প্রধানত উত্তেজনা প্রশমনের কাজে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সাধারণত রক্তচাপ, মৃগীরোগ, নিদ্রাহীনতার চিকিৎসা ও মানসিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই সকল ওষুধ মাদক রূপে ব্যবহার করলে আসক্ত ব্যক্তির মধ্যে ইন্দ্রিয়ঘটিত ও সঞ্চালনমূলক সংহতির অভাব দেখা যায় এবং মদ ব্যবহারজনিত কুপ্রভাবগুলিও লক্ষ্য করা যায়।

৫। **উত্তেজক** (**Stimulants**)—এই ধরনের ওষুধ ও মাদক ব্যক্তির মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এগুলি মানুষকে জাগিয়ে রাখে এবং কৃত্রিম আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তবে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করলে এগুলি দেহের মধ্যে কম্পন, অস্থিরতা, উত্তেজনা, নিদ্রাহীনতা, হৃদ্‌যন্ত্রের অস্বাভাবিক গতি প্রভৃতি সৃষ্টি করে। যদিও এই পদার্থগুলি খুব একটা শারীরিক আসক্তি তৈরী করে না কিন্তু বারবার গ্রহণের ফলে

এগুলির প্রতি সহনশীলতা তৈরী হয় যাতে ওষুধের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে হয়। এর ফলে অনেক সময় অতিরিক্ত উত্তেজক (otimulant) ওষুধ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাদকাসক্ত ব্যক্তি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে। শরীরের দিক থেকে তখন এটি খুব ক্ষতিকর হতে পারে।

৬। **অলীকবীক্ষণ সৃজক** (**Hallucinogens**)—এল-এস ডি এবং ডি এম টি (**LSD-25, DMT**) প্রভৃতি কিছু কিছু ওষুধকে অলীকবীক্ষণ-সৃজক বা হ্যালুসিনোজেনস্ (**Hallucinogens**) বলা হয়। এগুলি দুই প্রকারের হয় যেমন কিছু প্রাকৃতিক ও কিছু কৃত্রিম। এগুলি ব্যক্তির মধ্যে হাল্কাবোধ, মাথাঘোরা, বমিভাব, উল্লাসবোধ (**Euphoria**), উত্তেজনা এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের বিকৃতি ঘটায়। একবার ব্যবহারে বিশেষ ক্ষতি না করলেও এগুলির বার বার ব্যবহার বিপদের সৃষ্টি করতে পারে।

মাদকাসক্তির প্রধান কারণসমূহ

বর্তমান সমাজে মাদকাসক্তি একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মধ্যেই এই সমস্যাটি প্রসারিত হচ্ছে যদিও তুলনামূলক ভাবে মেয়ে অপেক্ষা ছেলেদের মধ্যে এটি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে ১৬ থেকে ২৫ এবং অনধিক ৩৫ বৎসর বয়সের ব্যক্তিরাই এর প্রধান শিকার। তবে আর্থ-সামাজিক স্তরের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই মাদকাসক্তির বিভীষিকাটির অবাধ গতিবিধি রয়েছে। সাধারণত মাদকাসক্তির কারণ রূপে বিশেষ কতকগুলি অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটির বর্ণনা নীচে করা হল।

প্রথমত, কতকগুলি বিশেষ ধরনের বিকৃত সংলক্ষণের ফলে কিছু কিছু ব্যক্তির মধ্যে মাদকে আসক্তি তৈরী হয়। সমাজে প্রত্যেকেই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সাফল্য লাভ করে না। কিন্তু সবাই মাদকাসক্ত বা অন্য কোন অস্বাভাবিকতার শিকার হয় না। কিন্তু যাদের মধ্যে এই বিকৃত সংলক্ষণ বা মানসিকতা থাকে তাদের মধ্যেই মাদকাসক্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এই জন্য মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিসত্তার ত্রুটিকে মাদকাসক্তির অন্যতম একটি কারণ বলে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, হতাশা মাদকাসক্ত হওয়ার আর একটি কারণ। বর্তমান সমাজের জটিলতা, চাহিদার অতৃপ্তি, সুযোগ সুবিধার অভাব, বেকারত্ব, জীবনে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু না পাওয়ার হতাশা প্রভৃতি কারণে মানুষের মধ্যে ব্যর্থতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং তরুণ সংবেদনশীল মন এই ব্যর্থতা সহজে গ্রহণ করতে পারে

না। তবে সবার ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য নয়। যদিও অধিকাংশই উপযোগী সঙ্গতিবিধানের মাধ্যমে এই পরিস্থিতি কোন না কোনভাবে কাটিয়ে ওঠে তবুও বেশ কিছু ব্যক্তির পক্ষে এর প্রভাব কাটানো সম্ভব হয় না এবং তারা তখনই অস্বাভাবিক পথে নিজেদের এই অতৃপ্তির সমাধান খোঁজে। মাদক এমনি একটি মাধ্যম যেটি বিকৃত হলেও তাৎক্ষণিক ভাবে ব্যক্তিকে তার সমস্যা ভুলে থাকতে সাহায্য করে।

তৃতীয়ত, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মাদকাসক্ত হওয়ার আরও একটি প্রধান কারণ বন্ধু-বান্ধবদের চাপ। কৈশোর-উত্তীর্ণ ও সদ্য-যৌবনপ্রাপ্ত তরুণেরা তাদের সঙ্গীসাথীদের মতামত, মনোভাব ও অনুরোধকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং এই বন্ধুবান্ধবেরাই তাদের জীবনের প্রধান কেন্দ্রে থাকে। এই সময় পিতামাতা, অভিভাবক, দাদা, দিদি বা অন্যান্য গুরুজনদের উপদেশ অপেক্ষা বন্ধুদেরই মতামত তারা বেশী গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। এর ফলে বন্ধুবান্ধবেরা যা বলে, এবং যা করে তার অনুসরণ করাই তরুণটি সবচেয়ে কাম্য পথ বলে মনে করে। এই কারণে বহু ক্ষেত্রেই তরুণ বা তরুণীটি দলের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে বা দলের চাপে পড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক আচরণ করে। মাদক গ্রহণ করা এরকমই একটা আচরণ। বন্ধুদের সঙ্গে প্রথম সিগারেট খাওয়ার কথা প্রায় প্রত্যেকেরই জীবনে দেখা যায়। আধুনিক সমাজের অন্যতম নেশার বস্তু হল এই মাদক এবং এইসব অপরিণতমনা কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরা মাদক গ্রহণ করাকে আধুনিকতার লক্ষণ বলে মনে করে এবং প্রথম নেশা তারা এই কারণেই শুরু করে, আর কিছুদিনের মধ্যেই তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে। এটিকে বন্ধুদলের চাপ (**Peer group pressure**) বলা হয়।

চতুর্থত আধুনিক সমাজে দ্রুত মূল্যবোধ, ধারণা, ন্যায়-অন্যায় বোধ, আচরণ ধারা, নীতি বোধ প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটছে। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে বহু আচরণ করছে যা তাদের ঐতিহ্য বা প্রথার বিরোধী। এরই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গণমাধ্যম, বিজ্ঞাপন প্রচার, রাজনৈতিক নীতি-হীনতা মানুষকে প্রভাবিত করছে। এই দুটি ঘটনার ফলে অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা নানা পরস্পর-বিরোধী ধারণা, নীতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। এই সকল দ্বন্দ্বের তারা সমাধান সুষ্ঠু ভাবে করতে সক্ষম হয় না। এই ধরনের মানসিক অবস্থায় তারা সহজেই আনন্দ বা উত্তেজনা খোঁজার চেষ্টা করে এবং হিরোইন, মদ প্রভৃতিতে আসক্ত হয়ে পড়ে।

যদিও প্রথমে এই সকল মাদকদ্রব্য এই সব তরুণতরুণী ক্ষণিকের আনন্দের জন্যে গ্রহণ করে তবু অল্প কয়েকদিন যেতে না যেতেই এরা এই নেশার দাস হয়ে পড়ে। এই কারণে যে সব দেশে গণমাধ্যম অত্যন্ত সক্রিয়, দ্রুত জীবনযাপনের প্রথা প্রচলিত এবং পারিবারিক বন্ধন কিছুটা শিথিল সেই সব দেশে মাদকাসক্তের পরিমাণ অনেক বেশী, যেমন আমেরিকায় মাদকাসক্তদের সংখ্যা অনেক দেশের চেয়ে বেশী। শৈশব থেকেই নীতির অভাব বা তার দ্রুত পরিবর্তনশীলতা, বৈচিত্র্য ও পারিবারিক সম্পর্কগুলি বার বার ভেঙে যাওয়ার ফলে আমেরিকার আধুনিক প্রজন্ম ভয়াবহ ভাবে মাদকাসক্তির শিকার হয়ে পড়েছে। ভারতেও এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে জটিল জীবন যাত্রা ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের ফলে।

পঞ্চমত, অনেকে আবার মনে করেন যে মাদক ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অনেকে মনে করেন সিগারেট, মদ এবং নানা ধরনের নেশার বস্তুর মাধ্যমে ব্যক্তির সৃজনশীলতা উন্নত করা যায়। এই ধারণা সর্বতোভাবে ভুল। এই সত্যটি বোঝার আগেই দেখা যায় যে অনেক শিক্ষিত ও সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণী মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েছে। এই ধরনের ভুল ধারণা প্রচারে মাদকবিক্রেতা, গণমাধ্যম এবং স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি বিশেষ ভাবে সাহায্য করে থাকে এবং স্বল্পবয়স্ক ব্যক্তিরা সহজেই তাদের প্ররোচনার শিকার হয়।

ষষ্ঠত, পারিবারিক অবহেলা, ভালবাসার অভাব, প্রথম জীবনে চাহিদার অতৃপ্তি ইত্যাদি কারণেও বহু ব্যক্তিকে মাদকে আসক্ত হতে দেখা গেছে। প্রতিটি মানুষই কতকগুলি মনোবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক চাহিদা নিয়ে জন্মায়। এগুলির তৃপ্তি তার সুস্থ ব্যক্তিসত্তা গঠনে অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু যদি এগুলি অতৃপ্ত থাকে তবে শৈশব থেকেই ব্যক্তি নিজেকে অবহেলিত মনে করে, তার নিরাপত্তার অভাববোধ দেখা দেয় এবং স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্কগুলির প্রতি ব্যক্তির কোন আস্থা থাকে না। এই ধরনের ব্যক্তিরা সহজেই মাদকের মধ্যে নিজেদের অতৃপ্ত চাহিদা ও বাসনার তৃপ্তি খোঁজার চেষ্টা করে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সে তার ভুল বোঝে কিন্তু তখন তার আর ফেরার পথ থাকে না।

মাদকাসক্তি ও তার চিকিৎসা

মাদকাসক্তি যতই তীব্র হোক না কেন আজ এটিকে একটি চিকিৎসাযোগ্য সমস্যা বলে মনে করা হয়। যদিও এটি শুধু শারীরিক চিকিৎসার সাহায্যে

দূর করা যায় না তার সঙ্গে যেটি প্রয়োজন হয় তা হল মানসিক চিকিৎসা। এই ধরনের চিকিৎসাকে মনোবৈজ্ঞানিক সুপরামর্শ (**counselling**) বলা হয়। যে কোন মাদকাসক্তকে চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে আনতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন হয় তার নিজের মানসিক প্রস্তুতি। যেহেতু মাদকাসক্তি ব্যক্তির মধ্যে দৈহিক নির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করে অত্যন্ত গভীর এক মানসিক নির্ভরতা সেই কারণে মাদকাসক্তদের মাদক ত্যাগ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসিক শক্তি না থাকলে এবং তার সিদ্ধান্ত দৃঢ় না হলে মাদকের চিকিৎসাতে কোন স্থায়ী ফল হয় না এবং ওষুধের সাহায্যে মাদক ছাড়লেও কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যক্তি পুনরায় মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে।

এই মানসিক দৃঢ়তা ও মাদক ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সুপরামর্শ দানের মাধ্যমে সাহায্য করতে হয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সে যাতে মাদক ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে তার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। একে বলা হয় প্রেষণামূলক সুপরামর্শ (**Motivational Counselling**)। এই সময় ব্যক্তি মাদকে আসক্ত থাকা অবস্থাতেই সুপরামর্শদাতার (**counsellor**) কাছে আলোচনা ও অনুপ্রেরণা পাওয়ার জন্য আসতে পারে।

মানসিক ভাবে তাকে প্রস্তুত করার পর ব্যক্তি মাদক ছাডার ফলে তার মধ্যে যে শারীরিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেই লক্ষণগুলি প্রশমিত করার জন্য তাকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ দেওয়া হয়। এই ওষুধগুলি প্রধানত মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে তার শারীরিক যন্ত্রণাগুলি কমাতে সাহায্য করে। সাধারণত ওষুধগুলি প্রচলিত ব্যথা, জ্বর প্রভৃতির ওষুধ হয়ে থাকে। তবে এই সময় লক্ষ্য রাখা হয় যাতে ব্যক্তি হিরোইন বা যে মাদকে সে আসক্ত সেটি ছাড়ার পর যেন এই চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ওষুধগুলির প্রতি সে আবার আসক্ত হয়ে না পড়ে। এই চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক সুপরামর্শদান (**counselling**) চলতে থাকে যাতে ব্যক্তি তার দেহের কষ্টগুলি সহ্য করার ক্ষমতা পায়।

মাদক ছাড়ার জন্য শারীরিক যন্ত্রণাগুলি উপশমের এই চিকিৎসা সাধারণত এক থেকে দুই সপ্তাহ চলে। কিন্তু যে মানসিক সুপরামর্শদান (**Counselling**) তাকে দেওয়া হয় এটি দীর্ঘদিন প্রয়োজন হয়। যে সব পদ্ধতি এই মানসিক চিকিৎসায় (**Psychological Therapy**) ব্যবহৃত হয়

সেগুলি হল ব্যক্তিগত মনশ্চিকিৎসা (Individual Psychotherapy), পরিচালনমূলক যৌথ মনশ্চিকিৎসা (Directive Group Therapy), মনোবৈজ্ঞানিক নাটক (Psychodrama) প্রভৃতি। তবে শুধু মাদকাসক্তকেই চিকিৎসা করলে চলে না তার পরিবারকেও এর জন্য প্রস্তুত করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় পরিবারভিত্তিক মনশ্চিকিৎসা (Family Therapy) বা পরিবারভিত্তিক সুপরিচালনা (Family Counselling).

এই মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হতে দেখা যায়। তবে সাধারণত এটি তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত চলে। এই স্তরে মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদক ছাড়ার যে সিদ্ধান্ত প্রথম স্তরে গ্রহণ করেছিল সেটিতে যাতে সে দৃঢ় থাকতে পারে তার জন্য তাকে সাহায্য (Support) করা হয়। এই সময় মনশ্চিকিৎসক ও পরিচালক ছাড়াও তার প্রয়োজন হয় তার পরিবারের নিকট আত্মীয়, বন্ধু বা নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তির সাহায্য। এই ক্ষেত্রে তার পারিপার্শ্বিক সমাজেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। এরা যদি ব্যক্তিটিকে সুস্থ বলে মনে না করে বা তাকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ না করে তাহলে ব্যক্তিটির পক্ষে মাদক ছেড়ে থাকা প্রায় সম্ভব হয় না বললেই চলে।

অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে মানুষ এমন কি তার নিকট আত্মীয়রাও বিশ্বাস করেন না এবং তাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেন না। তার ফলে মাদক ছাড়ার পরও যখন ব্যক্তিটি তার পূর্ব জীবনে আর প্রবেশ করতে পারে না তখন তার সামনে পুনরায় মাদকে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। সে তখন মাদক ছাড়া আর কোন অবলম্বন পায় না। তাই মাদকই তার জীবনের কেন্দ্র হয়ে থাকে।

এই কারণে মাদকাসক্তির চিকিৎসার একটা বড় অঙ্গ হল পারিবারিক ও সামাজিক পুনর্বাসন। এর জন্য মাদক-সংক্রান্ত বিষয়ে পরিবার ও সমাজের সবাইয়ের কিছুটা সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং মাদকাসক্তের প্রতি অকারণ ঘৃণা বা ভীতির ভাব থাকা উচিত নয়। বরং সে স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে চাইলে তাকে যাতে সর্বতোভাবে সাহায্য করা যায় তার মানসিকতা সবার থাকা দরকার।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্যে আধুনিক মাদকাসক্তির চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি স্বল্পকালীন বাসের জন্য আবাসিক কেন্দ্রের আয়োজন করে থাকে। এই সকল কেন্দ্রে মাদকাসক্তরা ছ' মাস থেকে এক বৎসরের

জন্য থাকতে পারে। এই কেন্দ্রে মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা তাদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার পর বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজ, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাত্রা ও অন্যান্য চিকিৎসাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মাদকবর্জিত একটি সুস্থ জীবনের জন্যে প্রস্তুত হতে শেখে।

আধুনিক দেশগুলিতে বর্তমানে মাদক, মদ প্রভৃতি থেকে মুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের মানসিক দৃঢ়তা বজায় রাখার জন্যে বিভিন্ন সংগঠন তৈরী করেছেন। এঁরা প্রতি সপ্তাহে একবার করে মিলিত হন এবং নিজেদের সমস্যা ও মানসিক অবস্থা খোলাখুলি আলোচনা করেন ও পরস্পরকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেন।

পিতামাতা ও অভিভাবকদের ভূমিকা

বর্তমানে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা না থাকার ফলে অধিকাংশ সময়েই বাড়িতে শিশু একা থাকে এবং পিতা-মাতা উভয়েই চাকরীসূত্রে দিনের প্রায় বেশীর ভাগটাই বাইরে কাটান। তাই যৌথ পরিবারের যে নিরাপত্তা অতীতে শিশু বা বালক-বালিকারা পেত তারা আর তা পায় না। এই সমস্যাটি অত্যন্ত বড় আকারে দেখা যায় বয়ঃসন্ধিকালে। এই সময় কিশোর-কিশোরীরা দেহ ও মনের দিক দিয়ে নানা পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় ও তারা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। এই সময় যদি তারা পিতা-মাতার কাছ থেকে যথাযথ সহযোগিতা, অনু-প্রেরণা ও সাহায্য না পায় তাহলে তারা অল্পেই বিপথে পা বাড়াতে পারে। এই সময়টা তাই পিতা-মাতাদের অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে এবং তাদের সন্তানদের শারীরিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক দিক থেকে যথাযথভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে পিতামাতারা কয়েকটি নীতি অনুসরণ করতে পারেন। যথা—

১। প্রত্যেক পিতামাতাকে তাঁদের সন্তানদের এবং তাদের অনুভূতিকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে নিয়মিত ভাবে কিছুটা সময় অতিবাহিত করতে হবে, তাদের সাহচর্য দিতে হবে, তাদের সমস্যা শুনতে হবে এবং তাদের মানসিক নিরাপত্তার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

২। সন্তানদের কাজ, শিক্ষা, অবসর সময়ের শখ ও তাদের বন্ধুদের সঙ্গে পিতামাতাদের পরিচিত হতে হবে এবং সন্তানদের জীবনে তাদের একটা স্থান করে নিতে হবে।

৩। প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত হল তাদের সন্তানদের সামর্থ্য ও আগ্রহ সম্বন্ধে জানা এবং তাদের সেই অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে উৎসাহিত করা। অনেক

সময় দেখা যায় যে সন্তানেরা যা চায় পিতামাতা তা চান না বা তাদের কাছ থেকে তাঁরা এমন কিছু প্রত্যাশা করেন যা দেওয়ার ক্ষমতা সন্তানদের নেই। তার ফলে যখন কিশোর-কিশোরীরা পিতামাতার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না তখন যেমন তারা নিজেরা হীনমন্যতার শিকার হয় তেমনই পিতামাতার হতাশা বা অতিরিক্ত চাপ তাদের মধ্যে বিকৃতির সৃষ্টি করে এবং তারা এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে চায়। মাদক তাদের কাছে এই রকম একটা মুক্তির পথ খুলে দেয়।

৪। পিতামাতারা যেন নিজেরা মাদক গ্রহণ না করেন। তাঁরা যদি তাঁদের সন্তানদের সামনে সুন্দর ও সুস্থ জীবনের আদর্শ স্থাপন করতে না পারেন তাহলে তাঁদের সন্তানদের কাছেও তাঁরা সৎ ও সুস্থ থাকার প্রতিশ্রুতি পেতে পারেন না।

৫। প্রত্যেক পিতামাতাকে তাঁদের সন্তানদের শারীরিক সমস্যাগুলি যেমন জানতে হবে তেমনি তারা কি ওষুধ ব্যবহার করে বা বাড়িতে কি ওষুধ আনে সে সম্বন্ধেও জানতে হবে।

৬। এসব ছাড়াও প্রত্যেক পিতামাতাকে মাদকের প্রকার, প্রকৃতি, লক্ষণ, চিকিৎসা প্রভৃতি সম্বন্ধে জানতে হবে। অধিকাংশ পিতামাতাই ড্রাগস বা মাদক নিয়ে আলোচনা করতে চান না, কারণ তাঁরা মনে করেন যে তার ফলে তাঁদের সন্তানেরা মাদকের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়বে এবং মাদকাসক্ত হবে।

কিন্তু এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। মাদক ও তার কুফল সম্বন্ধে জ্ঞান মাদকাসক্তি থেকে মানুষকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করে। এই জন্য প্রত্যেকেরই মাদক সংক্রান্ত কতকগুলি সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং এ সম্বন্ধে তাদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার।

শিক্ষার ভূমিকা

বিদ্যালয় বিশেষত উচ্চবিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকাসক্তির প্রচলন প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। কারণ ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই মাদকাসক্তির প্রভাব সব থেকে বেশী। এই কারণে মাদকবিরোধী প্রচার ও ব্যবস্থাগ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে।

শিক্ষা যেমন শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সমতা ও তৃপ্তি দেওয়ার আয়োজন করবে তেমনই তাদের ওপর কোন কারণেই

অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে না। শিক্ষার্থীদের বিকাশ প্রক্রিয়াকে সাহায্য করতে শিক্ষকদেরও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করতে হবে এবং তাদের মানসিকতাকে বুঝতে হবে।

এই ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে সঙ্গে যেটি অত্যন্ত আবশ্যক তা হচ্ছে মাদকসংক্রান্ত শিক্ষার আয়োজন করা। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে শিক্ষার্থীদের মাদক কি, কয় প্রকারের মাদক হয়, তার কুফল কি, মাদকে আসক্ত হলে কিভাবে তাতে মানুষ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং মাদকাসক্তির চিকিৎসা প্রভৃতি সম্বন্ধে জানতে হবে। এর জন্যে বিদ্যায়তনগুলিতে মাঝে মাঝে মাদক সংক্রান্ত আলোচনাচক্র, ক্লাস প্রভৃতির আয়োজন করতে হবে।

মাদক সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির আরও একটি বড় মাধ্যম হল প্রদর্শনীর আয়োজন করা। বর্তমানে মাদকবিরোধী পথসভা, পদযাত্রা, আলোচনাচক্র, শ্লোগান বা পোষ্টার প্রতিযোগিতা প্রভৃতি করা হয়। যে সকল শিক্ষার্থীর বয়স ১৪ থেকে ২৫'র মধ্যে তারা যাতে এই অনুষ্ঠানগুলিতে সক্রিয় ভাবে অংশ নিতে পারে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করাও বিদ্যায়তনের একটা বড় দায়িত্ব।

মাদক ও এড্‌স্

বর্তমানে মাদকের সঙ্গে আর একটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটি হল এড্‌স্ (AIDS)। এড্‌স্ বলতে "অর্জিত প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবজনিত কারণে সৃষ্ট লক্ষণসমূহকে" বোঝায়। ইংরাজীতে এড্‌স্ (AIDS) কথাটি এসেছে **'Acquired Immuno-Deficiency Syndrome'** থেকে। এটি একটি ভাইরাস ঘটিত সংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধিটি ব্যক্তির মধ্যে নানা লক্ষণ বা চিহ্নের মাধ্যমে দেখা যায়। এই ভাইরাস ব্যক্তির দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয় এবং তার ফলে ব্যক্তি যে কোন অসুখে আক্রান্ত হতে পারে এবং তার ফলে তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এমন কি খুব সাধারণ অসুখও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে এবং ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এড্‌স্ আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রোগের ভাইরাসের নাম এচ্-আই-ভি (HIV)। এড্‌স্ রোগের কোন চিকিৎসা আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করতে পারেন নি এবং এর কোন প্রতিষেধকও নেই।

এড্‌স্ নানা ভাবে মানুষের দেহে সংক্রামিত হতে পারে। এটি প্রধানত রক্তবাহিত রোগ এবং রক্তের মধ্যে দিয়েই এটি সংক্রামিত ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে যেতে পারে। রক্ত ছাড়াও পুরুষের শুক্রে ও স্ত্রীলোকের যোনিস্রাবে

এড্স্ রোগের ভাইরাস পাওয়া যায় এবং তা থেকে যৌনমিলনের মধ্যে দিয়ে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

যদিও এড্স্ বিভিন্ন ভাবে সংক্রামিত হতে পারে তবু মাদকাসক্তির সঙ্গে এর একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। দেখা গেছে যে যারা ইন্জেকসানের মাধ্যমে মাদক নেয় তারা যদি সকলে একই ইন্জেকসান সিরিঞ্জ ব্যবহার করে তাতে একজন যদি এড্স্-এ সংক্রামিত থাকে তবে তার থেকে রক্তের মাধ্যমে অন্যেরাও এড্স্-এ আক্রান্ত হতে পারে।

এই কারণে যারা মাদকাসক্ত বিশেষত যারা ইন্জেকসানের মাধ্যমে হিরোইন বা অন্য কোন মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে তাদের মধ্যে এডস হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। বর্তমানে দেখা গেছে যে সব মাদকাসক্ত ব্যক্তি একই ছুঁচ বা সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক দেহে গ্রহণ করছে তাদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যক ব্যক্তি এইচ-আই-ভি-তে আক্রান্ত হতে পাবে এবং আশঙ্কা করা যেতে পারে যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাদেব মধ্যে এড্স্-এর লক্ষণগুলিও পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে।

এই তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি যখন দেখি যে ভারতেরই পূর্ব সীমান্তরাজ্য মণিপুরে যেখানে মাদকাসক্তি অত্যন্ত ভয়াবহ আকার নিয়েছে, সেখানে ইন্জেকসানের মাধ্যমে যারা হিরোইন গ্রহণ করে তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশেরও বেশী ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষায় এইচ্-আই-ভি'র সন্ধান পাওয়া গেছে।

বিদেশেও দেখা গেছে যারা মাদকাসক্ত তাদের মধ্যে এইচ্-আই-ভি'র সংক্রমণ থেকে এড্স্-র বহিঃপ্রকাশ হতে অন্যান্য এইচ্-আই-ভি-আক্রান্ত ব্যক্তিদের তুলনায় কম সময় লাগে। এই কারণে মাদকাসক্তদের অন্য ব্যক্তিদের তুলনায় এড্স্-এ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

মাদকাসক্তদের জন্য এড্স্-সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া যেমন দরকার তেমনই তাদের জানা দরকার যে এড্স্-র কোন চিকিৎসা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। অতএব এড্সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে মানুষের আচরণকে পরিবর্তন করতে হবে। বিশেষত যে সকল মাদকাসক্ত ইন্জেকসানের মাধ্যমে হিরোইন বা কোকেন গ্রহণ করে তাদের এই অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। এটি যদি কোন কারণে সম্ভব না হয় তাহলে দেখতে হবে একই ছুঁচ যেন একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার না করে।

তাও যদি বন্ধ করা সম্ভব না হয় তবে ছুঁচটি একজনের ব্যবহারের পর যেন তা পরিস্রুত জলে বা ব্লিচিঙের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করে তবেই অপরে ব্যবহার করে।

এছাড়া ইন্‌জেকসানের মাধ্যমে মাদকগ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-গুলিও গ্রহণ করা দরকার।

প্রথম, এড্‌স্ সংক্রান্ত তথ্যের আদান প্রদান ও পরস্পরের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা।

দ্বিতীয়, এইচ্‌-আই-ভি'র জন্য রক্ত পরীক্ষা ও তার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক প্রস্তুতি।

তৃতীয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া যার সাহায্যে তারা সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিগুলি মেনে চলতে পারে।

প্রশ্নাবলী

১। মাদকাসক্তি বলতে কি বোঝায়? এর কি কি লক্ষণ? কিভাবে এই আসক্তি দূর করা যায়?

২। মাদকদ্রব্য বলতে কোন্ কোন্ পদার্থকে বোঝায়? কিভাবে এই দ্রব্যগুলি ব্যক্তিকে আসক্ত করে বর্ণনা কর।

৩। মাদকাসক্তি ও এড্‌সের সমস্যাটি আলোচনা কর। এর প্রতিবোধ কি ভাবে করা সম্ভব?

———